অন্বেষা
(নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ)
দ্বিতীয় খণ্ড
সম্পাদনা
নিধুভূষণ হাজরা
দেবব্রত দেবরায়

অন্বেষা

(নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ)

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনায় —

নিধু ভূষণ হাজরা

দেবব্রত দেবরায়

উত্তরণ

পুরান কালাবাড়ী লেন, কৃষ্ণনগর

আগরতলা - ৭৯৯ ০০১, ত্রিপুরা।

Anwesa –

A collection of Essays Vol.-II

Edited by : Nidhu Bhushan Hazra
Debabrata Debroy

Old Kalibari Lane
P.O. : Agartala- 799 001, Tripura
Tel. : 0381-232-2074

Price : 125/-

প্রথম প্রকাশ : ২৬শে জানুয়ারী ২০০৫

প্রকাশক : দীনেশ চন্দ্র সাহা

প্রচ্ছদ : অপরেশ পাল

আলোক চিত্র : রবীন সেনগুপ্ত

অলঙ্করণ : সুশান্ত শঙ্কর হাজরা

অক্ষর বিন্যাস : সানগ্রাফিক্স, গণরাজ চৌমুহনী
আগরতলা । ফোন - ২৩২৮৪৬৯

মুদ্রণ : অনিল লিথোগ্রাফি কোং
১৩, শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মূল্য : একশ পঁচিশ টাকা মাত্র ।

সূচীপত্র

সমীপেষু—

অন্বেষা প্রথম খণ্ডের পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। গত বৎসর ২০০৪ সালে প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় সংশয় সঙ্কোচ দুই ছিল। সেই সংশয় ছিল বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং পাঠকগণ অন্বেষাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন তাকে কেন্দ্র করে। এবার সেই সংশয় কিছুটা কেটেছে পা বাড়ালেই রাস্তা পাওয়ার মত। গতবার প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল একুশটি, এবার সেই সংখ্যা বেড়েছে উনত্রিশটি। কোন কোন মান্য প্রবন্ধ লেখক এবারও অন্বেষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। পাঠক বর্গ থেকে কোন লিখিত মতামত না পেলে ও পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কোন কোন পত্রিকা অন্বেষার কিছু কিছু লেখা সম্পর্কে উত্তম প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন।

ত্রিপুরায় স্বাধীনতা উত্তর ষাটের দশকে 'উত্তরণ' সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে শুরু থেকে অনেক সাহিত্য প্রেমী বার বার চেষ্টা করেও ত্রিপুরায় কোন একটি নিয়মিত সাহিত্য সাময়িকির স্থায়িত্ব দিতে পারেন নাই। এটাকে ব্যর্থতা ধরে নিয়েও বলা যায় বাংলা সাহিত্যের এখানে ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রয়েছে। আমাদের স্বীকার করতে হয় যে এই অক্ষুন্নতা রক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার দৈনিক পত্রিকাগুলোর সাপ্তাহিক 'সাহিত্য শিল্প বিভাগ' বিশেষভাবে দায়বদ্ধতা পালন করে চলেছে।

বর্ত্তমানে সাহিত্যের অখণ্ডতা স্বীকার করে নিয়েও ত্রিপুরার সাহিত্য তিনটি ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে — বাংলা, ককবরক এব দলিত সাহিত্য। গত ৮ই জানুয়ারী ২০০৫ বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের রাজ্য গুলোর প্রায় দু'শ কবির কবিতা সংকলন প্রকাশের রবীন্দ্রভবনে উৎসব হয়েছে। অন্বেষা এই ধারাকেই স্বাগত জানাচ্ছে। সাহ্যিতের বিভিন্ন ধারা এবং গোষ্ঠীবদ্ধতা বিজ্ঞান সম্মত ও প্রয়োজনীয়। এই প্রক্রিয়া সাহিত্যকে উত্তরণে সহায়তা করে।

গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বরাক উপত্যকা ও উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল সাহিত্য সংগঠন থেকে ত্রিপুরাকে বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভূবন আখ্যা দেবার প্রচেষ্টাও দানা বাঁধার চেষ্টা চলে আসছে। এটা শুধু কোন সাহিত্য সংগঠন বা জনগোষ্ঠির শ্লোগান বা অনুকম্পা নয়। সাহিত্যের উৎকর্ষতা, মেধা এবং মানবিক মূল্য বোধ একান্ত কাম্য। এখানে বিভিন্ন জাতীগোষ্ঠীর বিচিত্র মিশ্র সংস্কৃতির ও ভাষার জীবন ধারা বরাক লৌহিত গোমতির বিচিত্র জনস্রোতে মিশে আছে। উহা বাংলা সাহিত্য ধারাকেই সমৃদ্ধ করবে। তেমনিভাবে ঝাড়খণ্ড সহ পশ্চিমাঞ্চলে বাংলা ভাষাও সাহিত্য দুকুল ছাপিয়ে উঠুক অন্বেষা এমন স্বপ্ন দেখে।

রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার ক্ষেত্রে দেশ ভাগ দুর্ভাগ্যজনক। 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' এমন দু' একটা উপন্যাস ছাড়া এই বিরাট অঞ্চল এবং জন সাধারণ বাংলা সাহিত্যে ছিল উপেক্ষিত। ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর শুধু ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি বিশ্বে বিরল ঘটনা। বিগত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের নিয়মিত চেষ্টায় বাংলাদেশের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এত কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা, ছোট গল্পকার কোথায় ছিল? আজ বিরাট কলরবে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র সংঘের অন্যতম ভাষা। কলকাতা ও ঢাকা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমপর্যায়ে উচ্চারিত এবং আগরতলাকে মেধা, উৎকর্ষতা ও সামগ্রীক জীবন চর্চার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বাংলা দেশের আলোড়নকারী উপন্যাস নোবেল কমিটির দরবারে উপস্থিত হয়েছে।

সৌরপতি সূর্যশাসিত আমাদের প্রিয় পৃথিবী একবিংশ শতাব্দীতে নবতর প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের শাসন নিয়ে মানব সভ্যতার সম্মুখে উপস্থিত। তার গভীরতর প্রভাব পড়ছে মানব সমাজের উপর। সুতরাং বাংলাসাহিত্য ও সমাজ তার বাইরে নয়। তার বিশেষ প্রতিফলন ঘটবে আমাদের সাহিত্যের ধারক ও বাহকদের উপর। তাই সাহিত্যের সত্য মূল্য দেবার দায়বদ্ধতা বর্ত্তমান।

সাম্প্রতিক সুনামী ধ্বংসলীলা আমাদের বেদনাহত করছে। ত্রিপুরাতে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তড়িৎমোহন দাসগুপ্ত, নৃপেন চক্রবর্ত্তী, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের প্রয়ানে আমরা শোকাহত। তাঁদের সাহিত্য প্রীতি ও লেখালেখি ত্রিপুরার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা তাঁদের গভীরভাবে স্মরণ করছি।

নিবেদক —
নিধুভূষণ হাজরা
দেবব্রত দেবরায়
সম্পাদকদ্বয়

আগরতলা,
২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

ত্রিপুরার লোক সংস্কৃতি উন্নয়নের পথ

— শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা

লোকসংস্কৃতি শব্দটি, ঠিক কি বুঝায় তা' নিয়ে বহু বিতর্ক বর্তমান। সে সব বিতর্কের ঘুর্নাবর্তে প্রবেশ না করে, সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা যা বুঝি সেদিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে একটু ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন আছে বলে অবশ্যই স্বীকার করি ।

ইংরেজী 'কালচার' এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। আচার্য ক্ষিতীমোহন সেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শিল্পসম্বন্ধীয় একটি বাণী থেকে (আত্মসংস্কৃতির্ভাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা ঐতের্যমান আত্মানং সংস্কুরুতে) 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর মতে 'ঐতরেয় ছিলেন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির একটি অপরূপ ও লোকসংস্কৃতি মহনীয় সমন্বয়' । 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি' নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হলেও শেষ পর্যন্ত 'সংস্কৃতি' শব্দটিকেই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং আজও তা' চালু আছে । 'সংস্কৃতি' শব্দটির পূর্বে 'লোক' শব্দটি প্রয়োগ করে যে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি গঠন করা হয়েছে, তাতে লোকজীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দিক অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে । শুধুমাত্র সাহিত্য এবং শিল্পকর্মই নয়, জনজীবনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বস্তুপুঞ্জও এতে এসে যায় ।

'সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্তর'-এই শিরোনাম আমরা পাচ্ছি ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ এর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে । মানুষের 'মানুষ' হয়ে উঠার যে প্রয়াস - যাতে শিকারের জন্য পাথরের অস্ত্র থেকে শুরু করে লোহার হাতিয়ার, ঝুড়ি থেকে মাটির বাসন, ধাতুপাত্র, তীর-ধনুক, আগুনের ব্যবহার আবিস্কার ইত্যাদি এবং পাশাপাশি উচ্চারিত ভাষা ও ছন্দে গীত-সঙ্গীত সৃষ্টির দিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ হিসাবে আলোচনায় এসেছে । সুতরাং, 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি যখনই প্রথম ব্যবহৃত হোক না কেন, জনজীবনের মধ্যে নিহিত । অবশ্য লোককথা, লোকসাহিত্য ইত্যাদি মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে । লিখন পদ্ধতির ব্যাপারটা অনেক পরের এবং পরবর্তী সময়ে লিখিত সাহিত্য হিসাবে কিছু অংশকে আমরা পাই ।

আসলে আদিম সমাজে প্রাথমিক অবস্থায় - বন্যবস্থা ও বর্বর যুগে - অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম ছিল মুখ্য এবং এই সংগ্রামের ফলে ধীরে ধীরে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং সমাজ

সংগঠন গড়ে তোলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিকশিত হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সামাজিক চেতনাও বিবর্তিত হয়। এঙ্গেলসের মতে 'রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিকাশধারা অর্থনৈতিক বিকাশধারার উপরেই নির্ভরশীল, কিন্তু এরা সকলেই পরস্পরের উপরে এবং সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে' (এইচ্ স্টার্কেনবুগকে লেখা চিঠি, সিলেক্টড ওয়ার্কস, ২য় খণ্ড)। কৃষিযুগ আসার পর, বিশেষতঃ এযুগের বিকাশকালে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেল। উদ্বৃত্ত সম্পদ নতুন শ্রেণীর জন্ম দিল, যারা পণ্য বিনিময়ে ব্যাপৃত থাকত। পাশাপাশি অনেক আগে থেকেই 'সর্বপ্রাণবাদ' চালু হয়েছিল এবং প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি থেকে ধীরে ধীরে দেবতাদেরও তৈরী করা হল। ঐ সঙ্গে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে নারীদের একটা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে নানাধরণের ক্রিয়াকর্মও প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবে সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও সবই অন্তর্ভূক্ত হল।

আমাদের ভারতবর্ষে আর্য আগমনের পূর্বে যে প্রাঘার্য, সংস্কৃতি ধারা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিস্কৃত হয়েছে তা থেকে বুঝ যায় যে, কৃষিভিত্তিক সভ্যতার মাতৃদেবীর প্রাধান্য কারণ মাতৃকামূর্তি অনেকগুলি সেখানে পাওয়া গেছে। পরবর্তী আর্য সংস্কৃতি প্রাগার্য সংস্কৃতির ধারার সংশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির কাঠামো তৈরী করে দিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতায় যে তিনটি নগরগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল বলে গবেষকরা মনে করেন তা হল, আদি-অষ্ট্রেলিয়, ভূমধ্যসাগরীয় ও (এরাই দ্রাবিড়ভাষী) এবং আল্পীয়। কিন্তু এরা ছাড়াও ভারতের পূর্বাঞ্চলে অষ্ট্রিক, ভোট-বর্মীজ, মঙ্গোলয়েড, মন্-সংস্কৃতিখমের ইত্যাদি নরগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছিল বলে গবেষকরা দেখিয়েছেন। ভারতের ন্যায় এবং সে সব স্থানেই নতুনভাবে অবস্থান করে। তাদের অনেকের যাযাবর ধর্ম বিদ্যমান ছিল, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে জুম চাষ একমাত্র সহায় হওয়ার ফলে যে সব পাহাড়ে বা টিলায় প্রথম অবস্থান ছিল, সেখান থেকে কিছুদিন পর পর-ই স্থান পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কিন্তু এর মধ্যেও তাদের সংস্কতিকে তারা বহমান রেখেছে, বিকশিত করার প্রয়াস নিয়েছে।

ত্রিপুরা 'ত্রিপুরা উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি' আলোচনায় ডঃ অনাদি ভট্টাচার্য বলেন "ছোট এই ত্রিপুরা রাজ্যে তিন ধরণের প্রসঙ্গে .... ক) উপজাতি জনগোষ্ঠী - নিগ্রোবটু দাক্ষিণিক এবং মঙ্গোল দেখতে পাওয়া যায়। খ) এদের মধ্যে মঙ্গোল রক্তসম্ভূত উপজাতি জনগোষ্ঠীই প্রাণ। গ) মঙ্গোলীয় উপজাতি জনগোষ্ঠীকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় - ১) তিপ্রা জনগোষ্ঠী ২) অন্যান্য অ-তিপ্রা জনগোষ্ঠী।" (অন্বেষাঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ) ত্রিপুরা রাজ্যের কথায় যে মুহুর্তে আমরা এসে পড়ি, তখন-ই এক মিশ্র

সংস্কৃতির ধারায় নিজেদের অবস্থানকেও আমরা চিনে নিতে পারি। সংস্কৃতি যদি আমাদের পরিচিতিকে তুলে ধরে, তাহলে ত্রিপুরার মানুষ হিসাবে সেই মিশ্র সংস্কৃতির রূপকেও একটু দেখতে হয় ।

আসলে আজ যাকে আমরা গ্রামীণ বা লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃতিমূলক কার্যধারা হিসাবে চিহ্নিত করছি, সে ধারার জন্মদাতা প্রাথমিক বিকাশের পথে এগিয়ে আসা মানুষ থেকে শুরু করে আজকের গ্রাম পাহাড়ের মানুষ । ত্রিপুরা রাজ্যে সমতলের গ্রামগুলি এবং গ্রামের গন্ধমাখা অনেকগুলি শহর পাহাড় ও পাহড়গুলির মানুষ যেসব সাংস্কৃতিক পরিচয়ে নিজেদের মেলে ধরে, সে সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রয়াসের ফসলগুলি নিয়েই ত্রিপুরার সংস্কৃতি আপন বিকাশের পথে এগিয়ে চলে । যদিও এসব সাংস্কৃতিক প্রয়াসক্ষেত্রে প্রাচীন বহু উপাদান আজ চিহ্নিত হয়ে গেছে বা নিশ্চিত হওয়ার পথে । কিছু কিছু উপাদনগুলিকে সজীব করে রাখার চেষ্টা ইদানিংকালে অবশ্যই দেখা যায় ।

রাজন্য শাসনকালে ত্রিপুরার জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে কোন উদ্যোগ ছিল না । বাংলা ভাষা ছিল রাজ্য ভাষা । রাজার ধর্ম এবং ভাষাই প্রজার ধর্ম এবং ভাষা - এই সামন্তাশ্রয়ী ধারণা থেকেই আদি জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ঔদাসীন্য সহজেই লক্ষ্য করা যায় । শ্রদ্ধেয় বিজনবিহারী পুরকায়স্থের মতে, "উপজাতি জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন মধ্যে 'জনশিক্ষা সমিতি' ও 'গণমুক্তি পরিষদ' এর সংস্কারমূলক আন্দোলনেরকালে বিংশ শতকের চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে তার সূত্রপাত বলা চলে" (ত্রিপুরাঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত) জনশিক্ষা সমিতির শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন উপজাতি সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের সাথে যুক্ত । মূলতঃ কৃষিজীবনকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্প সবদেশেই গড়ে উঠেছে । ত্রিপুরাও এর ব্যতিক্রম নয় । জুমনির্ভর জীবনে স্বাভাবিকভাবেই অনগ্রসর কৃষিসমাজের মূল কামনা শস্য ও সন্তান । আর তারজন্য লোককথা ও লোককাহিনীতে ইন্দ্রজালের অবতারণা ও লক্ষ্য করা যায় । স্নেহভাজন রমেন্দ্র নারায়ণ পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকেও একধরণের ইন্দ্রজালস্বরূপ আমরা বুঝে নিতে পারি ।

ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একদিকে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে তার বিকাশের দিক । অন্যদিকে উপজাতি সংস্কৃতি । এই জনসংস্কৃতির দু'টি ভাগই পৃথক পৃথকভাবে দেখার প্রয়োজন । অবশ্য এর সঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতি, মি-তেই মণিপুরী সংস্কৃতি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সংস্কৃতি, হিন্দুস্থানী ও নেপালী সংস্কৃতির ধারা এসেও যুক্ত হয়েছে ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আগ্রহকেই লোকসংস্কৃতি চর্চার এক পূর্ণরূপ আমাদের দেশে বিদ্যমান । ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সম্পর্ক ছিল, তা আমাদের ভাব ও চিন্তার

জগতে এক নতুন আলোক সঞ্চার করেছে ত্রিপুরার লোকজীবনের সঙ্গে খুব পরিচিতি না ঘটলেও, রাজ পরিবারের অতিথি হিসাবে ত্রিপুরাকে আপন করে নেওয়ার রবীন্দ্র মনোধর্ম আমরা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করি ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ ইত্যাদির পরিণতিতে ত্রিপুরায় বাঙ্গালী জনসমাজের সংখ্যা অনেক পরিমানে বেড়ে যায় । পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চল থেকে সারা ত্রিপুরায় এলেন, তারা তাদের সংস্কৃতিগত উপাদানগুলি সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং ত্রিপুরায় বসবাসের সূত্রে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাত্রাপ্রণালী ও কর্মপ্রয়াসের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে, ফলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে । শ্রীহট্ট অঞ্চল বা ঢাকা-নোয়াখালি ইত্যাদি অঞ্চলসমূহে থেকে সারা ত্রিপুরায় এসেছেন, তারা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একই ঐতিহ্যের বাহক হলেও বাঙালী বিভিন্ন লোকাচার বিশেষতঃ স্ত্রী-আচার, লোককথা বা অন্যান্য উপাদান সমূহে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না এমন জনজীবনে নয় । কিন্তু ত্রিপুরায় আসার পর দীর্ঘদিন একসঙ্গে বসবাসের সূত্রে পার্থক্যগুলি কমে আসছে । পরবর্তী সময়ে লোকধারা ত্রিপুরার উত্তর, দক্ষিণ,পশ্চিম ইত্যাদি জেলাভিত্তিক পার্থক্য ছাড়া অন্য পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে না । এবং সে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে বাঙ্গালী জনসমাজ এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিল, তার অনের চিহ্নই বিলুপ্তির পর্যায়ে । সরকারী এবং ইদানীং কিছুটা বেসরকারী স্তরেও বিলুপ্তি থেকে এসব অনেক উপাদানকে রক্ষা করার একটা প্রয়াস সত্যিই প্রশংসার। উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে তৎকালীন পূর্ববাংলার শ্রীহট্ট জেলা থেকে অনেকেই এসেছেন। ঐ অঞ্চল থেকে মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন আচার এবং নানা অনুষ্ঠানে 'গীত', 'ধামাইল' ইত্যাদি খুবই জনপ্রিয় । অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বিয়ে, অন্নপ্রাশনসহ বিভিন্ন ধরণের পূজায় একসঙ্গে গোল হয়ে বসে রাধাকৃষ্ণের মিলনমূলক বিষয়, ছেলের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার কথা, বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম নিয়ে গান গাইতেন, এগুলোই 'গীত' । সুর অনেকটা একই রকম, মাঝে মাঝে রকমফের শোনা যেত। ইদানিং গ্রামাঞ্চলেও এটা প্রায় লুপ্ত । 'ধামাইল' গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তিন পদক্ষেপের মাধ্যমে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গান করা হয় । এসব গানেও উপরের বিষয়বস্তুকেই পাওয়া যায় । ধামাইলে লোকসংস্কৃতির রাধারমণের ভনিতাযুক্ত সঙ্গীতের প্রাচুর্য লক্ষণীয় । এছাড়া মাঘ মাসের প্রতি রবিবার মাঘমণ্ডল এবং সূর্যব্রত করা রূপ হত। সূর্যব্রতের ক্ষেত্রে ব্রত যিনি রাখেন, তাকে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী একটি রূপ উত্তর ত্রিপুরা প্রদীপকে বারে বারে ফেরাতে হয় । এছাড়া, আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে 'ধানের সাধ' দেওয়া হয়, লক্ষ্মীর পূজা হয়; চালতা পাতার মধ্যে সুন্দা, মেথি, বেলপাতা ইত্যাদি রেখে মাঝখান থেকে পাতা বন্ধ করে করে ঘরের চালের মাথায়, জমির ধানে ও অন্যত্র একটি ছড়ার আকারে কিছু শব্দ উচ্চারণ করে

(সুন্দা, মেতি, বেলের পাতা/হিজা মেলে আড়াই হাত...) রাখা হয় কার্তিক সংক্রান্তিক ভোলা সংক্রান্তিক হিসাবে চিহ্নিত করে ঘরের চারদিকে একটি কুলোয় বাঁশ দিয়ে আঘাত করে দৌড়াতে হয়ে, মুখে 'ভোলা চাড় ভোলি ছাড়/ বারমাইয়া পিছাইয়া ছাড়...' ইত্যাদি বলতে হয় । আসলে কৃষিজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এসব আচার অনুষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত । ভূমিসম্পর্কের মধ্যে নানা পরিবর্তন (বলা ভাল উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন) এবং ঐ সঙ্গে জীবনযাত্রা প্রণালীও পরিবর্তিত হওয়ার ফলে এসব অনুষ্ঠান বিলুপ্তির পথে। কার্তিক শেষে 'ভোলা বা অমঙ্গল' তাড়ানোর নামে যা করা হত, তা তো প্রাচীনকালের গোষ্ঠীসমাজের ম্যাজিক ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুই নয় । এসবও প্রায় লুপ্ত । চৈত্রের 'গাজন' যা' চালু আছে তা' অনেকটাই আদিরূপ (Form) বজায় রেখেছে মনে হয়, মনসামঙ্গলের 'ওঝার গান' বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে মনসা পূজার সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে দেখা যেত, তা-ও প্রায় লুপ্ত । ইদানীং এগুলোকেই তুলে ধরার চেষ্টা অবশ্যই লক্ষ্য করা যায় । পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় কিছু কিছু রূপবদল করে নানা অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, ত্রিপুরায় স্বাভাবিকভাবেই নয়া বসতে এগুলো অনেকটাই এসে গেছে । এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইসলাম ধর্মাশ্রিত মানুষের সংস্কৃতিগত কর্মকাণ্ড । পূর্ববাংলায় যেসব জারি, সারি, দেহতত্ত্বমূলক, বাউল, মুর্শিদী, মারফতি ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের উপাদানগুলি বর্তমান ছিল, তা ত্রিপুরার বাঙ্গালী জনসমষ্টির মধ্যে চালু আছে । এখানে হিন্দু বা মুসলিম এই বিভেদ প্রায় নেই । বিভিন্ন সঙ্গীত, আচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যও লক্ষ্যনীয় । বিয়ের গান, বিয়েতে কনে সাজানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রং-এর ব্যবহার এমনকি কিছু কিছু স্ত্রী-আচারের মধ্যেও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় ।

প্রসঙ্গতঃ, মণিপুরী জনগোষ্ঠীর কথাও একটু বলে নিতে হয় । বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত 'রাসলীলা' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে মি-তেইদের মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস ছিল তা' অনেক প্রাচীন 'সর্বপ্রাণবাদ' থেকে জাত বলে মনে হয় । এখনো তাদের মধ্যে সেই ধর্মবিশ্বাস সঞ্জাত সাংস্কৃতিক কর্মাকাণ্ড যা প্রচলিত, তার মধ্যে 'লেই হারাউবা', 'থাবলা চোংবী' প্রভৃতি অন্যতম । লেই মণিপুরী হারউবা আসলে সৃষ্টি তত্ত্বের ধারণা নিয়ে প্রচলিত । জল থেকে শুরু করে বিভিন্ন বস্তুপুঞ্জ এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে মানুষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির কথাই এর প্রতিপাদ্য । নারী ও পুরুষ দেবতার (পানতইবি এবং নংপখনিমতৌ) উদ্দেশ্যে এই নৃত্য । সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মি-তেই 'উমাংলেই' নামক দেবতাকে পাওয়া যাচ্ছে । আসলে কৃষিযুগের বিভিন্ন দেবদেবীর আজও প্রতিষ্ঠিত 'পানতইবি' (লক্ষ্মী!) ধান্যদেবতা এবং 'লামিইকিজগয়' কাপড় বোনার দেবতা । প্রাচীনকাল থেকেই হাতে কাপড় বোনা শুরু হয় । ধান রোপণ বা ধান কাটা গ্রামের সবাই মিলে করত । এটা

একটা সমন্বিত দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করা হত । লোককাহিনী 'খাম্বা থৈবী ' এবং লোকনৃত্যগুলি ('লৈমা জগোই', 'লৈসেম জগোই', 'মাইবি জগোই', 'কুনং জগোই') আজও প্রসিদ্ধ । এর মধ্যে 'খুনুং জগোই' কৃষির সঙ্গে যুক্ত ।

'থাবাল চোংবী' চন্দ্রালোকিত রাত্রে যুবক-যুবতীদের নৃত্য । এটাও মূলতঃ ধর্মীয় নৃত্য । মি-তেইদের মধ্যে পরমপিতা বলে আখ্যায়িত 'সরাবেল-সিদেব' এর যে লোককথা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে শিব-দুর্গা-কার্তিক-গণেশের নামে বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রচলিত একটি লোককথার অদ্ভুত সাদৃশ্য চোখে পড়ে । ১০৩ বার পৃথিবীর প্রদক্ষিণের মাধ্যমে পিতার সিংহাসন প্রাপ্তির এই লোককথায় দুর্বল ছোট ছেলে 'পাখাংবা' মায়ের আদেশে পিতাকে প্রদক্ষিণ করে সিংহাসন লাভ করে পৃথিবীর রাজা আর বড় 'সানামায়ি' পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেও পর্যন্ত পিতার বরে গৃহদেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠাই এর মূল প্রতিপাদ্য ।

বাদ্যযন্ত্র হিসাবে 'পে-না' (ভায়োলিন বা সেতারের মতো) ছাড়া 'লৈই হারাউবা'-তে কিছু থাকে না । মৃদঙ্গ সহযোগ অন্যান্য নৃত্য হয়ে থাকে । 'পুং-চলম্' তো মৃদঙ্গ বাজনার মাধ্যমে নৃত্য এবং এটা ধ্রুপদ নৃত্য । খুলং ঈশে, খুজুং ঈশে, পে-না খুং-জোম ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের ধারা আজও মণিপুরীদের মধ্যে জনপ্রিয় ।

উপজাতি ত্রিপুরায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় মেলে । তবে লোকসংস্কৃতির জনগোষ্ঠী যে ধারা অতীতকাল থেকে তাদের মধ্যে ছিল, তার পরিচয় একেবারেই মেলে না, তা-ও নয় । তাদের ঐক্যবোধ প্রাচীন গণশাসনের মধ্যেকার ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।

এবার ত্রিপুরার দু'একটি উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির কথা । ত্রিপুরায় বসবাসকারী ১৯টি উপাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় প্রধানতঃ যারা বসবাস করেন, তাদের মধ্যে ত্রিপুরী, হালাম, রিয়াং, চাকমা, লুসাই, খাসিয়া এবং চা-বাগানের কাজের সূত্রে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও এবং ভীলদের সাংস্কৃতিক পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এদের মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে একেবারে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলে নিতে চাই।

উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী ত্রিপুরীরা । ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর বড়ো শাখার কক্‌বরকভাষী এই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি রাজদরবার থেকে শুরু করে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত । বাঙ্গালীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আদান প্রদান প্রাচীনকাল ত্রিপুরী থেকেই লক্ষ্য করা যায় । চতুর্দশ দেবতার পূজায় (খার্চি) যে দেবতাদের পাওয়া যায় তারা ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত (হর, উমা, হরি, মা, বাণী, কুমার, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথ্বী,

গঙ্গা, সমুদ্র, হিমালয়, কামদেব, অগ্নি) এবং এতে বৈদিক ও তান্ত্রিকরীতির সঙ্গে আরো নানাধরণের পূজার্চনারীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে বলেও কেউ কেউ মনে করেন (পুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ত্রিপুরার রাজমালা)। কের, গড়িয়া, তুইমা, মতাইকতর প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার সঙ্গে একটি মিশ্রণসংস্কৃতির ধারা লক্ষ্যনীয়। তাদের নৃত্যে বাস্তবজীবনে অনুসৃত শিকার, কৃষি (জুম) এবং ধর্মীয় কাজকর্ম প্রকাশিত। গড়িয়া, লেবাং বুমানি, মামিতা, মসকসুমানি ইত্যাদি নৃত্যগুলির মাধ্যমে ত্রিপুরীদের জীবনধর্ম ফুঠে উঠে।

ত্রিপুরার প্রায় সব উপজাতি জনগোষ্ঠী জুম নৃত্যের মাধ্যমে নিজেদের জীবনধারাকে ফুটিয়ে তুলে এবং বেশ কয়েকটি জনগোষ্ঠীকে ত্রিপুরীদের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করা হয়।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং জীবনযাপনের ধারায় ত্রিপুরীদের থেকে স্বতন্ত্র অবস্থান থেকে এই মঙ্গোলয়েড শাখা সর্বপ্রাণবাদকে অবলম্বন করেই এখনো বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত। যদিও কিছু হিন্দু দেবদেবীর পূজা তাদের সংস্কৃতি জগতে প্রবেশ করেছ। রিয়াং রিয়াং মতাইকতর তাদের সর্বপ্রধান দেবতা (Supreme God)। মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পূজার্চনার জন্য তিনটি ধারা প্রচলিত। সামাজিক জীবনচর্চাকে ভিত্তি করে সুখদুঃখের এক অবিমিশ্র বর্ণাঢ্য ধারা তাদের সঙ্গীত জগতকে পুষ্ট করেছে। ঐ সঙ্গে হজাগরি (ব্যালেন্সের নৃত্য) নতুন ফসল তোলার দ্যোতক এবং লক্ষ্মীর আবাহন হিসাবে গৃহীত। আসলে কৃষি (জুম)-র সঙ্গে নৃত্যগীত যুক্ত হয়ে প্রাচীন কৃষিসংস্কৃতির দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। হজাগিরিসহ অন্যান্য নৃত্য তো ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে সমাদৃত।

ভোটবর্মীজ গোষ্ঠীর কুকি-চীন শাখার অন্তর্গত লুসাইরা খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করার পর পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অনুসরণ করার প্রবণতায় লুসাই নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতির ধারাকে অনেকখানি বিলুপ্ত করে দিয়েছে। চইলাম, খুয়াল্লাম, সোলাকিয়া, চেরোকন ইত্যাদি নৃত্য প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাকে বজায় রেখেছে।

হা (ভূমি) এবং লাম (পথ) - ভূমি ও পথের রক্ষক হিসাবে পরিচিত কুকি জনগোষ্ঠীর একটি শাখা হিসাবে হালামদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আমরা পাই। উত্তর ত্রিপুরা ধর্মনগরে প্রধান ভাবে এদের পাওয়া যায়। ডারলং, মলসম, কাইপেংসহ বিভিন্ন সম্প্রদায় এদের মধ্যে বর্তমান। হালাম সংস্কৃতি প্রধানতঃ ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে যুক্ত। সর্বপ্রাণবাদ হালামদের মধ্যে কার্যকর। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা তারা করে থাকে। সামাজিক ক্ষেত্র পঞ্চায়েত ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী। প্রাচীন গণশাসনে যেভাবে গণ ঐক্যের পরিপন্থী অবস্থাকে মেনে নেওয়া হতোনা, হালাম এধরণের কিছু কিছু দিক এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। গালিম (সর্বোচ্চ পদাধিকারী), গাবুর এবং চাপিয়া পদগুলিতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা বিচার-মীমাংসা,

জুমের কাজ শুরু করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্দেশ দেন । আবার সুবক-তুবতীদের কোনরূপ অন্যায় সংঘঠিত হলে, তার মীমাংসার জন্য আছেন ২ জন তাঙ্গুলিয়ান এবং ২ জন পানসং।

হালামদের মধ্যে ধানের দেবতা সাপিতে (লক্ষ্মী) এবং কার্পাসের দেবতা পার্পিতের পূজা প্রচলিত ।সাপিতে পূজায় সাপিতেলাম নামক নৃত্যগীত হয় ।ছোট লাউয়ের (তিত্‌লাউ) খোলে জল, দা ইত্যাদি উপকরণ এবং মোরগ বলি দিয়ে এই পূজা করা হয় । 'দশরা' অনুষ্ঠান আগে হত ধান কাটার পর; এখন দশমীতে হয়ে থাকে ।এতে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মীর পূজা, তবে কালীর পূজা হয় জঙ্গলে । ফসল তোলার পর কুজহুই জান্দোর (নারায়ণ?) পূজা হয় ।এতে ২টি মেনারগ ও ২টি মুরগী বলি দেওয়া হয় । বড় উৎসব - লাইয়া বুন উৎসব, এতে ১৭ জন দেবতার পূজা হয় ।এদের মধ্যে সুকুন্ধরাই-বুকুন্ধারই (চাঁদ) ও আকারতা-বিকারতা (সূর্য) ছাড়া বিভিন্ন নদী বা ছড়া দেবতা হিসাবে পূজিত । নদীগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশ ও কাছাড়ের কয়েকটি নদীসহ ত্রিপুরার গোমতী, মনু, লঙ্গাই, জুরি ইত্যাদিও আছে । সঙ্গে উত্তরের জেবতা (সিরিকলারায়-সিরিকালারায়) দক্ষিণের দেবতা (সিরিজেন্দুগায়-পাসারিজেন্দগায়), বাবই-তেসি-নাগরা (মহাদেব!) এবং দুই স্ত্রী ও দুই ছেলেসহ লংতারই কিং-এর পূজা ও হয়। এই উৎসবে ১৭টি মোরগ, ২৪টি পাঁঠা বলি হয়। পূজায় নৃত্যগীত উপস্থাপনা হয় । 'সেহাথ' পূজা ঐতিহাসিক পূজা বলে স্বীকৃত । ২/৩ বছর পর গবই বা নীলগাই উৎসর্গ করে পূজা করতে হয় ।হালামদের সবচেয়ে বড় দেবতা জগৎসিং দারুকা ।আসলে ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে যুক্ত থেকে হালাম সংস্কৃতি তার বিকাশের পথ খুঁজে নিতে চায় ।ঢোলের শব্দের মাধ্যমে বার্তা পাঠানোর প্রাচীন রীতি এখনো বর্তমান। বিভিন্ন পূজায় আলাদা ধরণের ঢোল ব্যবহৃত হয়, কারো মৃত্যু হলে আলাদা ঢোলের ব্যবহার করা হয় ।ঢোলগুলির পৃথক পৃথক শব্দধ্বনি অনেকদূর পাহাড়ের মানুষদের জানিয়ে দেয় ঘটনার কথা ।ইদানিংকালে যারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা এসব পূজা-পার্বণের ব্যাপারটা মানতে রাজী নয়, তবে সামাজিক ঐক্য রক্ষায় বিভিন্ন পাড়া-পঞ্চায়েত এবং সর্বোচ্চ পঞ্চায়েত (পাড়া-পঞ্চায়েতগুলির সমন্বয়ে গঠিত) ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে তাদের কোন আপত্তি নেই। বিশেষতঃ ধর্মনগরের নয়াগাঙ, বালিছড়াসহ অন্যান্য অঞ্চলে এ ধরণের একটা চিত্র আমরা খুঁজে পাচ্ছি । আসলে কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির একটা স্বচ্ছরূপ হালামদেরে মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ।সাম্প্রতিককালের যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই সংস্কৃতিকে ধরে রাখার একটা উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন বলে বয়স্কব্যক্তিরা মনে করেন । বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাকমার নিজেদের শাক্যবংশীয় বলে দাবী করে ।মূলতঃ চাকমার মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর লোক ।বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়া চাকমা সত্বেও তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতিনীতির ধারা এখনো অব্যাহত । পুরুষপ্রধান সমাজে নারীদের গুরুত্ব বিবাহকে কেন্দ্র করে অনুভূত হয় ।

ইদানীংকালে একেবারে কমে গেলেও ঘরজামাই প্রথা তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল। পণ দিতে হত ছেলের পক্ষ থেকে। বিয়েতে শুকর ১টা, মোরগ ৩টা, ডিম, ধানের খাঁচা ও চালের খাঁচা ব্যবহৃত হয়। ধান ও চাল পরমেশ্বরী ও সদাগর বলে পূজিত। 'গর্বা' (পিসি-মাসি) সম্পর্কে বিয়ে নিষিদ্ধ, 'হেল্লা' (ভাই-বোন) সম্পর্কে বাধা নেই, অবশ্যই পৃথক গোষ্ঠী বা গোত্রে বিয়ে হয়। এই মিলন, যা 'সুমুলং' নামে চালু- তার পূর্বে 'যদনবাণী' বা জোড়া তৈরী করার অনুষ্ঠান হয়। ওঝা (পুরোহিত) পূজা করেন।

চৈত্র সংক্রান্তিতে বিজু নৃত্য ও গীত অবশ্যই করা হয়। বিয়ের পর মেয়ের প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পরবর্তীকালে বিজুর অনুষ্ঠানে হলে, সে সময়ে আবার যেতে হয়।

মূলতঃ কৃষি নির্ভর সংস্কৃতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে এবং বৌদ্ধধর্ম-ও বলি বা অন্য প্রথাকে সরিয়ে দিতে পারে নি। একদিকে বিজু এবং অন্যদিকে জুম উৎসবের কেন্দ্রে থাকায় সংস্কৃতির এক বিশেষরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় (বাস্তবতঃ জুম চাষ এখন প্রায় নেই)। জুমের জন্য অগ্রহায়ণের পর 'থানমানা' পূজা অনুষ্ঠানে গঙ্গাসহ ৩৬জন দেবতার পূজা করা হয়। এতে ৩৬টি মোরগ, ২টি পাঁঠা, ৩টি শুকর বলি হয়, ৩টি ডিম-ও এতে লাগে। এরপরই ওঝা বৃষ্টির ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী দেন। জুম চিহ্নিতকরণ (ফাং) শুরু হয়। জুম চাষের স্তর অনুযায়ী নৃত্যগীত হয়ে থাকে। জুমকাটা ও অন্যান্য সময়ে 'মাওলেয়্যা' বা গোষ্ঠীর সকলের শ্রমদানের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষকে সাহায্য করা হয়ে থাকে। প্রাচীন এসব রীতি অনুসরণ করার সময়ে নৃত্যগীত করা হয়। কারো কারো মতে সঙ্গীতে সুর আছে কিন্তু তাল বা লয়ের সম্পর্কে আবছা বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বাঁশের তৈরী বাঁশি বা শিঙা, খেংরঁ, ঢোলক ব্যবহৃত হয়।

গেংখুলি, দণ্ডবিধি ইত্যাদি লোকসাহিত্য যুগ পরম্পরায় মৌখিকভাবে চলে আসছে। এছাড়াও কিছু লোক-প্রেমকাহিনীর (অলিখিত) কথাও শুনা যায়, যেমন 'রাধামোন ও ধনফদি (৬জন যুবক ও যুবতীর কাহিনী) এবং 'লরবোয়া ও মিদুঙী'-র পালা। পরবর্তী লিখিত কাহিনী হিসাবে ছান্দোবী ও নুয়ারামের কাহিনী পাওয়া যায়। ধর্মীয় কাহিনী (বলা হয় ২৫০-৩০০ বছর পূর্বের) সাধক শিবচরণের 'গজোনো লামা' সৃষ্টি তত্ত্বের কাহিনীও জানিয়ে দেয়। চাকমা সমাজ-সংস্কৃতিতে মেয়েদের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ প্রচলিত ছিল, যেমন শোয়ার বেলা পশ্চিমদিক ছাড়া অন্যদিকে মাথা দেওয়া নিষিদ্ধ, যাত্রাপালা দেখা নিষেধ, গান গাওয়া নিষেধ। বর্তমান সময়ে এগুলি প্রায় বিলুপ্ত। তবে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রে ইত্যাদির দ্বারা অসুখ-বিসুখ সারানোর খুব প্রাচীন ম্যাজিক চাকমা সংস্কৃতিতে বর্তমান। অবশ্য ঐ সঙ্গে বৈদ্যদের বনৌষধি ব্যবহারের ধারাও আছে।

চাকমাদের মধ্যে বৌদ্ধ হীনযান মতানুযায়ী সূত্র জাতীয় সাহিত্যও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, 'আগরতলা' নামে এটি প্রসিদ্ধ ।

সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, ভীল বৌদ্ধ সংস্কৃতি সঙ্গে প্রাচীন কৌম সংস্কৃতির মিশ্রণে এই সাংস্কৃতিক কর্মধারা বহমান আছে বলেই ধারণা ।

ত্রিপুরা রাজ্যে চা-বাগান শ্রমিকি হিসাবে পরাধীনতার কালে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, ভীলরা এখন এ রাজ্যের অধিবাসী, ফলে তাদের সংস্কৃতিগত পরিচয় উল্লেখের দাবী রাখে।

সাঁওতাল মূলতঃ অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ । সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন কৃষিনির্ভর । বহ্ বা বসন্ত উৎসবের মধ্য দিয়ে নানা উৎসবের সূচনা তারা করে থাকে ।

মুণ্ডরা বিন্ধ্য পর্বতে বসবাসকারী কোলদের শাখা । ঝুমুর নৃত্য, যাত্রা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এরা নিয়োজিত ।

ওঁরাও-রা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বললেও এরা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর লোক । করমা নৃত্য ও ঝুমুর নৃত্যের মাধ্যমে এদের জীবনবোধ প্রকাশিত ।

ভীলদের সংখ্যা ত্রিপুরায় খুবই কম । এরা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর শাখা ।

আসলে কৃষিজীবন সম্পৃক্ত এসব উপজাতি জনগোষ্ঠী মূলতঃ স্থানচ্যুত হওয়ায় কৃষিজীবনের সাথে সম্পৃক্তি হারিয়ে বাগানশ্রমিক হিসাবে পরিচিতি বহন করে চলেছে ।

ত্রিপুরা উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলি নিজস্ব সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছে । তাদের সংস্কৃতি এবং উন্নয়নের দিক নিয়ে গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন - একথা অবশ্যই স্বীকার্য। ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি-উপজাতির মিলিত সত্তা আসলে এক নতুন শক্তির উৎস । প্রতি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধারাগুলির সংস্কৃতির একসঙ্গে বসবাসের মাধ্যমে একে অন্যকে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত করে এবং এভাবেই এক মিশ্র সংস্কৃতির অঙ্গনে সমস্ত মিলন জাতি-উপজাতি জনগোষ্ঠী মিলিত হয়ে যায় । এই মিলনকে আঘাত দিয়ে বিভাজিত করার লক্ষ্যে কিছু ব্যক্তি বা সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে, যদিও এটা স্থায়ী একটা অবস্থা হতে পারে না । ইতিহাস এই শিক্ষা আমাদেরে দিয়েছে ।

এবার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিকচিহ্ন, যেগুলি বিলুপ্তির পথে, সেগুলিকে রক্ষা করার উপায় ভাবারও প্রয়োজন । মনে হয় নিম্নোক্ত কিছু পথ-সন্ধানের মাধ্যমে এব্যাপারে কিছুটা এগুনো যেতে পারে এবং এভাবে সংস্কৃতি-উন্নয়নের পথ-সন্ধানও সম্ভব হবে ঃ

(১) বিভিন্ন সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডগুলিকে যত বেশী সম্ভব প্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ত্রিপুরার সমগ্র জনসমাজের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে । সংরক্ষণ

(২) শহরে, গ্রামে এবং পাহাড়ে প্রতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য Cultural Affairs দপ্তরের কাজকর্মকে আরোও প্রসারিত করে প্রতি জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যেতে হবে । উন্নয়নের (৩) সরকারী ও বেসরকারী স্তরে সংস্কৃতি বিলুপ্তির অন্তরায় হিসাবে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষকে পথ-সন্ধান এর অন্তর্ভূক্ত করে এগিয়ে যাওয়ার পথ ঠিক করতে হবে ।

(৪) লোকসংস্কৃতি গবেষণার মাধ্যমে উন্নয়নের বাধা এবং বিলুপ্তির কারণসমূহ চিহ্নিত করে এগুলিকে সরিয়ে দেবার উদোগ নিতে হবে। মনে হয় 'FOLKDEV' এব্যাপারে খুব ভালো কাজ করতে পারবে ।

(৫) ঐ সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত বিভিন্ন জাতি-উপজাতি জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্ননের জন্য আরো বেশী ব্যবস্থা কিভাবে নেওয়া যায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । আশা করি ত্রিপুরার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধন সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যত বেশী দৃঢ় হয়, সে চেষ্টা করার জন্য আমরা সকলেই এগিয়ে আসব । নতুন এক জীবন-চেতনার প্রকাশ জাতি-উপজাতি জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত পদক্ষেপে ধ্বনিত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশাল আকাশে এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের জ্যোতি নিয়ে অকুণ্ঠ হোক - এই কামনা । এইসঙ্গে 'FOLKDEV' (লোকধাত্রী)-এর পূর্ণতার লক্ষ্যে ধাবিতে হবে বলেই বিশ্বাস রাখি ।

।। উদ্ধৃতিপঞ্জি ।।

এই বক্তব্য তৈরী করতে যে সমস্ত পুস্তক, প্রবন্ধ বা ব্যক্তিদের সাহায্য পেয়েছি, তাদের কাছে ঋণ স্বীকার করে নীচে নামগুলি দিলাম ঃ

১) লোকায়ত দর্শণ --- দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

২) পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি — ফ্রেঃ এঙ্গেলস্

৩) হরপ্পার অনার্য গরিমা — প্রশান্ত প্রামাণিক

৪) সংস্কৃতির সংগ্রাম — কিঙ্কর মিত্র

৫) লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার — বরুণকুমার চক্রবর্তী

৬) পালকরাণী — রমেন্দ্রনারায়ণ সেন

৭) ত্রিপুরার রাজমালা — পুরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী

৮) ত্রিপুরা - অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত — বিজনবিহারী পুরকায়স্থ

৯) ত্রিপুরার উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি — ডঃ অনাদি ভট্টাচার্য (অন্বেষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ)

১০) লোকসংস্কৃতি চর্চার ভূমিকা — ডঃ রঞ্জিত দে (অন্বেষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ)

১১) Dances and Festivals of Tripura – ICAT Publication

১২) শ্রী মাণিকবুল হালাম

১৩) শ্রী জহরজয় হালাম

১৪) শ্রী ধীরেন্দ্র সিংহ

১৫) শ্রী অজিত সিংহ

১৬) শ্রী বভ্রুবাহন চাকমা এবং নবীন ছড়ার অন্যান্য ব্যক্তিত্ব ।

(বিঃ দ্রঃ - ১২ থেকে ১৫ সবাই ধর্মনগর বিভাগের অধিবাসী ।)

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

অমরেন্দ্র শর্মা এম. এ., বি. টি. ত্রিপুরা বিধান সভার প্রাক্তন স্পীকার । জন্ম শ্রীহট্ট জেলায় ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল । ধর্মনগর ডি. এন. বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করেছেন । ছাত্রজীবন থেকেই লেখালেখি শুরু করেছেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটক প্রকাশিত হয়েছে । বর্তমানে ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে সাহিত্য চর্চায় মনোযোগী হয়েছেন ।

রাজনীতি ও ধর্ম প্রসঙ্গে

— অঞ্জলি চক্রবর্ত্তী

রাজনীতি যদি হয় বিশুদ্ধ তথা বৈজ্ঞানিক রাজনীতি এবং ধর্ম যদি হয় মনুষ্যত্বের ধর্ম তথা "মানব বৃত্তির উৎকর্ষণ" তবেই সম্ভব হয় রাজনীতি ও ধর্মের মিলনে এক নয়া সৃজনশীল ভারতবর্ষ। প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত ভারতীয় মনীষায় এই মহামিলনের তথা সমন্বয়ী ভারতবর্ষের 'খোঁজ' চলেছে। রামমোহন থেকে তিলক, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ থেকে মানবেন্দ্র নাথ এমনি এক ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতেন যা কেবল 'অন্নময়' কিম্বা কেবল 'ব্রহ্মময়' হবে না, তা হবে 'অন্নব্রহ্মময়' ভারত। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় 'আমরা আজ কোন্ ভারতবর্ষে বাস করতে চাই, তা স্থির করবার দিন এসেছে — একদিকে অন্নময়রূপ, অন্যদিকের অন্নব্রহ্মময় ভারতবর্ষ'।

রাজনীতি ও ধর্ম নিয়ে কেলেংকারী যখন জনমতকে দিশেহারা করে তুলেছে, তখন বিশী মহাশয়ের উক্ত প্রস্তাব আপাতদৃষ্টিতে নিছকই বাতুলতা অথবা বাস্তববিচ্যুত কল্পনা বলে মনে হবে বৈকি।

তথাপি, ভারতের নীতি নৈতিকতা বিসর্জিত রাজনীতির ঘূর্ণায়মান চক্রে কানামাছির ভোঁ-ভোঁ খেলা থেকে যারা পরিত্রাণ খুঁজেছেন, তাদের জন্য উক্ত মনীষীদের ভাবনাকে খড়কুটোতুল্য আশ্রয় জ্ঞান করেও বিচার করা যেতে পারে সেই সব চিন্তার সারবস্তু বর্তমানে কতটা প্রাসঙ্গিক।

আলোচ্য বিষয় দুটির গভীরে গেলে, রাজনীতি ও ধর্মের উৎস-উদ্ভব এবং চিন্তা-চেতনার বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণে এদের ঐতিহাসিক ভূমিকার অবদান ইত্যাদির গভীর পর্যালোচনা থেকে প্রথমেই মনে হয় যে আমাদের জীবনে রাজনীতি ও ধর্মের পার্থক্য ততটা মৌলিক নয়, যতটা বাহ্যিক।

দুইয়ের কর্মএলাকা যদিও ভিন্ন, যেমন রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ মানুষের বাহ্যিক আচরণের উপর, কিন্তু ধর্মের নিয়ন্ত্রণ আভ্যন্তরীণ চরিত্র বিকাশের দিকে। কর্ম এলাকার পার্থক্য ছাড়ালে দুইয়ের উদ্দেশ্যগত ঐক্য চোখে পড়ে।

ধর্ম যেমন মানুষেব ধর্ম, তেমনি রাজনীতিও মানুষের রাজনীতি। উভয়েই মানুষের কল্যাণ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যক্তিজীবন থেকে সামষ্টিক জীবনে পরিব্যাপ্ত। দুইয়েরই

লক্ষ্য সুস্থ জীবনের সন্ধান দেয়া এবং অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। ধর্মে 'সো অহম্' এর অর্থ 'আমি সে (মহত্তম) হয়ে উঠতে পারি এই 'হয়ে উঠা'। তথা সুপ্ত গুণাবলীকে বাইরের আলোয় নিয়ে আসার কাজ ধর্মের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়; সমান প্রচেষ্টায় রাষ্ট্র ব্যক্তির আত্মবিকাশের শর্তাবলীকে নিশ্চয়তা দান করে, রক্ষা করে, এরই নাম অধিকার।

অতঃপর রাজনীতি ও ধর্মের মিলন-ভাবনার প্রস্তাবটি এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। এবার তর্কশাস্ত্রের নিয়ম মেনে আগে বিপরীত প্রস্তাবকে (যেমন, রাজনীতি ও ধর্ম পরস্পর বিরোধী) খণ্ডন করতে হয়।

মধ্যযুগীয় রাজনীতিকে দর্শন, ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের ভারাক্রান্ত অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে রাজনীতির স্বাতন্ত্র্যতা ঘোষণা করেছিলেন ইটালীর এক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রীঃ)। রাজনীতিকে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র নিরপেক্ষ দেখবার এই দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপের রাজনীতি চর্চায় ঘটিয়েছিল আধুনিকতার সূত্রপাত। ম্যাকিয়াভেলি পূর্ব ও সমসাময়িক রাষ্ট্র রাজনীতির পটভূমিকায় এই চিন্তার উপযোগিতা ছিল। রাষ্ট্র ও সমাজের স্থায়িত্ব ও সংহতি আনতে এই দর্শন আপাতগ্রাহ্যতা পেয়েছিল এবং ক্রমশঃ গভীর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রের সংহতি ও স্থিরতা আনার মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরে রাষ্ট্রনায়ক (the Prince) কে এমনকিছু উপায় অবলম্বনের উপদেশ দিলেন যা মোটেই মহৎ নয়। কেননা তাঁর জীবন দর্শনে স্থান পেয়েছিল অসততা ও নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ বাস্তবের ছবি। সেই বাস্তব ছবির প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনায়ক আপন আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যে কোন ছল চাতুরী, কপটতা, বর্বরতা ও বলপ্রয়োগ ইত্যাদির আশ্রয় নেবার ছাড়পত্র পেলেন। 'ভাল আইনের' চেয়ে 'সামরিক আইন' অধিক গ্রাহ্য হলো, কারণ সামরিক আইন-ই দেশকে রক্ষা করতে পারে। দেশরক্ষার এই সাধু সংকল্প নিয়ে আধিপত্য বজায় রাখতে রাষ্ট্রনায়ক সুকুমার বৃত্তি চর্চাকে পরিহার করে চলবেন এবং গ্রহণ করবেন পাশবিক বৃত্তির চর্চা। শঠতা, বর্বরতা ইত্যাদির নিপুন প্রয়োগের মধ্যেই রাজনীতির সার্থকতা ঘোষিত হয়েছিল। বাস্তব ও ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানে ইতিহাসের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে এক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্ত্তন করলেন ম্যাকিয়াভেলি, যা সারা বিশ্বের রাষ্ট্রচিন্তায় এক নুতন যুগের সূচনা করলো।

কিন্তু বাস্তববাদের তাগিদে এবং ধর্ম ও নীতি নিরপেক্ষ কর্মবীর তৈরীর মানসে তিনি সেদিন যে চারাবৃক্ষটি রোপণ করেছিলেন, আজ আধুনিক যুগের শেষ লগ্নে সেই বিরাট বৃক্ষটির গভীর শিকড় যেমন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনি তার বিষফল সকলেই ভক্ষন করে চলেছে।

বিজ্ঞানের অনগ্রতির সেই সময়ে ম্যাকিয়াভেলির কাছে যা 'সঠিক' মনে হয়েছিল,

অধিকাংশের চিন্তায় তা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল; কিন্তু আজ বিজ্ঞানের চরম বিপ্লবের যুগে সেই সময়ের সঠিক চিন্তা আজ কতখানি 'সঠিক' আছে এর সত্যতা বিচারের প্রয়োজন। গতিশীল সমাজের ধারায় ম্যাকিয়াভেলি উত্তরকালের রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক চিন্তা-চেতনার বিকাশের ফলে আজ আমরা যেখানে এসেছি এবং যে ফলসমূহ ভোগ করছি, তার প্রেক্ষিতে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্র-দর্শনের চিরন্তন সত্যতা, কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।। এই দর্শনের মূলকথা ছিল (ক) ধর্ম ও নৈতিকতার প্রভাব থেকে রাজনীতি মুক্ত করা, (খ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে যে কোন ভাল বা মন্দ পন্থা অবলম্বনের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করা। তৎকালীন কট্টর নৈতিকতা ও পুরোহিতকুলের প্রাধান্য থেকে রাজনীতির চর্চার নয়া রাস্তা তিনি দেখালেন বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায়ের অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টির যে ফাঁকি থেকে গেল, তারই পরিণতি ফলরূপে ধর্মের ইতিবাচক আদর্শের বাঁধনমুক্ত হয়ে রাজনীতি চলেছে বল্গাহীন গতিতে এক অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে । অসৎ উপায়ে সৎ উদ্দেশ্যে কার্যকরী হয় না, চালাকি দিয়ে মহৎ কাজ অথবা সার্বজনীন ও স্থায়ী মঙ্গল সম্ভব হয় ন — এ কেবল ধর্মের নির্দেশ নয়, আধুনিক তর্কশাস্ত্রেরও এই শিক্ষা ।

কাজেই রাজনীতি চর্চা যদি উন্নত যুক্তিবিজ্ঞান নির্ভর হয়ে উঠতে পারে, তাহলে তার সঙ্গে ধর্মের বিরোধ থাকছে কোথায় ? যুক্তিবিজ্ঞান ভিত্তিক রাজনৈতিক কাঠামোতে ধর্মকে প্রাণবায়ুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে দেখা দিত অন্নব্রহ্মময় ভারতের রূপ রেখা । কিন্তু ধর্ম ও রাজনীতির প্রচলিত বাহ্যিক সংকীর্ণ রূপের ভেতর এই স্বরূপ দৃশ্যমান হতে পারে না ।

তাই ধর্মের যুগপোযোগী অর্থ ও ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কাম্য । ধর্ম চেতনা এক বিশ্বজনীন ঘটনা, যার মধ্যে রয়েছে জিজ্ঞাসা ও শ্রদ্ধার চিরন্তন আদর্শ । বহিরঙ্গে পোষাক যত ভিন্ন হোক না কেন, মানুষের ধর্ম তো একটাই — **মনুষ্যত্ব অর্জন** ও তার বিকাশ । প্রজাতিগত স্থূল বৈশিষ্ট্য থেকে যা তাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভের শক্তি যোগায়, ভূমার সন্ধান দেয় । তাই ধর্ম মানেই জিজ্ঞাসাহীন মেনে নেয়া নয়, ধর্ম মানেই **ঈশ্বরবাদ, অদৃষ্টবাদ, দুঃখবাদ** নয় । তার প্রমাণ রয়েছে বেদ ও উপনিষদের উপলব্ধিতে । **ধর্মের জিজ্ঞাসা থেকেই জন্ম** নিয়েছে বিভিন্ন দর্শন । তাই ধর্মের সঙ্গে মনুষ্যত্ব বিকাশের **ধারাটি বুঝতে হবে । ধর্মের দেশ এই** ভারতবর্ষ বহু পরিবর্তন ও বিবর্তনের স্রোতধারায় অবগাহন করে ধর্মকে 'মানুষের ধর্ম'(Religion of Man) নামের সুস্পষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত করেছে। এই মানুষের ধর্ম মানবিক বৈশিষ্ট্য বিকাশেরই অন্য নাম । অন্যদিকে রাজনীতি রাষ্ট্র ও সরকারের তাৎপর্য কি ? আমাদের রাষ্ট্রীয়-জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি ? 'The State is an organsim serving human ends ....' অর্থাৎ রাষ্ট্র নামে

সংগঠনটি কতকগুলি মানবিক উদ্দেশ্য (human ends) সাধন করার জন্য তার সৃষ্টি ও প্রয়োজন, মানবধর্মের বিপরীত কাজ রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে না। আমাদের সংগঠিত রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের এই উপযোগিতা আছে বলেই রাষ্ট্র আজও প্রয়োজনহীন হয়ে পড়েনি। আর রাজনীতি ? সরকারী ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করাই তো তার কাজ। রাষ্ট্র সামাজিক মানুষের বাহ্য আচরণকে নিয়ন্ত্রণের কাজ করে চলেছে কোন্ উদ্দেশ্যে ? কেবল শ্রেণী আধিপত্য ও শ্রেণী স্বার্থ পূরণের কাজ করলে রাষ্ট্র ও রাজনীতির সর্বজন গ্রাহ্যতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র-রাজনীতি যেমন নিজেই নিজের উদ্দেশ্য হতে পারে না, তেমনি একে কেবলমাত্র উপায় (means / tools) হিসাবে দেখলেও কোথায় যেন বড় একটা গড়মিল থেকে যায়। বরং রাষ্ট্র রাজনীতিকে উদ্দেশ্য ও উপায়ের সমন্বিত রূপে দেখলে নতুন চিন্তার অবকাশ মেলে।

অ্যারিষ্টটল মনে করতেন রাষ্ট্র সৎ হয় নাগরিকদের সততার গুণে। সরকার নিয়ন্ত্রণকারী রাজনীতি ও সামাজিক সংগঠনগুলি এক বৃহৎ সমাজেরই অংশ। অতএব রাজনীতিক সংগঠন ও নাগরিকদের সততার চর্চা না থাকলে একটি রাষ্ট্র ও রাজনীতি সৎ হবে কেমন করে ? সততা কিন্তু যুক্তি পরায়নতারই প্রকাশ। অথচ প্রচলিত ব্যবহারিক রাজনীতিতে সততার স্থান নেই। এখানে উদ্দেশ্য ও আচরণ, আদর্শ ও কাজের মধ্যে বিসদৃশ তফাৎ। নৈতিকতা বিসর্জিত রাজনীতি চর্চার ফলে ব্যক্তি মানুষ আজ বড় অসহায়।

তাই ব্যক্তির জীবন, দর্শন ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্র দর্শনের মতই নৈতিক আদর্শ বিচ্যুত। কারণ রাষ্ট্রদর্শন ও সমাজদর্শন উভয়ে পরস্পরের উপব ক্রিয়াশীল।

নৈতিকতা ও মানবধর্মের চর্চা রাজনীতিকে যুক্তিপরায়ণ করে তুলতে পারে, নীতিহীনতার আবর্ত থেকে মুক্ত কবতে পারে : অন্যদিকে যুক্তিভিত্তিক বৈজ্ঞানিক রাজনীতির চর্চার ফল সমাজ দর্শনকে বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। তখন রাজনীতি নীতি ও আদর্শ থেকে স্খলিত হতে পারবে না।

কারণ, রাজনীতি একটি মূল্যমান সাপেক্ষ বিজ্ঞানচর্চা। মূল্যমান নিরপেক্ষ রাজনীতির সার্বজনীন কোন আবেদন ও উপযোগিতা থাকে না। আশ্চর্য্য এই যে, ব্যক্তিজীবনে ম্যাকিয়াভেলী ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং বলেছিলেন ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে উৎসারিত গুণাবলী মানুষকে সুন্দর করে তোলে। ভাবুন তো, যে গুণাবলীর চর্চা ব্যক্তিমানুষকে সুন্দর ও মহৎ করে. তাকে কিনা তিনি রাজনীতিতে স্থান দিলেন না। কারণ বাস্তববাদের মানদণ্ডে নৈতিকতার স্থান ছিল না। তবে কি ব্যক্তিজীবনের লক্ষ্য রাষ্ট্রজীবনের লক্ষ্য বিপরীতগামী ? রাষ্ট্র ও রাজনীতির পাশবিক শাসনে নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির জীবন নৈতিকতা ও আদর্শের চর্চা করে কীভাবে সুন্দর

হয়ে উঠবে ? তাকেও শঠ ও নিষ্ঠুর হতে হবে (জল যে নীচের দিকে গড়ায়) । উপরতলার দুর্নীতি নীচতলায় সংক্রমিত হয়ে এক অদ্ভুত সমঝোতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্র জীবনের পার্থক্য সৃষ্টির দর্শন ব্যক্তিকে সমষ্টিজীবন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয় । 'ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মায়ের মুখে ধুপের ধোয়া' দেবার এই অসামাঞ্জস্য জীবন দর্শন রাষ্ট্রকে অমানুষ তৈরীর কারখানায় পরিণত করলো।

ব্যক্তি ও সমাজের কাছে রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি মরিচীকায় পরিণত হলো । তাহলে বর্তমান প্রজন্মের দায়বদ্ধতা-হীনতাকে (Non-commitment) নিয়ে আমরা এত বিব্রত কেন ? তারা ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার অধ্যাপক হবে, 'মানুষ' হবে কেন ? কেন হবে প্রকৃত নাগরিক ? উত্তরটা খুঁজতে হবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণের মধ্যে। এই সম্ভাব্য অবাঞ্ছিত পরিণতির কথা ভেবেই আলেকসিস টক্‌ভিল (১৮০৫-৫৯) রাজনীতিতে নৈতিকতার উপেক্ষাকে মানতে পারেননি. বিশেষত লক্ষ্যই উপায়ের ন্যায্যতা, এই নীতিকে।

ধর্ম ভাগ্যবাদ নয়, অন্ধ বিশ্বাসের জগদ্দল পাথরও নয়, ধর্মের আর এক নাম বিপ্লব। সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের এই সদর্থক ভূমিকার প্রমাণ রয়েছে । সনাতন হিন্দুধর্ম যখন কুসংস্কারে বন্ধ্যা হয়ে উঠলো. বৌদ্ধধর্মের বিদ্রোহ তা ভেঙ্গে সৃষ্টি করেছিল এক গতিশীল সমাজের বিকাশ ।

ইউরোপে যীশুর স্বচ্ছ সরল, ন্যায়বাণীর প্রচার ইহুদি পুরোহিততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করেছিল খ্রীষ্টীয় সভ্যতার । আর ইসলাম ? বিচ্ছিন্ন আরব গোষ্ঠীকে এক করে গড়ে তুললো মুসলিম সভ্যতা । যে কোন সমাজের স্থিতাবস্থা থেকে, তামসিকতা থেকে ধর্মের বিপ্লবী ভূমিকা সমাজের রাজসিক শক্তিকে জাগিয়েছে, সুতরাং বিপ্লব-শক্তি রাজনীতি ও ধর্ম উভয়ের মধ্যে উপস্থিত । কিন্তু ভারতীয় রাজনীতি চর্চার ইতিহাসে ভাবালুতা বিজড়িত বাস্তববাদের আধিক্যে প্রকট হওয়ায় রাজনীতি চর্চার সর্বজন গ্রাহ্য কোন নৈতিক অনুশাসন আজও নেই বললেই চলে । ইচ্ছেমত, সুবিধেমত ব্যবহারিক নীতি দিয়ে পরিচালিত রাজনীতির আবর্ত্ত থেকে বেরিয়ে আসার পথ যুক্তিবাদের চর্চা । প্রকৃতি বিজ্ঞানী নিউটন অভিজ্ঞতারও উপরে যুক্তিকে স্থান দিয়েছিলেন — 'অভিজ্ঞতাকে গণিত ও বলবিদ্যার সাহায্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে' । প্রকৃতি বিজ্ঞানের এই সূত্র অনুসরণে বিশুদ্ধ রাজনীতির জন্ম দিবে । মানুষের প্রধান তিনটি গুণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে (যথা-আবেগ, অভ্যাস, বিচারবোধ) বিচারবুদ্ধির ক্ষমতাকে বাড়াতে উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্য নিতে হতে। তবেই, একই সঙ্গে যুক্তিবাদী (rational) এবং সৎ (moral) মানুষ তৈরী সম্ভব । মানুষের আর একটি বিশেষ দিক — রোমন্টিক ও

কল্পনাপ্রবণ সত্তাটি নিত্যনূতন অনুপ্রাণিত হতে পারবে ধর্ম ও দর্শনের চর্চায়, যার ভেতর লুক্কায়িত রয়েছে মানবীয় আদর্শ সমূহের ঘণীভূতরূপ । স্বপ্নচারী ও দার্শনিক মানুষের কোনটাই মানবধর্ম বহির্ভূত নয় । শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী এই প্রধান চারটি মানবীয় বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনের সুযোগ করে দেয়া রাষ্ট্রের ও রাজনীতির দায়িত্ব । তবেই ঘটতে পারে ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের ঐক্য নির্মাণ । প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এহ্ বাহ্য, হলেও এর প্রয়োজন আছে, নইলে সাধারণ মানুষ বিমূর্ততাকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না । ধর্ম ও রাজনীতির প্রস্তাবিত মিলনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের পীঠস্থান হতে পারে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা । প্রস্তাবিত রাজনীতি চর্চার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েতের বর্তমান রূপের পরিবর্তন ঘটবে সৃজনশীল মানুষের হাত ধরে ।

তার আগে আর একবার বিচার করে দেখা যাক ধর্মহীন রাজনীতি প্রস্তাবিত বিষময় ফলের অভিজ্ঞতাকে ; বিচার করা যাক ভারত ও ইউরোপীয় মনীষীদের সেইসব উপলব্ধ সত্যকে । 'প্রকৃত রাজনীতি নৈতিকতার কাছে নতি স্বীকার না করে এক পাও অগ্রসর হতে পারে না' (কান্ট) । কিম্বা, 'Political theory is idle without ethical theory...' (Ivor Brown) । কিম্বা 'প্রাচ্যের ধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের মিলনে নতুন ভারতবর্ষ। (বিবেকানন্দ)

"... নীতি ভিত্তিক বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার ক্ষমতার উন্মেষের মাধ্যমেই হয় মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি লাভ, সৃষ্টি হয় সুন্দরতম সমাজ' (মানবেন্দ্রনাথ রায়) ।

প্রবন্ধ সূত্র ঃ ১। রাষ্ট্রদর্শনের ধারা — ডঃ অমল মুখোপাধ্যায়
২। পলিটিকস্ — অ্যারিস্টটল,
৩। মানবেন্দ্রনাথ রায় — জীবন ও দর্শন — স্বদেশারঞ্জন দাস ।
৪। বিবেকানন্দ রচনাবলী ।
৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞান — অধ্যাপক হিমাংশু ঘোষ
৬। ভাবনাচিন্তা (বর্দ্ধমান থেকে প্রকাশিত) ।
৭। রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস (প্রগতি প্রকাশন)

* প্রবন্ধটি বিলোনীয়া কলেজের মুখপাত্র উদীচিতে প্রকাশিত (১৯৯২) তের বৎসর লেখাটি পরিমার্জন ও সংযোজন করা হল ।

ঃ লেখিকার পরিচিতি ঃ

অঞ্জলি চক্রবর্তী - জন্ম, নভেম্বর, ১৯৫১ সাল । রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ ও অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত । অঞ্জলী চক্রবর্তী ইন্ডিয়ান র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট এসোসিয়েশন (পশ্চিমবঙ্গ শাখা)-এর সদস্য । সমাজসেবী সংস্থা ও সাহিত্য সেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ।

******

ককবরকের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু কথা

করবী দেববর্মা

গত ২৪ শে জুন ২০০৪ দৈনিক সংবাদে অককবরক ভাষী প্রদীপ চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত 'ককবরকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে সুবিস্তৃত বক্তব্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য । তিনি ককবরকের গতিপ্রকৃতি, তার বিকাশে বাধা বিড়ম্বনা এবং তার ভবিষ্যত উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ ভাষার প্রাচীনত্ব, সুমহান ঐতিহ্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শাসকের কখনো দুর্বল, কখনো সবল ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে ককবরক ভাষীদের ও ভাষায় প্রতি যথাযথ সশ্রদ্ধ মর্যাদাপূর্ণ আন্তরিক চেষ্টার অভাবের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়েও সমালোচনা করেছেন ।

এই প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয় । কারণ সমালোচনা একটি গঠন মূলক প্রয়াস । সমালোচনার জন্য সমালোচনা না হয়ে যদি সেটি ত্রুটি সংশোধনের এবং ভবিষ্যত পদক্ষেপের দিশারী হয় তবেই সেটি সার্থক সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে । যাক্ প্রদীপবাবু বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যতটা আলোচনা করেছেন তা থেকে উত্তরণের বিষয়ে ততটা আলোচনা করেননি । আলোচনা করলে, প্রস্তাব রাখলে যে তা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে যাবে তা নয়। তবু অনুরাগীদের দশজনের দশদিক থেকে প্রস্তাব রাখার মধ্য দিয়ে সার্থক একটা পথ বেরিয়ে আসতে পারে । তিনি খুব বৈজ্ঞানিক সততায় এবং নিপুণ ব্যবচ্ছেদে এ ভাষার কাল, ধর্ম, গতি-প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। পাকিস্তান অধিকৃত গিলগিটে ধাতুর তৈরী স্তম্ভে বোড়ো জাতির ধর্ম বিষয়ে লিখিত তথ্যের উল্লেখ করেছেন । বোড়রা ককবরক ভাষীদেরই একাংশ এবং নিকট আত্মীয় । ভোট চীনীয় ভাষা বংশের অন্তর্গত তিব্বত বর্মীয় শাখার বোড়ো উপশাখার ককবরক ভাষীরা একসময়ে হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তথা উত্তর ভারতের কিছু কিছু সমতলে বসতি স্থাপন করেছিলেন । চীন সভ্যতা পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। তাই এই জাতির ভাষা থেকে উদ্ভুত ককবরকের বয়স পাঁচ হাজার না হলেও ভাষা সম্পর্কীত আত্মীয়তা অনুযায়ী যথেষ্ঠ প্রাচীন ।

ককবরক ভাষায় বেশ কিছু শব্দ অন্য উন্নত ভাষাতে গৃহীত এবং অন্তর্ভূক্ত । উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি প্রসিদ্ধ সমাজবিদ হামদিবের উক্তিকে উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন দিল্লী শব্দটা বোড়ো শব্দ দৈইলির অপভ্রংশ যার অর্থ- বিস্তীর্ন জলভূমি । তেমনি

গঙ্গা শব্দও এসেছে বোড়া গঙ্গা শব্দ থেকে যার অর্থপিপাসা মেটায় এমন নদী মাতৃকা ।

এখানেই তার আপত্তি উচ্চারিত হয়েছে যে এমন একটি পুরানো জাতিকে কেন উপজাতি নামে ভূষিত করা হলো ? এটা অন্যায় ব্যাপার। Scheduled Tribe অর্থাৎ তপশীলিজাতি বললে তাকে উপজাতি বোঝায় না।

এটি খুবই সত্যি কথা জীবন যাপনের উপযোগী জ্ঞান, সংস্কৃতি শিল্পচেতনা এজাতির রয়েছে । রয়েছে সম্বন্ধ মৌলিক সাহিত্য রূপকথা, উপকথা, প্রবাদ প্রভৃতি । একমাত্র লিপিহীনতার জন্যেই ভাষা ক্রটি যুক্ত এবং উপযুক্ত সহায়তার অভাবে এর বিকাশ যথোচিত ঘটেনি । তবু একটি ঐতিহ্যবাহী জনগোষ্ঠীকে অশোভনভাবে খণ্ডজাতি বা উপজাতি বললে সেটা তাকে অপমান করা হয় এবং এই অপমানের জন্যই যুব সম্প্রদয়ের মধ্যে বিপথগামিতার সূত্র রয়েছে বলে তিনি মনে করেন ।

তার আরো দুঃখ যে চেতনার উপর এই মার সম্বন্ধে ওয়াকি বহাল না হয়ে এই জাতিগোষ্ঠী গত ত্রিশ-চল্লিশ বছর যাবৎ এই সরকারী শিরোপাকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছে ।

তিনি এই বিষয়ে বলতে চেয়েছেন যে সুদীর্ঘকালের অবহেলার পর এই ভাষাকে এ রাজ্যে সরকারী ভাষা হিসাবে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন (১৯শে জানুয়ারী ১৯৭৯) সত্যি কিন্তু বিদ্যালয়স্তরে পঠন-পাঠন বা সরকারী কাজকর্মে তাকে সার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি । ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অগ্রসর হয়ে যেতে তার প্রায় দশ বছর লাগালো এবং এর পরবর্তী ক্লাশের জন্য সংযোগকারী পঠন পাঠনের ভাষা হিসাবে ককবরককে নিয়ে যেতে পারাই গেলো না বলে ছাত্রদের আবার বাংলা পড়াশুনো করতে গিয়ে বছরের পর বছর ফেল করত হচ্ছে । তাদের ক্লাশ সিক্সে আর উঠা হলো না ।

এর কারণ হিসাবে তিনি সরকারের নীতি, পরিকল্পনা এবং পরিকাঠামোর অভাবকে দায়ী করেছেন । এই ব্যর্থতার সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর নজরে এসেছে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রে বসে থাকা ককবরকভাষী পদস্থ কর্মচারীদের ভূমিকা মাতৃভাষার উন্নতি বিষয়ে তাদের গোটা চরিত্রে অভাব এবং শিথিলতা । এ বিষয়ে তাদের কোন সচেতনতা নেই । তারা তাদের সন্তানদের ইংরাজী মাধ্যমে পড়াশুনা করাতেই আগ্রহী ।

তার মতে ককবরককে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যর্থতায় সরকারের ভূমিকা এবং তাদের সদিচ্ছার অভাবই একমাত্র দায়ী —কারণ তাদের সঙ্গতির কোন অভাব নেই । পঞ্চম স্থানের পর পরবর্তী ধাপগুলি চালু করার বিষয়ে তাদের উপযুক্ত উৎসাহের অভাবই দায়ী । তেমনই পাঠ্য পুস্তকে ভুল ভাষান্তর, ভুল বানান, ভুল শব্দের প্রয়োগ ককবরক
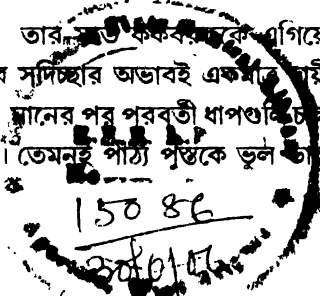
ভাযাভাষী মানুষের মনে এবিষয়ে অশ্রদ্ধা জাগিয়েছে এরা বরং ইংরাজীতে পঠন পাঠনের ব্যবস্থাতেই বেশী আগ্রহবোধ করেন ।

প্রদীপবাবুর মতে সবকারের তরফ থেকে ককবরককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যম করে উচ্চশ্রেণী চালু করার পক্ষে দৃশ্যতঃ কোন অসুবিধা ছিলনা তবু তা হয়ে উঠলো না । অথচ প্রচার ছিল সরব । পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যেসব বই ছাপা হয়েছিল তাতে ছিল অফুরন্ত অসঙ্গতি আর ভুল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামের ককবরক অনুবাদ বা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামের অনুবাদ হাস্যকর এবং অসঙ্গত। ককবরকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিযয়ে এসব বিপত্তি দেখে অভিভাবকরা বাংলা মাধ্যমেই ছেলেমেয়েদের পড়ানো শুরু করলো ।

কিন্তু মাতৃভাযার উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধির স্বার্থে নিজেদেরই এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এতে সন্তানদের সামিল করার কাজটা নিজেদেরই করতে হবে -এ ভাবনাও ককবরক ভাষীদের নেই । শহরবাসীরা এভাবেই নিজেদের শেকড় ছেড়া হয়ে গেছেন । বর্তমানে এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে খোদ পাহাড় থেকে আসা ককবরকভাষী এবং নব্য শিক্ষিত-সমাজ । যারা বাঙালীদেব রিফিউজী বলেন কিন্তু নিজেরাই যে নিজস্ব গ্রামপাহাড় ছেড়ে শহরে এসে ভিড় জমাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই । এদের সন্তানরা অনেকেই ককবরক জানে না ।

ককবরকভাষী বুদ্ধিজীবীব সন্তানরা সবাই ইংরাজীভাষী । এই বুদ্ধিজীবী ককবরকভাষীরা হঠাৎ হঠাৎ সরকারের বিরুদ্ধে, অফিসারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে বক্তৃতা করেন। এই অভিযোগ ছাড়া মাতৃভাযাব কল্যাণে তাদেরও যে কিছু আছে তা ভুলে যান ।

তেমনি সরকারী দপ্তরগুলিও দায় সারা গোছের কর্তব্য পালন করে ককবরকের অনুষ্ঠানে, সেমিনার ইত্যাদি করেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর পার হয়েছে ককবরকের সরকারী স্বীকৃতি দেবার পর । কিন্তু কিভাবে এর উন্নতি হয়, প্রসার ঘটে তার কোন পরিকল্পনা বা নির্দিষ্ট কর্মধারার চিহ্ন নেই ।

ককবরকের রজত জয়ন্তীর কর্মসূচী শুধু তিন দিনব্যাপী এক উৎসব পালনেই পর্যবসিত হয়েছে । এ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট কর্মধারা অনুসৃত হয়নি ।

নাচ গান, খাওয়া দাওয়া, হাল্‌কা বাহ্যিক ফলশ্রুতিহীন কিছু অনুষ্ঠানেই এর শেষ। এ নিয়ে কোন গভীর চিন্তাভাবনা ছিলনা ।

এসব কথা বলতে গিয়ে প্রদীপবাবু স্মৃতি রোমন্থন করেছেন —১৯৬৪ সালে বিধানসভায় প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলাকে রাজ্যে সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করা হয়। তেমনি ১৯৭৯ সালে বাংলার পাশে ককবরকও ব্যবহৃত হবে বলে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তবু পঁচিশ বছরেরও ককবরক সরকারী কাজে ব্যবহৃত হওয়ার পর্যায়ে যেতে পারেনি। উৎসব যা হলো তা বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হয়েছে। ককবরকের পঁচিশ বছর, ককবরক তের। — কোথাও বলা হয়েছে দ্বিতীয় রাজ্যভাষা ইত্যাদি।

এতে যা হয়েছে তা সবই ত্রুটি পূর্ণ-স্বদলীয়দের পুরস্কার দেয়া, যা সিনেমা হয়ে উঠেনি তাকে সিনেমা বলা বা ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে সি. ডি ক্যাসেট কেনা, নাচ গান সবই অসঙ্গতিপূর্ণ।

এতসব দীর্ঘ অভিযোগের ফিরিস্তি দিয়েছেন প্রদীপবাবু যা নেহাৎ অসত্য বলে হয়তো বলা যায় না।

কিন্তু সার্থক সমালোচনার পর কিছু সার্থক প্রস্তাব দেয়াও সার্থক সমালোচকের দায়িত্ব থেকে যায়। প্রদীপবাবু যদি সেটা করতেন তবে খুব ভালো হতো। এমন একজন অককবরক ভাষী অথচ ককবরক ভাষার উন্নতিতে সহানুভূতিশীল শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের পক্ষে তা খবু উৎসাহজনক হতো।

১৯৮৩ খৃঃ ১৫ই মে, আমি স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুরের নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি রাধামোহন ঠাকুর অ্যাকাডেমী। পরবর্তীকালে আমরা ককবরক শেখানোর ব্যবস্থা করি। এতে ভাষাবিদ্ কুমুদকুণ্ডু চৌধুরী, নরেণ দেববর্মা, রবীন্দ্রকিশোর দেববর্মারা শিক্ষকতা করেছেন। এই সূত্রে ক্লাশে বসে এই ভাষার যে ঐশ্বর্য, প্রকাশ ক্ষমতা দেখেছি, তাতে চমৎকৃত এবং গর্বিত হয়েছি। দুর্ভাগ্য একের পর এক শারীরিক দুর্ভোগে একে আমি টিকিয়ে রাখতে পারিনি।

বড়ো জনগোষ্ঠী ভাষা পরিবারের কোন লিপি নেই। ককবরকেরও লিপি নেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকথেকে দৌলত আহমেদ, রাধামোহন ঠাকুর ককবরকের উপর কিছু লেখালেখির প্রয়াস করেন। ব্যাকরণ দিয়ে এ চেষ্টা আরম্ভ হয়। রাধামোহন ঠাকুর ব্যাকরণ দিয়ে এ চেষ্টা আরম্ভ করেন — রাধামোহন ঠাকুর ব্যাকরণ ছাড়াও, পাঠ্যপুস্তক এবং ত্রৈভাষিক অভিধান লেখেন। রাজপরিবারে ককবরক চালু ছিল বীরচন্দ্রের আমল পর্যন্ত। বীরচন্দ্র মাণিক্যের কন্যা আমার ঠাকুরমা কুমুদিনী দেবী এবং আমার বাবাও ককবরক জানতেন। রাধামোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র রেবতী মোহন দেববর্মার সঙ্গে আমার ঠাকুরমার বিয়ে হয়। ছোট বেলায় পাহাড় থেকে আগত আমার পৈতৃক সূত্রের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে

তাদের ককবরকে কথা বলতে শুনেছি ।

ক্রমশঃ রাজবাড়ীতে এর বাইরেও বাংলা ভাষার আইনী প্রচলনের মাধ্যমে এবং এর বীরচন্দ্র বাংলাভাষার জোরদার বিকাশের ব্যবস্থা চালু করেন । যার ফলে পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়রা এখানে এই ভাষার চর্চাকে খুব প্রশংসা করেন । স্বাধীনোত্তর পশ্চিম বাংলা থেকে এখানকার সরকারী কাজে ব্যবহৃত পরিভাষা সম্পর্কে জানার জন্যে যোগাযোগ করা হয়েছিল । এজন্য দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল ।

বলা হয়ে থাকে যে ত্রিপুরার রাজবংশাবলী সংস্কৃত রাজ রত্নাকর থেকে ককবরকে একটি অনুবাদ হয়েছিল যাকে দুর্বোধ্য ভাষা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই দুর্বোধ্য ভাষা ককবরক বলেই সবার ধারণা । বইটি পাওয়া না গেলেও মুখে মুখে এর বিবরণ চলে এসেছে । রাজ রত্নাকর থেকে বাংলা অনুবাদই রাজমালা যা কালীপ্রসন্ন সিংহ রচনা করেছেন।

ককবরকের লিপি ছিল বলেও একটা কথা লোক পরম্পরায় চলে এসেছে । আমাদের ভাষাটির কোন বাহ্যিক সমাদর ছিল না বলেই হয়তো লিপিও হারিয়ে গেছে। কিন্তু বোড়ো ভাষী পরিবারের কারোরই লিপি নেই । ককবরকের জন্য কোন লিপি তৈরী হয়ে থাকলেও তা অনাদরে এই আর্দ্র অঞ্চলে নষ্ট হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ একে ব্যবহারিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার মতো সংঘবদ্ধ ভাষাপ্রেমী প্রতিষ্ঠান বা রাজ আনুকূল্য ছিল না । বলা হয়, মণিপুরের মৈতেয় লিপিও নষ্ট হয়ে গেছে সেখানকর রাজাদের হিন্দু ধর্ম গ্রহণের ফলে । যাক্ এত পুরানো রাজবংশ একদিক্রমে যে বংশে ১৮৫ জন রাজা স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করে গেছেন তারা তাদের মুখের ভাষা ককবরককে শ্রদ্ধা দিয়ে রক্ষা করলেন না, এর দায় তারা কখনোই এড়াতে পারবেন না । চাঁদের গায়ে কলঙ্কের মতো এটা লেগেই থাকবে ।

তবে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাভাষা ত্রিপুরা রাজ্যের ভাষা হয়ে গেছে এবং ত্রিপুরায় রাজারাও এর প্রসারে খুবই যত্নবান ছিলেন । বিশেষতঃ ধর্মগ্রন্থ ছাপানোর পর বিনামূল্যে-তা জনসাধারণ্যে বিলি করা হয়েছে । এভাবে বাংলাই তাদের ব্যবহার্য ভাষা হয়ে যায় । এছাড়া পার্শ্ববর্তী বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের সঙ্গে নানা লেনদেনের মধ্য দিয়েও বাংলাভাষা ত্রিপুরার আদিবাসীদেরও সামাজিক, বাণিজ্যিক ভাষা হয়ে যায়।

তবু ককবরক ভাষী জনগোষ্ঠীর মনে এটা একটা অভিমান এবং দুঃখ যে সংস্কৃতিবান বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালীরা কখনোই শ্রদ্ধা বা ভালবাসায় ককবরককে গ্রহণ করেনি । এই ভাষার প্রতি উৎসাহ দেখান নি ।

তবু সময়ের পথ বেয়ে ককবরক এগিয়ে এসেছে । ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠার পর বহু-গীতিকার কবি; প্রাবন্ধিক ককবরক ভাষী তাদের সাহিত্যচর্চাকে দশজনের সামনে তুলে ধরেছেন । তখন থেকেই বাংলা সাহিত্যে রেনেশাঁস বা নবআন্দোলনের মতো

একটা জোয়ার এসেছিলো যার ফসল এগুলি যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন । এ ব্যাপারে সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার নতুন লক্ষানীয়ভাবে দেখা দেয়। ১৯৭২ সালে ককবরক সাহিত্যসভা গঠিত হয় । নিজস্বতার খোঁজ, আত্মীয়তার শিকড় সন্ধানে নানা চর্চা গবেষণা শুরু হয় এবং বৃহত্তর বোড়ো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়ের পালা শুরু হয়। এগুলি খুবই আধুনিক ইতিহাস, সবারই জানা ।

ককবরকের ভাষা অঙ্গনে আরেকটি বাধা বা সমস্যা এসে হাজির হয় সেটা হচ্ছে লিপিসমস্যা । এর ফলে চাইলেন বৃহত্তর বোড়া জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পারস্পরিক ভাব বিনিময়, ক্রিয়া বিক্রিয়ার জন্য এমন একটি মাধ্যম যার সাহায্যে একাজ সম্ভব তারা দেখলেন । এজন্য উপযোগী রোমান লিপিখুব সহজে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে । এতে যে কোন ভাষাকে প্রকাশ করা যায় । তাই তারা বল্লেন ককবরকের জন্য রোমান লিপিই বাঞ্ছনীয় ।

এতদিনের প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত বাংলা ভাষার জগতে এই রোমান লিপি অন্য দলের গ্রহণীয় মনে হয়নি। কারণ বাংলাতেই স্কুল কলেজে এতদিন যাবৎ ত্রিপুরাবাসী লেখাপড়া করে আসছে । এই হরফ সকলেরই পরিচিত এতে লিখিত ককবরক সকলেই অনায়াসে পড়তে লিখতে পারবে কোন সমস্যার সৃষ্টি হবেনা ।

এসব বির্তকেও ককবরকের অগ্রগতি হোঁচট খেয়ে গেল ।

বস্তুতঃ ভাষার অগ্রগতির নির্ভর করে সেই ভাষার ক্ষনজন্মা বিরাট প্রতিভাধর ঔপনাসিক, কবি, প্রাবন্ধিকের আর্বিভাবের উপর । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা ভাষা শিক্ষিত মানুষের কাছে একান্ত হেয় ছিল । দশজন শিক্ষিতের সামনে একে অপরের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে লজ্জাবোধ করতেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বা মাইকেল মধুসূদন ডাট্ একদিন ভেবেছিলেন যে ইংরাজী ভাষায় লিখে যশস্বী হবেন । বঙ্কিমের 'Rajmohan's wife' বা মধুসূদনের 'captive lady' তাদের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দেবে । কিন্তু তা হয়নি। শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষায় লেখা দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস বাংলাভাষার শীর্য নদীতে প্রবল যৌবনের জোয়ার বইয়ে দিল । তেমনি মধুসূদনের বাংলাভাষায় লেখা মেঘনাদ বধ কাব্য বাংলা সাহিত্যে নূতন চিন্তাধারা ভাষার শক্তি লাবন্য, শব্দচয়নে, সংস্করণে ও তেজস্বিনী শব্দসম্ভারে বাংলাভাষাকে একটা শক্ত ভিত্তিভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দিল ।

এক লাফে বাংলাভাষা শতবছর এগিয়ে গেল । আজ ককবরকের জন্যও এটা দরকার ।

১) এই সাহিত্যিক চিন্তাচেতনা সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতটা সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রয়োজন তা দিতে হবে সরকারকে, সমাজকে। রচয়িতাদের

কি প্রয়োজন, এর উন্নতি কিভাবে হবে তা তারাই ঠিক করবেন। তাদের একক এবং সংঘবদ্ধ প্রয়াস ভাষা, সাহিত্য, সাহিত্য পত্রিকার জন্ম দেবে, তাকে সমৃদ্ধ করবে । মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করবে ।

২) এজন্য চাই মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার । বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনায় সেই ভাষার সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । সরকার যখন ককবরকে শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তখন অভিভাবক, শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীরা সকলে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন । যদি ককবরকে উঁচু ক্লাশ পর্যন্ত পড়ানোর পরিকাঠামো থাকতো তবে এমন হতো না কিংবা প্রথম থেকেই বাংলা এবং ককবরক একসঙ্গে পড়ানোর ব্যবস্থা রাখলে ক্লাশ সিক্সে এসে বাংলা না জানার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের মুখ থুবড়ে পড়তে হতো না।

তাই এসব এখন নূতন করে ভাবার সময় এসেছে । সাধারণভাবে অভিভাবকরা সবাই এখন ইংলিশ মিডিয়ামে নিজেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে চান । শিক্ষার্থীরাও তাই চায় । কারণ আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে, কম্পিউটার, ইন্টারনেটের যুগে যারা ইংরাজী জানেনা এবং কম্পিউটারে নিরক্ষর তাদের কোন ভবিষ্যত নেই বললেই চলে। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষার শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের মূল পরিকাঠামোর সঙ্গে মাতৃভাষার সংযোগ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে ।

৩) মাতৃভাষাকে জীবিকার মাধ্যম করে তাকে জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। ইংরাজী তো শিখতেই হবে কারণ এর পিছনে অর্থের হাতছানি আছে । কাজেই ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার এবং অন্যান্য ভাষা যেমন বাংলা, হিন্দী এদের একটি বিষয়কে বাছাই করে শিখতে হবে । এটাকে শ্লোগান ভেবে সামনে চলতে পারলে সাফল্য আসবে ।

৪) বর্তমানে বেসরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কলেজে রাজ্যের ভাষা বাংলাকে শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, হিন্দী যেহেতু রাষ্ট্রভাষা সেটাও শেখবার ব্যবস্থা হয়েছে । তাই, ককবরক ও যেহেতু রাজ্যের এক স্বীকৃত অন্যতম ভাষা যে ভাষায় বৃহৎ সংখ্যক ত্রিপুরীরা কথা বলেন - সেটাকে সি. বি. এস. সি. আই. সি. এস. সি. কোর্স যেসব বেসরকারী স্কুলে পড়ানো হয় তাদের কর্তৃপক্ষকে স্কুলে ককবরক শেখানোর পরিকাঠামোকে গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরা সরকার অনুরোধ জানাতে পারেন ।

৫) সে সঙ্গে ত্রিপুরা সরকার প্রত্যেকটি বাংলা মিডিয়াম এবং উচ্চতর বিদ্যালয়গুলোতে বাধ্যতা মূলক এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ককবরক শেখানোর পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারেন ।

৬) এভাবে স্কুলস্তরে ককবরক পরিকাঠামো তৈরী করে না দিলে প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থাপনা না থাকলে ককবরকের স্বীকৃতি শুধু কাগজে কলমেই থেকে যাবে ।

৬) ককবরক যেহেতু পিছিয়ে পড়া এবং এখানো অর্থকারী বিদ্যা নয় তাই ককবরকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য উৎসাহমূলক বৃত্তির ব্যবস্থা রাখলে ভাল হবে বলে মনে হয় ।

৭) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ককবরক জানা কর্মীকে A. D. C এলাকায় অগ্রাধিকার দিলে ককবরকের সম্মান এবং বাস্তব মূল্যবোধ বাড়বে । সকলে তখন ককবরক শেখায় উৎসাহ বোধ করবেন ।

৮) ককবরক জানা ব্যক্তির নিয়োগে প্রাথমিক নিযুক্তির সময় আর্থিক উৎসাহব্যঞ্জক কিছু ব্যবস্থা রাখা এবং বেতনক্রমে ইনক্রিমেন্ট দেবার সময় ককবরক জানালে বাড়তি সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা রাখলে ভাল হবে ।

৯) মাধ্যমিকস্তর থেকে উপরের দিকে যে সব ছাত্র ছাত্রী স্কুল কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়াশুনা করছেন জাতি উপজাতি নির্বিশেষে ককবরকে কোর্স পড়ার কারণে তাদের জন্য স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা রাখলে ভাল হবে ।

১০) বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যারা ককবরকের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ছেন তারা এটা শেষ করার পর দেখতে পান যে এর অর্থকরী কোন মূল্য নেই । তাই তারা এ শিক্ষার উৎসাহহীনতা বোধ করেন । এটা ভেবে দেখার বিষয় ।

১১) ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সবরাজ্যেই সে রাজ্যের প্রচলিত সরকাবী ভাষা পড়ুয়াদের অবশ্য গ্রহণীয় । সে সঙ্গে হিন্দী, সংস্কৃত থাকে ঐচ্ছিক। ত্রিপুরা রাজ্যেও বাংলা অথবা ককবরকে বাধ্যতামূলক করা হলে ককবরকে স্বীকৃতির প্রতি সুবিচার করে তার অগ্রগতিকে উৎসাহিত করা হবে ।

১২) বামফ্রন্টের আমলে A. D. C এলাকায় সরকারী চিঠিপত্র সারকুলার ইত্যাদিতে ইংরেজী বা বাংলার সাথে ককবরকের অনুবাদ দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল । সরকারী কাজে বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগে ককবরকে নোটিশ এবং সারকুলার প্রচারের সিদ্ধান্ত আছে এটা বাংলার বেলায়ও রয়েছে, কিন্তু এ সিদ্ধান্তকে বাধ্য করা হচ্ছে না । রাজ্যের একনম্বর স্বীকৃত ভাষারও অবস্থা সেরকমই । অবশ্য A. D. C ফাইলে মাঝে যাবেন ককবরকে এবং সরকারী ফাইলেও টুকিটাকি নোট বাংলায় দেয়া হয় । বিধানসভাতেও কোন কোন সদস্য ককবরকে বক্তব্য বা প্রশ্ন রাখেন । কিন্তু তা ইংরাজীতে অনুবাদ করতে হয় নইলে তার সবাই বুঝতে পারেন না ।

১৩) কোর্টে ককবরকে বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা আছে দোভাষী সেটা ভাষান্তরিত করে দেন তবে দরখাস্ত মুহুরী ধরে বাংলাতেই জমা দিতে হয় । এখানেও ককবরকে দরখাস্ত

দেবার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ ।

১৪) মন্ত্রীদের এবং সরকারী আধিকারিকদের কাছে আবেদন নিবেদন, অভিযোগ বা অন্য কিছু প্রকাশের জন্য ককবরক ভাষীদের ককবরকে চিঠিপত্র, দরখাস্ত দেবার অধিকার থাকা উচিৎ এবং দেয়া হলে তা সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে তার উত্তর ককবরকেই দেয়া উচিৎ।

১৫) সরকার সম্প্রতি জনসাধরণের সুবিধার জন্য প্রশাসনকে গ্রামগঞ্জে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় নিয়ে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে ককবরক ভাষীরা তাদের অভাব অভিযোগ বা অসুবিধার কথা ককবরকে বলার সুযোগ পেলে ককবরক ভাষীরা সবাই উপকৃত হবেন।

● মাতৃভাষার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ককবরক ভাষীদের জন্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রাথমিক স্তর থেকে ককবরক চালু করতে পারলে সরকারী প্রচেষ্টা সাফল্য পাবে । সরকার এবং মধ্যশিক্ষাপর্ষদ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন ।

● ইতিহাস, বিজ্ঞান ভূগোল সমাজবিদ্যা বিষয়ে ককবরক বই রচনার জন্য NCERT-র মতো একটি সংস্থা সরকারীভাবে গঠন করা দরকার । ত্রিপুরা সরকারের T.C.S., T.P.S. এবং I.A.S. কাডারের ১৯৬৩ সালে থেকে অফিসারদের বাংলা জানা আবশ্যক । না হলে তারা গ্রেডেশন পান না পাশাপাশি রাজ্যের স্বীকৃত ভাষা বাংলা জানা যদি তাদের বাধ্যতামূলক ব্যাপার হয়, তবে ১৯৭৯ সালে ককবরকের স্বীকৃতি সম্পর্কেও এটা তাই হতে পারে ।

● বড়োভাষা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে প্রতিবছর কয়েক কোটি টাকা মঞ্জুর করে আসছেন । তা থেকেই তাদের বই প্রকাশ, প্রচার, ছাপাখানা স্থাপন করা সব কাজ চলে । ককবরকের ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা রাজ্য কোন খান থেকেই এসব কাজের জন্য বাজেট ভুক্ত টাকা নেই । যদিও সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করে কোন ভাষার উন্নতি হতে পারেনা তবু স্বাধীন চিন্তা চেতনায় গবেষনামূলক কাজকর্ম চালানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন রয়েছে । ভাষা গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকদের জন্য উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দেয়া দরকার ।

এতসব কথার পরও একটি কথা যেন থেকে যায় সেটি হচ্ছে আমরা কি শুধু সরকার মুখাপেক্ষী হয়েই থাকবো ? মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে নূতন প্রজন্মের তরুণ যুবক সাহিত্যিক, লেখক সবাইকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে । আসতে পারেন বেসরকারী সংগঠনগুলিও জাতিধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে । এই প্রয়াসে দলাদলি দলবাজী না করে ক্ষমতাবান প্রতিভাধর যারা তারা একযোগে এগিয়ে না এলে কিছুই হবে না ।

প্রসঙ্গত প্রদীপবাবু যেভাবে শহরে উপজাতি এবং পাহাড়ী উপজাতিদের মধ্যে কৃষ্টি

এবং সংস্কৃতি বিষয়ে বা আর্থিক কারণে বৈষম্যের বাতাবরণের কথা উল্লেখ করেছেন তা গভীরভাবে ভাববার বিষয় ।একই জাতি, সংস্কৃতি ভাষার (যদিও অনেক শহরবাসী ককবরক ভাষী নন) অভিন্ন ভাগীদার হয়েও কল্পিত লক্ষণ রেখা মনে রেখে চলা বোধ হয় আর উচিত নয় ।যারা শহরবাসী ত্রিপুরী তাদের ঊর্ধ্বতন দু'তিন পুরুষরা আগে পাহাড়েই বাস করতেন।

ভাষার উন্নতির ব্যাপারে দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে সম্পূর্ণ মান অভিমান শূন্য হয়ে এগিয়ে যেতে হবে । যেমন বাংলা আছে ককবরকও থাকবে পাশাপাশি আর মিথ্যে অভিমান না রেখে ইংরাজীও যে অপরিত্যাজ্য এটা চিন্তা চেতনায় রেখেই কাজ করতে হবে । কারণ আমাদের বাস্তব জীবনে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান, অফিস ইত্যাদি আছে যাদের সঙ্গে আমাদের ইংরাজীতে সম্পর্ক রাখতে হবে, তাই ইংরাজীও পাশাপাশি অবশ্যই থাকবে।

পরিশেষে বলা যায় ককবরকের সুনিশ্চিত যাত্রা পথকে অযথা ব্যহত না করে প্রদীপবাবুর মত মানুষদের উৎসাহ এবং সহানুভূতিকে আমাদের পাথেয় করে আমাদের বলতে হবে ককবরক তুমি সবার ।এজন্য সচেতন হতে হবে, সকলকে শুধু আদিবাসী বা উপজাতি নয়, সকল জাতি, ধর্ম বর্ণের মানুষদের উন্নয়নের চাকা না ঘুরলে আমরা জীবন পথের পথিক হয়ে প্রীতির বন্ধনে থাকতে পারবো না ।

ঃ লেখিকার পরিচিতি ঃ

জন্ম ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩২ খ্রীঃ । শিক্ষা ঃ বাংলা অনার্স সহ এম. এ । বিভিন্ন সরকারী পদে কাজ করার পর ১৯৬৯-১৯৮৩ পর্যন্ত এম বি বি কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা এবং ১৯৮৩-১৯৯২ পর্যন্ত মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। ১৯৫০ সাল থেকে লেখালেখি শুরু করেছেন । পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ছাড়াও প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল ঃ লুণ্ঠিত সময় সীতা, মেরুদণ্ড দাও, কবিতা আমার সময় এসময়, সৃজনে উৎসবে, কিছু ব্যক্তিগত সংলাপ ইত্যাদি । এছাড়াও কবি, প্রাবন্ধিক করবী দেববর্মণ দুটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন । বিভিন্ন সময়ে আসাম ও পশ্চিমবাংলার কবিতা উৎসবে ও সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন । বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্য হিসেবে সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন । তাঁর কবিতার একটি ইংরাজী কাব্যের নাম Journey to the Heart উল্লেখযোগ্য । ২০০৪ সালে নজরুল পুরস্কার ত্রিপুরা রাজ্য সরকার থেকে প্রদান করা হয় ।

******

অদ্বৈত মল্ল বর্মণ ঃ জীবন ও সাহিত্য

— ডঃ কমল কুমার সিংহ

নিম্ন কোটির মানুষের শিক্ষার প্রতি মূল্যবোধ কিরূপ ! 'তিতাস একটি নদীর নাম' থেকে সে সম্পর্কে একটা উদ্ধৃতি দেয়া যায় । —'দেখ মাত্বর নিজে ত অঞ্জি ক খ শিখলাম না । কিন্তু কালা আঁখার যে কি চিজ অখন কিছু কিছু টের পাই'।

অদ্বৈত্য মল্ল বর্মণের উপন্যাসে গোকর্ণ ঘাট বলে যে গ্রামটির কথা বারবার উল্লেখিত হয়েছে সেটিই হলো অদ্বৈতের জন্ম স্থান । আগরতলার সন্নিকটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মাত্র তিন মাইল দূরে তিতাস নদীর পারে গোকর্ণ গ্রামে এক দরিদ্র মালো পরিবারে অদ্বৈতের জন্ম হয় । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী । ত্রিপুরার আপন জীবনের আত্মস্বরূপ । 'তিতাস বুকে, তিতাস ত্রিপুরার আপন জীবনের আত্মস্বরূপ । 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে অনন্ত নামের চরিত্রটি অদ্বৈত নিজে। একথা অদ্বৈতের জীবনের শৈশবের একটি ঘটনার ছায়াপাত থেকে প্রমাণিত হয় । পরিবারের কেউই খেলাপড়া জানতো না । কিন্তু শৈশব থেকেই অদ্বৈতের পড়াশুনার প্রতি ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। গাঁয়ে একবার মেলা বসেছিল । মনোহরি দোকানে তেল, সাবান, চিরুণি, আলতার পাশে সাজানো ছিল বাল্যশিক্ষার বই । অদ্বৈত বাল্যশিক্ষার বইয়ে হাত নিয়ে পাতা উল্টিয়ে বড় বড় অক্ষরগুলি মন দিয়ে দেখছিলেন । দোকানী জেলের ছেলে অদ্বৈতকে বকাবকি করলো । জেলের ছেলের লেখাপড়ার শখ বলে । এই ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে গোকর্ণ গ্রামের অনাথিনী মায়ের ছেলে অনন্তের মধ্যে । অনন্ত এখানে অদ্বৈত হয়ে গেছে ।

অদ্বৈতের পিতার নাম ছিল অধরচন্দ্র বর্মণ । তিন ভাই, এক বোন । ভাইদের মধ্যে অদ্বৈত ছিলেন দ্বিতীয় । নিজের গ্রামে বোনের বিয়ে হয়েছিল । বোনের দুই ছেলে। ডাক নাম চিন্তা ও কাঙ্গালী । অর্থাৎ চিন্তাহরণ বর্মণ ও সুশীল বর্মণ । শৈশবেই অদ্বৈতের পিতামাতার এবং কিছু সময় পরে দুই সহোদয়ের মৃত্যু ঘটে ।

ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার মাইনর স্কুলে অদ্বৈতের পড়াশুনা শুরু হয় । ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে স্কলারশিপ পেয়ে গ্রামের ছেলে অদ্বৈত ব্রাহ্মণ বাড়িয়া অন্নদা হাইস্কুলে ভর্তি হন।

বিদ্যালয়ে ফার্স্ট বয় । সেখানে তিনি সকলের প্রিয় ছাত্র ছিলেন । উচ্চ শ্রেণীতে প্রথম স্থান না পেলেও বাংলার সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন । মাইনর বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পান এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগেও মেট্রিকুলেশন পাশ করেন । এতদিন নগ্নপায়ে গোকর্ণ থেকে তিন মাইল পথ হেঁটে পড়াশুনা করলেও এবার আই এ পড়ার জন্যে কুমিল্লা শহরে গিয়ে ওখানকার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন ।

আর্থিক অনটনের জন্যে কুমিল্লা শহরে থেকে পড়াশুনা চালানো অদ্বৈতের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে । অসম্ভব দারিদ্র্যতাকে চালানো অদ্বৈতের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে । তাকে নিষ্পেষিত করতে থাকে । প্রায় পাগল অথবা জীবনযুদ্ধে পরাজিত হবার মুহূর্তে সন্তান প্রেসের মালিক জিতু দত্তের পরামর্শে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবিকার সন্ধানে তিনি কলকাতায় আসেন । আশ্চর্যের বিষয় তিনি কলকাতায় মাসিক ত্রিপুরা নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা এই পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন। ত্রিপুরা হিত সাধনী সভা গঠনের মূলে ছিল কালকাতা থেকে ত্রিপুরা পত্রিকা প্রকাশ । এই পত্রিকা সম্পর্কীয় কোন নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়নি । আশা করা যায় অদ্বৈত মল্ল বর্মনের অনেক তথ্য এখানে জানা যেতে পারে । অর্থ দৈন্যের জন্যই এই পত্রিকাটি অবলুপ্ত হয়ে যায় । এখানে থাকা অবস্থায় তিনি শ্রী কাইলার ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'নবশক্তি' কাগজে যোগ দেন ।

অদ্বৈতের লেখালেখি শুরু হয়েছিল স্কুলে পড়ার সময় থেকেই । সে কথা তাঁর বন্ধু শাহ আফতাবউদ্দীনের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় । ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুটি উচ্চবিদ্যালয় ছিল । একটি অন্নদা উচ্চবিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের কোন সাহিত্য পত্রিকা ছিল না । জর্জ স্কুলের একটি সাহিত্য পত্রিকা ছিল । 'সবুজ' নামে এই পত্রিকাটিতে সে বছরের ছাত্র সম্পাদক ছিলেন শাহ আফতাবউদ্দীন । সেই বছরেই 'তিতাস' নামে একটি কবিতা ছাপা হয় সবুজে । অদ্বৈত অন্য স্কুলের ছাত্র ছিলেন বলেও প্রসাদগুণে তাঁর কবিতাটি ছাপা হয় । অদ্বৈত তখন অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম কিম্বা দশম শ্রেণীর ছাত্র । পরে আফতাবউদ্দীনের সাথে এক সঙ্গে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন । আফতাবউদ্দীন বলেন 'সবুজ' পত্রিকার প্রকাশিত এই কবিতাটি মাইকেলের কপোতাক্ষনদের আঙ্গিক ও প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দিলেও তিতাস ও তার অতীতের জনপদের যে বাস্তব বর্ণনা ঐ কবিতায় ছিল তাকে ঐ বয়সেই আমাদের মনে হয়েছিল 'অদ্বৈত আমাদের কবি' কবিতাটি শুধু নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথাই বলেনি, বলেছে শোষিত মালোদের কথাও ।

১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ।

সাংবাদিকতার বিশ্লেষীকরণ তখনও হয়নি । সাংবাদিকতার সাহিত্য ছিল বেমানান। কারণ যারা সংবাদ লিখতেন তাদের পক্ষে, সাহিত্য লেখা সম্ভব ছিল না । সাংবাদিক হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । নাহলে দীর্ঘকাল তিনি একাজে থাকতে পারতেন না।

কিন্তু লেখক হিসাবেই তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় এবং বরণীয় বটে । কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে তাকে আমরা খুব কমই পাই । তাঁর সাহিত্যের সবটাই পড়ে আছে পত্র পত্রিকার পাতায় । সেগুলিকে সংগ্রহ করা এক বিশাল ব্যাপার। নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক চেষ্টা ছাড়া তা সম্ভব নয় ।

সোনার তৈরী নামক মাসিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সাদা হাওয়া' । চতুস্কোণ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস জাতীয় গল্প 'রাঙ্গামাটি' মূলত কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল । মাস পয়লা' নামে এক মাসিক পত্রিকায় ছাপা হলো তাঁর 'খোকাখুকু' নামক কবিতা । কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি ক্যারাল পপেলের রস রচনা অনুবাদ করেন । একবার গঙ্গাসাগর ঘুরে এসে দেশ পত্রিকায় 'সাগরতীর্থ' লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন । 'নাটকীয় কাহিনী' নামক তাঁর একটি গল্প দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৭-এ । দেশ পত্রিকার ১৯৪৮ শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা হয় 'ছোটদের ছবি আঁকা শীর্মক একটি প্রবন্ধ । এ বছরই টি এফ এলিয়েটের উপরও তাঁর একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ছাপা হয় । ছায়া ছবির কথা ও কাহিনী' সম্পর্কেও একটি প্রবন্ধ লেখেন । অসুস্থ অবস্থায় তাঁর অনুবাদ প্রবন্ধ জীবনতৃষ্ণা প্রকাশিত হয় । 'জীবনতৃষ্ণা' হলো আরভিং ষ্টোনের 'Lust for Life' এর অনুবাদ । 'তিতাস একটি নদীর নাম' যেমন অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপন্যাস, আরভিং ষ্টোনের উপন্যাসটিও তেমনি । আরভিং ষ্টোন চিত্রশিল্পী ভ্যানগগকে নিয়ে উপন্যাস লেখার আগে শিল্পী ভ্যানগগের চরিত্র ও পরিবেশ সম্পর্কে স্বল্প ধারণা অর্জণের জন্য দীর্ঘদিন আসস্টর্ডাম ও প্যারিসে শিল্পীদের পাড়ায় থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন । সরাসরি জীবনের কাছে হাত পাতার এই পদ্ধতিতে অদ্বৈত বিশ্বাসী ছিলেন ।

তখনকার দিনে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে সিরিজ আকারে ছোট ছোট পত্রিকা প্রকাশিত হতো । তেমনি একটি প্রকাশনা ছিল 'এক পয়সার একটি গল্প' । তাতে তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্তু সেই গল্পটি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না ।

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী' এর মত মানুষের বাঁচার সংগ্রামের একটা সুনিপুণ চিত্র ফুটে উঠেছে 'তিতাস একটি নদীর নাম'

উপন্যাসে । এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'মোহাম্মদী' সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । ১৯৪৫-এ মোহাম্মদীয় ভাদ্র সংখ্যায় উপন্যাসের যে অংশ প্রকাশিত হয় তার নাম ছিল 'দুই নদী' । আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের নাম ছিল 'রামধনু' । সম্পূর্ণ উপন্যাসটি কিন্তু মোহম্মদীতে প্রকাশিত হয় নি । কারণ তার আগেই অদ্বৈত মোহাম্মদীর চাকরী ছেড়ে দেন । তাঁর এই চাকরি ছাড়ার কারণ সম্পর্কে কবি মতিউল ইসলাম কিছুটা আলোকপাত করেছেন। তিনি যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায় অদ্বৈত মতিউলের চারটি কবিতা 'রক্ত নিশান' নামে ছাপেন মাসিক মোহাম্মদীতে । কবিতাগুলি ছিল ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী । সম্ভবত এই নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অদ্বৈতের মন কযাকষি হতে পারে। যার জন্য তিনি মোহাম্মদীর চাকরী ছাড়তে বাধ্য হন ।

এরপর তিনি কলকাতায় সাগরময় ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন এবং 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দেন । দেশ পত্রিকায় কাজ করার সময় অর্থের অনটন মেটানোর জন্য তিনি বিশ্বভারতীয় প্রকাশন বিভাগেও কাজ করতেন । তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে 'নবযুগ', 'কৃষক,' 'যুগান্তর' পত্রিকাতেও সাময়িকভাবে কাজ করেছেন ।

দেশ-এ কাজ করার সময় অদ্বৈত সম্পর্কে সাহিত্যিক বিমল মিত্র একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন । তিনি এক জায়গায় বলেছেন 'ছোট আকারের শরীর, ততোধিক ছোট একটা টেবিলে বসে তিনি নিখুঁত নিষ্ঠার সঙ্গে দেশ সাপ্তাহিকের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতেন । বেশির ভাগ দিনই তাকে দেখা যেত না । কারণ আমরা যারা বাইরের লোক তারা বেশির ভাগ বিকেলের দিকে হাজির হতাম । তখন তিনি কাজ করে চলে গেছেন । এক একজন মানুষ থাকে যারা সব সময়ই নিজেকে আড়াল করতে ব্যস্ত । অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন সেই জাতীয় মানুষ । তাই বিকেলবেলার দিকে আমাদের লেখকদের যে জমায়েত হতো তাতে তিনি নিয়মিত অনুপস্থিত থাকতেন । শুনেছিলাম উত্তর কলকাতার একটি বাড়ির ছোট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি পুরানো বইয়ের পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে পুরাতত্ত্ব বিষয়ে চর্চা করে তাঁর অবসর সময়টুকু যাপন করতেন । তাকে দেখে আমার মনে হতো তিনি সবসময় নিজেকে নিয়ে বিব্রত । কিংবা নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে বিড়ম্বিত। অথচ তার এমন সাহস ছিল না সেই দুর্ভাগ্যের বিবরণ অন্য কাউকে শুনিয়ে নিজের বোঝা লাঘব করবেন ।"

মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি আর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পাওয়া সত্ত্বেও ভিক্টোরিয়া কলেজে আই. এ. পড়া অর্থাভাবে অসমাপ্ত রেখে তাকে চাকরি খুঁজতে হয় । প্রথম নিয়মিত চাকরি তাকে দিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত । কুমিল্লাবাসী এই ব্যবসায়ী ব্যাংকের

ব্যবসা ছাড়াও বিভিন্ন বাণিজ্যিক উদ্যোগে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন । শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল । কুমিল্লার মানুষজনের প্রতি কিছু প্রীতি পক্ষপাতও ছিল। 'নবশক্তি' পত্রিকাটি তিনি কিনে নিয়ে সেখানেই সহ-সম্পাদকের কাজ দেন অদ্বৈতকে । সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র । ১৯৩৮-এ প্রেমেন্দ্র মিত্র এ কাজ ছেড়ে দেবার পর অদ্বৈত মল্ল বর্মণই 'নবশক্তি'র সম্পাদক নিযুক্ত হন । ১৯৪১ পর্যন্ত তিনি-এ কাজের দায়িত্ব পালন করেন । সেই সময় থেকেই অদ্বৈত মল্ল বর্মণের নিয়মিত গদ্য লেখা শুরু হয় । যদিও তার আগে ছোটদের পত্রিকায় তাঁর একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল ।

'নবশক্তি'তে নানা ধরণের প্রতিবেদন, বাংলার লোকগান ব্রত ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি । বাংলার মাটি সম্পর্কে তাঁর লেখালেখির শুরু এখান থেকেই । অদ্বৈত মল্ল বর্মণের গল্প লেখার শুরুও এখান থেকেই । খুব বেশি একটা গল্প লেখেননি তিনি ।

এই সময় লেখা 'সন্তানিকা' নামে একটি গল্প ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত অদ্বৈত মল্ল বর্মণের নিয়মিত কোন চাকুরি ছিল না । 'নবশক্তি' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । অনিয়মিতভাবে দুয়েকটি পত্রিকায় তিনি কাজ করতেন । সেই সময়েও বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন । তার একটি হলো 'স্পর্শ দোষ' । গল্পটিতে ১৯৪০-৪২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হিটলারের তাণ্ডবের উল্লেখ আছে ।

এরপর তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশনা গোষ্ঠীতে যোগ দেন । 'দেশ'ও 'আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । আর প্রকাশিত হয়েছিল 'লাষ্ট ফর লাইফের' বাংলা অনুবাদ 'জীবন তৃষ্ণা' (মার্চ ১১৪৯-মে ১৯৫০) । তাঁর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতের চিঠি পার্ল বার্ককে' নামে তাঁর একটি রচনা সংকলন । সমকালের সমাজ ও রাজনীতি বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে তাঁর একমাত্র গ্রন্থ । পার্ল এস বাক নোবেল পুরস্কার পান 'দি গুড আর্থ' লিখে । পার্ল বাক ১৯২৪ থেকে ১৯৩১ অবধি চীনে অধ্যাপক ছিলেন। প্রকৃতির অনিয়ন্ত্রিত শাসনে চীনের মানুষের ভাগ্য দারুণভাবে পর্যুদস্থ । ফলে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ তাদের নিত্য দিনের সাথী । দরিদ্র ওয়াংলাঙ বাঁচার সংগ্রাম করছেন প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে । দারিদ্র্যের যুদ্ধে জিতলেও সমস্যা তার থেকেই যায়। দরিদ্র, নিপীড়িত দলিত মানুষের জীবনচিত্র এর আগে কেউই এমন নিপুণভাবে বিশ্বসাহিত্যে চিত্রিত করেননি । পরে লেখা হয় আর একটি বই আর্নেষ্ট

হেমিংওয়ের 'দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী' । সেখানে একক মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বনা । পার্ল বার্কের বিখ্যাত এই বইটির নায়ক ওয়াংলাঙের জীবনের সাথে ভারতের দলিত মানুষদের, তিতাসকুলের মানুষের মিল আছে । উভয়কেই প্রকৃতির খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করে বাঁচতে হয় । যে মানুষ চীনের মানুষের দারিদ্র্যের কথা লিখে নোবেল পুরস্কার পান, তাঁকেই উদ্দেশ্য করে অদ্বৈত লেখেন এই দেশের অর্থাৎ ভারতের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থান । অদ্বৈতের ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি থেকে বোঝা যায় লেখক তাঁর মানসিকতায় দলিত চেতনার স্বপক্ষে কত বড় যোদ্ধা ছিলেন ।

অদ্বৈত যা রোজগার করতেন তার অর্ধেক ব্যয় করতেন বই কেনার জন্য। বাকী অর্ধেকের অর্ধেক টাকা পাঠাতেন দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনদের । যেটুকু থাকতো তার দ্বারা নিজের অন্ন সংস্থান করতেন । এই কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে জীবন সংগ্রাম করতে গিয়ে খুব অল্প বয়সেই তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন । তিনি অনেকদিন ধরেই যক্ষ্মারোগে ভুগছিলেন । যখন এই রোগ ধরা পড়ে তখন নিজের চিকিৎসা করার মতো সামর্থও তাঁর ছিল না । শেষে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে অদ্বৈত ভর্তি হন । কিছুটা সুস্থও হয়ে উঠেন । হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে ষষ্ঠীতলার পুরাতন সেই ছোট ঘরটিতে আশ্রয় নেন । তিতাস উপন্যাসটি নতুন করে লেখার চেষ্টা করেন । শোনা যায় মোহাম্মদীতে তিতাস প্রকাশের সময় মূল পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায় । এরপর মূল চরিত্রগুলি অপরিবর্তিত রেখে নতুন করে তিতাস লেখার কাজ শুরু করেন। দিনের সকল কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় নগরের পূর্বপ্রান্তে তাঁর ষষ্ঠীতলার বাসাটুকুতে ফিরে যান । সেই বাড়ীতে অধিকাংশই রেলের শ্রমিক । ঘর বারান্দা মিলিয়ে ঠাসাঠাসি করে তাদের খণ্ড খণ্ড সংসার। কিন্তু অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে চারতলার ছাদের ঘরটিতে গিয়ে পৌছামাত্র দেখা যেতো সীমাহীন খোলা আকাশ। অদ্বৈত তাঁর ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিয়ে তিতাসের কাহিনী লিখতে বসতেন। দিনরাত মিলিয়ে সামান্যতম বিশ্রামের অবসর পেতেন না তিনি। এই করতে করতে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার কাঁচড়া পাড়া হাসপাতালে ভর্তি হন । হয়তো অদ্বৈত বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর জীবন আর বেশী দিন নেই । সেজন্য তিনি হাসপাতাল থেকে কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যান । 'তিতাস একটি নদীর নাম' শেষ করেন । ষষ্ঠীতলার ছোট ঘরখানায় আত্মীয় স্বজনের সামনে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল মাবা যান ।

কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসাপাতাল থাকাকালীন অদ্বৈত মল্লবর্মণ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখতেন । বিশেষ করে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে । তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন । অদ্বৈত নিয়মিতভাবে তাঁর জন্ম দেশের

মালোদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করতেন । অনুশীলন সমিতির অমর মুখোপাধ্যায় ছিলেন কাঁচড়া পাড়া হাসপাতালের রোগী। তখন অদ্বৈত মল্লবর্মণও সেই হাসপাতালে ছিলেন । তিনি অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কে লিখেছেন, "তখন দেশের অবস্থা খুবই জটিল । পূর্ববাংলা থেকে প্রতিদিন দলে দলে মানুষ চলে আসছে পশ্চিম বাংলায় । তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা খবরের কাগজ ভরিয়ে দিচ্ছে । বর্মণদা কাগজ পড়েন । মাঝে মাঝে উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কপালে করাঘাত করেন । দেশের রাজনৈতিক নেতাদের দেশভাগের প্রস্তাবে সায় দেওয়ার ফলেই বাংলার অগণিত মানুষের এই দুর্গতি বর্মণদার স্থির ধারণা । তাঁর বন্ধু বান্ধব, যাঁরা পূর্ববাংলা থেকে এসে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের খবর নেবার জন্য প্রতিদিনই গোছা চিঠি লেখেন । মাঝে মাঝে দু-একখানা চিঠির উত্তরও আসে। বর্মণদা চঞ্চল হয়ে পড়েন । চোখ দুটো জলে ভরে যায় । রাত্রের ঘুমটাও চলে যায় । প্রায়ই বলেন এই হাসপাতালের অলস জীবন আর ভাল লাগে না । মনে হয় পালিয়ে যাই । আমি বলি—তার চেয়ে বরং আপনি শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠুন দীর্ঘদিন ধরে ওদের সেবা করুন । বর্মণদার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠে । বলেন —জানেন তো এবারের বুকের ছবিটা আরো খারাপ হয়ে গেছে ! কাজেই নিরাময়ের আশা খুবই কম । এখন শুধু এই শয্যায় পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা। তাই ভাবছি, যে কটাদিন পারি ওদের পাশে থেকে কাটাই । এরপরই অদ্বৈত হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে আসেন । জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু তিনি নষ্ট করেননি। তিতাসকে তিনি পূর্ণ করে গেলেন । তিতাস তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়।

মালোরা অদ্বৈতের মধ্য দেখেছিল মুক্তির একটি দিশা । তারা বুঝেছিলো, "মালোগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান লোক নাই, চিঠি লেখাইতে, মাছ বেপারের হিসাব লেখাইতে গোপানগরে হরিদাস সাও পাও ধরাধরি করি, ভাল ভাল মাছ খাওয়াই। এ যদি বিদ্যামান হইতে পারে মালোগোষ্ঠির গৌরব।"

অদ্বৈতের মৃত্যুর পর আবুলকালাম সামসুদ্দীন তাঁরা অতীতদিনের স্মৃতিতে লিখেছেন "এমন এক সাহিত্য প্রতিভা এরূপ অকাল অপমৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হলো এটা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দুরপয়নের কলঙ্ক ।"

অদ্বৈতের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী স্মরণ উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকায় (১৯৫২) লেখা হয়, "কাহাকেও বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন না করিয়া জীবন যাপনের এক দুরূহ ব্রতে তিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের যুগে বিরল । জীবনের দেবতা দুরূহের বেশেই তাহার সম্মুখে আসিয়াছিলেন । সেই দুরূহকে শান্তচিত্তে ও কুণ্ঠাহীন নিষ্ঠার সহিত পূজা করিয়া

গিয়াছেন। জীবন এমন মানুষের ইতিহাসকে সবার অলক্ষে পবিত্র করিয়া গিয়াছে। আমরা আজ সেই জীবনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আসল অদ্বৈতের আবির্ভাব মৃদু হলেও মালো সমাজকে তরঙ্গায়িত করেছিল তিতাসের পৃষ্ঠায় সে সংবাদ জানা যায়। নিজেরা শিক্ষিত না হলেও শিক্ষার প্রতি একটা আগ্রহ গড়ে উঠেছিল তাদের। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রকাশিত দুটি বইয়ের কথা বলা যায়। লেখক মহেন্দ্রনাথ মল্ল বর্মণ। পুস্তিকা দুটির নাম যথাস্থানে 'ঝালমাল তত্ত্ব' (১৯১৪) এবং 'ঝল্লমল্ল পরিচয়' (১৯২৪)। পুস্তিকা দুটিতে লেখক মহেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সংস্কৃত সূত্র উদ্ধার করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তারা আসলে শূদ্র নন, ক্ষত্রিয়। ভারতীয় সমাজে এরকম চেষ্টা আধুনিকতার অবদান। সমস্ত ভারতবর্ষেই এই চেতনা জেগেছিল। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ ডঃ এম. এন. শ্রীনিবাস একে Self respect movement নাম দিয়েছেন। প্রত্যেক জাতি স্ব-স্ব পেশায় আচ্ছন্ন থাকতে বাধ্যতার কারণগুলি সনাক্ত করেছেন, অন্য সুবিধাজনক পেশায় যাবার চেষ্টা করেছেন। আর একই সময়ে তারা ভারতীয় চতুবর্ণাত্মক কাঠামোর মধ্যে উচ্চতর অবস্থান পেতে চেয়েছেন। অথচ বাস্তব উন্নতির সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র যোগ নেই। এই আত্মোন্নয়নের আকাঙ্খা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ত আকাঙ্খা ত্রিশের দশক থেকে রাজনৈতিক মাত্রা পেতে থাকে।

ঃ লেখিকার পরিচিতি ঃ

লেখক ডঃ কমল কুমার সিংহ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক। সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গান্ধীজী এবং আম্বেদকরের জীবন ও কর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়াও - পত্র পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের জন্ম ঃ ৩০শে ডিসেম্বর-১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পি. এইচ, ডি লাভ করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল - গান্ধীজি ও বাংলা সাহিত্যে, আম্বেদকর জীবন ও সংগ্রাম, ভারতীয় সাহিত্যে গান্ধীজি ইত্যাদি। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০০২ সালে শিলচরের পথে করিমগঞ্জে বাসের মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়। ২০০৩ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্য দলিত সাহিত্যের পক্ষে কমল কুমার স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

******

ত্রিপুরায় অনুশীলন সমিতি ও ত্রিপুরা বিপ্লবী বীরদের ইতিকথা

— গৌতমী রায়

ঊনিশ শতকে সংস্কার আন্দোলনের ফলে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। ভারতের মাটিতে বিদেশী শাসন যে অভিশাপ, এটা ধীরে ধীরে কলকাতা তথা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। পাঠান বা মোগল শাসনের সময় এদেশের অর্থ বিদেশে পাচার হচ্ছিল না : কেননা পাঠান আর মোগল শাসকরা এদেশকে আপন করে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে ইংরেজরা ছিল আক্ষরিক অর্থেই বিদেশী শাসক। তারা এই দেশটাকে শোষণ করে নিজেদের দেশের তহবিল বাড়াচ্ছিল। ফলে এদেশের অর্থনীতি বেহাল হয়ে পড়েছিল। ভারতের মাটি থেকে বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করতে হলে এদেশের জনগণকে সংগঠিত করা দরকার। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগানো দরকার, এটা উপলব্ধি করেছিলেন কলকাতা তথা বাংলার কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ। পরে সেই উপলব্ধি ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষের মনে।

স্বদেশী আন্দোলন দু'টি ধারায় বিভক্ত হলো, এক-নরম পন্থা এবং চরমপন্থা। নরমপন্থীরা বয়কট আন্দোলনকে ধরে রইলেন। চরম পন্থীরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিলেন। তাঁরা গঠন করলেন গুপ্ত সমিতি। প্রথমে গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল দেশীয়শিল্পের বিকাশ, শরীরচর্চা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি কাজে। কলকাতায় খুবই গোপনীয়তার মধ্যে দিয়ে সমিতিগুলির কাজকর্ম চালানো হতো। কলকাতার বাইরেও, বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় এদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

১৯০২ সালে কলকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হলো। এর সভাপতি হয়েছিলেন প্রমথনাথ মিত্র। শ্রী অরবিন্দ বাংলায় এলে এর শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামেগঞ্জে।

১৯০৮ সালের পর থেকে গুপ্ত সমিতিগুলির কাজের পরিধি বেড়ে যায়, কাজের ধারা আরো গতি পায়। ইংরেজ সরকার যতই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন দমনের জন্য মারমুখো হয়ে উঠতে লাগলো, গুপ্ত সমিতিগুলি ততই প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হতে লাগল।

কলকাতায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম সশস্ত্ররূপ নিলে তাকে দমন কাজে নিযুক্ত হন চার্লস টেগার্ট, সি. এস. আই, সি, আই, ই এম. ভি. ও। তিনি ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন ১৯০১ সালে। শেষ ৮ বছর কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদে আসীন ছিলেন। ১৯৩১

সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ষ্টেটস্ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের সেক্রেটারীর সদস্য হন । ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি রয়্যাল এমপায়ার সোসাইটিতে এক বক্তৃতায় গুপ্ত সমিতি সম্পর্কে বলেন ।

I must tell you something about the foundation of the secret Societies in Bengal, because unless you understand that, you can not understand the position today... Let us now turn to Bengal, which is a very different story, as the terrorist movement founded 25 years ago has spread far and wide and is exceedingly active today and it has engendered similar conspiracies in the United Provinces. The founder was Barindra Ghosh, who have lived and practised in England, where Barin and his brother Arobindo were born.

Having collected a few disciples, Barin, who was shortly, followed to Calcutta by his brother Arobindo, started by publishing in 1905 a pamphlet entitled 'Bhawani Mandir' the temple o Bhawani.

The 'Jugantar' was West Bengal group, but Eastern Bengal quickly followed suit.

Here was founded about the same the other main group called the 'Anusilan' or Culture Society. It was founded by Pulin Behari Das. Ostensibly as a society for physical and religious culture. The creed once started spread like wild fire, and this latter group soon had 500 branches in Eastern Bengal. The development must was strictly controlled from headquarters.

এই থেকে জানা যায় সশস্ত্র সংগ্রামীরা ইংরেজ সরকারের কাছে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিলেন । ঢাকার অনুশীলন সমিতির নেতা ছিলেন পুলিন বিহারী দাস ।

১৯০৯ সালে যে সব বিপ্লবী সমিতিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে, ঢাকার অনুশীলন সমিতি ছাড়াও ময়মনসিংহের সাধনা সমিতি আর সুহৃদ সমিতি, ফরিদ পুরের ব্রতী সমিতি, বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি আর কলকাতার অনুশীলন সমিতি । কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষণা হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গোপনে কাজ চালিয়ে গেছেন । ক্রমে সমগ্র ভারতে ও ব্রহ্মদেশে ছড়িয়ে পড়ে । ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত ভোলাচং গ্রামে অনুশীলন সমিতির এক বৈঠক হয় । ত্রিপুরার উদয়পুর ও বিলোনিয়ায় দুইটি ফার্ম ছিল । আপাত দৃষ্টিতে ফার্ম মনে হলেও আসলে ছিল বিপ্লবীদের একটি শিক্ষা কেন্দ্র । এখানে অনেক বিপ্লবীরাই আত্মগোপন করে থাকতেন । সেদিন ত্রিপুরাতে গড়ে উঠেছিল গুপ্ত সমিতি, ছাত্র সংঘ, ভ্রাতৃসংঘ । এতে নিয়মিত লাঠিখেলা, শরীর চর্চা চলতো ।

নারায়ণ ব্যানার্জী, নীলু গাঙ্গুলী, যোগেশ চক্রবর্তী, বীরেণ দত্ত, প্রভাত রায়, শচীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশ সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে এই গুপ্ত সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে বিপ্লবী সংগঠনের কাজে ব্রতী হন । ১৯২৮ সন নাগাদ ভ্রাতৃসংঘ তার প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় আগরতলার সমাজ জীবনে । ব্যায়ামচর্চার প্রসার ঘটে আগরতলার তরুণদের মধ্যে এবং এর মধ্যে দিয়ে দেশাত্মবোধক ধ্যান ধারণা মূর্ত হয়ে উঠে । শরীরচর্চার বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী সে সময় করে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলবার কাজে সহায়ক ছিল । ছাত্রদল সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের ভাবধারায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল । তৎকালীন রাজন্য শাসিত স্বাধীন ত্রিপুরায় বৃটিশের আগমন ঘটেছিল । রাজন্য আমলের পলিটিক্যাল এজেন্টে, গভর্ণর ছিলেন বৃটিশ । তবে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই চেতনা তখন বিপ্লবীদের কাজের মধ্যে প্রকাশ পেতনা । উদয়পুর ও বিলোনিয়া ছাড়া অনুশীলন সমিতি আর একটি ছোট্ট কেন্দ্র ছিল । মোটর ষ্ট্যাণ্ডের কাছে নরসিংহ আখরায় । অনন্ত দের নেতৃত্বেই সেই সময় পার্ব্বত্য ত্রিপুরার বিপ্লব কার্য্য পরিচালিত হতো । তিনি ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আন্দামানের সেলুলার জেলে ছিলেন । ত্রিপুরাতে আসেন ১৯৩৯ সালে । এক গাড়ী দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন ।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী "তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত" —-বাণীটি বিপ্লবীদের মনে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিল । তাঁদের মধ্যে এক বৈপ্লবিক শক্তির উদ্বোধন হয়েছিল । জনকল্যাণ ও সমাজ সেবায় কাজ ছিল অগ্রণ্য, এমনি এক অনুপ্রাণিত পুরুষ ছিলেন দ্বিজেন দে । উনি ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ও দমদম সেন্ট্রাল জেলে দীর্ঘদিন ছিলেন । প্রাচ্যভারতী, নেতাজী, বড়দোয়ালী ও ঈশানচন্দ্র নগর বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন । বর্তমান ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে তিনিই প্রথম বেসরকারী প্রসূতি সদন প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী উদ্যোগ নিয়েছিলেন ।

হেমেন্দ্রবিজয় রায় ১৯৩০-৩১ সালে ১৩ মাস কুমিল্লা জেলে এবং দমদম স্পেশাল জেলে অন্তরীণ ছিলেন তিন মাস । ১৯২০ সালে কোলকাতা রিপন স্কুলের ছাত্র ছিলেন । হঠাৎ সংবাদ পেলেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক নেই । স্কুল বর্জন করে ছাত্রদের নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন । নেতৃত্ব দিলেন হেমপ্রভা মজুমদার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমল । এঁরা এসে দাঁড়ালেন বিভ্রান্ত ছাত্রদের পুরোভাগে । দ্বারা-ভাঙ্গা বিল্ডিং এর সামনে পিকেটিং করার অপরাধে প্রথম পুলিশের হাতে প্রহৃত ও গ্রেপ্তার হন । আইন অমান্য আন্দোলন ১৯৩০ সালে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর নেপাল সেন মহাশয় কর্তৃক কুমিল্লা জেলের অভ্যন্তরে বিচারে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন । ১৯৫৫-৫৬ সালে ঈশানচন্দ্র নগর স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন ।

তখনকার সময় দেশ ও জাতির চরিত্রগঠনের আদর্শই ছিল বিপ্লবীদের আদর্শ। ক্ষুদ্র স্বার্থ, দুর্নীতি, শোষণ, এ সবের উর্ধ্বে ছিলেন বিপ্লবীরা । সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিপ্লবী বীরগণ এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে গেছেন । ১৯৩১ সালের ৫ই

এপ্রিল জ্যাকসন গেইটের কাছে—অমর সুধা নামে এক ঔষধের দোকানে ডাকাতি হয়েছিল। ডাকাতি করার সময় ঘটনাস্থলে পবিত্র পাল, শচীন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ধরা পড়েন । এদিকে এলিসন মার্ডারও জেল থেকে পলায়নের জন্য তাঁদের সাহায্য করেছিলেন রাজ পরিবারভুক্ত তথা নক্ষত্র রায়ের বংশধর ঠাকুর প্রভাত রায়, কান্তি দেববর্মা, সুশীল দেববর্মা, অনন্ত দে ও অমিয়া দেবী দেববর্মা । প্রয়াত প্রভাত রায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়তে গিয়ে সুকুমার ভৌমিকের সাথে অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন । ছাত্র সংঘের সদস্য হয়ে নিয়মিত ব্যায়াম, লাঠিখেলা, কুস্তিচর্চা করতেন । আগরতলা জেল থেকে তাঁদের মুক্ত করার জন্যও পিস্তলের প্রয়োজন ছিল । প্রভাত রায়ের একান্ত ভক্ত কান্ত দেববর্মা প্রভাত রায়ের ছোট মামা সোনামুড়ার বিভাগীয় হাকিম ললিত মোহন দেববর্মার বাসায় থাকতেন । কুমিল্লা থেকে সোনামুড়ায় প্রভাত রায়ের যাতায়াত ছিল। মামাতো বোন অমিয়া দেববর্মাকে দিয়ে তাঁর বাবার পিস্তল লুকিয়ে নিয়ে কান্ত দেববর্মা মারফৎ কাজটি হাসিল হতে পারেনি । পিস্তলসহ অনন্ত দে ও কান্তি দেববর্মা ধরা পড়েন কুমিল্লায় । কান্তি দেববর্মার উপর অস্বাভাবিক দৈনিক নির্যাতন করা হয় । তবুও তিনি ছিলেন অনড় অটল । এই খবর শুনে প্রভাত রায় , সুশীল দেববর্মা মারফৎ একখানা চিঠি সোনামুড়ায় অমিয়া দেবীর কাছে পাঠান। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল কান্তি দেববর্মা ও অনন্ত দে ধরা পড়েছে তুমি সাবধানে থেকো । এই চিঠিশুদ্ধ সুশীল দেববর্মাও কুমিল্লা রেল ষ্টেশনে ধরা পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত রায়ও গ্রেপ্তার হলেন । এই ঘটনায় হাকিম ললিত মোহন দেববর্মাকে অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে । পরিবার পরিজনসহ হাতীর পিঠে চড়ে জঙ্গল পার হয়ে আগরতলায় চলে আসেন। অমিয়া দেবী বাক্‌শূন্য জ্ঞান হারিয়ে পরে মারা যান । তৎকালীন সংরক্ষণশীল পারিবারিক লজ্জা, ভয় উপেক্ষা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অমিয়া দেবীর ত্যাগ এক উজ্জ্বল নারীর দৃষ্টান্ত, প্রভাত রায় দীর্ঘদিন অন্তরীণ ছিলেন । এরপর ১৯৩৮ সালে জনমঙ্গল সমিতি, ১৯৪৮ এ প্রজামণ্ডল, ৫০-৫১ সালে গণতান্ত্রিক সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এছাড়াও ছিল 'চিনিহা' পত্রিকার সম্পাদনা । ১৯৫৩-৫৪ সালে দ্বিজেন দে-সহ ঈশানচন্দ্রনগর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বিনা বেতনে, অর্দ্ধাহারে থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা করেছিলেন । অনেক বিপ্লবীদেরই গোপন আশ্রয় ছিল প্রভু বাড়ীতে । জীতু দত্ত, বীরেণ দত্ত বিপ্লবী অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । ১৯৩১ সালের প্রথম দিকে কুমিল্লা এলিসন মার্ডার ও মোগড়া ডাকাতির মামলায় ধরা পড়েন । তখন জেলে ছিলেন সুখময় সেনগুপ্ত, শচীন সেনগুপ্ত, আশু মুখার্জী, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক হীরেন নন্দী, আসরাফউদ্দিন চৌধুরী, স্বর্ণ কমল রায়, আরও অনেকে বিপ্লবী কার্যে যুক্ত ছিলেন । ১৯৩০ সালে আখাউড়া রেল স্টেশনে আগরতলায় সামরিক বাহিনীর জন্য প্রেরিত বৃটিশ সরকারের প্রায় শতাধিক রাইফেল রহস্যজনক কারণে রেল স্টেশনে আটকে থাকে । দলীয় সদস্য জ্যোতিষ চক্রবর্তী অন্য সূত্রে তৎক্ষণাৎ কুমিল্লায় খবর পাঠান । তখন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মেজর ত্রিপুরার প্রাক্তন কারামন্ত্রী স্বর্গীয় যোগেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীনে এই রাইফেলগুলি ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা

হয় । হয়তো এই অস্ত্রগুলি বিপ্লব আন্দোলনের মোড় ঘুড়িয়ে দিত । কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে এ্যাকশনের ২-৩ ঘন্টা আগেই রাইফেলগুলি সামরিক বাহিনী নিয়ে নেয় । ঐ দলে ছিলেন স্বর্গীয় যোগেশ চক্রবর্তী, নলিনী ভদ্র, শচীন দত্ত, যোগেশ ধর, ইন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জগবন্ধু ভট্টাচার্য্যসহ প্রায় ১৫ জন বিপ্লবী । স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেবামুলক কাছে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন আরেকজন বিপ্লবী দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত । ১৯৩১ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে যখন আই. এস. সি. পরীক্ষার্থী, পরীক্ষার হলে নির্দেশ আসে আত্মগোপন করতে হবে । অনুশীলন সমিতি যখন ব্যাপকভাবে সারা ভারতবর্যে বিদ্রোহ সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখনই ঘটল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং তার প্রভাব এসে পড়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রবল বিক্ষোভ । তিন বছর আত্মগোপন করে ১৯৩৩ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন । আট বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন।

সংগ্রামী জীবন বেছে নিয়েছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী রতন চক্রবর্তীর পিতা ফটিক চক্রবর্তী । নিজের পরিচয়েই চলতেন । গাড়ী বিক্সার ধার ধারতেন না । তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মগুরু হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ । ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, সূর্য্যসেন । এদের কার্যাবলি তাঁকে প্রভাবিত করেছিলো । ভারতছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কারাবরণ করেন । ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ গুপ্ত সমিতিগুলির মাধ্যমে ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ত্রিপুরাতেও এসে পড়েছিল । বহু তরুণ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশ বাহিনীর নজরে পড়ে কারাগারে বন্দি দশা কাটিয়েছেন বহু বছর । যুগের পরিবর্তনের সাথে রাজনৈতিক যাতাকলে চাপা পড়ে তাদের অনেকেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান । আবার কেহ বা মূর্তি হয়ে গলায় মালা পড়ে জেগে উঠেন। কিন্তু আমি চাই যাঁদের সম্পর্কে জানি তাঁদের কথা, তাঁদের কাহিনী ফুটে উঠুক সকলের হৃদয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা যেন তাঁদের আত্মত্যাগের কথা পৌঁছে দিতে পারি স্বাধীনতা দিবসে— এই হোক আমাদের শপথ ।

ঃ লেখিকার পরিচিতি ঃ

স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা ত্রিপুরার তৎকালীন বিশিষ্ট জননেতা প্রয়াত প্রভাত চন্দ্র রায়ের কন্যা গৌতমী রায়ের জন্ম আগরতলা কৃষ্ণনগরে ১৯৫৭ সালে । তিনি আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রে কর্মরতা । গত ২০০২ সালে তাঁর বাবার লিখিত রচনাগুলি সংগ্রহ করে, মাতৃদেবী শ্রীমতী হাসি রায়ের আগ্রহে ত্রিপুরার স্বনাম ধন্য লেখকদের সাথে "প্রভাত রায়ের রচনা সংগ্রহ ও স্মৃতি কথা" বইখানির সাহিত্যের অংশটি সম্পাদনা করেছেন। বাবার লেখা থেকেই প্রেরণা লাভ করে অল্প অল্প করে লিখতে শুরু করেছেন মাত্র ।

******

ত্রিপুরা ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক কেন্দ্রের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

— চিরব্রত রায় বর্ম্মণ

শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বই সমাজ বিকাশের মূল সূত্র । উৎপাদন শক্তির কিরূপ বিকাশ হয়েছে, তার উপর সামঞ্জস্য রেখেই গড়ে উঠে উৎপাদন সম্পর্ক । কিন্তু এই সামঞ্জস্য বেশীদিন বজায় থাকে না, যতই উৎপাদন শক্তির বিকাশ হয়, ততই উৎপাদন সম্পর্কের সাথে বিরোধ বাধে ।

একটা সময় আসে, যখন উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির বিকাশের পথে বাধা জন্মায় । ইহাই সমাজ বিপ্লবের অবস্থা । সমাজে যে শ্রেণী পরিবর্তন বিরোধী এবং যে শ্রেণী পরিবর্তন প্রয়াসী তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে । সে সময় যারা পরিবর্তন চায় তারাই বৈপ্লবিক শ্রেণী ।

সামন্ত্রতন্ত্রের শেষ দিকটায় সদ্যোজাত বুর্জোয়া শ্রেণীই ছিল বৈপ্লবিক । ইহাই সমাজতন্ত্রের কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে পুজিতন্ত্রের জন্ম দেয় । আবার, পুজিতন্ত্রের উৎপাদন শক্তির এত বিরাট পরিবর্তন হয় যে এত বেশী বিকাশ হয় যে পুজিতন্ত্রের কাঠামো ইহাকে সামাল দিতে পারে না, নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ।

কিন্তু পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের বাধা সৃষ্টি করে এবং পুঁজিতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্ভব । পুজিতন্ত্র সাম্রাজ্যতন্ত্রে পরিবর্তন হয় । পুজিতন্ত্রের এক চেটিয়া উৎপাদন যখন থেকে শুরু হয়েছে, তখন থেকেই পুজিপতির নিকট বাড়তি মাল হয়ে দাঁড়ায় — বড় রকমের সমস্যা। সেই হতে সে উপনিবেশের খুঁজ, দেশ দখল । কোন একটা দেশকে শোষণ করতে হলে, উহাকে রাজনৈতিকভাবে উপনিবেশে পরিণত না করেও অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করে শোষণ চালিয়ে যাওয়া যায় ।

বর্তমান বিশ্বে উন্নত দেশগুলিতে পুজির মালিক এবং কারখানার মালিক মিলে নিজেদের দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে । এদের হাতেই গোটা দেশের জাতীয় ধন সঞ্চিত হয় । বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে যুক্ত সংগঠন গড়ে তোলে এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার স্থাপনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অনগ্রসরমান দেশগুলোর উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে ।

বর্তমান বিশ্বে, সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি উন্নত

দেশগুলোর প্রধান রাষ্ট্রনীতি হলো — পৃথিবীর তামাম দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা পালন করা ।

অধিক কাঁচামালের সংগ্রহের জন্য চাই প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বিশাল ভূ-এলাকা । এই ভূ-এলাকা সন্ধানে সাম্রাজ্যবাদীরা শক্তির পৃষ্ঠপোষকতার বিভিন্ন সংখ্যা মানব কল্যাণের প্রকাশ্য কর্মসূচী নিয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে ।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পূর্ব হিমালয় অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্যসমূহ এবং দ্বীপগুলো প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে ভরপুর ঃ

অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থার জন্য এই সম্পদ ভাণ্ডারকে সঠিকভাবে উৎপাদন শিল্পে ব্যবহার করে রাজ্যের উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ । এই ব্যর্থতার জন্য মূলতঃ রাষ্ট্রীয়স্তরে বিজ্ঞানসম্মত প্রকৌশলগত অভিজ্ঞতা ও সম্পদের অভাবের দরুন কোন পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে উঠেনি । ফলস্বরূপ ট্রেডিশনাল ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে আকড়িয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে । তাতে করে রাষ্ট্রীয়স্তরে ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক চাহিদা, শ্রমশক্তির অপচয়, বেকারত্ব অনিশ্চয়িতা ও সামাজিক অসন্তোষ, সমাজ জীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে চলেছে । তার প্রভাব রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর অবশ্যই পড়ে ।

বর্তমান পুজিতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উন্নত দেশসমূহের পররাষ্ট্রনীতিই হলো অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দুর্বল দেশসমূহে তার আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের নামে আর্থিক অনুদান (কঠিন সত্বে) দিয়ে রাষ্ট্রের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা ।

অর্থনৈতিক শোষণের সূত্রটি, জাতীয় স্তরে এক চেটিয়া পুঁজিপতি অধিক মুনাফা স্ফীত করার লক্ষ্যে স্থানীয় স্তরে অর্থনীতির বিকাশ না ঘটিয়ে সব সুবিধাযুক্ত বাহির বাজারের লক্ষে তুলনামূলক স্থানে শিল্প প্রসার ঘটিয়ে যাচ্ছে।

হিমালয়ের পাদদেশে — ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ থাকা সত্বেও বৃটিশ রাজত্বকাল থেকে অবহেলার দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে । স্বাধীন ভারতেও একইভাবে অবহেলিত হয়ে আসছে ।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার লাভের পর তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনৈতিক বিকাশকে স্ব-নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মৌলিক শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা নেয় ।

প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থনৈতিক জাতীয় পরিকল্পনায় গুরুত্ব দিয়ে ভারতে কয়েকটি ক্ষেত্রে মৌলিক শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং রূপায়িত হয় ।

এই মৌলিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছিল, কারণ সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করায় । এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল জাতীয় ক্ষেত্রে । ফলে, বহিরবিশ্বের কোন রাজনৈতিক চাপ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয় নাই । পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সহযোগিতায় আমাদের জাতীয় স্তরে অর্থনৈতিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে।

কিন্তু এই সাফল্য একটা স্তর পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে । ভারত একটা কৃষি প্রধান দেশ । দেশের সত্তর থেকে আশি শতাংশ লোক কৃষি নির্ভর । আবার এই কৃষি ব্যবস্থাটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে কৃষি কাজের সংস্কার ঘটানো হয়নি, বরঞ্চ উপেক্ষিত হয়েছে । অথচ আজও সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থাকে সুনজরে লালন পালন করা হচ্ছে । কেন না এটাকে ভাঙ্গতে হলে -- জাতীয় সরকারের স্বচ্ছ শ্রেণী চেতনা থাকা চাই । সাধারণ অগণিত দুর্বল কৃষক সমাজের স্বার্থে কর্মসূচী রূপায়ণ করা ।

বৃহৎ শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন ব্যাপকভাবে ভারতের মত কৃষিভিত্তিক দেশের জন্য প্রধান বিবেচ্য কর্মসূচী হওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

ভূমি সংস্কার ও সমবায় কৃষি আন্দোলন ঃ

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবসায় গড়ে উঠা বৃহৎ ভূ-স্বামীদের মালিকানায় নিয়ন্ত্রণে সত্তর থেকে আশি শতাংশ কৃষিজাত জমি । তাদেরে কোলাক বলা হয়। এই কোলাক শ্রেণীর মালিকানায় দৈনিক মজুরীর বিনিময়ে কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে । তারাই ক্ষেতমজদুর বা কৃষকশ্রমিক । সামাজিকভাবেই ফসল উৎপাদনে আন্তরিকতার অভাব থেকে যায় । প্রাথমিকভাবে লাঙ্গলের সাথে জমির মালিকনা উৎপাদনকে বৃদ্ধি করতে উৎসাহ বাড়ায় । তাতে করে কৃষককে আত্মচেতনা বৃদ্ধি করে । তাই প্রথমে প্রয়োজন বিধি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভূমি সংস্কার ঘটানো । কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখযোগ্যভাবে ভূমি সংস্কারের কাজটা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং করা হচ্ছে।

যদিও ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে জমির খণ্ডিকরণ ঘটানো হয় ; তাতে সাময়িকভাবে জমির পরিমাণ কমে গিয়ে তা ছোট ছোট খণ্ডে চাষের ব্যঘাত সৃষ্টি করে । তথাপি, এটি একটি বিবর্তনের ধাপ । তাতে করে কৃষকের (যিনি চাষ করেন) নিজের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস উৎপন্ন হয় । এই আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য এবং বৃহত্তর ভূমিহীন কৃষক সমাজকে জমির মালিকানা দেওয়ার মধ্য দিয়ে এক দিকে শোষণের হাতিয়ারটিকে ভাঙ্গা হবে এবং অপরদিকে কৃষি উৎপাদনে অধিক পরিমাণে কৃষক সমাজকে উৎসাহিত করবে । সমাজ

পরিবর্তনের এই ধাপটাকে অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় । যদিও অগ্রসরমান আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতি রেখে, উৎপাদনকে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত কৃষি চাষই শ্রেয় । সমবায় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট খণ্ড জমিকে একত্র করে আধুনিক উন্নত মানের চাষই কাম্য । অপরদিকে - চাপিয়ে দেওয়া পশ্চিমী পৃষ্ঠপোষকতায় ম্যাকান্স সূত্র অনুসরণ করে কৃষি চাষ কখনও সমর্থনযোগ্য নয়, তাতে একদিকে সমস্যাই সৃষ্টি করবে এবং কৃষক সমাজকে জমি থেকে বিতাড়িত করা হবে ।

কর্মসংস্থান একটা বর্তমান ভারতে জ্বলন্ত সমস্যা —

বিশাল ভারতে, কর্মসংস্থান একটা জ্বলন্ত সমস্যা । প্রতিটি সক্ষম যুবক-যুবতী তার যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করার অধিকারী । পাশাপাশি, প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তি কি শহুরে কি গ্রামে অর্থকরী কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে চায় । অথচ বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় --- মুনাফাব প্রতিযোগিতায় বৃহৎ পুঁজিকে স্ফীত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ।

জাতীয় অর্থনীতির পশ্চাদ প্রসারণ - অস্থিতীশীল অবস্থার সৃষ্টি - বৈরী সমস্যার উদ্ভব ঃ

পণ্ডিত নেহেরুর পরবর্তী সময়ে জাতীয় সরকারগুলো, নেহেরুর স্বয়ম্ভর অর্থনীতিকে পাশে ঠেলে দিয়ে মিশ্র অর্থনীতির নামে জাতীয় অর্থনীতিকে বৃহৎপুঁজিপতিদের স্বার্থে একের পর এক পরিবর্তন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সংস্কার ঘটানো হয় ।

তাতে কোন কর্মসংস্থানের কোন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি । বরঞ্চ কর্মসংস্থান দিনের পর দিন সংকুচিত হয়েছে এবং বিশাল জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ।

ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাতীয় সরকার প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সমূহের বিকাশে কোন প্রকার উৎসাহ দেখায় নি । যার ফলস্বরূপ, আর্থসামাজিক অবস্থা এক ভয়াবহ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে । বেকারত্ব কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যুব সমাজকে ঠেলে দিয়েছে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে । নতুন করে একে অপরের উপর বিশ্বাস হারিয়ে বৈরী ভাবের উদ্ভব । সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অবিশ্বাস, হানাহানি, সংঘাত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রবণতা, দিনের পর দিন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে । অপরদিকে পশ্চিমী দুনিয়ার সু-নিপুণ পৃষ্ঠপোষকতায় কতিপয় কিছু সংখ্যক মিশনারী গণের হাত দিয়ে এই স্থায়ীভাবে অস্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে । অপরদিকে উগ্রপন্থী এই ব্যবস্থারই একটা অঙ্গ । ফলে, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলোতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা একটি প্রধান প্রশাসনিক সমস্যা ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল-অর্থনৈতিক বিভাগের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ঃ

অথচ এই রাজ্যগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । ভৌগোলিক অবসান, জলবায়ু, বনসম্পদ, কৃষি উপযোগী চাষজমি, চা-শিল্প, বাগান-চাষ এবং ছোট-বড়-মাঝারি শিল্প

বিকাশের এক সম্ভাবনাময় এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ।

কিন্তু বিশ্বায়ণের যুগে, বাজার অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় — আমেরিকা, বৃটেন, ইটালী, স্পেন, জাপানসহ কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশের পুজির দ্বারা । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ থেকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির অসাধারণ পুনর্গঠনের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দাবী রাখে । সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের ইউরোপের বাইরের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরাট চাপের মুখে পড়ে যায় । ভারতসহ প্রতিটি অগ্রসরমান ও অনগ্রসর দেশসমূহ জাতীয় বৈশিষ্টের উপর এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং পাশাপাশি পরস্পর এর উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক বাজার গড়ে তোলা প্রয়োজন ।

জাতীয়পুজির বিকাশ ঃ

ধনতান্ত্রিক বিকাশের ধর্ম অনুসারে, প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে একই সারিতে অবস্থান করে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে । লব্ধ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে । তার নিজ পুঁজির একছত্র আধিপত্য লাভ করে । জাতীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে জাতীয় ধনিক শ্রেণীর ভূমিকা খুবই লজ্জাজনক । মুনাফার পাহাড় স্ফীত করাই প্রধান লক্ষ্য ।

প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে, শিল্পে শ্রমিক ছাটাই ক্রমশই বেকার সমস্যা বৃদ্ধি হচ্ছে । নতুন নতুন শিল্পের উদ্ভাবনের ফলে পুরানো শিল্পের বাজার নষ্ট হয়ে পড়ছে । যেমন তরল পানীয় বাজারের আসার ফলে চা শিল্পকে প্রচণ্ডভাবে অস্তিত্ব রক্ষায় লড়াই করে যেতে হচ্ছে ।

ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে মিশ্র অর্থনীতির কথা বলা হলেও — মূলতঃ পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি । মুক্ত অর্থনীতির নামে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আই-এম.এফ.-এর অঙ্গুলীর নিদের্শে পরিচালনা করা হচ্ছে ।

জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক শিল্প গড়ার কর্মসূচী গ্রহণ করে জাতীয় শ্রম শক্তিকে উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন ।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিয়ত জাতীয় বিকাশে একচেটিয়া শিল্প পতিদের স্বার্থ রক্ষায় ঝুকে পড়েছে । জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলো বিশ্লেষণ করলে তার যথার্থতা প্রমাণিত হবে ।

পরিকল্পনা খাদে ব্যয়ের বরাদ্দ প্রমাণ করে ক্রমশ কৃষি ও কৃষিজাত বিকাশে পিছু টান —

কৃষি ও কৃষি সম্পর্কীয় ব্যয় পরিকল্পনা খাতে নিম্নগামী

Sys plan	Agriculture & allied atirits	Rural Development	Special area programme	Irrigation of Hord	Total
পঞ্চবার্ষিকী		---	--	---	৩৭.০০
দ্বিতীয়	---	—	—	—	২০.৯
তৃতীয়	--	—	—	—	২০.৫
চতুর্থ (১৯৬৪-৭৪)	১৯.৭	—	---	৮.৬	২৮.৩
পঞ্চম (১৯৭৪ ৭৯)	১২ ৪	---	--	৯.৪	২২ ২
ষষ্ঠ (১৯৮০-৮৫)	৬ ১	৬ ৪	১.৪	১০.০	২৩.৯
সপ্তম (১৯৮৫-৯০)	৫ ৮	৭ ০	১.৬	৭.৬	২২ ০
অষ্টম (১৯৯২ ৯৭)	৫.২	৭.৯	১.৬	৭.৫	২২.২
নবম (১৯৯১-২০০৩)	৪.৪	৮.৫	০.৪	৬.৫	১৯.৮
দশম (২০০২ ২০০৭)	৩ ৯	৮.০	১.৪	৬.৮	২০.১

Source : Sri Ranga Rao Ganamanuni - performance of Agriculture Sector in India (Since 1950's) paper presented to the National Seminer on Institutional Policy Options for Sustainable Agricultural Development Organised by the Department of Economics - OSmania University on 10th to 11th April, 2004.

মুক্ত অর্থনীতি সংকট ঃ

ভারতের বর্তমান মুক্ত অর্থনীতির ফলে জাতীয় শিল্প প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রচণ্ডভাবে সংকটের সম্মুখীন হয়ে - গুটিয়ে নিতে হচ্ছে, নয়তো শ্রমিক ছাটাই করে অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে।

ফলে এই বিশাল ভারতে কোটি কোটি শ্রমশক্তির কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ একেবারেই অনুপস্থিত। শহরে যেমন শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত

বেকারের সংখ্যা দিনদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে এবং পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে তেমনি শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত এবং সাময়িক কর্মহীন বেকারের সংখ্যাও হিমালয় পরিমাণ।

আবার ব্যবহারিক জীবনে, স্বল্প শিক্ষিত গ্রামীণ বেকারগণ যখন কোন কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো এবং এই উৎপন্ন দ্রব্যের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা থাকতো । কিন্তু আজ আধুনিক যন্ত্র শিল্পের ফলে নতুন নতুন চমকপ্রদ ভোগ্যপন্য, জনগণের হাতের নাগালের মধ্যে এসে যাওয়ায়, চাহিদার পরিবর্তন ঘটছে এবং পুরানোটাকে ত্যাগ করছে । ফলে এক বিরাট সংখ্যা স্ব নিয়োজিত জীবিকা উপার্জন থেকে ছিট্‌কে পড়ছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে । তাতে করে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় -- টি.ভি. বাজারে আসার আগে ব্যাপকভাবে রেডিও ব্যবহার হতো শহুরে গ্রামেগঞ্জে এবং রেডিও মেরামত করে গ্রামে গঞ্জে, হাটে বাজারে ও শহুরে উল্লেখ সংখ্যক শ্রমজীবি জীবিকা উপার্জনের উপর নির্ভরশীল ছিল । তেমনি উন্নতমানের ঘড়ি বাজারে আসার আগে পর্য্যন্ত তেমনি পুরানো ঘড়ি মেরামত করে বহু বেকার স্বনিয়োজিত কর্ম্মের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং সর্বক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ধাক্কা লেগেছে ।

প্রতিযোগিতার বাজারে নিত্যনতুন চমকপ্রদ জিনিষ বাজারে এসে পুরানোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে । ফলে এই প্রতিযোগিতার যুগে কোন ব্যবসাই নিশ্চিন্ত করতে পারছে না কর্ম সংস্থানকে ।

একটি বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সংকট । এই সংকট প্রতিটি দেশেই উপস্থিত । বাঁচার রাস্তা কোথায় । আজ এই সমস্যা থেকে রাষ্ট্রকে কিভাবে সংকটমুক্ত করে এক সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায় । তারজন্য জাতীয় রাজনৈতিক দল সমূহকে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন । এই কর্মসূচীর ভিত্তি হবে প্রতিটি দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মানুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানো । তারজন্য প্রয়োজন ... জাতীয় সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকার ।

উত্তরণের মধ্যবর্তী সময়ে অভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঃ

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উত্তরণের মধ্যবর্তীকালীন সময়ের জন্য প্রয়োজন এক অভিন্ন সহযোগিতায় আন্তরিক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ব্যাপক পরিকল্পনা । বিকাশের কোন স্তরকে আংশিক উপেক্ষা করে পরবর্তী স্তরে এগিয়ে যাওয়াতে সাফল্য আসবে না । পাশাপাশি শ্রমজীবি জনগণকে রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং লক্ষ্যরাখা প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ

যাতে করে সাফল্যের মুখ দেখতে পায় ।

পশ্চিমী দুনিয়া থেকেমুক্ত এক অভিন্ন অর্থনৈতিক বাজার গড়ার প্রয়োজন ভারতসহ এশিয়ার দক্ষিণপূর্ব দেশ সমূহের মধ্য পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক । পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে সামাজিক বাজার গড়ার প্রয়োজনে । ইহাই একটি আদর্শ রাস্তা । কারন কোন দেশের রাষ্ট্রীয় সরকার দেশের আর্থ সামাজিক বিকাশ না ঘটিয়ে শাসনের চাবুক দেখিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না দীর্ঘকাল । জনগণ বাঁচার প্রয়োজনে পরিবর্তন চায় । তই শুধু রাজনীতিই নয় সম্পর্ক স্থাপন হওয়া প্রয়োজন শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সবক্ষেত্রেই । তাতে করে জনগণ জনগণের সাথে এক পারস্পবিক বন্ধন রচনা হয় । ইহাই হবে সমাজ পরিবর্তন মূল চাবিকাঠি ।

এশিয়ার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব দেশ সমূহের আর্থ সামাজিক অবস্থা খুবই দুর্বল । পশ্চিমী দুনিয়ার অর্থনৈতিক বাজারের চাপে পড়ে আছে । বেশির ভাগ রাষ্ট্রীয় সরকারের চরিত্রগুলো জন উন্নয়ন চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হওয়ায় রাষ্ট্রীয় স্তরে বাস্তবমুখী অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তুলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি । অপর দিকে, পশ্চিমী দুনিয়ার উন্নত দেশসমূহ তাদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উপনিবেশ বানিয়ে মুনাফায় পাহাড় স্ফীত করে চলেছে ।

পশ্চিমী দুনিয়ার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে হলে, প্রতিটি রাষ্ট্রকে নিজ অর্থনীতির আমূল সংস্কার ঘটাতে হবে এবংস্বাভাবিক কারনে বিকাশের ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গ্রহণ করা জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন যা সমাজের দুর্বল অংশের মানুষকে আকৃষ্ট করবে । যে সব কৃৎ-কৌশল এবং বিদেশী বিনিয়োগ সম্মানজনক স্বত্বে গ্রহণ করা যেতে পারে ।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন — ভারত ঃ

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে, ভারতের আজ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে নতুনভাবে জোরদার করতে হবে । জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে নতুনভাবে জোড়দার করতে হবে । জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে আবার নিজেকে নেতৃত্বের আসনে সফল করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । জোট আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী হলো - পশ্চিমী দুনিয়ার চাপ মুক্ত হয়ে মানব কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা, নিজ রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি নজর রেখে ।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে জোড়দার করা বর্তমান পৃথিবীর কোটি কোটি দুর্বল অংশের মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে একটা নিশ্চিত সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন উপহার দেওয়া ।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা জরুরী ছিল যখন ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবস্থান ছিল পাশাপাশি । কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের

পর আমেরিকার নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক শিবির বাধাহীন আক্রমন নীতি সমগ্র দেশের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে । এই চাপের হাত থেকে বাঁচার প্রয়োজনে উন্নয়নকামী এবং অনুন্নত দেশসমূহকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে পারস্পরিক বোঝা পড়ার মধ্য দিয়ে একটি সমন্বয় ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাজার গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন ।

এরজন্য প্রয়োজন পাশ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিকাঠামো । এই পরিকাঠামো গড়ে উঠবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিনিময়, ক্রীড়া ও মৈত্রী সফরের মধ্য দিয়ে ।

বিকাশে আঞ্চলিক বৈশিষ্টগুলির প্রাধান্য ঃ

শরীরের কোন বিশেষ অংশকে দুর্বল রেখে সমস্ত শরীরটাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলা যায় না । ঠিক তেমনি ভারতের মত বিশাল জনসংখ্যার দেশে, যে অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর । তাকে সদ্ ব্যবহার না করে বা আঞ্চলিক আর্থ সামাজিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেশ অগ্রসর হতে পারে না ।

তাই অঞ্চলভিত্তিক সমস্যাগুলোর উপর গুরত্ব দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগলিক অবস্থান, স্থানীয় জলবায়ু ও লোকসংস্কৃতি ও স্থানীয় শ্রমশক্তির উপর গুরুত্ব দিয়ে কৃষি ভিত্তিক শিল্প তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজদন । কৃষিভিত্তিক শিল্প আধুনিক প্রযুক্তিগত হওয়া প্রয়োজন ।

পরিকল্পনাটা হওয়া চাই বাস্তবমুখী এবং আঞ্চলিক চাহিদা অনুযায়ী । অধিক সংখ্যক কৃষি ভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক মাঝারি ও ছোট শিল্প স্থাপন কর্মসূচী গ্রহণ করাই বাস্তবমুখী পরিকল্পনা । এই পরিকাঠামো গড়ার জন্য অধিক পরিমাণ সুন্দর বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না ।

এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় বিবেচনায় থাকতে হবে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে স্থানীয় বেকার সমস্যা সমাধান করা এবং প্রাকৃতিক এবং কৃষিভিত্তিকউৎপাদনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে আর্থ সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটানো যায় ।

সমবায় আন্দোলন - সাফল্যের চাবিকাঠি ঃ

স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দিয়েই শিল্প সম্পদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা শ্রেয় এবং শিল্পের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল তার সুস্থ পরিচালন ব্যবস্থার উপর । প্রতিটি উদ্যোগই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন । বে-সরকারী উদ্যোগ কখনও সমর্থনযোগ্য নয় । কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ বা কৃষি সহায়ক উদ্যোগগুলো সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পরিচালনের দায়িত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয় । এই সমবায় সংগঠনগুলো শুধুমাত্র

প্রতিটি উদ্যোগের শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্ট সরকারের প্রতিনিধিটির মিলিত হাতেই পরিচালনা দায়িত্ব থাকবে । উদ্যোগের সাফল্য বা ব্যর্থতা সরাসরি মিলিতভাবে সমিতির উপর থাকিবে । প্রতিটি উদ্যোগের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে তার উৎপাদন ব্যবসায় কতটা পরিমাণ প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটিয়ে চাহিদাকে সন্তুষ্ট করতে পারে ।

আর বাজারের চাহিদাকে স্থির জায়গায় বেঁধে রাখার প্রয়োজনে প্রতিটি কৃষিজাত উৎপন্ন ফসলকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপায় উদ্ভাবন করে সংরক্ষিত রাখা যায় । ফলে কৃষক তার অধিক উৎপন্ন ফসলের সঠিক মূল্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে । বাজারে উৎপন্ন ফসলের মূল্য উঠানামা করার সম্ভাবনা আর থাকবে না । কৃষকের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা বহুলাংশে কমে যাবে । কৃষি উৎপাদনে ব্যঘাত ঘটাবে না।

কৃষিভিত্তিক বা কৃষি সহায়ক শিল্প উদ্যোগগুলো শুধুমাত্র একটি বা দুটো উৎপন্ন ফসল বা ফলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলে কখনও সাফল্য বা লাভবান হবে না । এই সমস্ত ফসল বা ফলগুলো বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ প্রায় তিন মাসকাল সময়ের। তাই পরবর্তী দীর্ঘ নয় মাসকাল কাঁচামালের অভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হয় । তাতে প্রতিষ্ঠানটি লোকসানে চালাতে হয় । এ ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত উদ্যোগ আরম্ভ করার পূর্বে স্থির করে নিতে হবে অন্তত তিনটি ফসল বা ফল যা কিনা একটা ফল উৎপাদন শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় ফলটি উৎপাদন শুরু হয় এবং উৎপাদন শেষ হওয়ার মুহূর্তে তৃতীয়টির উৎপাদন শুরু হয় ।

তাতে করে বার মাসের মধ্যে অন্তত নয় মাস কাল প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন চালিয়ে যেতে সক্ষম । আর বাকী তিন মাস সময়কাল শিল্প প্রতিষ্ঠানটির রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন । তাহলে প্রতিষ্ঠানটি কখনও লোকসানে পরিচালন করার প্রশ্নই আসবে না ।

প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্থির রাখার জন্য প্রয়োজন কাঁচামালের স্থায়ী যোগান । এই স্থায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচামালের যোগানের জন্য সম্পূর্ণভাবে খোলা বাজারের উপর নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় । তারজন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে কৃষি ফার্ম গঠন করে চাহিদার অনুরূপ উৎপাদন নির্দিষ্ট করা । কাঁচামাল যোগানের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না ।

পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটিকে লোকসানের হাত থেকে রক্ষার প্রয়োজনে উৎপন্ন বস্তুকে বাজারজাত করার স্থানীয় চাহিদা ও বৈদেশিক চাহিদা সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য নিতে হবে । বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হবে ।

এই ধরণের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্টের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল প্রচুর পরিমাণ কৃষিজাত ফসলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে ।

প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপনের পূর্বে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে প্রতিষ্ঠানটিতে সারা বছর কাঁচামাল যোগান দেওয়া সম্ভব হবে কিনা । নতুবা দুই বা তিন ধানের ফসল চক্রাকারে উৎপাদন করে যোগান দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ।

আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং বিপুল কর্মসংস্থান-এর রাস্তা উন্মোচনের জন্য প্রয়োজন - উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যে একাধিক কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক মাঝারি মাপের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা । ফলে দুর্বল আর্থ সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটাবে এবং ধীরে ধীরে উগ্রপন্থী সমস্যার অবসান ঘটবে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নও ঘুচে যাবে ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে মাঝারি মাপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে বহুমুখী অর্থনৈতিক বাজারের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং বাহির বাণিজ্যের দোয়াব উন্মোচন হয়ে যাবে । একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাজার অর্থনীতি চাংগা হবে এবং ছোটখাট বহু উপার্জনের দেখা দেবে । এই ব্যবস্থায় মধ্য দিয়ে জন সাধারণের মধ্যে একটি অবস্থার মনোভাব চলে আসবে । এই অবস্থার মধ্য দিয়ে স্থানীয় জনসাধারণ খুজে পাবে ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা । হতাশা, বিদ্বেষ, হানাহানি বহুলাংশে কমে যাবে এবং আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নেও প্রশাসনকে অধিক ব্যস্ত থাকার প্রয়োজন হবে না । সামাজিক স্থিতিশীলতার মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষিত হবে । কল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হবে । বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় যুব সমাজকে অধিক সংখ্যায় যোগদানে উৎসাহিত করা সম্ভব হবে জাতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে । উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা এক নতুন বিশ্ব বাণিজ্য পরিবেশ গড়ার সম্ভাবনা —

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সাথে ত্রিপুরারাজ্যের অবস্থানগত কারণে এক বিশাল বাহির বাণিজ্যের দোয়ার উন্মোচনের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে । ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সড়ক পথে । জলপথে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দক্ষিণপূর্ব দেশ সমূহের সাথে অল্প ব্যয়ে এবংসহজে ব্যাপক বিনিময় বাণিজ্য গড়ে তুলা সম্ভব ।

নেপাল, ভূটান, ভারত, চীন, বাংলাদেশ, মায়ামমার, থাইল্যাণ্ড, মালদ্বীপ মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনামসহ দক্ষিণ, দক্ষিণ পূব এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে এক নতুন সামাজিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীল বাণিজ্যসংস্থা গড়ে তুলা যেতে পারে । যা কিনা পশ্চিমী চাপমুক্ত হয়ে প্রতিটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংস্কার ঘটাতে সক্ষম হবে । ভারত এ ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা নিতে পারে । তার মধ্য দিয়ে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর দ্রুত বিকাশ ঘটা সম্ভব এবং এই ত্রিপুরা রাজ্য হবে এই বহির বাণিজ্যে প্রাণকেন্দ্র ।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঃ

আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক ও কৌশলগত ক্ষেত্রে এখন ইউরোপের গুরুত্ব বেড়েছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে বাড়িয়ে ২৫ করেছে।

আগে ইউরোপীয় দেশগুলো পরিষ্কার দু'ভাগে বিভক্ত ছিল, এখন আর সে সব ইতিহাস।

ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্বভাবগতভাবেই বন্ধু। গণতন্ত্র. বহুত্ববাদ; আইনের শাসন, স্বাধীন সংবাদমাধ্যম ও বিচার ব্যবস্থা এ সবক্ষেত্রে একই মূল্যবোধের উপরে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে বহু বিস্তৃত হয়েছে।

অনুরূপভাবে দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে নতুন বাণিজ্যিক উদ্যোগ এক সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যত পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ জনসংখ্যার বসবাসকারী জন সমাজকে উপহার দিতে সক্ষম হবে। সার্ক এর অন্তর্ভুক্ত ভারতের তিন প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল ও ভূটান ও বাংলাদেশ।

নেপাল ঃ ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতের কোলে স্বাধীন নেপাল রাষ্ট্র অবস্থিত। নেপালের সর্ব দক্ষিন ভাগে রয়েছে তরাই সমভূমি। প্রশস্ত এই সমতল অঞ্চলের উত্তর ভাগ আরণ্যময় এবং দক্ষিণ অংশ উর্বর কৃষি ভূমি।

অধিবাসীগণের অধিকাংশই কৃষিজীবি। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ আসে কৃষি থেকে। কারিগরি দক্ষতা পরিবহন, বিদ্যুৎ ও সমতলভূমির যথেষ্ট সুযোগ না থাকায় আশানুরূপ শিল্প গড়ে উঠে নি।

বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য নেপাল ভারতের বন্দরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ভারতের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

ভূটান ঃ

ভারতের উত্তরে সিকিম রাজ্যের পূর্বে হিমালয়ের একটি পার্বত্য রাষ্ট্র ভূটান। ভারত ভূটান সীমান্তের দক্ষিণ ভাগের কিছুটা অংশে সমভূমি। এই সংকীর্ণ সমভূমি ডুয়ার্স সমভূমি নামে পরিচিত। ডুয়ার্স কোন ইংরেজী শব্দ নয়। ইহা বাংলা দুয়ার শব্দের ইংরেজী বহুবচনের রূপ। অর্থ দুয়ার সমূহ অর্থাৎ কয়েকটি প্রবেশ পথ।

এই পথগুলো দিয়ে ভূটান রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। দক্ষিণে ১০/১২ মাইল জায়গা দিয়ে এই পথগুলি অবস্থিত। এইগুলি ডুয়ার্স।

অধিকাংশে লোকের জীবিকা কৃষি এবং দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। তবে কৃষি কাজ এখনও অনুন্নত। শিল্প ভীষণ অনগ্রসর। অধিকাংশ শিল্পই কুটির ও

হস্তজাত ।

ভূটানের অর্থনীতি ভীষন দুর্বল । পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির সাথে সড়ক পথে ডুয়ার্স অঞ্চলে যোগাযোগ রয়েছে । ভূটানের বাণিজ্যমূলতঃ ভারতের সাথেই হয়ে থাকে ।

বাংলাদেশ ঃ

১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম । তিনদিগের সীমানায়ভারত এবং দক্ষিণ পূর্বের ছোট্ট সীমানায় মায়ানমার । দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ, অসংখ্য নদী একেবারে মাকড়সার জালের মত বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ, শিল্পে বিশেষ উন্নতি হয়নি । খনিজ সম্পদের অভাবে বৃহদায়তন শিল্প গড়ে উঠেনি । তবে এখানকার কৃষিজ ও বনজ সম্পদের ব্যবহার করে কয়েকটি শিল্প গড়ে উঠেছে ।

বাংলাদেশের উপর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হওয়ায় জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বৃহত্তম বন্দর এবং বহির বিশ্বের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের একমাত্র গুরত্বপূর্ণ বন্দর । তাছাড়া সড়ক ও রেলপথে মায়ানমার ও ভারতের উন্নতি ঘটিয়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে । কলিকাতা থেকে জলপথে সুন্দরবনের নদী নালা দিয়ে বাংলাদেশের নদীপথ ধরে আসামের গৌহাটি পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ জলপথ রয়েছে । এইপথে নিয়মিত পণ্যদ্রব্য পরিবহন করা হয় । শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ একটি উল্লেখযোগ্য নদীবন্দর ।

বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক আছে । ১৯৭২ সালে ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি হয় । এই চুক্তির ফলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় প্রভৃতি বাংলাদেশ সংলগ্ন রাজ্যগুলির সাথে বাংলাদেশের অবাধ বাণিজ্য ব্যবসা চালু হয় । ১৯৭৩ সালে আরও একটি বাণিজ্য চুক্তি হয় । এইসব চুক্তি ফলে দুদেশের মাল আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য চালু আছে ।

ত্রিপুরা রাজ্যের গায়ে গায়ে এবং মায়ানমারের দূরত্ব বেশী নয় এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ও ত্রিপুরা রাজ্যের অতি নিকটে রেলযাতায়াতও খুবই ভাল । ফলে রপ্তানি বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধাও সম্ভাবনা আছে এই রাজ্যে।

মায়ানমার ঃ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহের সাথে স্থলপথে ভারত, বাংলাদেশের যোগাযোগকারী করিডোর ।

উর্বর পলি সমৃদ্ধ মায়ানমার উপত্যকায় কৃষি কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ । উষ্ণত্ব আর্দ্র আবাহাওয়ায় নানারকম প্রচুর কৃষিজ ফসল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং উল্লেখযোগ্য অর্থকরি ফসল বা জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ কৃষি হতে সংগ্রহ হয় ।

শিল্পে তেমন উন্নতি হয়নি । অধিকাংশে শিল্পই ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের ।

আভ্যন্তরীণ নদীপথ ও উপকূলীয় জলপথ পণ্য পরিবহনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম । সড়ক ও রেলপথ উল্লেখযোগ্য ।

দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ বাজারগুলির আমদানী ও রপ্তানির সম্ভাবনাকে আরও দৃঢ় করেছে । বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটানের সঙ্গে সরাসরি এবং অসম, মণিপুর, দিয়ে মায়ানমার এর সাথে এবং সিকিমের পাথুলা পাস দিয়ে চীনের সাথে বাণিজ্য প্রসার বৃদ্ধি করা সম্ভব ।

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার জয়গাঁ এবং ফুলবাড়ি দিয়ে ভূটান এবং বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানী করা হয় ।

কোচবিহার জেলার চ্যাংরা বান্ধা দিয়ে বাংলাদেশ, দার্জিলিং জেলার পাণি ট্যাঙ্কি দিয়ে নেপাল, উত্তর দিনাজপুর জেলার রাধিকাপুর দিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি দিয়ে বাংলাদেশ, মালদা জেলার মাহেদিপুর দিয়ে বাংলাদেশ, উত্তর ২৪ পরগণার পেট্রোপল দিয়ে বাংলাদেশ এবং নদীয়ার রাণাঘাট ও কলিকাতার খিদিরপুর (T.T.Shed) দিয়ে বাংলাদেশের সাথে বর্তমানে রপ্তানী বাণিজ্য গড়ে উঠেছে ।

দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের একে অপরের অভিন্ন স্বার্থে গড়ে উঠা বাণিজ্যিক সম্পর্ক, আগামী দিনে কোটি কোটি জনগণকে বড় সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাবে । এবং এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্য হবে মূল যোগসূত্র এবং বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

লেখক চিরব্রত রায় বর্মণ একজন সুপরিচিতসমাজ সেবাকর্মী এবং সাহিত্য সংস্কৃতির জগতেও বিশেষ উৎসাহী । রাজ্যে কর্মচারী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ নেতা ও কর্মী । দীর্ঘদিন সমাজ সেবাদপ্তরে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ছিলেন । বর্তমানে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে রয়েছেন । লেখালেখির ক্ষেত্রে নবাগত হলেও ভাল প্রবন্ধ লিখছেন।

******

ত্রিপুরার শিক্ষাচিত্র ও কন্টকময় আগামীদিন

— ডঃ জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাটা অস্বীকার করে লাভ নেই যে আজকের ত্রিপুরায় নীচু থেকে উপর পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরে যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড একাধিক কঠিন প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন, বহুবিধ সমস্যার ভারে জর্জরিত, যার ফলে শিক্ষার্থী তথা রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিক্ষক, অধ্যাপক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ কমবেশী সবাই বিচলিত বোধ করছেন। বছর কয়েক আগে রাজ্যে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। বেশ কিছুদিন হল সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে কমিশন তাঁদের রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে দিয়েছেন। আমরা জানি না এই রিপোর্টটি জনসাধারণের অবগতির জন্য মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে কিনা। শোনা যায় কমিশনের কতগুলো সুপারিশ টাইপ করে প্রকাশ করা হয়েছিল কেবলমাত্র সরকারী প্রশাসক ও কর্মচারীদের আলোচনা ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য। বিস্ময়কর ব্যাপার হল এসব সুপারিশের মধ্যে এমন সব প্রস্তাব রয়েছে যেগুলো ত্রিপুরার বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়িত করা মোটেই সম্ভবপর নয়। তার মানে সুপারিশগুলোর কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। পথনির্দেশের পরিবর্তে এসব অবাস্তব সুপারিশ কর্মীবৃন্দকে শুধু বিভ্রান্তই করল। এভাবেই কি সব চলতে থাকবে? উত্তরণের পথ কোথায়?

আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিভূমি বলে যে স্তরটি সর্বজনস্বীকৃত, ত্রিপুরায় এই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাচিত্রটি সব থেকে শোচনীয়। অথচ বিশ্বের সমস্ত অগ্রসর দেশেই, এমনকি আমাদের দেশের অনেক বেসকরারী স্কুলেও দক্ষ, প্রবীণ ও সংবেদনশীল শিক্ষকের পরিচালনায় এই স্তরের লেখাপড়ার কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। দেশভাগের আগে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের কথা মনে পড়ে। একটি দৃষ্টান্ত থেকেই বিষয়টি বোঝা যাবে। একজন খ্যাতনামা ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন দাশগুপ্ত স্যার। সে আমলের ইংরেজীতে এম. এ. পাশ। অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে তিনিও প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী পড়াতেন। আবার ক্লাশ X-এতেও ইংরেজী পড়াতেন। অংকের ক্ষেত্রেও একই কথা। আমাদের রাজ্যে এই প্রাথমিক স্তরটির অবস্থাই সবচেয়ে হতশ্রী ও করুণ। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরের ক্ষয়রোগ সংক্রামিত করছে পরবর্তী স্তরগুলোকে। আঘাত আসছে উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং শেষ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষাস্তরের লেখাপড়ার

উপর । এক উতোরচাপান অবস্থা চলছে । কেবল অভিযোগ আর পরস্পর দোষারোপ । কলেজের অধ্যাপকরা বলেন যে চেষ্টা করেও তাঁরা কিছু করতে পারেন না । স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা তো কিছুই শিখে আসে না । বিভিন্ন বিষয়ে তাদের এত গলদ ও অসম্পূর্ণতা যে কলেজে অল্প সময়ের মধ্যে চেষ্টা করেও তাঁরা কিছু করতে পারেন না । আসলে এ তো অনেকদিনের জমানো গলদ । মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা আবার অভিযোগ করেন, 'যারা মাধ্যমিক স্তরে আসে তারা নীচের থেকে কিছুই শিখে আসে না । বিভিন্ন বিষয়ে তাদের V-VI এর বিদ্যাও নেই । আমরা কি করব ? আবার প্রাইমারীর সিলেবাস পড়াব? না মাধ্যমিকের সিলেবাস পড়াব? দুই বছরের মধ্যে আবার প্রাইমারী আর মাধ্যমিক দুটো সিলেবাস কি করে পড়াব? এদের বোর্ডের পরীক্ষা দিতে হবে না' ? আবার দেখুন সব শেষে প্রাইমারী স্কুলের দাদা দিদিমণিরা কি বলেন । ''স্কুলের ঘরবাড়ীর অবস্থা শোচনীয় । গ্রামে গিয়ে একটু বাস্তব অবস্থাটা দেখুন । জরাজীর্ণ বাড়ীঘর । দরজা জানালা নেই । সব খোলা । স্কুলের ঘড়ি ঘন্টা পর্যন্ত বাড়ীতে নিয়ে রাখতে হয়। সময়মত মেরামতের কোন কাজ হয় না । স্কুলে টুলটেবিল নেই । বাচ্চারা বাড়ি থেকে কাগজ এনে ক্লাশে আসন হিসেবে ব্যবহার করে । অভিভাবকরা কোন খোঁজ রাখেন ? রাতে অনেক স্কুলে গরু ছাগল থাকে । কি পরিবেশে আমাদের কাজ করতে হয় তার খবর কেউ রাখেন ? আর এখন তো মাসের শেষে পুরো মাইনের টাকাটাও ঘরে নিয়ে যেতে পারি না । উগ্রপন্থীদের বছরের টেক্সো তো আছেই । তার উপর আজ এই চাঁদা, কাল সেই চাঁদারও শেষ নেই ।' এই উতোর চাপানোর মধ্যেই চলছে গোটা স্কুল স্তরের শিক্ষার কাজ । এই নিবন্ধে আলোচনা মূলতঃ স্কুল স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকবে । কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার সমস্যা, এর গুণাগুণ, মহকুমাস্তরে কলেজগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও পরিকাঠামো, পাঠ্যবিষয়াবলী ও তাদের প্রাসঙ্গিকতা, ডিগ্রীলাভের সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্বন্ধ, ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স চালু হবার পরে বিভিন্ন বিষয়ে পাশের হার, কলেজগুলোতে স্থায়ী শিক্ষকদের নিযুক্তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার অবকাশ বর্তমান স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে নেই । কাজেই আলোচনা প্রধানত স্কুল স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখব এবং তাও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে ।

আসলে প্রকৃত শিখন পঠনের জায়গায় এক ক্ষয়িষ্ণু আধোগতি রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে । ফলে শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোটি বিরাট এক অচলায়তনে পরিণত হয়ে শিক্ষার্থী সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের কাজেই শুধু আসছে । আগেও ঠিক এটাই হত । গ্রাম-পাহাড়, প্রত্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চল, উপজাতি সম্প্রদায়, উপেক্ষিত মহিলা সমাজ, শ্রমজীবী দুর্গত মানুষ - এককথায় আগে যারা বঞ্চিত ছিল আজও তারাই বঞ্চিত এবং তাদের বিকাশ ও উন্নতির সঙ্গে এই

শিক্ষাব্যবস্থার কোন নিবিড় যোগাযোগ আজও স্থাপিত হয়নি । এজন্যই স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় ষাট বছর পরেও দেখা যায় যে কোন দিনমজুর ক্ষেতমজুর বা রিক্‌সাচালকের ঘরের ছেলেমেয়ে বোর্ডের পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করলে তার সচিত্র বিবরণ সংবাদপত্রের খবর হয় । আর সেই সঙ্গে এই আশংকাও প্রকাশ করা হয় আগামীদিনে যোগ্যতা অনুযায়ী এই মেধার স্ফূরণ ঠিকমত হতে পারবে তো ? না অর্থ, সুযোগ ও সমর্থনের অভাবে তা অকালে 'মরুপথে হারিয়ে' যাবে ? তার মানে, এই সাফল্য আজও বিরল ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র । নিয়ম হতে পারেনি । কয়েক বছর আগে একটি উপজাতি মেয়ে প্রথম দশ জনের মেধা তালিকায় স্থান করার পর তাও খবর হয়েছিল । এখন পর্যন্ত ঐটিই প্রথম ও শেষ । আসলে নির্মম সত্যটি হল, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করে পেশাগত যোগ্যতা অর্জন, জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীয় দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে নেতৃত্বপদ অধিকার, সৃজনীধর্মী চেতনা ও ভাবাদর্শে দীক্ষিত নূতন এক শ্রমশীল প্রজন্মের সৃষ্টি, জীবনধারণের আর্থ-সামাজিক উত্থান প্রভৃতি যে কোন দিক থেকেই আমজনতার জীবনচিত্র বিচার করা থাক না কেন, দেখা যাবে এদের জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন আজও আসেনি । যদি সত্যিই আসত তাহলে রাজ্যে জীবনজীবিকার গোটা পরিমণ্ডল বহুলাংশেই রূপান্তরিত হয়ে যেতো । সমষ্টিজীবন অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠত । রাজ্যে উগ্রপন্থার জন্মও হত কিনা সন্দেহ ।

ছিদ্র অন্বেষণ করা এই নিবন্ধকারের উদ্দেশ্য নয় । কিছুই হয় নি, সব বহিরঙ্গের জলুষ এসব কথা বললে সত্যের নিদারুণ অপলাপ হবে । হয়েছে অনেক কিছুই । বিগত পঞ্চাশের দশক থেকে নিশ্চয়ই অনেক সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে । আর হয়েছে বলেই ভারতের শিক্ষামূলক মানচিত্রে ত্রিপুরা একটি স্থান করে নিতে পেরেছে । দেশে অঙ্গ রাজ্য হচ্ছে ২৮টি । এই ২৮টির মধ্যে সাক্ষরতার নিরিখে ত্রিপুরার স্থান ১২, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৮ । কাজেই হয়েছে অনেক কিছুই । কথা তা নয় । কথা হচ্ছে একটা সময় ছিল যখন নতুন নতুন স্কুল স্থাপন, শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, প্রশাসনিক কলেবর বৃদ্ধি, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজগুলোই ছিল কর্মসূচীর প্রধানতম অঙ্গ । কিন্তু সে পর্যায় তো এখন আর নেই । এখন দেখতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে রাজ্যের সমষ্টিজীবনে কোন অভ্যুদয় হয়েছে কিনা । শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে কিনা । দক্ষতা, নিষ্ঠা অর্জন করে সেবাধর্মের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত নূতন প্রজন্মের অগ্রগামী এক শ্রমশক্তি গড়ে উঠছে কিনা এবং শিক্ষাপ্রসারের ফলে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হচ্ছে কিনা - এককথায় রাজ্যবাসীর জীবনের মান ও পরিবেশ কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে তাই হবে বিচারের মাপকাঠি । এত কর্মকাণ্ডের পর আজ আমরা

কি দেখতে পাচ্ছি ? আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জিত হয়েছে? অর্জিত হবার পথে চলেছে ? না, রাজ্যের শিক্ষার আকাশে কালো মেঘ জমে উঠেছে ।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ অসমাপ্ত ন্যূনতম কর্মসূচী ঃ

সবাই স্বীকার করেন যে শিক্ষাব্যবস্থার আসল ভিত্তিভূমি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা যেখানে পাঁচটি ক্লাসে ৬-১১ বছরের শিশুদের পড়বার কথা । এখানে পাঁচটি বছরে লেখাপড়ায় গলদ জমতে থাকলে উপরের দিকে সব বেসামাল হয়ে যায় । এইস্তরে আমাদের অবস্থা কি ? এখানে কর্মসূচীর প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে তিনটি ঃ সার্বিক সুযোগের ব্যবস্থা (universal provision of facilities), সার্বিক ছাত্রভর্তি (universal enrolment) এবং সার্বিক ধারণ (universal retention) । বিচার করলে দেখা যায় প্রথম যে কাজটি, মানে স্কুলের বন্দোবস্ত করা, সেই কাজটিও আমাদের রাজ্যে এখনো শেষ হয়নি। অর্থাৎ সব অঞ্চলের সব শিশুদের জন্য এখন পর্যন্ত স্কুলও খোলা যায়নি ।

১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রকাশিত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক যোজনার (১৯৮৫-৯০) প্রস্তুতিপত্রে (Approach paper) বলা হয়েছিল যে ত্রিপুরার ১৬০০ পল্লী জনপদে কোন প্রাথমিক স্কুল নেই, আর সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আরও ১২০০ স্কুল খোলা দরকার হবে । '৯০ সালে এসে আমরা কি দেখলাম ? ১২০০ তো দূরের কথা । করা হয়েছে মাত্র ৩২১ টি অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার ২৬ শতাংশ মাত্র। এবার দেখুন Sixth All Indiaa Educational Survey-র ত্রিপুরা ষ্টেট রিপোর্টে কি বলা হয়েছে । এই ষ্টেট রিপোর্টটি ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা অধিকার থেকে প্রকাশিত হয়েছে । এখন থেকে এই রিপোর্টটিকে আমরা শুধু সার্ভে রিপোর্ট বলে উল্লেখ করব । রিপোর্টে দেখা যায় যে রাজ্যে ৬৮০২টি গ্রামীণ জনপদ রয়েছে এবং এদের মধ্যে ১৬৬৮টি জনপদে কোন প্রাথমিক স্কুল নেই । আরও লক্ষ্যনীয় যে ১৯৮৪ সালে যেখানে স্কুলবিহীন জনপদের সংখ্যা ছিল ১৬০০, চৌদ্দ বছর বাদে সেই সংখ্যা কমার পরিবর্তে বেড়ে হয়েছে ১৬৬৮ । এই সময়ের মধ্যে কিছু নতুন স্কুল তো অবশ্যই হয়েছে । তাহলে স্কুলবিহীন জনপদের সংখ্যা বাড়ল কি করে ? এই সময়ে লোকসংখ্যাও বেড়েছে । নতুন জনপদেরও পত্তন হয়েছে । তাহলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমানতালে প্রয়োজনমত স্কুল করা হচ্ছে না ।

তাছাড়া, এ প্রসঙ্গে যে কথাটা ভেবে দেখা দরকার তা হল স্কুলবিহীন এসব এলাকাগুলো কোথায় ? দেখা যাবে এলাকাগুলো গভীর অভ্যন্তরভাগে, দূরবর্তী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় । যেমন, কাঞ্চনপুরের খেদাছড়া, লম্বাছড়া অঞ্চল, ছাওমনুর মানিকপুর

গোবিন্দবাড়ী, সালেমার গান্ধীনগর চাকমাপাড়া, অমরপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বিশেষ করে গণ্ডাছড়া ও ভগীরথের চারপাশে, সাব্রুমের বিস্তৃত দক্ষিণ ও পূর্বাংশ এবং খোয়াই, মাতাবাড়ী, বগাফার অরণ্য ও পাহাড়ী এলাকা। এসব অঞ্চলে জনবসতি কম। রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। উপজাতি পাড়াগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কোন স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই। উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থাটুকুও নেই, যা আন্ত্রিকের প্রকোপের সময় প্রতি বছর সংবাদের শিরোনাম হয়, স্থায়ী কোন বাজার গড়ে উঠেনি। বিদ্যুৎ তো অনেক দূরের কথা। এক কথায় এসব অঞ্চলে আধুনিক জীবনযাত্রার কোন বেগবান প্রাণস্পন্দনের অস্তিত্বই নেই। জীবনের ভারে বিপর্যস্ত অতিদুর্গত এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে শুধু স্কুল করাই নয়, তারপর শিক্ষকের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করে স্কুলগুলোকে প্রকৃত অর্থে সক্রিয় রাখা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। এদিকে জাতীয় শিক্ষানীতির সময়সীমা ১৯৯০ সাল কবেই পার হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের রাজ্যে শতশত জনপদে এখনো কোন স্কুলই নেই। আর স্কুলই যদি না থাকে তাহলে ছাত্র ভর্তির প্রশ্নও উঠে না। কাজেই সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম যে পদক্ষেপ, মানে স্কুলের ব্যবস্থা করা, সে কাজটিও ত্রিপুরায় এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। কবে শেষ হবে কাজটি ? নির্দিষ্ট সময়সীমার কোন ইঙ্গিতও কিন্তু পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছাত্রভর্তির বিষয়ে যে কথাটি বড়গলায় প্রচারিত হয় তাহল এই যে আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে এখন ছাত্রভর্তির হার নাকি ১০০ শতাংশ অতিক্রম করে ১১৬ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। আর উপজাতি শিশুদের মধ্যে এই হার নাকি ১২৫ শতাংশ। সব সম্প্রদায় মিলিয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা নাকি ৪ লক্ষ ৭০ হাজার। শিক্ষাজগতের পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞগণ এই ধরনের পরিসংখ্যানকে বলে থাকেন smil- i n g বা বহিরঙ্গের প্রফুল্ল মুখোশ, যা প্রকৃত বাস্তবকে আড়াল করে রাখে। আর মধুর সাইরেন সংগীতের মত অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষকে মোহগ্রস্থ করে আত্মপ্রবঞ্চনার দিকে নিয়ে যায়। ছাত্রভর্তির ব্যাপারে আমরা তো ১০০ শতাংশ অতিক্রম করে গিয়েছি। আমাদের কাজ তো তাহলে শেষ। এর থেকে আত্মপ্রবঞ্চনা আর কিছু হতে পারে না। যে মামুলী কথাটা প্রথমেই ভুলে যাই তা হল শতশত জনপদে যেখানে স্কুলই করা হয়নি সেখানে ছাত্রভর্তি ১০০ শতাংশ অতিক্রম করে কি করে ? স্কুলবিহীন এলাকার প্রাইমারী স্কুলে পড়বার বয়সের শিশুরা কোন্ স্কুলে গিয়ে ভর্তি হল ? তাছাড়া, আমরা জানি যে প্রাথমিক স্কুলে পাঁচ ক্লাশে ৬ থেকে ১১ বছরের শিশুদের পড়বার কথা। রাশিবিজ্ঞানের স্বীকৃত সূত্র অনুযায়ী যে কোন সমাজে এই বয়সের শিশুদের সংখ্যা হয় মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগ। কোন গ্রামের লোকবসতি ১০০০ হলে প্রাইমারী স্কুলে পড়বার যোগ্য শিশুদের সংখ্যা হবে ১৩০। সব দেশেই এই হিসাব প্রচলিত। ত্রিপুরার জনসংখ্যা

এখন ৩২ লাখ। শতকরা ১৩ জন হিসাবে প্রাইমারী স্কুলে পড়বার উপযুক্ত শিশুদের সংখ্যা তাহলে সর্বাধিক হতে পারে ৪ লক্ষ ১৬ হাজার। এই সংখ্যাও বাস্তবসম্মত নয়। কারণ, অন্ধ, মূকবধির, রুগ্ন, বিকলাংগ প্রভৃতি প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ স্কুলে পড়তে পারে না। এজন্য সাধারণ স্কুলে ভর্তির হার ৯৪/৯৫ শতাংশ হলেই সার্বিক শিক্ষার কাজ হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। এখন ৯৫ শতাংশ ধরলেও ভর্তির সংখ্যা হতে পারে সর্বাধিক ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার। অথচ তথ্য প্রচারিত হচ্ছে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ছেলেমেয়ে এখন প্রাথমিক স্কুলে নাকি লেখাপড়া করছে। এই বিসদৃশ ব্যাপারটি হয়েছে এই কারণে যে ৬ থেকে কম এবং ১১ থেকে বেশী বয়সের অনেক ছেলেমেয়ে পঞ্চায়েত থেকে অসত্য সার্টিফিকেট নিয়ে প্রাইমারী স্কুলে এসে ভর্তি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ জিনিষ চলছে কতগুলো প্রলোভনের কারণে, যেমন, জলখাবারের ব্যবস্থা, পোষাক, হাজিরা বৃত্তির টাকা ইত্যাদি। ফলে যাদের প্রাইমারী স্কুলে থাকার কথা নয়, তারাও অসত্য প্রমাণপত্রের জোরে ভর্তি হচ্ছে এবং ভর্তির হার স্ফীত করে ১০০ শতাংশের বেশী করে তুলছে। অথচ আরেকদিকে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা অহরহই দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইমারী স্কুলে পড়বার বয়সের অনেক শিশু সংসারের চাপে নানান উপার্জনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। এদের স্কুলে যাবার সুযোগ হয়নি। এরা মাঠে গরু রাখে, বন থেকে লাকড়ি আনে, বাজারে বাবার সঙ্গে সবজি বিক্রী করে, খাবারের দোকানে চা-মিষ্টি পরিবেশন করে, মোটর ষ্ট্যাণ্ডে মোট বয়, বিত্তবানদের ঘরে গৃহভৃত্যের কাজ করে, আবার আকালের দিনে খাদ্যের সন্ধানে বড়দের সঙ্গে বনে চলে যায়। মেয়েরো আবার ব্যস্ত থাকে গৃহস্থালির কাজে। আবার, মহকুমা, ব্লক, অথবা পঞ্চায়েত নিয়ে আলাদা ভর্তির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে জনগোষ্ঠী, ছেলে-মেয়ের পার্থক্য ও অঞ্চলভেদে ভর্তির হারে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। আসলে ছাত্র ভর্তির কাজটিও এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। যে smiling mask -এর সংখ্যা প্রচারিত হয়ে থাকে তা একটি অবাস্তব স্ফীতকায় সংখ্যা। এই সংখ্যা সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার সত্যিকার পরিচায়ক নয়। কথাটা সরকারীভাবে অষ্টম যোজনাপত্রে (১৯৯২-৯৭) স্বীকারও করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ The apparent high enrolment ratio is due to enrolment of over-age and under-age children at this (primary) stage. The net enrolment ratio will be much less and well below 100. ভাবনার কথা হল ৬-১১ বছরের কত শিশু এখনও স্কুলের বাইরে রয়েছে তার সঠিক তথ্য সংগ্রহের কোন প্রচেষ্টার কথাও শোনা যায় না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় যে পূর্বশর্ত অর্থাৎ ছাত্রভর্তি সে কাজটিও ত্রিপুরায় এখনো শেষ হয়নি। কাজটি কিন্তু শেষ হবার কথা ছিল ১৯৯০ সালে।

তৃতীয় পদক্ষেপ universal retention অর্থাৎ সার্বিক ধারণের কাজটি হচ্ছে

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষজ্ঞরা বলেন যে স্থায়ী সাক্ষরতা অর্জন করতে হলে একটি শিশুকে অন্তত ক্লাশ IV পর্যন্ত পড়া ও লেখার কাজ চালিয়ে যেতে হবে । তার আগে স্কুল ছেড়ে দিলে অভ্যাস ও চর্চার অভাবে সে আবার নিরক্ষর হয়ে যাবে । ত্রিপুরার বাস্তব চিত্র হল প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া প্রতি ১০০টি ছেলেমেয়ের মধ্যে ৫০জনই দু'এক বছরের মধ্যে স্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছে, আর যথারীতি অচিরেই নিরক্ষরদের দলে মিশে যাচ্ছে । সরকারী নথিতেই এই অসময়ে স্কুল ছেড়ে দেওয়া বা ড্রপআউটের হার ৫৫ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এই সংখ্যাটি সারা রাজ্যের সব শিশুদের গড়ের হিসাব । উপজাতি শিশুদের মধ্যে এই ড্রপআউটের হার অনেক বেশী এবং তাহল ৬৩ শতাংশ । বালিকাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ । তার মানে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ১০০টি উপজাতি শিশুদের মধ্যে ক্লাশ V পর্যন্ত ২৫/৩০ জনও টিকে থাকে না । স্কুলে জল খাবার, পোযাক, হাজিরাবৃত্তির টাকা প্রভৃতি উৎসাহদায়ক ব্যবস্থা করেও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি । যেখানে বিরাট এক জনগোষ্ঠীর প্রতি ১০০টি শিশুর মধ্যে ৭০ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে নিরক্ষরতা অজ্ঞানতার অন্ধকারে হারিয়ে যায়, সেখানে সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার সারবস্তু আর রইল কি ? উপজাতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবার আপার প্রাইমারী স্তরে, মানে ক্লাশ VI-VII-এ, এই ড্রপআউটের হার শতকরা ৭৯ এবং মাধ্যমিকস্তরে, মানে ক্লাশ IX - X এ শতকরা ৮৬। তার মানে উপজাতিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া প্রতি ১০০ জন শিক্ষার্থীর ভিতর ক্লাশ VIII পর্যন্ত টিকে থাকে মাত্র ২১ জন । আর মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাত্র ১৪ জন । সহজেই বোঝা যায় বাস্তব অবস্থা কিরূপ মর্মান্তিক ও ভয়াবহ । এই মর্মান্তিক ঘটনার পরিণাম দ্বিবিধ-সামাজিক ও আর্থিক । সামাজিক দিক থেকে নিরক্ষরতা সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের কাজ ব্যাহত করে চলেছে । আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি এই ভেবে যে ত্রিপুরায় সাক্ষরতার হার দিনদিন বেড়ে চলেছে । কথাটা অবশ্যই সত্য । কিন্তু এ কথাটা আমরা ভেবে দেখি না যে রাজ্যে লোকসংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, আর ড্রপআউটের ফলে জনশক্তির বিরাট এক অংশ আগের মত নিরক্ষরই থেকে যাচ্ছে । যেমন দেখুন, ১৯৯১ সালে ত্রিপুরায় সাক্ষরতার শতকরা হার ছিল ৬০, আর মোট নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৯২ হাজার । দশ বছর বাদে সাক্ষরতার হার অনেক বেড়ে হল ৭৩ শতাংশ, কিন্তু মোট নিরক্ষর লোক রয়ে গেল ৯ লক্ষ । দশ বছরে দুই লক্ষও কমল না, যদিও এই সময়ে সাক্ষরতার হার ১৩ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এর কারণ হল দশ বছরে রাজ্যের লোকসংখ্যাও ২৭ লক্ষ ৫৭ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩২ লক্ষ । উপজাতিদের ক্ষেত্রে চিত্রটি আরও বেদনাদায়ক । ত্রিপুরায় ১৯৮১ সালে যেখানে নিরক্ষর উপজাতি মানুষের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার, দশ বছর বাদে ১৯৯১ সালে সেই স ংখ্যা তো কমেই নি বরং বেড়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৪

হাজার - ৪৫ হাজার বেশী । যদিও এই সময়ের মধ্যে উপজাতিদের সাক্ষরতার হার বেড়ে হয়েছে ২৩ থেকে ৪২ শতাংশ । কারণ ঐ একই —'৮১ থেকে '৯১ এই দশ বছরে উপজাতিদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যা ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার । কাজেই মোট জনসংখ্যা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সাক্ষরতার শতকরা হার বিবেচনা করলে কোন সমাজের নিরক্ষরতার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না । বললে ভুল হবে না যে ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে নিরক্ষরতার পরিধি দিনদিন বেড়েই চলেছে । মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে উপজাতি মহিলা সমাজের । কিছুদিন আগে দেখেছিলাম প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে উপজাতি মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জনই নিরক্ষর । সাক্ষর মাত্র ২৩ জন । বিবেকানন্দের কথাটি মনে পড়ে ঃ 'There is no chance of welfare unless the condition of women is improved. A bird cannot fly only on one wing'। যে সমাজে মহিলাদের শিক্ষার অবস্থা এরকম সেই সমাজ এগুবে কি করে? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে উপজাতিদের মধ্যে সাক্ষরতা হার কত ছিল তার আলাদা হিসাব এখনও পাওয়া যায় নি । আসল কথা ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও নিরক্ষর ।

আবার উপজাতি শিশুদের মধ্যে ব্যাপক ড্রপআউটের ফলে শুধু যে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বাড়ছে তাই নয় । স্কুলশিক্ষার অন্যান্য স্তরে আগের মতই তারা পিছিয়ে পড়ছে । গোটা উপজাতি সমাজই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । বর্তমান দিন অত্যন্ত কঠিন। কারণ ভয়ংকর প্রতিযোগিতামূলক । একবার পিছিয়ে পড়লে চলার পথ আর মসৃণ থাকে না । প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভের প্রধান হাতিয়ার হল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা । কিন্তু এখানকার অবস্থাটিই অত্যন্ত করুণ । '৯৮ সালের পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে ।

শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার

তারিখ ৩১.৩.৯৮

শতকরা ভর্তির হার

	সবসম্প্রদায় মিলিয়ে			শুধুমাত্র উপজাতি সম্প্রদায়		
শিক্ষাস্তর	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
উঃ প্রাথমিক (VI-VIII)	৫৬.২	৪৬.৭	৫১.৫	৪৮.৩	৩৪.৫	৩৯.২
মাধ্যমিক (IX-X)	৪২.২	৩১.৪	৩৬.৭	৩৩.৩	১৭.৬	২৫.৮
উঃমাধ্যমিক (XI-XII)	১৮.০	১১.০	১৪.৫	৮.১	২.৬	৫.৪

'৯৮ সালের এই পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে গোটা রাজ্যের চিত্রটাই হতাশাব্যঞ্জক । আবার উপজাতিদের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির হার শতকরা মাত্র

২৫। বালিকা মাত্র ১৭ জন । উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শতকরা মাত্র ৫ জন । বালিকা ৩ জনেরও কম । আর এ তো শুধু ভর্তির হিসাব । এর মধ্যে কতজন, পরীক্ষা দিয়ে ভালভাবে পাশ করবে, তারপর শিক্ষক, ডাক্তার, অধ্যাপক, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী প্রভৃতি হয়ে সমাজের নেতৃত্বপদ অধিকার করবে এবং আস্তিন গুটিয়ে ত্রিপুরার উন্নয়নের রথচক্রে কাঁধ মেলাবে তা সহজেই অনুমান করা যায় । আর এই অবস্থার পেছনে আসল কারণ কিন্তু প্রাথমিক স্তরের ভয়াবহ ড্রপ আউট । আসলে নীচের ক্লাশ থেকে ঠিকমত উঠে এলে তো উপরের দিকে সংখ্যা বাড়বে । ফলে সমাজজীবনে বৈষম্য ব্যবধান আগের মতই থেকে যাচ্ছে । আনুপাতিক হারে কমছে না । শিক্ষাক্ষেত্রে গোড়ায় যেখানে বিরাট গলদ সেখানে সংরক্ষণের রক্ষাকবচ দিয়ে ব্যবধান দূর করা যাবে ? যদি যেত তাহলে শত শত সংরক্ষিত পদ বছরের পর বছর খালি পড়ে থাকত না । বিরাট এই অপচয়ের ফলে আরেকদিকে রাজ্যকে দিতে হচ্ছে এক সর্বনাশা আর্থিক মাশুল । প্রতি ১০০টি শিশুর মধ্যে যখন ক্লাশ V পর্যন্ত টিকে থাকে মাত্র ৫০ জন এবং উপজাতিদের মধ্যে ৩৭ জন আর বাকীরা হারিয়ে যাচ্ছে নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতার অন্ধকারে. যখন উপজাতি শিক্ষার্থী ক্লাশ VIII পর্যন্ত টিকে থাকছে শতকরা ২১ জন, আর মাধ্যমিক ক্লাশ পর্যন্ত মাত্র ১৪ জন, তখন তো শিক্ষাখাতে ব্যয়িত অর্থের সিংহভাগই বৃথা খরচ হচ্ছে । পরিকল্পনা রচনার সময় অগ্রিম একথা ভেবে কেউ ব্যয়ের হিসাব করেন না যে প্রাথমিক স্তরে মাত্র ৩৭ শতাংশ লেখাপড়া করবে, আর উচ্চ প্রাথমিকে এই সংখ্যা হবে ২১ শতাংশ এবং মাধ্যমিকে মাত্র ১৪ শতাংশ । কাজেই অর্থব্যয় যা হবার ঠিকই হচ্ছে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপকৃত হচ্ছে সমাজের মুষ্টিমেয় একটা অংশ ঠিক যে ব্যাপারটা আগে ছিল। এদিকে সিংহভাগ টাকাটাই জলে যাচ্ছে । পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞগণ এই অবস্থাকেই বলে থাকেন investment in ignorance। এই সর্বনাশা অবস্থায় রাতের ঘুম তো উড়ে যাবার কথা ।

কারা এই ড্রপআউটের শিকার ? দেখা যাবে এরা সবাই বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষ - উপজাতি, তপশিলী সম্প্রদায়, দিনমজুর ক্ষেতমজুর প্রভৃতি শ্রমজীবি দুর্গত মানুষ আর বালিকা । অথচ এদেরই আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন সব থেকে বেশী । এদেরই মধ্যে চেতনা সঞ্চার করে জনজীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্যই এত আয়োজন, অর্থব্যয় আর শিক্ষাপ্রসারের কর্মসূচী । অথচ আগের মত এরাই নিরক্ষর, অশিক্ষিত ও অনগ্রসর থেকে যাচ্ছে । ফলে সমাজ দেহে তীব্র হচ্ছে বৈষম্য ও ব্যবধান । এই পরিস্থিতি আগামী দিনে বিস্ফোরক আকার ধারণ করলে অবাক হবার কিছু নেই । বিপদ সংকেত দিন দিন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে নাকি? তাহলে বাস্তব চিত্র কি ? শতশত জনপদে এখনও কোন

স্কুল নেই, প্রাইমারী স্কুলে যাদের পড়বার কথা এমন বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে রয়েছে স্কুলের বাইরে আর ড্রপ আউটের ফলে বাড়ছে বৈষম্য ও ব্যবধান এবং সেই সঙ্গে বন্ধ্যা অর্থ ব্যয় । এই অবস্থায় ১১৬ শতাংশ ভর্তির কথা বলা একেবারেই অর্থহীন । ত্রিপুরায় সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়েই রয়েছে । উত্তরণের লক্ষ্যে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কথা কিন্তু কিছুই শোনা যাচ্ছে না । পূর্বোক্ত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে কি এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করা হয়েছে ? রাজ্যবাসী জানতে পারলে উপকৃত হতেন ।

শিক্ষা পরিদর্শন ও শিক্ষক শিক্ষণ ঃ

এই প্রেক্ষাপটে দু'টি কর্মসূচীর উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার ছিল — শিক্ষামূলক বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং শিক্ষক শিক্ষণ । আক্ষেপের বিষয় ত্রিপুরায় স্কুল শিক্ষার সর্বস্তরে প্রথম কাজটি বহুদিন আগে থেকেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে । স্কুলে পঠন-পাঠনের উৎকর্ষ সাধন এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষামূলক পরিদর্শনের কোন অস্তিত্বই এ রাজ্যে আর নেই । এই পরিদর্শন বলতে বৃটিশ আমলের পুলিশী ব্যবস্থা অথবা শিক্ষকদের সন্ত্রস্ত করা বোঝায় না । বোঝায় শ্রেণীপাঠনার কাজে শিক্ষকের সহযোগী অংশীদার হয়ে তাকে সাহায্য করা, তার সুবিধা অসুবিধার খোঁজ রাখা, তাকে উৎসাহ দেওয়া, আর স্কুলের সামগ্রিক কাজের মূল্যায়ন করা যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা দিনদিন শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু এখন বাস্তব হল স্কুল পরিদর্শককে অনেক কিছুই করতে হয় — শুধু এই শিক্ষামূলক কাজটি ছাড়া । যে জিনিষ নেই তা নিয়ে আজকের ত্রিপুরায় কথা বলা মনে হয় অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু হবে না । ভবিষ্যতে কোনদিন হয়তো শিক্ষা ব্যবস্থার এই অপরিহার্য প্রক্রিয়াটির পুনরুজ্জীবন হবে । কিন্তু ততদিনে কত প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কি পরিমাণ মাশুল গুণতে হবে তার পরিমাপ করা কোন দিনই সম্ভব হবে না । সে মাশুল এখনও দিতে হচ্ছে । আর শিক্ষক শিক্ষণের কথা ? বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষক শিক্ষণের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে । সার্ভে রিপোর্টে দেখা যায় যে ২০২৯টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ৯৬ শতাংশ স্কুলই হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায় । তার মানে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রায় গোটা কাজটাই সামলাতে হচ্ছে রাজ্যের পশ্চাৎপদ প্রত্যন্ত অঞ্চলে । আর কাজ করতে হচ্ছে এমন সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা যুগযুগ ধরে বঞ্চনা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগব্যাধির শিকার হয়ে আছে । স্কুলে পড়াতে হবে এসব পরিবারেরই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের । তার উপর ছনবাঁশের তৈরী স্কুল বাড়ি সব জরাজীর্ণ । আসবাবপত্রের বালাই নেই । সার্ভে রিপোর্টে এও দেখা যায় যে কাগজপত্রে স্কুল আছে কিন্তু তার ঘরবাড়ী বলতে কিছুই নেই । এমন তথাকথিক

স্কুলের সংখ্যা ৪০টি । কোথায় বসে এমন স্কুল ? বোধ হয় কোন গাছের ছায়ায় । তারপর রয়েছে গ্রামাঞ্চলে এক শিক্ষক দুই শিক্ষক স্কুলের পঠন পাঠন সমস্যা । ইদানিং অনেক সময় শুনেছি এসব প্রাইমারী স্কুল নাকি ত্রিপুরায় আর বিশেষ নেই । থাকলেও যৎসামান্য কিছু থাকতে পারে । সার্ভে রিপোর্ট কি বলে ? চমকে উঠবেন না । একজন শিক্ষকও নেই এমন সরকারী স্কুলও আমাদের রাজ্যে আছে । এদের সংখ্যা ২২ । এক-শিক্ষক স্কুল রয়েছে ১৫৫টি, দুই শিক্ষকের ৫০৮টি , আর তিন শিক্ষকের ৩৮৭টি । চার-পাঁচ শিক্ষকের স্কুলের হিসাব আর এখানে আনলাম না । তাহলে শিক্ষকহীন স্কুলগুলো বাদ দিয়ে মোট সংখ্যা হল ১০৫০ । রাজ্যে মোট স্কুল ২০২৯টি । তার মানে শতকরা ৫২টি স্কুলেই শিক্ষক রয়েছেন হয় ১জন বা ২জন বা ৩ জন । কিন্তু ক্লাশ তো পাঁচটি । এসব স্কুলে শিক্ষকদের একই পিরিয়ডে একাধিক ক্লাশ মিলিয়ে যুগ্ম শ্রেণীপাঠনা করতে হয় । রুটিনও করতে হবে সেভাবে । হাতে কলমে বিশেষ প্রশিক্ষণ ছাড়া একজন সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে কাজটি ঠিকমত করা সম্ভব নয় । সে সব কি কিছু আছে ? তাছাড়া বর্তমানে শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে মেধা, বিষয়-জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদির কোন স্থান নেই । বেকার জীবনের দীর্ঘতা, পরিবারের প্রয়োজন, পরিবারে আর কেউ চাকুরীরত আছে কিনা ইত্যাদির মাপকাঠিতেই শিক্ষক নিযুক্ত হয় । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল ককবরক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন । এই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে উপজাতি অভিভাবকদেরই অনেক অভিযোগ । সহজেই বোঝা যায় দুর্গম দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলে কাজের প্রতিকূল পরিবেশ, স্কুল ঘর আসবাবপত্রের চরম দৈন্যদশা, একশিক্ষক, দুই-শিক্ষক স্কুলের পঠন পাঠন পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার পরিবর্তে শিক্ষা বহির্ভূত বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ, ককবরক শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান-এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষণের কাজটি কতটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

কিন্তু শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করার পরিবর্তে দীর্ঘ উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের কবলে নিক্ষেপ করে শিক্ষা ব্যবস্থার এই অন্যতম মৌলিক কাজটিকে আমাদের রাজ্যে প্রায় মৃতকল্প করে ফেলা হয়েছে । সার্ভে রিপোর্টে দেখা যায় যে প্রাইমারী স্তরে শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ১৫ হাজার যার মধ্যে মাত্র ৩০.৭৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৬১০ জন ট্রেনিং প্রাপ্ত । বাকী ১০ হাজারের উপরে শিক্ষকদের কোন ট্রেনিং নেই । আপার প্রাইমারী স্তরে শিক্ষক সংখ্যা ২৭২৪ যার মধ্যে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক হচ্ছেন ১০৫৪ জন । মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক সংখ্যা ৬২০০, যার মধ্যে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক হচ্ছেন ২৬৬০ জন । আর উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক সংখ্যা ২৬৭৪, যার মধ্যে ট্রেনিং নিয়েছেন ১২৬৫ জন । দেখা যাচ্ছে মোট ২৭,৬০০ শিক্ষকের মধ্যে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ৯৫৭৯ । ১৮০০০ শিক্ষকের ট্রেনিং এখনো বাকী । ট্রেনিং কলেজগুলোতে বর্তমানে যে আসন

সংখ্যা রয়েছে তাতে আগামী চল্লিশ বছরেও একাজ সম্পন্ন হবে কিনা সন্দেহ । এখন নবতম ব্যবস্থা হয়েছে কর্মরত শিক্ষকদের এক বছরের পরিবর্তে ছয় মাসের ট্রেনিং দেওয়া হবে, যাতে বছরে দু'টি দলের ট্রেনিং শেষ করা যায় । একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার শিক্ষার কর্ণধারগণ প্রাইমারী ট্রেনিং কলেজগুলোতে একদিকে আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষণকাল এক বছরের জায়গায় দুই বছর করার জন্য, শুধু পরিকল্পনা নয়, কাজও আরম্ভ করেছিলেন । সেই উদ্দেশ্যে বড় আকারের হোস্টেলও নির্মাণ করা হয়েছিল, কারণ প্রাইমারী ট্রেনিং কলেজগুলো তখন বাধ্যতামূলকভাবে আবাসিক ছিল । শুনতে পাই সেই পাকা বাড়ীগুলোতে এখন নাকি অন্য অফিসের স্থান হয়েছে, কোথাও নাকি আবার বি. এস. এফ. অথবা সি. আর. পি. ক্যাম্প হয়েছে । শিক্ষণকাল দুই বছর করবার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের শিক্ষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো (theoretical content) সম্বন্ধে সম্যক অবহিত করা, বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে হাতে কলমে কমপক্ষে ছয়মাস teaching practice করা, আর মাতৃভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজী প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য বিষয়ে তাঁদের গভীরতর জ্ঞানলাভে সাহায্য করা যাতে ট্রেনিং শেষে তাঁর দক্ষ ও বিচক্ষণ শিক্ষক তথা সমাজসেবী হিসাবে কাজ করতে পারেন । এখন ট্রেনিং কাল হয়ে গেল ছয় মাস । এই ছয়মাসও একটা কথার কথা । ভর্তির কাজ, সরকারী ছুটি, অন্য স্কুলে গিয়ে teachig practice করা, পরীক্ষা গ্রহণ এসব করে প্রকৃত ক্লাশের সময় তিনচার মাসও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ । ফলে বর্তমান ট্রেনিং সিলেবাসও অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । কয়েক বছর আগের কথা । একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজে দিল্লী ও ব্যাঙ্গালোর থেকে দু'জন সর্বভারতীয় আধিকারিক তথা প্রবীণ শিক্ষাবিদ ত্রিপুরায় এসেছিলেন । দু'টি ট্রেনিং কলেজ দেখে এসে এই প্রতিবেদককে তাঁরা বলেছিলেন ঃ'তোমাদের ট্রেনিং কলেজ দু'টিতে আগের শ্রী ও সমৃদ্ধির কিছু চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায় । কিন্তু বর্তমানে এগুলো ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতকল্প হয়ে আছে (decaying and moribund) । আমাদের 'অগ্রগমন' কোন্ দিকে হচ্ছে ? সামনের দিকে না পিছনের দিকে ?

বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল ঃ

শিক্ষা পরিকাঠামোর নীচের দিকে পরিব্যাপ্ত ঔদাসীন্য ও শিথিলতা, ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষক শিক্ষণ, বিলুপ্ত পরিদর্শন, প্রগল্ভ পল্লবগ্রাহিতা সব মিলিয়ে পরিণতি যা হবার তাই হচ্ছে - বোর্ডের পরীক্ষায় ফেলের প্রাবল্য । যারা পাশ করে তাদের মধ্যেও আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে পাশের সংখ্যা অতি নগণ্য । এর মধ্যে আবার রয়েছে grace marks-এর ভরতুকি । এই ভরতুকির পরিমাণ কত কেউ বলতে পারেন না । এক এক

বছর এক এক রকম । একান্ত আলাপে জানা যায় যে খাতা দেখার পর প্রকৃত নম্বরের উপর ফলাফল প্রকাশিত হলে পাশের হার ১৫-২০ শতাংশও হত না । একজনও পাশ করতে পারে না এমন সরকারী মাধ্যমিক স্কুলও আছে । ২০০২ ও '০৩ সালের নিয়মিত (রেগুলার) মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

	২০০২ সাল	২০০৩ সাল
১। মোট পরীক্ষার্থী	১৮,২৩৫	১৯,৮৬৬
পাশের সংখ্যা	১১,৯২১	১৩,০৬৫
ফেলের সংখ্যা	৬,৩১৪	৬,৮০১
শতকরা পাশের হার	৬৫.৩২	৬৫.৭৬
প্রথম বিভাগ	৯২৮ (৭.৭৮ %)	১,২৪৩ (৯.৫১%)
দ্বিতীয় বিভাগ	২,৬২৪ (২২.০১%)	২,৯৬৪ (২২.৬৮%)
তৃতীয় (পাশ) বিভাগ	৮,৩৬৯ (৭০.২০%)	৮.৮৫৮ (৬৭.৭৯%)
২। সবাই ফেল এমন স্কুলের সংখ্যা	৩০	৪৩
৩। মোট উপজাতি পরীক্ষার্থী	১০,৬৩৪	১০,৫৫৪
পাশের সংখ্যা	২,৫৯৯	২,৭৬৭
ফেলের সংখ্যা	৮,০৩৪	৭,৭৮৭
শতকরা পাশের হার	২৪ ৪৪	২৬,২১
প্রথম বিভাগ	২৮ (১.০৭%)	৪১ (১ ৪৮%)
দ্বিতীয় বিভাগ	২০২ (৭.৭৭%)	২৭৬ (৯.৯৪%)
তৃতীয় (পাশ) বিভাগ	২,৩৬৯ (৯১.১৫%)	২,৪৫০ (৮৮.৫৪%)

দেখা যাচ্ছে ২০০২ ও '০৩ সালে সব পরীক্ষার্থী ফেল করেছে এখন স্কুলের সংখ্যা ৩০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৩ । আবার রাজ্যে পাশের হার যেখানে ৬৫ শতাংশের উপরে, সেখানে উপজাতি পরীক্ষার্থীদের পাশের ২৫-২৬ শতাংশ । উপজাতিদের মধ্যে শতকরা দুইজন পরীক্ষার্থীও প্রথম বিভাগে পাশ করতে পারে না । শতকরা ৯০ জনই তৃতীয় বিভাগে পাশ । অবশ্য সারা রাজ্যেও প্রথম বিভাগে পাশের সংখ্যা শতকরা দশজনও হয় না । আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মত । দেখা গেছে ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ এই সাত বছরে নিয়মিত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮২৫ জন । এর মধ্যে পাশ করেছে ৭৫,৭২৬ জন, ফেল ৫২,০৯৯ জন । ভাবনার বিষয় হল প্রতি বছর এই যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ফেল করছে এরা

কারা? কোন্ অঞ্চলের ? কোন্ সম্প্রদায়ের? এরা কোন্ স্কুল থেকে এসেছে ? কি রকম পরিবারের ? সন্ধান করলে দেখা যাবে ফেলের সংখ্যা সেখানেই সর্বাধিক যেখানে শুধুমাত্র সাইনবোর্ড পরিবর্তন করে হাই স্কুল করা হয়েছে, যেখানে প্রধান শিক্ষক নেই, বিষয় শিক্ষক নেই, আর যেখানে পরীক্ষার্থীদের কয়েকজন করে গৃহশিক্ষক রাখবার সংগতি নেই। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই রকম চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বোর্ডের পরীক্ষায় একজনও পাশ করতে পারে না এমন স্কুল সেখানেও আছে। এমন কি বছর বছর সবাই ফেল এমন স্কুলও আছে। বলা বাহুল্য স্কুলগুলো উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। এই অবস্থা ভবিষ্যতের দিক থেকে কি বার্তা বহন করে আনছে ? রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। না থাকাবই মত। আবার ওদিকে একমাত্র সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া ধর্মনগরের উত্তরে কোথাও ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের কোন জায়গা নেই। এই অবস্থায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে যে কতটা দক্ষ, শ্রেষ্ঠ ও নিপুণ করে গড়ে তোলা দরকার ছিল তা আব বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা কি সেদিকে এগিয়ে চলেছি ? না কাজের পাহাড় ক্রমশঃ জমেই চলেছে ? সময় কিন্তু থেমে নেই।

শিক্ষিত বেকারদের কর্মহীনতা ঃ

আরেকটি বিষয়ের সামান্য উল্লেখ করে এই নিবন্ধ শেষ করব। বিষয়টি শিক্ষিত বেকারদের কর্মহীনতা। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত এই বেকারদের মধ্যে যেমন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ বেকারগণ রয়েছে, তেমনি আছে স্নাতক, স্নাতকোত্তীর্ণ ও প্রযুক্তি কারিগরি পাশ করা কর্মপ্রার্থীরাও। অবস্থাটা দিনদিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ২০০২ সালের কর্মপ্রার্থী তালিকায় দেখা যায় যে মাধ্যমিক মাধ্যমিকোত্তীর্ণ প্রার্থী রয়েছে ৭২,৭০০ এর মত। স্নাতক স্নাতকোত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। আই. টি. আই. পাশ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা ৭৫৩৭। এগ্রি. বি. এস. সি. / এম. এস. সি. রয়েছে ১৯৪ জন। ইংরেজীর স্নাতকোত্তীর্ণ প্রার্থী রয়েছে ১৭৬ জন। আইনপাশ বেকারও এই তালিকায় আছে। ২০০২-০৩ সালের নথিভুক্ত তালিকায় কর্মপ্রার্থীর মোট সংখ্যা হয়েছে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার। দশ বছর আগেও এমন ভয়ংকর অবস্থা ছিল না। একে আমরা কি বলব ? ত্রিপুরার শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি ? না সমাজজীবনে এক ভয়াবহ অশনি সংকেত ?

পথ কোথায় ? আজ একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে - শুধু আজ নয়, অনেক অনেক বছর আগে থেকেই - একদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন আরেক দিকে এই ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা সুনিশ্চিত করা, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী যা বর্তমানে আছে এবং

আগামীদিনে গৃহীত হতে চলেছে তার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সংযোগ স্থাপন করা - যাতে করে শিক্ষা শেষে ছেলেমেয়েরা যথাসম্ভব রাজ্যের উৎপাদনমূলক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে । সুনিশ্চিত করা যাতে তাদের জন্য কিছু পরিকল্পিত কর্মসংস্থান হয় । এই লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী যদি এখনও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্র, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার রূপদান প্রণালীর ক্ষেত্রে সক্রিয় আঙ্গিকে পরিণত না হয় — এখনও যদি গোটা শিক্ষা পরিকল্পনায় নতুন চিন্তাভাবনা ও আর্থ-সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার স্থলে মান্ধাতার আমলের সেই অকেজো সম্প্রসারণমূলক মডেলই চলতে থাকে, যা নবনির্মাণের পরিবর্তে তরুণ সমাজকে কর্মহীনতার অভিশাপে দিনদিন জর্জরিত করে তুলছে — তাহলে অদূর ভবিষ্যতে কঠিন এক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার জনজীবন যে অস্থির হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

ডঃ জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় । জন্ম ঃ ঢাকা জিলার বিক্রমপুর ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে । স্কুলশিক্ষা গ্রামের বিদ্যালয়ে । '৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় জেলে থাকার কারণে লেখাপড়ায় বাধাবিঘ্ন । উচ্চশিক্ষা ঢাকা ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে । দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৬৮ সালে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ । দেশভাগের পর পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে স্থায়ী বসবাস । ১৯৫৪ সালে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে শিক্ষাবিভাগে স্কুল শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু । তারপর আগরতলার বেসিক ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষক এবং কাঁকড়াবন ট্রেনিং কলেজ ও স্টেট ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ । শেষে ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকারে শিক্ষা অধিকর্তার কর্তব্য পালন । ত্রিপুরা সরকারের কাজ থেকে ১৯৮৩ সালে অবসর গ্রহণের পরে উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদে শিক্ষা এবং তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে মুখ্য আধিকারিকের দায়িত্ব গ্রহণ এবং সেখান থেকে ১৯৮৮ সালে অবসরগ্রহণ । দৈনিক সংবাদ, সমাচার, উদীচি, গোমতী, Educational Miscellany, Tripura Review প্রভৃতি স্থানীয় পত্রিকায় লেখকের প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরার বাইরে বরোদা এবং দিল্লী থেকে প্রকাশিত Administration of Education in India, Education of Teachers in India, Vitalizing Elementary Education প্রভৃতি সংকলন-গ্রন্থে লেখকের অবদান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

******

আকাশ সমুদ্র ও সমতলের পাঁচালি

— তুষারকণা মজুমদার

পুরীর 'স্বর্গদ্বারের' সামনে পর্যটক, তীর্থযাত্রী নানা লোকের সমাগম — প্রতিদিন একই চিত্র। মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে নীল জলের উন্মত্ত তরঙ্গ রাশির নৃত্য দেখে মগ্ন হয়ে আছে। অথচ আজই আমরা সন্ধ্যার ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরে যাব। ভোর পাঁচটার আগেই 'বেঙ্গল লজ' থেকে বেরিয়ে এসেছি সমুদ্রের জল থেকে উদীয়মান সূর্যরশ্মি দেখার জন্য। গতকাল ভোরেও এসেছিলাম কিন্তু সূর্যোদয় দেখতে পেলাম না, আকাশ মেঘলা ছিল বলে। আজও মেঘে আচ্ছন্ন, তবু আমি সকলকে তাগিদ দিয়ে বেরিয়ে আসি। কিন্তু ও কেন একলা বসে আছে? ছোটবেলা মাকে হারিয়ে যে কিশোরীটি ভাই বোনের দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে মায়ের ভূমিকা পালন করে অধিক বয়সে সাত পাকে বাঁধা পড়ে, সে এখন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীও। একাধারে তিনটি সংসার সামাল দিতে গিয়ে খিট্‌খিটে মেজাজি বলে পরিচিত। আজ ভোরে সমুদ্রের তটে শান্তভাবে মগ্ন হয়ে বসে আছে, ব্যাপার কী? বেলা বাড়ছে আর তো দেরি করা চলে না। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিতেই — আমাকে বলেন, মাসি গো ফটো তোলব। ফটোওয়ালা এল, ঢেউ না এলেও তোলব — কয়েক মিনিটের মধ্যে এমন ঢেউ এল, আমি টলমল করে ছিটকে গিয়ে জলতরঙ্গে এগোচ্ছি আর পিছিয়ে যাচ্ছি। নোনাজলে ডুবছি আর উঠছি। ভ্রমণে এসে এবার বুঝি পৈত্রিক সম্পত্তি সাধের প্রাণটা যায়! হাত তুলতে স্নানরত এক পুরুষের হাত আমার হাত ধরে ঢেউ-এর তোড়ের মধ্যে ছেড়ে দিল খানিকটা এসে। আমি আবার ডুবে যাচ্ছি। পায়ের আঙ্গুল যেন বেঁকে যাচ্ছে। প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে পূর্ণিমার ঢেউ ভয়ঙ্কর, মরিয়া হয়ে আবার বাম হাত তুললাম, পায়ের উপর দিয়ে কে যেন মাড়িয়ে গেল। মরতে অনেক বার ইচ্ছে হয়েছিল আজ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বাঁচবার জন্য হাত তুলছি। ঘাত-প্রতিঘাতময় সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে অবাঞ্ছিত ঘটনা দুর্ঘটনায় পড়ে অনেকবার মৃত্যু কামনা করেছি। আজও ভোরে 'বেঙ্গল লজ' থেকে বেরুবার মুখে গেট এ কর্তব্যরত কর্মচারী জানতে চায় —'কোথায় যাচ্ছি'।

জবাবে বললাম — 'সাগরে'।

হাসতে হাসতে সেই স্ব-র কবিতার কয়টি লাইনও শুনিয়ে দিলাম —

'জীবন ভর জ্বলে খাঁক্ হ-ল যে হাড় মাংস, জ্বালিয়ে ছাই করো না তারে, করো না ধ্বংস,

শ্মশান, মশান, তন্ত্র মন্ত্র শান্তিতে থাক্ পড়ে —

ভাসিয়ে দিও শীতল জলে তারে ।'

আর এই মূহুর্তে সাগর জলে ঢেউ-এর মুখে পড়ে কেবলি বাঁচতে চাই । মরিয়া হয়ে হাত তোলার পর কে যেন ভগবানের মত শক্ত হাতে শক্ত করে ধরে প্রতিকূল ঢেউ-এর মধ্যে আমাকে তীরে ছেড়ে দিল — কোন্ যাত্রী ? না নুলিয়া চেনবার মত বোধ ছিলো না । তারপর বালিতে হামাগুড়ি দিয়ে খাবলে ধরে কচ্ছপের গতিতে আমি সামনের দিকে এগোচ্ছি সমস্ত জীবনী শক্তি দিয়ে, পাছে যদি আবার ঢেউ-এর আঘাতে পড়ি ।

সর্বাঙ্গে বালি দিয়ে আচ্ছাদিত আমাকে এই অবস্থা দেখে যাত্রীরা হাসছে । হাসুক আমি তো এই যাত্রা বেঁচে গেছি —'বেঙ্গল লজে' বাথরুমে বালতি বালতি জল ঢেলেও সব বালি ছাড়াতে পারিনি । মাথার মধ্যে যেন পাঁচকিলো বালি আটকে গেছে । আবার নিচু স্বরে বললাম দাদা জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা দিদি ভাইপো, গতকাল ভিড়ের আশঙ্কায় তোমাদের স্নান যাত্রার দর্শনে যাইনি, আজ নিশ্চয় আমার স্নান দেখেছিলে — সাধুরা বলেন— ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়— আমি ভক্ত কিনা জানিনা - তবে জলে ভেসে মরার ইচ্ছের অপমৃত্যু হয়ে গেল চিরদিনের জন্য । এখন কবির ভাষায় — "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে— মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই ।" এবার শুনুন, এই কাহিনীর শুরু থেকে শেষ । বেশ কয়েক মাস ধরে হঠাৎ মনে হল আমি একা, বড় একা, দিনগুলি আর সোনার খাঁচায় রইল না । এক পা দুই পা করে বার্ধক্যের খাতায় নাম লিখতে চলেছি । জীবনের শুরু থেকে কত হাজার মাইল হেঁটেছি । সেই হিসেব করিনি কোনদিন । প্রশ্নটা হাফুস্ হুপুস্ করছে । চারদিকে সবই চলছে নীরবে । যেমন চলে প্রতিদিন আজও তেমনি— তবু যেন কী নেই কী নেই । মনে হচ্ছে কেবলি—

"সমাজ সংসার মিছে সব —

মিছে এই জীবনের কলরব

যে কথা এতদিনে রহিয়া গেল মনে,

সে কথা আজি যেন বলা যায় ।"

কিন্তু বলব কাকে ? এর মধ্যে প্রচণ্ড গরম শুরু হয়ে গেছে ।

মনটা বলছে, যাও দিন কয়েক আত্মীয় দর্শন করে এসো । সত্যিই একদা সাত পাঁকে

বাঁধা পড়ে যার সাথে গিট বেঁধে এই পাহাড় সমতল লুঙ্গা বেষ্টিত চিরসবুজ পার্বতী ত্রিপুরায় এসেছিলাম । ভেবেছিলাম অবসর সময়ে সারা রাজ্যে চষে বেড়িয়ে লম্বা-বেঁটে ধনী-নির্ধন, সবাইর জীবন কাহিনী শুনব, দেখব । কিন্তু সে গুড়ে বালি ।

কোথা থেকে উগ্রপন্থী নামকরণে অমৃতের সন্তানেরা বাজ পাখির মত উদয় হল । যার ফলে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল জানি না —

''ঘর জ্বালানোর আগুন কে দেয় উস্কে ?

মানুষ মারে নির্দোষী মানুষকে ।

দুঃখ ছড়ায়, সন্ত্রাস ছড়ায়, দেশে দেশে দুঃখী সকল মন —

হে নবজাতক, কার নাম তুই করিস উচ্চারণ ?''

তাই দেবভূমি সবুজ রাজ্যটা হয়ে গেল ভয়ঙ্কর আতঙ্কিতস্থান । বেঁটেরা হয়ে উঠল অবিশ্বাসের পাত্র । অথচ দেহের বয়স বেড়ে গেলেও মনের বয়স এক ইঞ্চিও না বাড়াতে, অবুঝ মন কানে কানে অহরহ স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রেরণা দেয় - —

''থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগতটাকে' । কিন্তু জগতটা দেখতে চাইলে কি দেখা যায় ? বিশেষ করে আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের মনকে অর্থনৈতিক দুঃশ্চিন্তা এতই কলুষিত ও নিষ্পেষিত করেছে যে আজ তারা নৈতিক চরিত্র হারাতে বসেছে । তারা যেন জগতের কেউ নয়, অথচ তাদের মন কত আশাই পোষণ করে । যাই হোক ইচ্ছাশক্তির জোরে সঙ্গী পেলাম ।

ছোট ভাই ত্রিশ বছর চাকুরী জীবন কাটিয়ে যাদবপুরে নিজ বাড়িতে যাবে। আত্মীয় দর্শনের নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি ১০ মে সোমবার (২০০৪) বিকাল ৪.৩০ মিঃ । আমি এখন ভাই-এর পাশের সিটে বসে আকাশে পথে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলাম । জানালা দিয়ে পাশে চোখ রাখতে দেখা যাচ্ছে নীচের পাহাড়, নদী-নালা, গাছপালা ক্রমশ ছোট হতে ছোটতর হয়ে যাচ্ছে। পাশে এখানে সেখানে নীচে গুচ্ছগুচ্ছ তুলার মত সাদা মেঘ। সমতলের রাজনীতি ভেদনীতি, কূটনীতি সব কিছুকে ছাড়িয়ে মুক্ত আকাশে পাখির মত প্লেনের ডানা ভর করে আনন্দে মশগুল কল্পনাপ্রবণ এই আমি, চলমান মেঘগুলোকে দেখে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতকে স্মরণ করছি । পাশে গুচ্ছগুচ্ছ সাদা তুলোর মত মেঘ এখানে সেখানে । তা দেখে মনে পড়ে কোন এক কবির কবিতা — 'ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্য ঝঞ্ঝা বায়ু প্রহারে— পড়ে আছে দূরাগত, জীর্ণ অভিলাষ যত — ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রকারে ।' চোখ ঘুরিয়ে উপরের দিকে তাকাতেই স্বর্গ নামটা যেন চোখে ঠেকছে ।

জ্ঞান হওয়া অবধি স্বর্গ-নরকের শান্তি-অশান্তি আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে । কেননা শাস্ত্রকারেরা কথায় কথায় পাপ পুণ্যের কথা বলে স্বর্গ নরকের উপমা দিতেন । শাস্ত্রীয় মতে বিশেষ মানুষদের দান করলে এবং তাঁদের বাক্য পালন করলে—মৃত্যুর পরে সরাসরি স্বর্গবাস — আর অমান্য করলে, পাপ করলে নরকে গমন । প্রসঙ্গত আমার শিক্ষক স্বামী মৃত্যুর প্রাক্কালে বলে স্বজনগণকে, তিল শ্রাদ্ধ করতে, কিন্তু সে মৃত্যুর পর শাস্ত্রকারদেরও কিছু পরগাছা আত্মীয়দের পরামর্শে ষোড়শ করিয়ে সদ্য বিধবার মাথার উপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে হিতৈষীর মুখোশ খুলে চলে গেলেন । তারা—আর শোক সন্তপ্ত বিধবাটি ঋণ সাগরে বন্যার আর্জনার মত ভেসে চলেছে । তাই আকাশ পথে উড়ো জাহাজে বসে পরলোকগত পতিদেবতার উদ্দেশ্যে উড়ু খবর ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'ও আনন্দবাবু প্লিজ, তোমার স্বর্গীয় আরাম কক্ষে আমার জন্য একটুখানি জায়গা রেখো, মাত্র সাড়ে তিন হাত । আমি তো ছেলেকে আমার ষোড়শ শ্রাদ্ধ করার জন্য টাকা দিয়ে যেতে পারব না । পরলোকগত কল্প জগতের স্বামীর কাছে যখন স্বর্গবাসের আশ্রয়ের জন্য আগাম কামনা করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে বিমান সেবিকার সতর্ক আদেশ 'বেল্ট বাঁধুন' । সম্বিত ফিরে দেখি বিমানটি দম দম রানওয়ে শব্দের গুঞ্জন করতে করতে দ্রুত ছুটে চলছে ।

লোকসভার পশ্চিমবঙ্গে আজ ভোট । ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কিনা চিন্তিত সবাই । ভাই ট্যাক্সি ধরতে লাইনে দাঁড়াল । জনৈকা ভদ্রমহিলা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. করেন । তাঁকে নারকেল বাগানে নামিয়ে দিতে আমাদের সহযোগিতা চাইলেন । 'বাইবেলে' পড়েছিলাম, "Duty is God" একাকী নারীকে সাহায্য করাও কর্তব্য মনে করে রাজি হলাম । পশ্চিমবঙ্গে সন্ধ্যার রাস্তায় ট্যাক্সিতে বসে বেশ রোমান্স মনে হচ্ছিল । যতক্ষণ তিনি ছিলেন, কাব্যচর্চা করতে করতে গেলাম । অবশেষে যাদবপুর সুকান্ত ব্রিজকে অতিক্রম করে খালের পাশ দিয়ে পিচ ঢালা রাস্তার উপর দিয়ে এসে ট্যাক্সি যে গলির মুখে থামল নাম তার কামারপাড়া । রাস্তাটার পুরানো নাম উপেন্দ্র বিশ্বাস সরণি ।

পরদিন রাস্তায় প্রাতভ্রমণ করতে গিয়ে দেখলাম —-খালের পাড়ে বস্তি । ব্রিজের নীচে ও সিঁড়ির তলায় লোক শুয়ে আছে । দেখে মনে হল ওরা সকলেই পূর্ব বাংলার লোক। শেষ পর্যন্ত বাঁচার জন্য যারা এই রাজ্যে প্রবেশ করে, বেশির ভাগই ফুটপাতেই জীবিকা নির্বাহ করছে— কথায় আছে না —

"আমি যাই বঙ্গে
আমার বরাত যায় সঙ্গে" ।

পরদিন বেলা আড়াইটায় আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে সুকান্ত ব্রিজের উপর এসে বাস

ধরলাম । এই সময় বাস খালি । এর পূর্বে মামার বাড়ি এলেই - কালিঘাট, চিড়িয়াখানা, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একবার চক্কর না দিলে ভাল লাগত না । এবার কিন্তু শেষবারের মত আত্মীয় দর্শন । আত্মায় আত্মায় মিল হলে নাকি তাকে বলে আত্মীয়তা । কিন্তু সে যুগের এসব বাণী আজকের সমাজে অচল । এইসব ভাবতে ভাবতে রাস্তার দুইপাশে চোখ ঘুরিয়ে বহুবার দেখা কলকাতা শহরকে দেখতে দেখতে চিড়িয়াখানার পাশে আদিগঙ্গার উপর দিয়ে বাস যে স্টপেজে থামল — সেটা পুরানো জেলের কোয়ার্টার ছিল । দেশ বিভাগের পর যে সব কর্মচারী চাকুরী বদল করে আসে — এইগুলিতে থাকেন — এখন ওদের বংশধরেরাও বাস করেন । আমাদের ভাইবোনকে কয়েকটি বৌ ও ছেলে-মেয়ে এসে কৌতুহলী চোখে দেখছে । পাশে কুলকুল করে আদিগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে আপন গতিতে । ৩ নং ভবানীপুর রোডের ২০ নং বাড়ীতে প্রবেশ করে মামিকে প্রণাম করতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেন—অতদূর থেকে আমাকে দেখতে এলি ? বললাম, হ্যাঁ এলাম ।

— তোদের রাজ্যে আমাকে নিবি ? বুঝলাম -

—বুড়ি হওয়াতে অবহেলিত জীবনযাপন করছে । আমাদের দেশে বৃদ্ধাবস্থায় পরিবারে দুর্গতির সীমা থাকে না । বিলোনীয়া সারদা আশ্রমে কলেজের অধ্যাপক ডঃ তাপস রায়চৌধুরী ভাগবত আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন —"ষাট বছরের উপর মানুষের বয়স হলে নাকি গরুর মত অবস্থা হয় ।" এই উক্তি যে আংশিক সত্য অনেক পরিবারে লক্ষ্যনীয় । আমি মামিমার প্রশ্নের জবাবে বললাম — আমাদের রাজ্যে নিশ্চিন্তে কোথাও যেতে পারবে না । জনপদ আতঙ্কিত । সন্ধ্যে হতেই মোটামুটি আমরা ঘরবন্দি । জোরে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মামি বললেন, কী- খাবি ? খাব ? —মামার বাড়ির এক মুঠো ভাত, বলেই রান্না ঘরে গিয়ে হাঁড়ি হাতড়িয়ে এক গ্রাস ভাত নিয়ে মামার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বললাম, ছোট মামা দেখুন, আপনার সুদূরের ভাগ্নি ভাত খাচ্ছে । তারপর ছেলে মেয়েদের নিজের লেখা বই দিয়ে ট্যাক্সি করে সেই গঙ্গার উপর দিয়ে ফিরছি । গঙ্গার জলে কত যে আবর্জনা ভেসে যাচ্ছে তা দেখে এ যুগের যুক্তিবাদীরা কি গঙ্গার জলের মাহাত্ম্যের কারণে ব্যবহার করতে বলবেন? এই নিয়ে কোন এক সময়ে দুই পণ্ডিতে তর্ক বাঁধে । ১ম পণ্ডিত — শ্রেষ্ঠ হচ্ছে - ফলের মধ্যে আম, নারীর মধ্যে চাম (সুন্দরী নারী), পুরুষের মধ্যে সদাগর, জলের মধে গঙ্গার জল' । ২য় পণ্ডিত — প্রতিবাদী কণ্ঠে বলেন, না— না —

শেষ্ঠ হচ্ছে, "ফলের মধ্যে কদলী, নারীর মধ্যে হেদলী —
পুরুষের মধ্যে চাষা, জলের মধে ভাসা ।"

এবার পণ্ডিতদের শ্রেষ্ঠত্বের সত্যতা — বিচার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে - জানাচ্ছি কদলী মানে কলা, হেদলী কাজের মহিলা, যে কারণে, অতিঅতি সাজের সময় নেই । ভাসা সর্বত্র পাওয়া যায় সেই জলে । মামার বাড়িকে লক্ষ্য করে শেষ প্রণাম জানিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া করে ফিরছি । একদিকে কালিঘাট — অন্যদিকে চিড়িয়াখানা- ন্যাশনাল লাইব্রেরি পেছনে ইডেন... কোন কিছুতে আসক্তি নেই শুধু খাঁচা বন্দি একাকিত্ব মনকে খানিক চাঙ্গা করার জন্য আত্মীয় দর্শনে এলাম ? একদা অখণ্ড ভারতে সে সমাজে মানুষ বসবাস করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে সেই ঐতিহ্যপূর্ণ বংশপরম্পরা সমাজ ভেঙ্গে গেছে অথচ ইহাও নিরন্তন সত্য "Man is a social animal. It is impossible for man to live alone in society-says an English poet. " আর আজ আমরা যে সমাজে বাস করছি, পাশে বসার লোকটিকে এ বিশ্বাস করতে পারিছ না । এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের লুকোচুরির মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মযজ্ঞ পরিচালিত করতে হচ্ছে ।

ট্যাক্সি এসে যেখানে দাঁড়াল নাম তার সার্ভে পার্ক - মাসির বাড়ির সামনে । যাই হোক্ মায়ের অভাব এই বাড়িতে পূরণ হল । তাকে সফর সঙ্গী করে —১১/৫ যাদপুর আশ্রমে আসি । মাত্র ১০ টাকা জমা দিয়ে পেট ভর্তি অন্নব্যঞ্জন প্রসাদ । ৯ বছর বয়সে নাম পেয়েছি । ঠাকুর বলেছিল, সর্বদা নাম করতে । আফিং যে লোক জাইন্যা খায় — তাঁরও নেশা ধরে, আর যে না জাইন্যা খায় তারও নেশা ধরে— নামের নাকি এমনই গুণ । বয়স কম সেদিন বুঝিনি - আজ বুঝলাম, কত উপদেশ দিয়েছিলেন । যদি নোট করে রাখতুম, আশ্রম থেকে প্রসাদ নিয়ে এসে দিন দুয়েক সার্ভে পার্কের রাস্তায় হেঁটে বেড়ালাম। মাত্র ৯ হাজার টাকা দিয়ে তিন কাঠা জায়গা রেখে যারা বাড়ি করেন, আজ তিন লক্ষ টাকায়ও পাওয়া যাচ্ছে না । দিন দিন সর্বত্র সব কিছুরই দাম বাড়ছে - শুধু মানুষের দাম বাড়ছে না - একদা গৃহলক্ষ্মীর বংশধরেরা আজ রাস্তায় ইট ভাঙ্গছে বালি টানছে - নারী পুরুষ ক্রমেই সস্তা থেকে সস্তাতর হয়ে যাচ্ছে দিনদিন, জানিনা মানুষের এই অবস্থার চরম মুক্তি কবে ? কারও কারও মতে এগারই সেপ্টেম্বর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ বপণ হয় ।

তবে কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধই মানুষকে চিরশান্তি দেবে প্রাণ হরণ করে ? কে জানে ? আপাতত অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে অন্ধকারে রেখেই এই মানব স্রোত মহাকালের দিকে এগিয়ে চলছে । অনেকক্ষণ হাঁটার পর একটি কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে বসলাম । জগজ্জনীকে প্রণাম করে মনে মনে বললাম মা-পাঁচজন সাহেব একত্র হলে একটি ক্লাব

করে, আর পাঁচজন বাঙালি একত্রিত হলে একটি কালীবাড়ি করে । এইভাবে পাঁচ জনের কাঁধে ভর করে মা তুমি গোটা বিশ্বে স্থান করে নাও। আমরা বাঙালি তো - ঠেলা ঠেলির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গৃহ ছেড়ে বন্যার আবর্জনার মত । তাপদগ্ধ মানুষগুলি যেন তোমার প্রাঙ্গণে এসে শান্তি পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করো মা — ফিরে এসে বুড়ি মাসিমার ঘরখানা ফিটফাট করতে লাগলাম । তারপর মাসির বাড়ি থেকে আমি আমার পাণ্ডুলিপিগুলো গুছিয়ে নিলাম । ছোট বোন ডঃ জ্যোৎস্না চ্যাটার্জি গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে সল্টলেকে নিয়ে এল । বড়লোকের বাসস্থান বলে কেহ কেহ বলে থাকে । ওদের ফ্লেটে বসে দিন সাতেক আমি শুধু আমার গল্পগুলো সংশোধন করেছি । সময়ে প্রয়োজনে সব কিছু সমানে এসে যায় । সাহিত্য চর্চার এমন পরিবেশ আর কোথাও পাইনি । ওরা উভয়ে বলে — দিদি আপনি লিখুন । সকাল বেলা বোনের সাথে খানিকটা হেঁটে বিজু পার্কে প্রাতভ্রমণে যাই । ভ্রমণরত কয়েক জনকে দেখা যায় রাস্তার পাশের বাড়ির দিকে নমস্কার দিতে । কারণ কি ? সামনে এগিয়ে দেখি বাড়ির বারান্দা দেওয়ালে 'লোকনাথ' বাবাজির একখানা ফটো । আশেপাশে পথের ধারে দেবস্থান, আমাদের প্রাচীন এই আধ্যাত্ম ভারত ভূমিতে । মনে যেন জোর পাচ্ছি । মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে ।'

হ্যাঁ একলাই চলব । এখনো যখন কেহ বলে কী দরকার এই বয়সে সাহিত্য চর্চা করার ? বাঁচবেন আর কয়দিন ? আরাম করুন । তখন পাণ্ডুলিপির পাহাড়ের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হয় । সাতদিন একনাগাড়ে মা ও ছেলে মিলে ছাব্বিশটি ছোট গল্প গুছিয়ে ও সংশোধন করে প্রকাশক ডঃ মনোজ চাটার্জি (ভগ্নিপতির) হাতে তুলে দিয়ে ভাইপোকে সঙ্গী করে বড় ভাইকে দেখতে নদিয়া জেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । বিধান স্টেশনে এসে ট্রেনে চাপি । ট্রেনে ভ্রমণ আমার ভাল লাগে। অচেনা মুখের বহু যাত্রী থাকে পাশে । বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতবর্ষের বিচিত্র পোশাকের নর-নারী বিচিত্র ভঙ্গীতে ট্রেনে উঠানামা করছে এ যেন নিত্য নতুনের আনাগোনা । তার মধ্যে নানা পসরা নিয়ে ফেরিওয়ালার হাঁকডাক । মাঝেমাঝে গরম চা বা কফি, কী মজা । শহর কলকাতা ছাড়িয়ে ট্রেন এখন বঙ্গ জননীর আদি রূপকে পেছনে ফেলে এক সময় চাকদহ স্টেশানে থামল । ট্রেন থেকে নামার পর কী কাণ্ড। ভাইপো কাঁধে করে রেললাইন ক্রশ করে আমাকে ওপারে এনে বাসে তুলল । আমি বললাম একী করলি ? ও বলল - ব্রিজ পার হয়েআসতে আসতে বাস ছেড়ে দিতো । পড়ন্ত বিকেলে বেলেবাজার নেমে জিপে যাচ্ছি । বলরামপুর গণ্ড গ্রামের দিকে-সেই গ্রামে ৬৪ সনে দাঙ্গার সময় দুধে ভাতে খেয়ে বড় হওয়া বাড়ির যে বড় ছেলেটি শুধু মান সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার

জন্য সপরিবারে এই গ্রামে এসে ডেরা বেঁধে বসবাস করে রিক্ত হস্তে। দারিদ্র্যের সাথে কঠোর লড়াই করে অর্ধাহারে অনাহারে সাতাত্তরে পা দিয়েছেন। বড় ভাইকে শুধু দুই চোখে দেখতে এবং শেষ প্রণাম করতে এসেছি। অপ্রত্যাশিতভাবে না জানিয়ে হঠাৎ বোনকে ছেলের সাথে দেখে চোখ ছলছল্ করছে। আর দুটো ঠোঁট কাঁপছে। তারপর কোন গায়কের কণ্ঠে হয়তো আবার শুনবেন 'ভায়ে মায়ের এত স্নেহ কোথা গেলে পাবে কেহ —'

নদিয়া জেলার বলরামপুর গ্রামের সাধারণ খেঁটে খাওয়ার শ্রমজীবি মানুষেরা এখন বিঘার পর বিঘা - কলা বাগান আর পেঁপে বাগান করেছে। পেঁপের ক্ষীর ওষুধের কাজে লাগে। এইজন্য বলরামপুর গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়ার শ্রমজীবী মানুষেরা এখন বিঘার পর বিঘা - কলা বাগান আর পেঁপে বাগান করেছে। পেঁপের ক্ষীর ওষুধের কাজে লাগে। এইজন্য ব্যবসায়ীরা পেঁপে কিনে নেয়।

বুড়োবুড়িরা বলে থাকেন বড় ভাই বাবার সমান। —আমাকে নিজ হাতে জল খাবার পরিবেশন করছেন। এই স্নেহের পরশে আমার পথের ক্লান্তি টাকা পয়সার শোক এই শ্রীনগর গ্রামের আশেপাশেই ছিল। আবার কারো কারো মতে তাঁর বাড়ি গোপাল নগরেই ছিল। লাঘব হল। পরদিন ঘুম থেকে উঠে ভোর বেলা নাতিন পায়েলকে নিয়ে প্রাতভ্রমণে গ্রামের রাস্তায় বের হলাম। ভোরে গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে খুবই ভাল লাগছে। আসলে স্বীকার করুক বা নাই করুক, বৈচিত্র্যহীন জীবন একঘেয়েমির শিকার হয়। তাই শহর জীবনের চেয়ে গ্রাম বাংলার বিকল্প কিছুই নেই। রাস্তার দুই পাশে টালির ঘর। ছন ও টিনের ছাউনি বাড়ির মধ্যে নানা রকমের গাছগাছালি আমরা কিছুদূর যেতেই পায়েল বলল আরও খানিকটা গেলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাগানবাড়ি দেখা যাবে।

বলরামপুর থেকে তিন কিলোমিটার দক্ষিণে এই বাগান বাড়ি। একশো বিঘা জমি নিয়ে পুরো বাড়িটা কিছু পরিত্যক্ত ঘর। পাশে কয়েক গজ দূরেই ইট ভাট্টা। চারদিকে পরিখা ঘেরা। বাড়ির ভেতর এক বিঘা জমি নিয়ে একটি পুকুর। পুকুরটির নাম রাণীরপুকুর। এখান থেকে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি। এই বাগান বাড়ি যে গ্রামে তার নাম শ্রীনগর। শ্রীনগরের গ্রামের বয়স্কা মহিলা স্নিগ্ধা বিশ্বাসের কথায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরা তিন ভাই ছিলেন। এক ভাই শ্রীশচন্দ্র। তিনি শ্রীনগরেই থাকতেন। এটাই ছিল তার রাজধানী। অপর ভাই-এর নাম না জানলেও শোনা যায় তিনি বর্ধমানের কালনায় থাকতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্ব ছিল কৃষ্ণনগরে এবং তিনি এখানে মাঝে মধ্যে আসতেন। এই শ্রীনগরেই আর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর নাম গাজি বাবা। তাঁর নাকি এতটাই ঐশ্বরিক প্রদত্ত শক্তি ছিল যে তাঁর নিষেধে নাকি বাঘ পর্যন্ত

মানুষ খেতে বিরত থাকত ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যে গোপাল ভাঁড়ের নাম শোনা যায়, তাঁর বাড়ি নাকি এই শ্রীনগরে একটি সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ছিল । এই মন্দিরের সেবক এবং গাজিবাবার সাধনার উপর একদিন একটি প্রতিযোগিতা হয় । প্রতিযোগিতায় গাজিবাবা জয়ী হন । এই গাজিবাবার এখানে সমাধি আছে । এই সমাধিকে কেন্দ্র করে এখানে প্রতি বছর মাঘ মাসে মেলা বসে ।

রাজা শ্রীশচন্দ্রের রাজত্ব ধ্বংস হওয়ার পেছনে অনেক বিতর্ক । এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা অমর গায়েনের কথায়, রাজা শ্রীশচন্দ্র নাকি গাজিবাবার অত্যাচারে রাজত্ব ছেড়ে এখান থেকে চলে যান । এই গাজি বাবা নাকি তাঁর একটি হাতি এখানকার বিলের পাড়ে বাঁধত । তখন থেকে এই বিলের নাম হল হাতি বাঁধা বিল । এই বিলটি আজও এখানে স্বমহিমায় বিরাজ করছে ।

আবার স্নিগ্ধা বিশ্বাসের মতে রাজা শ্রীশচন্দ্র এবং বাংলা দেশের রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে নাকি রাজা শ্রীশচন্দ্র জয়ী হলেও খবর আসে তিনি যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত । এই খবর শুনে রাণীরা এখানকার পরিখায় ডুবে আত্মহত্যা করেন। কেহ কেহ বলেন রাণী এবং রাজবাড়ির দাসীরা এখান থেকে পালিয়ে যান । আবার কেহ কেহ বলেন কলেরা রোগে এই গ্রামে মড়ক লাগে — এই রকম বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতের মধ্যে সত্য হল যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর ভাইয়েরা - এক সময়ে এই বাগানবাড়িতে থাকতেন ।

রাজা শ্রীশচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন এবং কোন না কোন কারণে রাজার রাজত্বের বিলুপ্তি ঘটে । স্নিগ্ধার কথায় জানা যায়, যখন ছোট ছিলো তখন এই গড়ে সিংহ দুয়ার ছিল। আজ পরিচর্চার অভাবে বিলীন । আর জানা গেল এখানকার প্রভাবশালী জনৈক ব্যক্তির মেয়ের বিড়াল প্রীতির কথা । বিড়াল নিয়েই তার ঘর সংসার । তখন বাবা আলাদা করে মেয়েকে বাড়ি করে দেয় । আমার বাগান বাড়ি দর্শনের সহায়ক নাতি অনিমেষ । আমাকে যখন সে বাগানবাড়ি দেখাচ্ছিল, তখন স্নিগ্ধা বিশ্বাসের বিছানার উপরও অনেকগুলি বিড়াল দেখেছিলাম ।

বিড়াল প্রেমিক আর একজনের নাম লোকের মুখে মুখে । তিনি নদিয়ার তারকনাথ মল্লিক । মল্লিক বাড়িতে রাস্তা থেকে রুগ্ন বিড়াল তুলে এনে দুধ, মাছ খাইয়ে যত্নের সঙ্গে পালন করা হয় । বর্তমানে ১০০টি বিড়ালের মধ্যে ৪০টি আছে ।

চারশো বছরের এই মন্দির । হিন্দু সভ্যতার পর মুসলিম শাসন এই অঞ্চলকে

প্রভাবিত করেছিল । প্রাচীন ব্রহ্মময়ী মন্দির, জটেশ্বর নাথ, লালজি মন্দির প্রভৃতি হিন্দু শৈলির নিদর্শন । সেইসাথে কাজি মন সাহেবের কবর ও নানাইদ্‌গার মুসলিম শাসনের অস্তিত্ব বহন করে । এই গ্রামে প্রাচীন পুকুর ও দীঘি বর্তমান । এড়াছা সাতটি অলৌকিক কুণ্ড ছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে । সেগুলি অগ্নিকুণ্ড, জীবিত কুণ্ড, মুক্ত কুণ্ড ইত্যাদি নামে পরিচিত । কাল স্রোতে এই গ্রাম নানা উত্থান পতনের সাক্ষী । ব্রিটিশ শাসন ও মিশনারীদের দাপটে, ম্যালেরিয়া ও নানা সংক্রামক রোগের আক্রমণে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গ্রামটি অতীত গৌরব হারিয়ে ফেলে ।

জমিদার জিতেন্দ্র করের জমিদারি বিলুপ্তির পর মেহানাদ গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয় । বহু লোক গ্রাম ছেড়ে চলে যায় । একদিকে জঙ্গলে পরিপূর্ণ গ্রাম, অন্য দিকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে অন্যত্র পালায় ।

স্বাধীন ভারতে ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তুরা এসে সরকারি সহায়তায় এখানে পুনর্বাসন নেয় । পূর্ববঙ্গের শ্রমজীবি মানুষ ধীরে ধীরে গ্রামটিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করে ।

সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মময়ী মন্দির দেখতে গিয়ে জনৈক কর্মকর্তা বলেন, মন্দিরে মায়ের সামনে কোন ঘট নেই । ভেতরে নরমুণ্ডের উপর ঘটস্থাপিত । মন্দিরের উপরে ছোটোখাট আকারের তিনটি শিব মন্দির । সবার উপরে সাদা শিব । তান্ত্রিকের নিয়মানুসারে ঘট স্থাপিত হলেও মন্দিরের পূজা অন্যান্য মন্দিরের মতই হয়ে থাকে । ফিরতে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে পড়লেও অজানাকে জানার অদম্য উৎসাহে সাময়িক সব অসুবিধা, বিরক্তি গ্রাহ্য করিনি ।

পরদিন ভোরবেলা --- জামতলায় মন্দির ও জীয়ত কুণ্ডের ব্যাস কাশি দেখে এবং উল্টো দিকে নীলকর সাহেবদের কুটিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হল, সেই সময়ের অত্যাচারী সাহেবদের চিহ্ন ও চাষীদের চোখের জল এখনো গ্রামের মাটিতে মিশে আছে ।

এবার চললাম - ঐতিহাসিক মোহানাদ থেকে সোদপুরের দিকে । সঙ্গী বোনের মেয়ে, কলেজ ছাত্রী । তার জন্মকর্ম পশ্চিমবঙ্গে । পথ ঘাট সবই মুখস্থ । বাসে বেগুেলে এসে ট্রেন ধরে নৈহাটি । নৈহাটি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিচন্দ্রের জন্ম স্থান । সঙ্গী বলল, তুমি একটু বসো, আমি ফোন করে আসি । আমি বললাম তা হবে না । সুন্দরী তরুণীকে ছাড়া যাবে না । ও হেসে বলে, ঠাকুরমা, কলেজে পড়ি আমি কি এখন ছোটো ? ভয় নেই । ভালমন্দ বুঝবার বয়স হয়েছে । ভয় চল্লিশ বছরের উপর অকৃতদার বুড়ো খোকা, আর তিরিশের ওপর

বুড়ো খুকিদের । তারাই হতাশ হয়ে ভারাসাম্য হারায় । অঘটন ঘটায় আমার হাত ধরে টেনে বলে, চলো অটোতে যেতে হবে । তোমার যখন ভয়, তখন ফোন করব না । আমি বললাম, এম এ কোর্সে পড়েছিলাম, নিজের মাংসে হরিণ বৈরি ।' নিজের মাংসই নিজের শত্রু । যেই পৃথিবীতে খাদ্য ও খাদকের রাজত্ব । সেখানে বিশ্বাস তাই আপনা থেকে বিদায় নেয় । গোলাঘাটে সোদপুরে দিদির বড় মেয়ের বাড়ি এসে পৌঁছলাম । যে মেয়েটি কিশোরী বেলা মাকে হারিয়ে গোটা সংসারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মেজাজি হয়ে পড়ে । যে পুরীর সমুদ্রের তীরে উদাসীন শান্তভাবে বসেছিল — যাকে ডাকতে গিয়ে আমি সমুদ্রের ঢেউ-এর আঘাতে টলমল করে ভেসে যাচ্ছিলাম, সে কথা পরে বলব । আপাতত আলোরাণীর ঠাকুর ঘরে প্রণাম করতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল । বড়দের মুখে শুনেছিলাম 'এক দেব এক সেবা, তারে বলে ঠাকুর সেবা' । আর এখানে প্রচলিত দেবতাদের সমাবেশ । প্রতিদিন ব্রাহ্মণ দিয়ে দশজন দেবতার একবেলা পূজা করানো হয় । প্রতিদিনের বরাদ্দ গুরুদেব রামঠাকুরের জন্য 'লাল বাতাসা, মিশ্রি, ফল, জিলিপি' । বৃহস্পতিবারে সিন্নি দিয়ে সত্যনারায়ণ পূজা ও পাঁচালি পড়া । নানা দেবদেবীর জন্য নানারকম ভোগের আয়োজন ।

সতী মায়ের ভোগ দেওয়া হয় — খই বাতাসা । সতী মা নাকি ডালিম গাছের সাথে মিলিয়ে গেছেন তাই তিনিও দেবী হয়ে গেলেন । আমি জানতে চাইলাম — খাবার সময় এই দেব দেবীরা রকমভেদের জন্য ঝগড়া করেন না ? ও বলল এইভাবে ভক্তরা এইসব দেবতার ভোগ দিয়ে থাকেন । এমন ধর্মপ্রাণ মহিলাটি সংসারী । একধারে বাবার বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি সামলাচ্ছেন আবার ইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীও যুক্তিবাদীরা, এইসব দেখে শুনে আপনারা কি হাসছেন ?

আলোর বাড়ির ঠিক ডান পাশের বাড়ির ঘর থেকে বেড়িয়ে তিনটি ছেলে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে । ওরা বারেবারে জানালা দিয়ে এই বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে । জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম, ওরা ত্রিপুরার আগরতলার ছেলে । আমি ত্রিপুরা থেকে এসেছি শুনে তারা এই বাড়ির জানালার দিকে বারবার তাকাচ্ছে । দেশের টান যে কী জিনিস - আমিও ভাবলাম । আহা রে ছেলেগুলো মা-বাবাকে ছেড়ে পড়ার জন্য এই বাড়ি ভাড়া করে আছে। ওদের ঘরে গেলাম । শহর আগরতলার ছেলে তারা । আমি বিশটা টাকা হাতে দিয়ে বললাম, তোমরা চানাচুর খাবে । এই টুকুতে ওরা খুশি । গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিল। বিদেশে বাঙালির জন্য বাঙালির টান বেড়ে যায় ।

২৯শে মে চন্দননগর থেকে বোনের মেয়ে তপতী এসে আমাকে সল্টলেকে দিয়ে গেল । ও বলল, 'মাসি একবার চন্দননগর এসে এক মাস আমার কাছে থেকে গল্প লিখ ।

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এসেছিলেন । বললাম, মন্দ কি ? তাহলে তো — ত্রিপুরার সব পত্রিকাতে লেখা পাঠাতে পারব । বড় ইচ্ছে করছে ত্রিপুরা ভবনের ভেতরে গিয়ে দেখতে। কিন্তু বোনের আপত্তি পাছে যদি থেকে যাই ভবিষ্যতে তাদের বাড়ি না উঠি । সন্ধ্যার সময় সল্টলেকের বাজার দেখতে গেলাম ।

৩০মে আবার সার্ভে পার্কে ফিরে আসি । পুরীর টিকেট হয়ে গেছে । পুরী ভ্রমণের ব্যবস্থাপনায় মাসিমা প্রীতিলতা মজুমদার ও তাঁর ছেলে নীলাদ্রি । দুই দিন এগিয়ে ৩১ মে রাত আটটায় ট্রেনে ওঠতে হবে । শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে । অনেকবার পশ্চিমবঙ্গে আত্মীয় দর্শন করতে এসেও পুরী যেতে পারিনি । কিন্তু শুনে এসেছি করতে এসেও পুরী যেতে পারিনি । কিন্তু শুনে এসেছি 'সব ধাম বারবার, পুরীধাম একবার ।' আষাঢ়ের রথযাত্রার টিভির পর্দায় দেখে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছি । কিংবদন্তী আছে সমুদ্র সুভদ্রাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। বলরাম জগন্নাথ রাজি হননি । সুভদ্রাকে ধরতে সমুদ্র এক ক্রোশ এগিয়ে আসে। সুভদ্রা ভয়ে তখন জগন্নাথ বলরামের মাঝখানে বসে । সেই থেকে জগন্নাথ বলরামের মাঝে বোন সুভদ্রাকে আমরা পূজা করি । যাই হোক তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ এই ভারতের দেবভূমি স্বচক্ষে দেখার বাস নাই — আমাকে বারে বারে ঘরছাড়া করে ।

(দ্বিতীয় পর্ব)

তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকছে, দিন দিন শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলছি অথচ আজও পুরীর জগন্নাথ মন্দির দর্শন হল না । ক্ষোভ প্রকাশ করতেই ছোট মাসি প্রীতিলতা মজুমদার, আমারই মত ভ্রমণ পিয়াসী প্রস্তাব দেন - চেষ্টা করব। মাসিমা নীলাদ্রিকে দিয়ে টিকেট কাটাল । প্রসঙ্গত ভারত দর্শন মোটামুটি তাঁর হয়ে গেছে । শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল জঙ্গি উৎপাতের কারণে দেখা হয়নি । মাসিমার আগ্রহে নীলাদ্রিও তার স্ত্রী সোমা কয়লাঘাট রেল স্টেশন বুকিং অফিসে পুরীর টিকিট কাটতে গিয়ে কোন টিকিট পায়নি । কারণ গ্রীষ্মের ছুটি ও জগন্নাথের স্নানযাত্রার কারণে টিকিট নেই ।

আষাঢ়ের স্নানযাত্রা উপলক্ষে পুরীর জগন্নাথ মন্দির হতে ভাই বোনের বিগ্রহ একবার বের করা হয় । মহা সমারোহে এই স্নানযাত্রার উৎসব । বহু ভক্তের সমাগম হয় । দূর-দূরান্ত হতে ধর্মপ্রাণ ভক্তেরা আসেন । এইসব কারণে টিকিট শেষ । সোমার হতাশ চেহারা দেখে জনৈক অফিসার বলেন, স্পেশাল ট্রেন সপ্তাহে তিনদিন ছাড়ে গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষ্যে যেহেতু সময় কম, সেহেতু সেই টিকিটও শেষ হয়ে যায় । সোম, বুধ, শুক্র, এই ট্রেনটি ছাড়ে সন্ধ্যায় । অনেক কাকুতি মিনতি করার পর ঐ অফিসার চারটি টিকিট যোগাড় করে দিলেন ।

তবে উপরে, নীচে সিট নেই ।

আমাদের টিকিট এইভাবে করা হয় । সার্ভে পার্কে এসে বড়বাজার হয়ে নীলাদ্রির বাড়িতে আমাদের নিয়ে যায় । আট বছরের মেয়ে রুচিরাকে ভাত খাইয়ে দিতে গিয়ে দেরি হয়ে যায় । সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছে ।

তবুও আমরা একবার রাস্তার ঐ দিকে আবার এই দিকে এসে যখন একটা ট্যাক্সিতে উঠলাম, তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে । যানজট ঠেলে ঠেলে হাওড়া যখন পৌঁছলাম তখন হাতে মাত্র পনেরো মিনিট সময় । নীলাদ্রি সোদপুরের আলোকে খুঁজছে — ওকে ৬টায় আসার জন্য সময় দিয়েছিল, আমি নীলাদ্রির দিকে চোখ রেখে ওর পেছনে ছুটে যাচ্ছি-পাছে যাত্রীর ভিড়ে যদি চোখের আড়াল হয়ে যায় । মাসিমা রুচিরার হাত ধরে আমাদের পেছনে । এ যেন ঊর্ধ্বশ্বাসের প্রতিযোগিতা । আলো তার স্বামী ও ছেলেকে সঙ্গী করে সময় মত আসে । কিন্তু আমাদের দেরি দেখে ওরাও খুঁজছে আমাদের । ভাবলাম পুরী যাওয়া বুঝি ভাগ্যে নেই । এমন সময় একটা প্রাণ ফাটা ডাক, এই যে দিদা - আমরা এসে গেছি । আমি নীলাদ্রিকে থামালাম । এবার আবার দৌড়াচ্ছি - ট্রেনের দিকে । কামরার পর কামরা পেছনে ফেলে যাচ্ছি - নাম্বার খুঁজে পাচ্ছি না । আসলে আমরা জানতাম না স্পেশাল এই গাড়িটার সব কামরার মাঝখানে কোন পার্টিশন নেই । প্রথমে একটিতে উঠলে ভেতরে খুঁজে নিতে পারতাম । যাই হোক, নাম্বার দেখে সকলে ঠেলাঠেলি করে ওঠে দাঁড়ানো মাত্র ট্রেন ছেড়ে দিল । আবেগে আমি হাত তোলে কপালে ঠেকে চিৎকার দিয়ে বললাম, জগন্নাথ, তুমি অনাথের নাথ, অকুলের কুল ।

তারপর ? আলোর স্বামী ছেলে চলে গেছে । অভিমানী মেয়েটি উপরের সিট দেখে আমাদের দুই জনের কথা চিন্তা করছে । — সোমা বলেছিল-মিষ্টি করে বললে নীচের সিটের পুরুষ যাত্রীর কাছে সিট বদল করতে চাইলে দেবে । কিন্তু ও হরি, মিষ্টির যুগ চলে গেছে, নিজের আরাম পাগলেও বুঝে। সহযাত্রীর জন্য এত বড় ত্যাগ কেউ করতে রাজি হয়নি । হোক না বৃদ্ধা মহিলা । বরং সকাল দশটার পর সটান হয়ে শুয়ে পড়ে । আমার আটাত্তর বছরের মাসিমার মত এক যাত্রীর সিটের কোণে ঝিমুচ্ছে । আর আমি মনে মনে বয়সটাকে আরও কমিয়ে এনে নীলাদ্রির সহায়তায় উপরে উঠলাম । কিন্তু চোখ বুঝে আসছে । সারাদিনের ধকলে । তবুও ঘুমোতে সাহস হচ্ছে না । কারণ ঘুমোলে গভীর ঘুমে চলন্ত ট্রেনের নাচুনিতে যখন শরীরটা নাচতে নাচতে এলিয়ে পড়বে তখন আমার মনে হবে নিজ বাড়ির বিছানায় সুখ নিদ্রায় আছি । আর পাশ ফিরিয়ে এদিক ওদিক করতেই আচমকা নিচে ধপাস করে সকলের জন্য বিপদ ডেকে আনব । পরিণামবাদী আমি, এইসব চিন্তা

করে খাবারের জল ছিটিয়ে চোখের মধ্যে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছি । সেইদিন তপতীর সাথে নৈহাটিতেও স্টেশনে সন্টলেকে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠে সিট নেই । মাসি বোনঝি দাঁড়িয়ে রইলাম । সামনের সিটের থেকে সেই যুবকটি দাঁড়িয়ে আমাকে সিট দেয় । নাম জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম সে মুসলিম । জাত দিয়ে মানুষের মূল্যায়ন নয় । মনুষ্যত্বই তার আসল পরিচয় । নিচে নেমে কতক্ষণ হাঁটাহাটি করে গরম চা খেয়ে ভোররাতে ট্রেন বড় স্টেশন ভুবনেশ্বরে দাঁড়াল । তখন মনে হল সামনে ঘুমিয়ে থাকা যুবকটিকে বসিয়ে দিয়ে তার কাঁধে মাথা রেখে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেই । কিন্তু ইচ্ছেটাকে চেপে রেখে ভুবনেশ্বরের আলো ঝলমল স্টেশনের দিকে তাকিয়ে থাকি । এক সময় ভোরের আলো ফুটল । ট্রেন দুই পাশের অফিস আদালত বাড়ি-ঘর, মাঠ-ঘাট পেছনে ফেলে চলছে । বেলা নয়টায় নীলাদ্রি আমাদের সকলকে অটো করে বেঙ্গল লজে সমুদ্রের মুখোমুখি গলিতে তুলল । মালিক ৩৫/৩৬ বছরের শ্যামাচরণ চ্যাটার্জি । অন্যত্র চাকুরি করে তবে সেইদিন ছিল। দোতলার দুই সিটের রুম ব্যবস্থা করে দেয় । এটা হোটেল নয় । তবে জিনিস দিলে তারা রান্নার ব্যবস্থা করে দেবে । আমরা গলির বাঁদিকে 'দাদা বৌদির' রেস্টুরেন্টে ভাত খেয়ে নিলাম । মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মত রান্নার মেনু । কেউ কেউ বলে মালিক এখনো বিবাহ করেনি আবার কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে বলে তার দু'টো বৌ । তবে অল্প টাকায় খাওয়ার আয়োজন । ব্যবস্থাপনাও ভাল। নীলাদ্রি আমাকে বলল, দিদি, আজ রাতেই জগন্নাথ মন্দির দর্শনে বের হব। কারণ আগামীকাল ২রা জুন, মন্দির বন্ধ থাকবে । ৩রা জুন বিগ্রহ বের করে স্নান করাবে । পোশাক পড়াবে । প্রচণ্ড ভিড় হবে সেদিন । তার কথামত অটো করে মন্দির দর্শনে বের হলাম । বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে বড় রাস্তা । তবে ঢেউ এখানে পাড় ভাঙে না । খানিকটা বালির চর । জলের সাথে সামুদ্রিক মোটা বালি উঠানামা করে । ঢেউ-এর নৃত্য, নীল জল রাশি থেকে সাদা তরঙ্গরাশি যেন একজনের গায়ে একজন এসে আছড়ে পড়ছে । দর্শনার্থী ও পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা । এই তটভূমিতে স্বর্গদ্বারের সামনে বহু দোকানপাট । সামুদ্রিক ঝড়ে অনেক দেশ বিপর্যয়ে পড়ে - খবরের কাগজে ও রেডিও টিভিতে সকলেই জেনে থাকে । ওড়িশাও তার বাইরে নয় । তবুও এই সাগরই এই রাজ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে । প্রতিদিনই অগণিত পর্যটক তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণ পিয়াসীর আগমন । রেলগাড়িতে যাত্রীর ভিড় । পূজা পার্বণ এবং ছোটো বড়ো ফেরিওয়ালা, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা এই পুরী ধামের মাধ্যমে গোটা রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখছে ।

দর্শনে বেড়িয়ে বহু বছর পর আবার স্বামী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম শুনলাম । তাঁর ভজন কুটিরের সামনে স্বামী কুলদানন্দ স্ব-হস্তে লিখে রাখেন সব মূল্যবান উপদেশ । যেমন --- এ্যাইছা দিন নাহি র হেগা / আত্ম প্রশংসা করিও না / শাস্ত্রও মহাজনদের আচারে

যা মিলবে না তা বিষবৎ ত্যাগ করবে / অহিংসা পরম ধর্ম, সর্বজীবে দয়া কর / শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর / স্বামী কুলদানন্দ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য মন্দিরের গায়ে নানা মূর্তি / আছে রাধাকৃষ্ণ / স্বামীজির আবির্ভাব ১২৭৪ সাল ২৪ কার্তিক বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে / তিরোভাব ১৩৩৭ সালে / মন্দিরের প্রতিষ্ঠা / স্বামী কুলদানন্দ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য / শিবলিঙ্গ ও পঞ্চলিঙ্গ/ তারপর আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকায় ভজন কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে ছোটবেলা বাবার কণ্ঠে শোনা সেই লাইনগুলির সুর মনে পড়ল —

'আনিয়ে কুসুম দল, মাখিয়ে নয়ন জল—/ গুরুপদে কর সমর্পণ । / স্বামী বিজয়কৃষ্ণ বলেন, বহু জন্ম ভাগ্য ফলে / মিলেছে গুরুর শ্রীচরণ' ।

ওখান থেকে বেরিয়ে তাঁর সমাধি মন্দিরে গেলাম । তার গায়ে লেখা স্বামী বিজয় কৃষ্ণের আবির্ভাব ১২৪৮ সালের ১৯শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমায় । তিরোভাব ১৩০৬ সাল ২২ জৈষ্ঠ্য বৈশাখী কৃষ্ণ দ্বাদশীতে । এই মন্দির বর্ধমান নিবাসী নগেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নির্মিত মন্দিরের রং সাদা । মন্দির প্রতিষ্ঠা বাংলা ১৩১৮ সালে । আশ্রমের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ডালের শাখা মাটিতে ছুঁয়ে আছে বকুল গাছের । মনে হয় যেন দেবতাকে প্রণাম করছে। সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম জগন্নাথের মাসির বাড়ি । মাসির বাড়ির প্রবেশের দরজার বামদিকে সাক্ষী গোপালের মন্দির । জগন্নাথদেবের মাসির নামসত্যবতী। মাসির বাড়িতে রথে এসে ভাই বোন সাতদিন থাকেন । পাশেই সাবিত্রী সত্যবানের মূর্তি ।

জগন্নাথের মাসির বাড়ির সামনে বসে আছে একজন মহিলা বামন । বয়স ৩৭ বছর । বাবার নাম সর্বেশ্বর দাস । মায়ের নাম দৈবকী । পঁচিশ বছর পর্যন্ত এখানে একই জাগয়া সকাল হতে রাত্রি পর্যন্ত যাত্রীদের দান গ্রহণ করে । উচ্চতা দুই ফুট থেকে সামান্য বেশি । সেখান থেকে বেরিয়ে সোনার গৌরাঙ্গের মন্দিরের সামনে প্রণাম করে দাঁড়ালাম । মূর্তিটি সোনা দিয়ে তৈরি । ১৩৩৪ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত ।

এরপর অটো ঘুরিয়ে আমরা জগন্নাথ মন্দিরে যাই । সন্ধ্যা হয়ে গেছে । বিকেল বেলা পূজারীর ভিড়ও তেমন নেই । যদিও স্নান করে না খেয়ে সকাল বেলা গেলে ভাল লাগতো । কি করা যাবে । আগামীকাল বিগ্রহ বের করার জন্য মন্দির বন্ধ থাকবে । তাই ৫১ টাকার তালপাতার প্যাকেটে ভোগ কিনে নীলাদ্রি দিল । সে অনুসন্ধান অফিসে গিয়ে মদনমোহন পাণ্ডাকে ধরে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে । তার আগে আলোরানি আমাকে নিয়ে দারোয়ানকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে প্রবেশ করে । ও আমাকে বলে — মাসি প্রাণ ভরে দু'চোখের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে দর্শন কর । আমি লুটিয়ে প্রণাম করলাম । মন্দির থেকে ভোগ নিয়ে বেরিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে চারিদিক হেঁটে দেখছি — এখানে সেখানে কিছু ভক্ত, আবার

এক গায়গায় কয়েকজন বসে ঢোল করতাল নিয়ে কীর্তন করছে — যজ্ঞ বোস নামে জনৈক ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম — বারশো শতাব্দীতে জগন্নাথ মন্দির গঙ্গা রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কাঞ্চি জায়গার নাম। জগন্নাথ বলরাম নাকি কালো ঘোড়া ও সাদা ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, তখন গনেশ তাঁদেরকে বন্দি করে নিয়ে আসে। আর সমুদ্র সুভদ্রাকে ধরবার জন্য তাড়া করলে সে দুই ভাই-এর মাঝখানে আশ্রয় নেয়। জানি না এসব তথ্য কতখানি সত্য।

গর্ভমন্দিরের প্রবেশ মুখে ডান দিকে কান পাতা হনুমানের মূর্তি। কান পাতা হনুমান নাকি সমুদ্রের গর্জন আটকে দিয়েছে। তাই গর্ভমন্দির থেকে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায় না। এই সন্ধ্যায় মন্দির দর্শনে আমাদের সহায়তা করে সুকান্ত দাস। তাঁর কাছে শুনলাম, সুভদ্রার নাম নাকি ভদ্রকালী। জগন্নাথ মন্দিরের মহাভোগ যে হাঁড়ির উপর হাঁড়ি বসিয়ে করা হয় রান্না, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নীচের হাঁড়িতে জল থাকে, ভাপে সিদ্ধ হয়। গঙ্গা-যমুনা নামে দুইটি বিশেষ কুয়ো আছে যার জল মিঠে। ঐ জল দিয়ে রান্না হয় বলে মিঠে হয় প্রসাদ। তিনশো পরিবারের মধ্যে ছয়শো রাঁধুনি, চারশো সহযোগী রান্নার কাজে সাহায্য করে। দুই ঘন্টা আগে খবর দিলে মহাপ্রসাদ তৈরি করে দিতে পারে।

জগন্নাথ মন্দিরে শেষ প্রণাম করে ক্ষীরচুড়া গোপীনাথ মন্দির দর্শন করে সেই রাতের জন্য অগণিত ভক্তবৃন্দের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে বেঙ্গল লজে অটো করে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে চা টিফিন খেয়ে, স্নান সেরে, কোণারকের মন্দিরেব উদ্দেশ্যে স্ট্যাণ্ডে এসে শুনি আমাদের দেরি হয়ে গেছে। সমস্ত ট্যুরিস্ট বাস বেরিয়ে গেছে। এই ঢিলে যাত্রার প্রথম কারণ আমি যাঁদের সঙ্গী, তারা এর আগেও এসেছেন। হয়তো অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। তৃতীয়ত, চল বলতে কাঁধে বোচকা নিয়ে যারা ভ্রমণ পথে বেরোতে পারে না — তারা সময় মত দশজন যাত্রীর সাথে তাল রেখে চলতে পারে না। পরদিন যাবার প্রস্তাব এলে বলি সময় নষ্ট করতে পারব না। ওড়িশায় পুরীধাম দেখতে এসেছি, পূজা পার্বণের চেয়ে দেখা শোনাটাই আমার চরম লক্ষ্য। কারণ আগামী দিন স্নানযাত্রার ধর্মীয় উন্মাদনায় মেয়েটি যাবে না বলে বেঁকে বসে। ভাই নীলু, একটি ব্যবস্থা কর। কলকাতা থেকে তোদের আসা যত সহজ — ত্রিপুরার বিলোনিয়া থেকে আমার পক্ষে আবার আসা শুধু স্বপ্ন। অনুরোধে ও খবর নিতে শুরু করে। তখন দুই একজনের সাথে আলাপ করে আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে আসি। সিট পাওয়া গেল। মনে পড়ে একদা বিলোনীয়ার বিদ্যাপীঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় মনীন্দ্র চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, লক্ষ্য যদি স্থির হয়, তখন ভগবানও সাহায্য করেন।' সিটে বসে রাস্তার দুই পাশে তৃষিত চাতকের

মত চোখ রেখে যাচ্ছি। সেই মুহূর্তে বিবাহ বাসরে প্রথম পুরুষের স্পর্শের মত সবই মধুর হতে মধুরতর মনে হচ্ছে। সকলেই এটা সেটা খাচ্ছে। আমি মুখ বন্ধ করে আছি। কেননা আমার যে নাভি দোষ আছে। কথায় আছে না, 'চিত্ত সুখে গান গায় — নাভি সুখে নিদ্রা যায়'। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাস যেখানে এসে থামে — জায়গাটার নাম চন্দ্রভাগা নদী। পাশে সাগর। সময়-পনেরো মিনিট বলে, যাত্রীরা যার যেমন নেমে পড়েছে। খাচ্ছে-আর আমি জিজ্ঞাসা করে তথ্য সংগ্রহ ও স্থানটার মাহাত্ম্য ইতিহাস জানবার চেষ্টা করছি। চন্দ্রভাগা নদী সম্বন্ধে জনশ্রুতি হল নারদ, কৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে একটি কাজ করে দিতে বলেন, রাজি না হওয়াতে তাকে উচিত শিক্ষা, দেওয়ার জন্য নারদ বলেন, কৃষ্ণ তোমাকে চন্দ্রভাগা নদীতে যাওয়ার জন্য ডাকছেন। শাম্ব নারদের কথা মত এসে দেখেন কৃষ্ণের সখীরা নদীতে জল কেলি করছেন। তাকে দেখে সখীরা স্নান করতে বলল। এই সময় নারদ আবার কৃষ্ণকে চন্দ্রভাগা নদীতে পাঠায় সখীরা ডাকছে বলে। কৃষ্ণ এসে দেখে পুত্র সখীদের সঙ্গে জলকেলি করছে। তা দেখে পিতা কৃষ্ণ রেগে যান। তখন পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, 'ওরে দূরাচার, যাঁদের সঙ্গে জলকেলি করছিস, জানিস কি তাঁরা তোর মা। এই বলে কৃষ্ণ বলেন, শরীরের উপর তোর এতই গর্ব। আজ হতে তুই কুষ্ঠরোগী হয়ে যাবি। শাম্ব তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল, ''বাবা আমি নিরপরাধ, আপনি ডেকেছেন — এই বলে নারদ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। মায়েরা ডেকেছেন আমি তাঁদের আদেশ পালন করেছি। আপনি আমাকে অভিশাপ দিলেন কেন ? তখন কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করে সব জানতে পারেন। বুঝতে পারেন নারদের চালাকি। সুর নরম করে পুত্রকে বলেন, বৎস একবার তীর যখন ছাড়া হয় তখন সেটা চেষ্টা করলেও তূণে ফিরে আসে না। তদ্রূপ আমার কথাটাও ফিরিয়ে নিতে পারব না। তবে তোমার শাস্তি আমি কম করে দিতে পারি। তবে বার বছর তুমি এইরূপে থাকবে। বার বছর পর চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করে তুমি শাপমুক্ত হবে। তারপর শুকিয়ে যাওয়া নদীটি অভিশাপের বার বৎসর পর চন্দ্রভাগা নদীতে এই স্থানে জল আসে। এমনি চন্দ্রভাগা নদী সব সময় শুকনো বালির দ্বারা ভর্তি। সেই দিন ছিল শুক্লা চতুর্থ পক্ষের পূর্ণিমা তিথি। সেইদিন থেকে আজ অবধি মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থ পক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে নীচ থেকে জল আসে এবং ঐ দিনে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তেরা এসে স্নান করেন। এই উপলক্ষে বিরাট মেলা হয়। এই কাহিনী পুরীতে এর পূর্বে বাইশ বার এসেছে, আমাদের গাইড নীলাদ্রির কাছে শুনলাম, চা খেতে খেতে। চন্দ্রভাগা নদীর কাহিনী শোনার পর কিছুক্ষণ বালুর উপরে হেঁটে পরে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে ঢেউ-এর দৃশ্য দেখার পর আমরা চললাম 'কোণারক' মন্দির দেখার জন্য। 'কোণারক' মন্দিরের প্রবেশ মুখেই নাট্যশালা। কোণারকে আগে প্রবেশ মূল্য ছিল না। বর্তমানে জন প্রতি দশ টাকা লাগে। এই মন্দিরে

পাথর লাগাবার বৈশিষ্ট্য দারুন । এত ভারি ভারি পাথরে সিমেন্ট বালি কিছুই জোড়া লাগানো হয়নি । একটি পাথরের গায়ে লোহা ঢুকিয়ে এক সঙ্গে জোড়া দেওয়া হয়েছে । অথচ দূর থেকে বুঝা যায় না যে আলাদা আলাদা পাথর । এই মন্দিরের উচ্চতা ছিল ২১৮ ফুট । বর্তমানে কমে ৯০ ফুট । মন্দিরের অধিকাংশ মূর্তি ভেঙ্গে গেছে । বর্তমানে সরকারের তত্ত্বাবধানে কিছু কিছু পুনঃনির্মাণ চলছে। কথিত আছে — কোণারকের মন্দির বার একর জমির উপর বার বছর ধরে বারশো শিল্পী দিয়ে তৈরী করানো হয়েছিল । আশ্চর্যজনকভাবে আরও একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায় । বার বছরের কিশোর শিল্পী কর্মরত অবস্থায় উপর থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল । এই মন্দিরটি একটি রথের মত । প্রবেশ দ্বারে দুই দিকে চারটে চারটে ঘোড়া । যেন রথ নিয়ে দৌড়াচ্ছে । এই মন্দিরে চারদিকে রথের বারটি চাকা । একটি ঘোড়া ছাড়া বাকি সব ঘোড়া ভেঙ্গে গেছে । প্রতিটি চাকার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য । প্রথমে ঢুকে বাম দিকে যে চাকাটি আছে তার উপর সূর্য ঘড়ি । সকাল থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এই ঘড়িটি চলে । সেই সময়ের চাকার মাঝখানে প্রতি তিন ঘন্টার একটি বড় দাগ আছে । সেখান থেকে ফিরে ধবলগিরির পাশে নতুন লিঙ্গ মন্দির দেখতে গেলাম

একদা মহারাজ অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর এত লোকের মৃত দেহ দেখে অস্ত্র ত্যাগ করেন । তারপর রাজা অশোক চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হন । এই লিঙ্গ মন্দিরের চারদিকে চারটি বুদ্ধদেবের মূর্তি । একটি শান্ত, একটি ক্ষমা, একটি দয়া, আর অন্যটি ত্যাগের প্রতীক । আরেকটি মূর্তি শায়িত বিশ্রামের প্রতীক । ধবলগিরির পাশে একটি মৃতবৎ নদী । জানা যায় কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্ত গঙ্গা বয়ে গেছে এই নদীর জলে । সেখান থেকে বেরিয়ে ভুবনেশ্বর মন্দির এই মন্দিরের বিশেষত্ব একশো ছোট বড় শিব ও দুটি বিষ্ণু মন্দির । মন্দিরের বাইরে গা ঘেঁষে একটি বিশালাকার ষাঁড়ের মূর্তি । মনে হয় যেন জীবন্ত ।

ধবলগিরি থেকে বেরিয়ে উদয়গিরি এখানে ছোট বড় ১০৮টি গুহা । অতীতে সাধকেরা এইসব গুহায় বসে ধ্যান ও তপস্যা করতেন ।

উদয়গিরির সম্মুখে 'খণ্ডগিরি' । একহাজার আট সালে এখানে পাহাড়ের উপর দুটি জৈন সম্প্রদায়ের মন্দির নির্মিত হয়েছিল । একটির নাম দিগম্বর অন্যটির নাম সীতম্বর । মন্দিরটি পাশে পার্শ্বনাথ নামে আর একটি মন্দির । এই মন্দিরগুলির দিকে তাকিয়ে সাধুরা ধ্যান করতেন । মন্দির প্রবেশ করার আগে টাকার বিনিময়ে পায়ে জল দেওয়া হয় । সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে জলের স্পর্শ ভালই তো লাগে।

দিনের শেষ দর্শনীয় স্থান ছিল নন্দন কানন । এই অভয়ারণ্য ১৯৬০ সালে তৈরি ।

১৯১৯ সালে ওড়িশায় বিধ্বংসী ঝড় হয়ে যায় । নন্দন কাননের সব গাছ গাছড়া এই ঝড়ের দাপটে ভেঙ্গে পড়ে । তখন খাঁচাগুলি ভেঙ্গে যাওয়াতে তিনটি অজগর বেরিয়ে যায় ।

প্রচুর প্রাণীর মৃত্যু ঘটে । বর্তমানে কলো বাদুর, চিতাবাঘ, রয়েল বেঙ্গলটাইগার, হায়েনা, সাদা বড় বাঘ, গুহার ভেতর পেঁচা ও বনবিড়াল; হরিণ, বেজি, সজারু, গিনিপগ ও অনেক বাচ্চা, অজগর, বিভিন্ন প্রকারের সাপ. পাশে ছোট লেকে কুমির । এই চিড়িয়াখানার পাশে চার বগির ছোট ট্রেন চলার জন্য লাইন তৈরি হচ্ছে, যাতে চড়ে দর্শনার্থীরা নন্দন কাননের পুরো জায়গা দেখতে পারবে । এই কাননের প্রবেশমুখে লেখা আছে "Way to gate Botanical garden' এত বড় জায়গা নিয়ে সব. যে ভেতরের পথ ফুরোয় না । তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত যাত্রীদের নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে থামতে -- যার যেমন সুবিধা মত যাত্রীরা নেমে গেল । আমরাও অটো করে বেঙ্গল লজে ফিরে এলাম । রাতটা যে কখন চলে গেল বলতে পারব না । মাসিমার ডাকে ভোর ৬ টার পূর্বে ঘুম জড়ানো চোখে সূর্য উদয় দেখার জন্য সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াম । আকাশে মেঘ । ছোট ছোট বৃষ্টির ফোঁটা । তাই সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না । সমুদ্রের তীরে এই সকালে চা হেঁকে যাচ্ছে, কৃষ্ণ নামে একটি চা ওয়ালার থেকে ৩ টাকা দিয়ে চা খেয়ে নিলাম । কিছুক্ষণ পর আকাশের মেঘ কেটে গেছে, সূর্য মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু অনেক উপরে জলের ভেতর থেকে সূর্যোদয় আর দেখা হল না আজ । পরদিন আবার দেখার দৃঢ় সংকল্প করে ফিরে গেলাম লজে । ৪ ঠা জুন শুক্রবার ভোরে সূর্য উদয় দেখার জন্য সকলকে তাগিদ দিয়ে সাগর পারে চলে এলাম । কিন্তু আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলে জলের ভেতর হতে আস্তে আস্তে লাল আভা ছড়িয়ে সূর্য উদয় দেখার ভাগ্য হল না । বসে আছি বালির উপর চোখ দুটি সমুদ্রের দিকে । সাগরের নীল জলের ফেনিল তরঙ্গের নাচানাচি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য দার্শনিক করে তুলল । পৃথিবীর তিনভাগ জল. এক ভাগ স্থলের মানুষ আমরা । প্রতিদিন আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নের জাল বুনে চলছি । বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ দেখে আমাকে যেন কোন্ কল্প রাজ্যে নিয়ে গেছে । চা ওয়ালা এলে ১ কাপ খেলাম । মাসিমা ওপাশে এসে বসলেন । কলকাতার প্রচণ্ড গরম এখানে নেই । সমুদ্রের মৃদুমন্দ আবহাওয়ার মাঝে মহা মানবের মিলন ক্ষেত্র যেন এই পুরীধামের তটভূমি । এই ভোরেও কেহ বা দাঁড়িয়ে কেহ বা স্নানে রত। কেহবা উত্তাল ঢেউ-এর সাথে লাফাচ্ছে । এদের মধ্যে মাঝারি বয়সের লোকও আছে। এখানে কেহ নিন্দা সমালোচনা করে না, নির্দোষ আমোদ । তবে অশালীন কোন দৃশ্যও নেই। দুইটি যুবক-যুবতী মদ খেয়ে স্নান করতে নামলে পুলিশ তাদের তুলে দেয় । মাসিকে বসিয়ে রেখে রুচিরার সাথে আমি বালির উপর কিছুক্ষণ দৌঁড় দৌঁড় খেললাম । টাটা কোম্পানীর পাঁচ

ভদ্রলোক জামসেদপুর থেকে এসেছেন । পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের সবাই । ঢেউ-এর সাথে হাসাহাসি করতে করতে লাফ দিয়ে স্নান করছে প্রত্যেকেই । এদের মধ্যে একজনকে বালি দিয়ে সারা গা ঢেকে দিয়ে জুতা বুকে দিয়ে ফটো তুলতে দেখে আমি চিৎকার দিয়ে বললাম আই দাদারা করছেন কি ? তার চেয়ে টাকা সিকি আধুলি দিয়ে প্রণাম করুন, দেখবেন ধর্মীয় উন্মাদনায় ভক্তরা এই ফটো কিনবে । শুনে ওরা হাসতে হাসতে তাই করল । আমিও একটি মুদ্রা দিলাম । এঁদের মধ্যে একজন শিখ যুবকও আছেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতের বিচিত্র মানুষ, তার চেয়ে বিচিত্রতম হল মানুষের মন । এই মন যে কখন কি চায় আগে থেকে বলা মুস্কিল । সেই মনের আবেগে এইসব নানা কর্মযজ্ঞ চলছে চলবে আদিকাল হতে অনাদিকাল পর্যন্ত ইহা শাশ্বত চিরন্তন সত্য । ফটো তোলার পর অবশ্য ওরা সকলের টাকা ফিরিয়ে দেয় । এই পাঁচ ভদ্রলোক দুই ঘন্টা ধরে সমুদ্র স্নানের আনন্দ যা করছেন — তা পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশে করতে পারতেন না, 'পাছে লোকে কিছু বলে ।' তারপর আমার জন্য যে ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করে আছে তা আজ কাক ভোরে বেরুবার সময়েও ভাবতে পারিনি । সত্যি সত্যি সাগর জলে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি — তখন সবচেয়েপ্রথম যে মুখগুলির জন্য প্রাণে হাহাকার হল সে আমার নাড়ি ছেঁড়া ছেলে মেয়ে । শেষে কি এতদূর এসে এই সাগর জলে মরব ? তাই বাঁচবার জন্য বারবার হাত তুলেছি । না দাদা, আর মরতে চাই না —সক্ষম থেকে যতদিন বেঁচে থাকব— ততদিন এ পৃথিবীর সকল মানুষকে যেন এক পরিবারের লোকের মত ভালোবেসে বাঁচতে পারি — সে দিন এই প্রতিজ্ঞা করে সারা গায়ের সামুদ্রিক বালি ঝেড়ে ফেললাম । মানুষে মানুষে পার্থক্যের ভেদাভেদের দেওয়ালটা ভেঙ্গে ফেললাম মন থেকে ।

'বৌদির রেস্টুরেন্ট' সকলে গিয়ে ভাত খেয়ে এসে একটানা ঘুম দিলাম । অনেকক্ষণ ধরে সমুদ্রের জলে মরা-বাঁচার-লড়াই করায় ঘুমটা ভালই হল ।

বিকেল বেলা স্বর্গদ্বারের দোকানগুলি দেখতে যাব । রেণুকা গলির উপর বেঙ্গল লজ মিউনিসিপালটির অন্তর্গত । এই জায়গাটা — বিত্তশালীরা কিনে হোটেল করে । হোটেল থেকে বের হলেইসাগরের দৃশ্য । স্বর্গদ্বারের বাজার বার বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত । স্বর্গদ্বারের রাস্তার নাম নিউমেরিন ড্রাইভ রোড । 'ঘুম থেকে উঠে বিকাল বেলা বেরিয়েছি শ্মশান দেখার উদ্দেশ্যে সোনালি হোটেলের পাশ দিয়ে কড়াই আশ্রমের সামনে দিয়ে আমরা যাচ্ছি । জনশ্রুতি এখানকার রাজা এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতেন। স্বর্গদ্বারের দোকানগুলোও আলো ঝলমলে জিনিসপত্র সত্যিই অপূর্ব সুন্দর । তারই সাথে পড়ন্ত বিকেলের সমুদ্রের তরঙ্গ । প্রথমে স্বর্গদ্বারের মহাশ্মশানের শিবের যজ্ঞ কুণ্ড সামনে একটি

তোতা পাখি খাঁচার রড কামড়াচ্ছে। পাখিটাকে দেখে ইচ্ছে হল চুপিসারে যদি ছেড়ে দিতে পারতাম তাহলে মুক্তি। মুক্তি এর চেয়ে সুখের কী আছে? কত জেলখানা কয়েদিরাও হয়তো -- জানালার রড কামড়াচ্ছে মুক্তির জন্য। একসময় বললাম —চলুন সবাই কিছু খেয়েনি। মাসিমা সায় দিলেন। তারপর স্বর্গোদ্বার থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের তটের দোকানগুলো দেখছি। দেখলাম বাঙালি গৃহিনীরা শাঁখ কিনছে। মাসিমা অনেকগুলো কিনলেন। আমিও একটি বড় শাঁখ কিনলাম — পুরীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। ওরা সকলে কেনাকাটি করছে— কিন্তু শাঁখ কিনে আমি ক্ষান্ত দিলাম। কারণ আমাকে আবার ত্রিপুরা উড়ে যেতে হবে। এমন একটি পাণ্ডব বর্জিত দেশে আছি বের হতে গেলেই ভাড়াতে অনেক টাকা চলে যায়। তাই শুধু দোকানগুলি দেখছি। আর একবার আসব বলে সেদিন লজে ফিরে এলাম।

এবার কলকাতা ফেরার পালা। অটো করে স্টেশনে এলাম আমাদের গাইড কনফার্ম টিকেট পায়নি। তদুপবি পাঁচজনের দুটো সিট, তাও উপরে. মাথা নিচু করে ঘুমন্ত যাত্রীব পায়ের কাছে বসে আছি। উপরে উঠে লাভ নেই। ভয়ে ঘুম হবে না। জগন্নাথ এক্সপ্রেস দুই ঘন্টা। কিন্তু খোরদা রোড স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। একজন চেকারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন 'আর দশ মিনিট' পরে ছাড়বে। তখন ট্রেনের গা ঘেঁষে একজন লোককে বললাম, ও দাদা কখন ছাড়বে? বললেন, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। আমি দেখলাম একটি লোক অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে --- ঠিক মাসির মাথার কাছে জানালা ঘেঁষে। মাসিমার নকল সোনার হাতেব বালাটা চিকটিক করছে। তাকে ট্রেনের দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করতেই লোকটি সরে গেল। বুঝলাম তার লক্ষ্য ছিল ঐ বালাটাই। এইদিকে পাঁচজনের দুটো সিট। রাত দশটার পর সকলেই ঘুমাতে চায়, অতএব যা হওয়ার তাই হল — ঢুলতে ঢুলতে রাত কাটালাম। ভোর হলে ঘুমন্ত চোখ ধুয়ে জানালা দিয়ে দুই পাশের বিস্তীর্ণ মাঠ খোলা চোখে দেখতে থাকি। শহর রাজধানীর ঝলসানো আলোও বাড়ির ঘরের পর গ্রামের চেহারার কোন পরিবর্তন নেই। মাঠে কোথাও সুজলা সুফলা তেমন কিছু দেখা যায় না। ঘর বাড়ি নিম্নমানের। পর্ণকুটির বলা যায়। মাঠে কর্মরত চাষীদের দারিদ্র ক্লিষ্ট হতশ্রী চেহারা, কোথায়ও বলদ গরু নিয়ে চাষ করতে দেখা গেল। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীর পরও আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে? মুষ্টিমেয় ধনকুবরের অধীনে এখনো 'এই দেশ, এই সময়'। কবে সবলোক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পাবে? এই ভাবনায় কখন চলন্ত ট্রেনের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি। ইত্যবসারে ট্রেন মেচদা স্টেশন পার হয়ে গেল। কফি খেয়ে নিলাম দু'বার। মেদিনীপুরের উপর দিয়ে যেতে রূপনারায়ণের উপর যে কোলঘাট ব্রিজ তা পার হতে লাগে পাঁচ মিনিট সময়। দেখতে খুব সুন্দর জায়গা।

পিকনিক করতে নাকি অনেকে এখানে আসে । সামনের সিটে বসা গলায় মালা, কপালে তিলক চোখ কচলিয়ে এক বুড়ো জিজ্ঞাসা করেন, আমরা কোথায় এসেছি ?' বললাম— এই তো হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম । ইঞ্জিন নষ্ট হওয়াতে অনেক দেরিতে ট্রেন পৌঁছল । গেইট পার হতে আর এক বিপদ । রুচিরাতো উড়ে এসে আমাদের সাথে জুড়ে বসেছে । তার টিকিট পায়নি । মেয়ে চেকার আটকায় । নীলাদ্রি অনেক দৌঁড়ঝাপ করে ১৩০ টাকা গাছা দিয়ে উদ্ধার পায় । আমি ভয়ে কাঁপছি । শেষ পর্যন্ত ভিনরাজ্যে এসে বিপদে পড়ব নাকি ? টাকার দৌলতে শেষ রক্ষা । সত্যি তো —

''টাকা হল জগতের বাপ —
টাকা হলে খণ্ডে পাপ' ।

টাকার নৌকা পাহাড়ের উপর দিয়েও যায় । আলোরাণি তো বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে সোদপুরের দিকে যায় । আর মাসিমার কড়া হুকুম --- সোজা সার্ভেপার্ক যেতে । একটা ট্যাক্সি নিয়ে - রুচিরাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে — আমরা সার্ভেপার্কের দিকে চলছি । হাওড়া ব্রিজের নীচে এসে যানজটে ট্যাক্সি থেমে গেল । যতদূর দৃষ্টি যায় সারি সারি বিভিন্ন গাড়ি যাত্রীও মাল নিয়ে থেকে আছে । কী ব্যাপার ? জানতে চাইলে ড্রাইভার বলে ভি.আই.পি.-র গাড়ি পার হবে । মাসিমা বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন,—বসে থাক । ক্ষিদেতে পেটের নাড়িভুড়ি জ্বলছে । ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসছে । --- কী আর করা ? সিটে হেলাম দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম ।

ঃ লেখিকা পরিচিতি ঃ

লেখিকা তুষারকণা মজুমদার নিয়মিত গল্প - কবিতা - ভ্রমণ কাহিনী লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন । ইতিমধ্যে লেখিকার কবিতাগুচ্ছ এবং নির্বাচিত ছোট গল্প সংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে । তিনি ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষাবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সাহিত্য চর্চায় নিযুক্ত রয়েছেন । নোয়াখালীর করুণানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা ছিলেন শিক্ষাবিদ মণীন্দ্র কুমার সরকার । ১৯৭৭ সালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বি, এ পাশ করেন । বিলোনীয়ার বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসেবী ও শিক্ষক প্রয়াত অনন্ত কুমার মজুমদার তাঁর স্বামী ছিলেন ।

******

জনশিক্ষা আন্দোলনের ষাট বছর

যে আন্দোলন আমাদের প্রেরণা দেয়

— দেবব্রত দেবরায়

গত কয়েকবছর ধরেই রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মহলে একটা প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছে যে, ত্রিপুরার গণশিক্ষা সম্প্রসারণের ঐতিহাসিক যে অধ্যায় চল্লিশের দশকের 'জনশিক্ষা আন্দোলন', তা কেন এখনো রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার স্তর, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে আসলো না এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে কেন শিক্ষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক এই অধ্যায়টি পড়ানো হচ্ছে না । ঘুরে ফিরে প্রতিবছরই এই প্রশ্নটা আসছে । অথচ আমরা দেখি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিন বিশিষ্ট মিশনারী উইলিয়াম ক্যারী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড একটা গভীর দায়বদ্ধতা নিয়ে এদেশে এসেছিলেন এবং এদেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । শিক্ষার সম্প্রসারণে এই ইতিহাস যদি পাঠ্যক্রমে স্থান পেতে পারে তাহলে ঐতিহাসিক জনশিক্ষা আন্দোলন কেন পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে না ?

প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক । কেননা আমাদের রাজ্যের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রম যেমন বর্তমানে আমরাই প্রণয়ন করি তেমনি মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমও বর্তমানে আমরাই রচনা করছি । এমনকি স্নাতক স্তরে ত্রিপুরাতে যে নতুন পাঠ্যক্রম তৈরী করা হয়েছে তা করেছেন আমাদের রাজ্যের শিক্ষাবিদগণই । এটা খুবই আক্ষেপের যে, জনশিক্ষা আন্দোলনের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা একটা লাইনও পাঠ্যক্রমে স্থান পায়নি । ত্রিপুরা রাজ্যের কোন ছাত্রছাত্রীকে জনশিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না । কোন ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় জনশিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে একটা প্রশ্নও ছাত্রছাত্রীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় না । শুধু তাই নয়, একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাতেও জনশিক্ষা আন্দোলন বিষয়বস্তু হিসেবে থাকে না ।

অথচ এই শিক্ষা আন্দোলন এবার ষাট বছরে পা দিয়েছে । ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ছিল ১৩৫২ বঙ্গাব্দের পৌষমাসের ১১ তারিখ । ৫৯ বছর আগে এই দিনটিতেই আগরতলার কাছে দুর্গাচৌধুরী পাড়াতে জন্ম নিয়েছিল জনশিক্ষা সমিতি । ত্রিপুরার শিক্ষার ইতিহাসে এবং গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এই ১১ই পৌষ একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন । এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশে, রাজনৈতিক বিবর্তনে তাই জনশিক্ষা সমিতি এবং জনশিক্ষা

আন্দোলন একটি মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত। এই রাজ্যের সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ এই দিনটিকে, এই আন্দোলনকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন।

দুর্গাচৌধুরী পাড়ার কৃতী সন্তান ছিলেন হেমন্ত দেববর্মা যিনি জনশিক্ষা সমিতির প্রথম সম্পাদক এবং প্রয়াত জননেতা সুধন্বা দেববর্মা ছিলেন প্রথম সভাপতি। এই আন্দোলনকে দ্রুত সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা দশরথ দেব। এছাড়াও প্রয়াত জননেতা অঘোর দেববর্মা, নীলমণি দেববর্মা প্রমুখ উপজাতি যুবকেরা অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন। আজ থেকে ষাট বছর আগে যে কয়েকজন উপজাতি যুবক রাজ্যের মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে এখনো জীবিত আছেন, সুস্থ আছেন ডাঃ নীলমণি দেববর্মা। তিনি বলেছেন ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করে শিক্ষার আলো জ্বালানোর উদ্দেশ্যে জনশিক্ষা সমিতি শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। অনেক স্বপ্ন বুক ভরা আশা আর উৎসাহ নিয়ে এই আন্দোলনেব পথ চলা শুরু হয়েছিল। সময়ের প্রবাহে এই আন্দোলনের গুরুত্ব কমে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আজ এত বছর পরেও এই জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব এতটুকু কমে যায়নি। কারণ আমরা এখনো প্রত্যন্ত আদিবাসীদেব সকলকে শিক্ষিত সচেতন করে তুলতে পারিনি।

জনশিক্ষা আন্দোলনকে শুধুমাত্র শিক্ষার আন্দোলন ভাবলে ভুল হবে। জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ তাদের প্রচার পত্রে বলেছিলেন শিক্ষা শুধু বই পড়তে পারার জন্য নয়। বর্তমানে আমরা গোটা রাজ্যব্যাপী সাক্ষরতার যে লড়াই করছি সেখানেও এই একই কথা বলা হচ্ছে। শুধু পড়তে পারাই বা লিখতে পারাই সাক্ষরতা নয়। মানুষকে তার সমাজ সম্পর্কে সচেতন করাই হল মূল কথা। এই রাজ্যের গণ আন্দোলনের প্রবাদ প্রতীম ব্যক্তিত্ব প্রয়াত জননেতা দশরথ দেব জনশিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন যে, একদিকে অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং অন্যদিকে উন্নত জীবন মানের জন্য প্রস্তুত করা ছিল জনশিক্ষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মহাদেব চক্রবর্তী বলেছেন — উপজাতি জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় নেতা দশরথ, হেমন্ত, অঘোর নীলমণি, সূর্যকুমার প্রভাত, হিরণ দেববর্মাদের সাথে হাত মিলিয়ে সেদিন প্রয়াত নেতা বীরেন দত্ত মশাই ও জনশিক্ষা আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুক্তি পরিষদ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কিছু কু-অভ্যাস ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু করেছিল যেমন ডাইনী প্রথা, ছুতমার্গ, জামাই খাটা, পণপ্রথা, শ্রমিকদের 'কুলি' বলা, বধু নির্যাতন তিতুন প্রথা, বনকর, ঘাসুরী কর, সহ নানারকম অত্যাচারী বিধান বা প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রাম এর হাতে খড়ি হয়েছিল জনশিক্ষা আন্দোলনের

মাধ্যমে ।

এই জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জনশিক্ষা আন্দোলন ভারতবর্ষের গণশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় । জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের কর্তব্য তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যাঁরা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে মহান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্বত্য ত্রিপুরার মানুষের উন্নতিকল্পে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন । এই শিক্ষার আন্দোলন যে নিছক শিক্ষার আন্দোলন ছিল না এই ব্যাপারেও আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত । চল্লিশের দশকের জনশিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষার আন্দোলনের যথেষ্ট পার্থক্য আছে । এই আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা শিক্ষা সম্প্রসারণের পাশাপাশি মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে থাকা কুসংস্কার দূরীকরণ, তাদেরকে উন্নত রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার মহান দায়িত্বও তারা পালন করেছিলেন। আর এজন্যই জনশিক্ষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের কাছে অনেক বেশী ।

গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, জনশিক্ষা আন্দোলনই ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথম সংগঠিত শিক্ষার আন্দোলন । এজন্যই জনশিক্ষা সমিতি কি, কেনই বা এই সংগঠনের জন্ম হয়েছিল, জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, কেন এই আন্দোলন এতটা জনপ্রিয় হয়েছিল ইত্যাদি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা জরুরী । এই দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে সেই সময় ত্রিপুরাতে যে গুটিকয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এগুলি মূলতঃ রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে হলে সেই সময়কার ত্রিপুরার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থাকে মূল্যায়ন করতে হবে ।

সময়টা ছিল চল্লিশের দশক । ত্রিপুরার শেষ রাজা বীর বিক্রম ক্ষমতাসীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে । নাগরিকরা সবাই রাজার অনুগত প্রজা । অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা, প্রজাদের বিশেষ করে উপজাতি জনগণের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে । আধুনিক প্রযুক্তিগত বিকাশ না ঘটলেও বিশ্বের সবচাইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ মার্কসবাদ সম্পর্কে কিছু কিছু পুস্তিকা এবং সাহিত্য এসে পৌঁছাতে শুরু করেছে । সোভিয়েত রাশিয়ার দুনিয়া কাঁপানো প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর নতুন সমাজ ব্যবস্থার কিছু কিছু খবরও প্রজাদের কাছে চলে আসছে । কেননা ১৯৩০ সালে নিজের অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে নতুন সমাজ ব্যবস্থাকে দেখে এসে এই ব্যবস্থাকে তীর্থদর্শন বলেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। আমাদের রাজ্যে তখন হাতে গোনা অল্প কিছু স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি ছিল। যদিও রাজবাড়ীর সঙ্গে সারা যুক্ত ছিলেন, তাদের পড়াশুনার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল । যেহেতু সারা পৃথিবীর রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট প্রায় একই ছিল, ফলে ত্রিপুরার প্রজারা বিশেষ

করে উপজাতীয় জনগণ রাজতন্ত্রে চূড়ান্তভাবে শোষিত হয়েছেন।

আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই যখন দেখি যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কবি রবীন্দ্রনাথ এই রাজ্যের মানুষের কাছে বারেবারে ছুটে এলেও সেই সময়ের রাজন্যবর্গ তাঁকে প্রজাদের সংস্পর্শে আসতে দেয়নি । বাংলাভাষায় রাজকার্য চলছে দেখে তিনি গর্বিত হলেও এই রাজ্যে প্রজাদের অর্থাৎ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর যে একটা নিজস্ব ভাষা রয়েছে, সেই ককবরব সম্পর্কে তাঁকে কিছুই জানোনো হয়নি । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রজাদের যোগাযোগের বা আদান প্রদানের ভাষা ছিল ককবরক । আর রাজকার্য হতো বাংলাতে । এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও যে সমস্ত উপজাতি তরুণ সেদিন নিজস্ব উদ্যোগে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে সময়ের দাবীকে স্বীকৃতি দিয়ে সহজ সরল প্রজা সাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সুধন্বা দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, দশরথ দেব, নীলমণি দেববর্মা, ললিত মোহন দেববর্মা, অমরেন্দ্র দেববর্মা (বংশী ঠাকুর), প্রভাত রায় প্রমুখ এবং তাদের সহযোগী হিসেবে ছিলেন বীরেন দত্ত মহাশয় ।

এই সমিতির মধ্য দিয়েই প্রথম গ্রাম ত্রিপুরায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে। সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রায় পায়ে হেঁটে কমলপুর খোয়াই, উদয়পুর এবং সদর আগরতলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের কাজ সম্প্রসাবণ করেন । চল্লিশের দশকে গাড়ী ঘোড়ার প্রশ্নই ছিল না । পায়ে হেঁটেই তারা তাদের কাজ সম্পাদন করতেন। গবেষণায় এটা বলা হয়েছে যে সমিতির নেতৃত্বে প্রায় ৪৮৮টি নন্ ফর্মাল স্কুল সেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তবে এটা বলাই বাহুল্য যে স্কুলগুলি আজকের মত প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না । এই সমস্ত স্কুলে আদিবাসীরা সমবেত হতেন । প্রতিটি স্কুলেই সাধারণ লেখাপড়া জানা স্থানীয় যুবকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। গণশিক্ষার পাশাপাশি গণচেতনার কাজটি সম্পাদিত হত । কারোর বাড়ীর উঠোনে বা একটি ঘরে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কুসংস্কার দূরীকরণ ইত্যাদির পাশাপাশি রাজতন্ত্র শোষণ বঞ্চনার কাহিনী তুলে ধরা হত ।

জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে বীরেন দত্ত মশাই ছিলেন কমিউনিষ্ট এবং মার্কসবাদে দীক্ষিত । তিনি এটা বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আন্দোলনের নেতৃত্বও এটা বুঝলেন যে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ... শুধুমাত্র শিক্ষা আন্দোলন বা নিরক্ষরতা দূরীকরণে সাফল্য আসে না । ফলে ধীরে ধীরে এই শিক্ষা আন্দোলন একটা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় । রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাদের মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব জাগ্রত করাই ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম সাফল্য । রাজা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি নন, রাজার আদেশ অমান্য করা যে, ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা নয়,

এটা অন্ততঃ বোঝানো সম্ভব হয়েছিল ।

জনশিক্ষা আন্দোলনের তীব্রতা উৎকর্ষতা এতটাই ছিল যে, এই আন্দোলনের ঢেউ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে এবং তৎকালীন মহারাজা বীরবিক্রমের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাউন সাহেব তিনশো স্কুলকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । ফলে এই আন্দোলনের তৎকালীন সাফল্য যেমন ছিল ; তেমনি ছিলসুদূর প্রসারী সাফল্য । ফলে এই আন্দোলন গুরুত্বহীন নয়, তাৎপর্যহীন নয় । এই আন্দোলনকে আমাদের নৈর্ব্যক্তিকভাবে মূল্যায়ন করে তা ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে । ত্রিপুরার জনশিক্ষা বিস্তারের এই সামাজিক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হওয়া প্রয়োজন । অত্যন্ত দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রায় তিনশো স্কুল কিভাবে গড়ে উঠেছিল, কিভাবে বেসরকারীভাবে শিক্ষার উপকরণগুলি যোগাড় করা হতো কী কী বিষয় আলোচিত হতো, এই সমস্ত তথ্য আজকের প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের জানা উচিত । এই ইতিহাস রচনার দায়িত্ব ইতিহাস বিদদেরই নিতে হবে । হয়তো জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ ইতিহাসের নিয়মেই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরবর্তীকালে মিশে গেছিল, কিন্তু তা সত্বেও নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে কিভাবে বীর বিক্রম তার শ্রেণী চরিত্র অনুযায়ী জনশিক্ষা সমিতিকে কোনঠাসা করার জন্য তাঁর সমর্থক উপজাতি সর্দারদের নিয়ে ত্রিপুর সংঘ গঠন করেছিলেন । একই সঙ্গে শিক্ষার আন্দোলন এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কিভাবে এই রাজ্যে পরিচালিত হয়েছিল, এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ইত্যাদি সবকিছুই নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে ।

জনশিক্ষা আন্দোলন সম্পর্ক তৎকালীন রাজা বীরবিক্রমের দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল, কেন জনশিক্ষা সমিতির নেতা সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা এবং বংশী ঠাকুরকে বীরবিক্রম গ্রেপ্তার করেছিলেন । তা যেমন জানা প্রয়োজন, তেমনি এই আন্দোলনের ফলে গড়ে ওঠা যে সমস্ত স্কুল আজও সসম্মানের সঙ্গে চলছে সেগুলিকেও বিশেষভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। ত্রিপুরার রাজাদের কাহিনী যদি প্রাথমিকস্তরে পাঠ্য বইতে স্থান পেতে পারে তাহলে কেন জনশিক্ষা সমিতির শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে না ? গবেষণা হওয়া উচিত গামছা কোবরা, লেফুঙ্গা, খোয়াই এর উগানবাড়ী, আঠাইবাড়ী, সদর উত্তরের রাজমাটি, সমতলের কাতলামারা, সদরের দক্ষিণ জম্পুইজলা, দুর্গাচৌধুরী পাড়া, কুমারীবিল, ফাল্গুনী চৌধুরী পাড়া, নক্ষত্র বাড়ী, আখড়া বাড়ী, তুইহাচিং বাড়ী, পাগলাবাড়ী, ওয়ারেন্ট বাড়ী, হাজারী বাড়ী, নলুংবাড়ী, তিনঘড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কিভাবে জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্বে কয়েকশত বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।

যদি এই ইতিহাস আমরা রচনা না করতে পারি, তাহলে ত্রিপুরার শিক্ষার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে । শুধু তাই নয়, ঐ একই সময়ে চল্লিশের দশকে ১৯৪৮ সালে কেন

গোলাঘাটিতে তৎকালীন পুলিশ বাহিনী কৃষকদের উপর বর্বরোচিতভাবে গুলি চালিয়ে ত্রিপুরায় প্রথম কৃষক হত্যা সংগঠিত করেছিল সেই ইতিহাস যেমন রচিত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি এর পরের বছর ১৯৪৯ সালে কেন খোয়াই এর পদ্মবিলে পুলিশ শান্তিপ্রিয় নারীদের উপর গুলি চালিয়ে কুমারী মধুতী রূপশ্রীকে হত্যা করেছিল । সেই ইতিহাস রচনা করা প্রয়োজন । ত্রিপুরার প্রথম নারী শহীদদের সম্পর্কে একটি কথাও প্রাথমিক স্তরের এবং মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা জানে না । এটা আমাদের অজ্ঞতা, এটা আমাদের সংকীর্ণতা । সংগ্রামের এই উজ্জ্বলকাহিনীগুলিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে নিয়ে আসা জরুরী। তেমনি জরুরী জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির মধ্যে যেগুলি এখন বন্ধ হয়ে আছে সেগুলি আবার নতুনভাবে খোলা যায় কিনা তা ভেবে দেয়া এবং উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

ভয়ঙ্কর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যারা অন্ধকারের বিরুদ্ধে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছিলেন সেই জনশিক্ষা সমিতির প্রথম সম্পাদক এবং সভাপতি প্রয়াত হেমন্ত দেববর্মা এবং সুধন্বা দেববর্মার নামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামাঙ্কিত করা যায় কিনা তাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে । শিক্ষা যে একটা মিশন একটা সংগ্রাম এবং দায়বদ্ধতা তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখি জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্যে । কেননা স্থানীয় অভিভাবকরা শিক্ষকদের থাকার জায়গা যেমন দিতেন তেমনি তাঁদেরকে চাল ডাল ইত্যাদি দিয়েও সাহায্য করতেন । জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রচারপত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যগ্রন্থের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার কয়েকটি লাইন ছাপা হত । লাইনগুলি ছিল —"এইসব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা, এইসব ক্লান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা .... ইত্যাদি । যেহেতু আমরা আজও আমাদের রাজ্যের সব অংশের মানুষকে শিক্ষিত এমনিক স্বাক্ষর জ্ঞান করে তুলতে পারিনি, তাই এই প্রচার পত্রে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার লাইনগুলিতো আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ।

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজও আমাদের রাজ্যের একটা অংশের শিক্ষিত মানুষ এবং তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন যারা এই ঐতিহাসিক জনশিক্ষা আন্দোলনকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেন না । তারা তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে এই আন্দোলনকে দেখেন বলেই হয়তো আজও আমরা আমাদের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে জনশিক্ষা আন্দোলনের এই অধ্যায়টিকে তুলে ধরতে পারিনি । জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্ব প্রয়াত জননেতা দশরথ দেব সুধন্বা দেববর্মা অঘোর দেববর্মা প্রমুখরা উন্নত বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্কসবাদে পরবর্তীকালে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে বা তাঁরা কমিউনিষ্ট ছিলেন বলেই যদি এই আন্দোলন সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পোষন করা হয় তাহলে এর থেকে পরিতাপের

বিষয় আর কি হতে পারে । তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, সময় পরিবর্তনশীল, সমাজ পরিবর্তনশীল । তাই ইতিহাসের নিয়মেই এই ঐতিহাসিক জনশিক্ষা আন্দোলন ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর বিষয়বস্তু হবে । ইতিহাসের আলোচনায় স্থান পাবে । গণশিক্ষা বিস্তারের এই গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীকে চাপা দিয়ে রাখা যাবে না । যেমনভাবে ককবরক ভাষাকে চাপা দিয়ে রাখা যায় নি, যেমনভাবে উপজাতি সংস্কৃতিকে চাপা দিয়ে রাখা যায়নি তেমনিভাবে জনশিক্ষা আন্দোলনকেও চাপা দিয়ে রাখা যাবে না । কেননা ইতিহাসের চালিকা শক্তি মানুষের সংগ্রামের পরিপোরক । ভারতের গণশিক্ষা বিস্তারের যে ইতিহাস তাতে ত্রিপুরায় জনশিক্ষা আন্দোলন একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় । শ্রদ্ধা এবং সসম্মানের সঙ্গে এই ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করা জরুরী ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

লেখক এবং এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক দেবব্রত দেবরায় রাজ্যের বামপন্থী গণ আন্দোলনের একজন অগ্রনী কর্মী হলেও তিনি মূলতঃ একজন শিক্ষা গবেষক। গত দুই দশক ধরে শিক্ষা সমস্যার উপর তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন পত্র পত্রিকা এবং সাময়িকীতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রী দেবরায়ের এখন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো —'জাতীয় শিক্ষানীতি কোন পথে', 'শিক্ষায় সংকট', 'জনশিক্ষা সমস্যা ও দৃষ্টিভঙ্গী', 'গান্ধীজীর শিক্ষাচিন্তা', 'ভারতীয় সংবিধানে দলিতদের অধিকার', 'নারীর ক্ষমতায়ন', ইত্যাদি । শ্রী দেবরায়ের জন্ম ১৯৬১ সালে।

******

ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের পটভূমি

— দীনেশচন্দ্র সাহা

পৃথিবীর সব দেশেই ইতিহাসের এক সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গণ-আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। জনগণের অধিকারবোধ এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংগ্রাম থেকেই গণআন্দোলনের জন্ম হয়। বহু রক্তপাত, অত্যাচার, নির্যাতন ও জীবন দানের মধ্য দিয়েই গণআন্দোলনের অধিকার অর্জন করতে হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই গণআন্দোলনের অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লিখিত বা অলিখিত সংবিধান পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশেই প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুনির্দিষ্ট মৌলিক অধিকার হিসেবে গণআন্দোলনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যে দেশে নাগরিকদের এই অধিকার নেই সে দেশকে গণতান্ত্রিক দেশ বলে স্বীকার করা হয় না। সে দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য কোন না কোন ধরণের সংগ্রাম করতে হয়। স্বৈরাচারী শাসনের প্রচণ্ড দমননীতির মোকাবিলা করতে হয়। সেখানে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ খোলা থাকে না।

ত্রিপুরার গণআন্দোলনের পটভূমি বুঝতে হলে প্রথমেই ভারতের গণ আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে হবে। সেই সঙ্গে সারা বিশ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকেও খানিকটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

ইউরোপীয় গণতন্ত্রই ভারতের গণআন্দোলনের এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রেরণা যুগিয়েছে। আজকের ইউরোপ দুইশ বছর আগেও এমনটি ছিলনা। ১৮১৫ সালেও ইতালী এবং জার্মানী অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। একই ভাষাভাষি রাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে এক একটি শক্তিশালী জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য বহুযুদ্ধ, বহু রক্তপাত হয়েছে। নেপোলিয়ন ইউরোপে নিজের অজ্ঞাতসারেই জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

ফরাসী বিপ্লব থেকে এসেছিল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারণা। বহু রক্তপাতের পর ১৮৬১ সালে অখণ্ড ইতালী রাষ্ট্র গঠিত হল, রোম হল রাজধানী। জার্মানীর বীর যুবকরা অস্ত্র ও রক্তের হোলি খেলায় বারবার পরাজিত হল। ১৯১৮

খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের আগে ইউরোপে ছিল ধর্মের শাসন । রাজা এবং পুরোহিত ছিল জনগণের ভাগ্যবিধাতা । জনগণও বিশ্বাস করতো রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি । এই পরিবেশেই জন্ম নিয়েছিল অসংখ্য ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার ।

বিজ্ঞান এবং যন্ত্রশিল্প ভেঙ্গে দিয়েছে পুরানো সব সংস্কার । রাজা এবং পুরোহিত উভয় শক্তির উচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে আধুনিক পুঁজিবাদ । রাজাকে হটিয়ে প্রজাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহৎ আদর্শকে তুলে ধরেছে বুর্জোয়া দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ্ এবং দার্শনিকেরা । এই সংগ্রামে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে কৃষক-শ্রমিক ও মধ্যবিত্তরা ।

ইংলেণ্ডের গণতন্ত্রে একজন রাজ প্রতিনিধিকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্ষমতার শীর্ষ আসনে, যদিও তিনি পার্লামেন্টের নির্দেশকে মেনে চলতে বাধ্য । রাজতন্ত্রের উপর এই মোহের প্রধান কারণ হল ইংলেণ্ডেই প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটেছে । ইংলেণ্ডই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে বহুদেশকে পদানত করেছে । তাই দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র এবং উপনিবেশের সাম্রাজ্যে রাজার নামে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য গণতন্ত্রের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করেছে । অবশ্য অভিজাত ইংরেজদের মধ্যে রাজতন্ত্রের একটা মোহ সর্বদাই ছিল । তাদের কাছে রাজা হলেন আভিজাত্যের প্রতীক

ফরাসীরাও শিল্পবিপ্লব ঘটিয়ে বিশ্ববাজার দখলের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে প্রায় একই সময়ে । ভারতে এবং কানাডায় ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের বার বার যুদ্ধ হয়েছে । ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান সহযোগী ছিল রাজা এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট । কিন্তু ফরাসী পার্লামেন্টের মাথায় রাজা ছিল না । কাজেই বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় ফরাসী বণিকরা ফ্রান্স সরকারের সাহায্য পায়নি । তাই ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে ফরাসীরা হেরে গেছে । বৃটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডার ছিল বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ।

রুশবিপ্লবের আগে ইংলেণ্ড বা ইউরোপের কোন দেশেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি । শ্রমিক, কৃষক এবং নারীর ভোটাধিকার ছিলনা । রুশবিপ্লবের ধাক্কায় ইউরোপের সবদেশেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে । সব নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পেতে থাকে । অবশ্য গণআন্দোলন ছাড়া কোন দাবীই আদায় হয়নি ।

শিক্ষাবিস্তার, বিজ্ঞানের নব নব-আবিষ্কার এবং যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবে উৎপাদন

ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে গেছে । সমাজের সকল মানুষের স্বার্থেই রাজার শাসন এবং পুরোহিতের কর্তৃত্বকে উচ্ছেদ করার জন্য বণিক-শিল্পপতি, কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইউরোপের প্রতিটি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তাক্ত সংগ্রাম করেছে এবং সমাজ কাঠামোর বদল ঘটিয়েছে । এইসব ঘটনায় জনগণের আন্দোলনকে বিদ্রোহ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং নিষ্ঠুর দমননীতি চালানো হয়েছে । সেজন্যই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে সশস্ত্র লড়াই করতে হয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো গড়ে উঠার পর প্রতিটি দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র হিসেবে নতুন, নতুন শহর, নগর গড়ে উঠেছে । নগর জীবনে দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চর্চা । রাজার শাসনে কোন দেশেই জনগণের জন্য শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ ছিল না । জনগণের সংস্কৃতিও ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত । রাজন্য শাসনের স্বার্থে ইউরোপের সব দেশেই দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে গীর্জা। গীর্জাগুলোকে সর্বাধিক আকর্ষনীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুরোহিতের হাতে ছিল সামাজিক শাসনের অনেক ক্ষমতা । রাজা বা পুরোহিতের কোন কাজের সমালোচনা কবলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো। ধর্মীয় আচরণে ত্রুটি ধরা পড়লে খুঁটিতে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হতো ।

ভারতে ধর্মীয় আচরণে এতটা নিষ্ঠুরতা ছিলনা । মুসলিম আগমনের আগে ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশী । যার যেমন খুশী ধর্মমত পোষণ করতে বাধা ছিল না। প্রকাশ্যে তর্কবিতর্ক করার সুযোগও ছিল । মুসলিম আগমনের পর ব্যাপক ধর্মান্তর শুরু হওয়ায় হিন্দু ধর্মের প্রাচীন দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য — ১) পরধর্ম সহিষ্ণুতা এবং ২) বিবেকের স্বাধীনতা সামাজিক জীবন থেকে প্রায় মুছে গেছে । ধর্মের মুখোশ পরে নানা কুসংস্কার, রীতিনীতি ও মতবাদ হিন্দু সমাজের ঘাড়ে চেপে বসেছে ।

প্রাচীন ভারতের সমাজে একধরণের গ্রামীণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । রাজার শাসন সেখানে হস্তক্ষেপ করত না । সেই ব্যবস্থা এক সময়ে হারিয়ে গেল । সমাজের সর্বস্তরে জনগণের স্বাধীনতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ।

প্রাচীনকালে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠার প্রথম যুগে সব দেশের দার্শনিকেরাই রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কল্যাণ হয় এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ দেন । গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর চিন্তাধারা পরবর্তীকালে সারা ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল।

ভারতে-'কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্র'-প্রাচীন রাজাদের রাষ্ট্র পরিচালনার এক অভিনব শাস্ত্র বলে গণ্য হয় । গ্রীক সেনাপতিরা এরকম উন্নত রাষ্ট্র কাঠামো দেখে অবাক হয়েছিলেন।

কৌটিল্যের অপর নাম চানক্য, আসল নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত ।

কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে রাজা ও মন্ত্রীর কর্তব্য, গ্রাম ও নগরের শাসন ব্যবস্থা, আইন-আদালত, সামাজিক রীতিনীতি, নারীর অধিকার, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তির প্রতিপালন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ব্যবস্থা, বয়নশিল্প, যুদ্ধ ও শান্তি, সেনাবাহিনীর গঠন ও গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অতি মূল্যবান নীতি ও নির্দেশ রয়েছে ।

রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রজারা সমবেত হয়ে রাজার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করতো । রাজা শপথ গ্রহণ করতেন —"প্রজাদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখবেন —" এই শপথ বাক্য পাঠ করে । মূল আদর্শ ছিল "প্রজার সুখে রাজার সুখ, প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ । সে যুগে রাজা অর্থে প্রজার সেবক বোঝাত ।

সে যুগে নগরবাসীদের কেউ রাস্তায় আবর্জনা ফেললে জরিমানা আদায় করা হত । এই নীতি বর্তমান যুগেও প্রয়োজ্য নগরে পৌরসভা এবং গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল ।

পরবর্তী সময়ে ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং বারবার বিদেশী আক্রমণের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ এবং নগর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায় । প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে সব গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বীজাকারে দেখা দিয়েছিল তা সুদীর্ঘকালের মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল ।

বৃটিশ বণিকরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে একশ বছর । এই সময়টাকে বলা হয় কোম্পানীর শাসন । পরবর্তী নব্বই বছর শাসন করেছে বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বৃটেনের রাজা বা রাণী । বৃটিশ বণিকরা চেয়েছিল ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার । কিন্তু ভারতীয় বিশ্বাসঘাতকেরা তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল শাসনের অধিকার । বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার এবং রক্ষার মূল শক্তি ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী । যাদের মধ্যে স্বাধীনতার কোন চেতনাই ছিল না ।

সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ পার্লামেন্ট বুঝতে পেরেছিল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ভারতবাসী আর বেশীদিন বরদাস্ত করবেনা । তাই কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীনে ভারতশাসনের সিদ্ধান্ত নিল বৃটিশ পার্লামেন্ট ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবাসীর জন্যে বহু প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন । ভারতীয় প্রজাগণ এক বুক আশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রইল প্রতিশ্রুতি পূরণের মাধ্যমে কিভাবে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন হয়, তা দেখার জন্যে ।

বলা যায় ভারতীয় জনমনে এই সময় থেকেই আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার সূত্রপাত হয়েছে: যদিও তা ছিল ইংরেজী শিক্ষিত অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু গণআন্দোলনের অধিকার তখনও স্বীকৃত হয়নি। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা যেখানেই সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করেছে সেখানেই কৃষক বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে প্রচণ্ড দমননীতি চালিয়ে কৃষকদের প্রতিবাদ এবং দাবী দাওয়াকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব দমননীতি চালানো হয়েছে জমিদার এবং দেশীয় রাজাদের পূর্ণ সহযোগিতায়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা না ঘটলে ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যই ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হতো। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ দমনে বৃটিশ সরকারকে দেশীয় রাজা মহারাজারা যেভাবে সাহায্য করেছে তা দেখে বৃটিশ পার্লামেন্ট অভিভূত হয়ে যায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করলেন —যতদিন দেশীয় রাজারা বৃটিশ সরকারের অনুগত থাকবে ততদিন তাঁদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার সব দায়িত্ব বৃটিশ সরকার বহন করবে।

ভারতে বিশাল জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়েছিল বৃটিশ স্বার্থরক্ষা করার প্রয়োজনেই। জমিদার এবং দেশীয় রাজা-মহারাজারা স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিল যে, বৃটিশ সরকারের অস্তিত্বের উপরই তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। কাজেই তারা আন্তরিকতার সঙ্গেই বৃটিশ স্বার্থরক্ষায় সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। বিনিময়ে প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করেছে।

বৃটিশ শাসকরা নিজেদের দেশে গণতন্ত্র ভোগ করলেও ভারত সাম্রাজ্যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে মজবুত করে তুলল সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা।

সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল — কৃষক ও গ্রামীণ কারিগর শ্রেণীর উপর নির্মম শোষণ, বল প্রয়োগ করে বিনা পারিশ্রমিকে খাটানো এবং নানা রকমের কর ও ভেট আদায় করা। ভারতে জমিদার শ্রেণী এবং দেশীয় রাজা মহারাজা ও নবাবেরা বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অধিকার ভোগ করেছে। ফলে গণতন্ত্রের ভেকধারী বৃটিশ সরকারের শাসনে অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে বিদ্রোহ বলে ঘোষণা দিয়ে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে।

ভারতের বহু রাজ্যে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যেও বেশ কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। ইউরোপের প্রতিটি দেশে কৃষক বিদ্রোহ ভয়ানক রক্তাক্ত রূপ নিয়েছিল। আমেরিকায় সামন্ত শাসন ছিলনা। ইংরেজ এবং ফরাসী বণিকরা উপনিবেশ স্থাপন করে কৃষি কাজের জন্য কৃষক বা কৃষি মজুর খুঁজে পায়নি। স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ান

উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা কৃষিকাজ করতে রাজী হয়নি । ফলে রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়েছে । বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা রেড ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়েছে রেড ইণ্ডিয়ান জনগোষ্ঠীগুলোকে । কৃষি কাজের জন্য আমেরিকানরা এশিয়া ও অফ্রিকার বহু দেশ থেকে জোর করে ধরে এনে ক্রীতদাস হিসেবে কৃষি কাজে নিয়োগ করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে । প্রকাশ্যে পশুর মত খাঁচায় বেঁধে ক্রীত দাসদের কেনা বেচার জন্য বহু বাজার ছিল আমেরিকায় ।

১৭৭৫ সালে আমেরিকার তেরটি বৃটিশ উপনিবেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে রক্তাক্ত যুদ্ধের পর স্বাধীন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হয় । স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে, বলা হয়েছিল — ''সব মানুষই সমান হয়ে জন্মায় ।'' অর্থাৎ স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার । কিন্তু চল্লিশ লক্ষ ক্রীতদাসকে তারা মানুষ বলেই গণ্য করল না ।

১৮৬৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘোষণা করলেন । আমেরিকান খামাব মালিকরা বিদ্রোহ করল । দুই বছর গৃহ যুদ্ধ চলল । আব্রাহাম লিংকন আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন । গৃহ যুদ্ধের অবসান হল । ক্রীতদাসরা মুক্তি পেল। কিন্তু আইনত নাগরিক অধিকার পেলেও আমেরিকার সাদা-কালো মানুষের বৈষম্য শেষ হল না । আজও তার অবশেষ রয়ে গেছে ।

আমেরিকাব গৃহযুদ্ধে অসংখ্য যুবক মারা গেছে । এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য ইউরোপের নানা দেশ থেকে বহু যুবক আমেরিকায় আসার সুযোগ পেল । আমেরিকার বিপুল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম । ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা প্রসারের জন্য নানা দেশ থেকে আগত দক্ষ শ্রমিক ও কর্মীদের স্বাগত জানানো হলো ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে নানা দেশের নানা ভাষার অজস্র মানুষের স্রোত আমেরিকায় এসে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পাওয়ায়, নতুন এক মিশ্র জাতির-আবির্ভাব ঘটল আমেরিকায় । অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিল্পবিপ্লব ঘটিয়ে বৃটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল আমেরিকা । শিল্পপণ্য বিক্রীর বাজার দখলের জন্য নতুন কোন দেশ দখলের যুদ্ধে গেল না আমেরিকা। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে লাগল অন্যান্য দেশকে । এভাবে নুতন এক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল আমেরিকা । বর্তমানে সারা বিশ্বে অবাধ বাণিজ্য এবং উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে আমেরিকা। কারণ যন্ত্রশিল্পে আমেরিকা আজ এতই উন্নত যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় তাদের পক্ষে বাজার দখল করা খুবই সহজ।

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করতে হয়নি । ভারতেও এই অধিকার অর্জনের জন্য অহিংস এবং সহিংস দুই ধরণের লড়াই হয়েছে প্রায় একশ বছর ধরে । বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির প্রথম যুদ্ধ শুরু করেছিল বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ ভারতীয় সিপাহীরা । দেশীয় রাজা মহারাজাদের সাহায্য না পেলে তখনই এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হতো ইংরেজ শাসকদের ।

তখন ভারতীয় জনগণের মধ্যেও স্বাধীনতার কোন চেতনাই ছিলনা । বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী দখল করে প্রাক্তন সম্রাট বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়েছিল । ইংরেজ শাসনের পরিবর্তে মুসলমান শাসন ফিরিয়ে আনার আগ্রহ অধিকাংশ ভারতীয়দের মধ্যে ছিলনা । তবুও এই বিদ্রোহের ফলে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হল । ভারতবর্ষ বৃটিশ পার্লামেন্টের সরাসরি শাসনে গেল । এতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের সূচনা হল ।

প্রতিটি প্রজা বিদ্রোহ এবং কৃষক বিদ্রোহের মধ্যেই কিছু না কিছু রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ লুকিয়ে থাকে । উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও নেতৃত্ব পেলে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের বীজ থেকেই গণআন্দোলন বিকশিত হয়ে উঠে ।

ত্রিপুরায় প্রজা বিদ্রোহগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে ছিল গণআন্দোলনের বীজ । জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই বীজ থেকেই বিকশিত হয়েছিল গণআন্দোলনের সবুজ চারাগাছ, কিন্তু সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে সে চারাগাছটি বেড়ে উঠতে পারলনা স্বাভাবিক গতিতে । গণআন্দোলন প্রায় বিদ্রোহের ধারায় প্রবাহিত হল নতুন পরিবেশে ।

ভারতভুক্তির পর ত্রিপুরায় যে গণ-আন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রধান ভিত্তি তৈরী হয়েছিল জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্যেই । অবশ্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেই প্রথম গণ-আন্দোলনের পথ খুলে দেয়া হয় । শহরের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে জেগে উঠে জাতীয়তাবাদী আবেগ ।

ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথে প্রধান বাধা ছিল নিরক্ষরতা, জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অস্পৃশ্যতা, ও চরম দারিদ্র্য ইত্যাদি ।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে এসব বাধা একে একে অতিক্রম করার প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিচ্ছেদ থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাওয়া গেলনা । ভারতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বার বার ভয়াবহ রূপ নিয়েছে । শুধুমাত্র বৃটিশের ভেদনীতিকে এর

জন্য দায়ী করে দায়িত্ব এড়ান যায়না ।

মুসলমান আগমনের পর থেকেই ভারতীয় হিন্দুরা ক্রমশঃ সংকীর্ণতার নীতি নিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছে । চরম গোঁড়ামীর পথে ধর্মীয় রীতিনীতিকে কঠোর করে তুলেছে ।

একইভাবে মুসলমানদের মধ্যেও শরিয়তি শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মৌলবাদ প্রচণ্ড গোঁড়ামীর জন্ম দিয়েছে ।

সম্রাট আকবর দুই ধর্মমতের মিলন ঘটাতে গিয়ে মোল্লা-মৌলবী ও পারিষদদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ।

আধুনিক যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা জাতীয়তাবাদী নেতারা করেন নি ।

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং অভিজাত মুসলমান । তাদের নিজেদের মধ্যেই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল । রবীন্দ্রনাথ লোকহিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে তীব্র কষাঘাত করেছেন ।

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করার ভারতীয় আদর্শ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সফল হয় নি । নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আন্দোলনের নীতির মধ্যে পার্থক্য থাকার ফলেই এই ব্যর্থতা । বৃটিশ সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে ।

জাতিভেদ প্রথা মুসলমান সমাজেও প্রচলিত হয়েছিল । ভারতের নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা সামাজিক সাম্য ও মর্যাদা লাভের আশায় দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মুসলিম অভিজাতরা তাদেরকে নিম্নবর্ণের মুসলমান বলেই গণ্য করেছেন । খৃষ্টান ধর্ম যারা গ্রহণ করেছিল, তাদের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটেছিল । দক্ষিণ ভারতে নিম্নবর্ণের খৃষ্টানদের জন্য আলাদা গীর্জা তৈরী হয়েছিল।

আসল সমস্যা হল অর্থনৈতিক বৈষম্য । সেক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী নেতারা খুব বেশী নজর দেননি । একই গ্রামের কৃষক-জমিদার ও মহাজনকে একই সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা সফল হতে পারে না ।

সারা ভারতে অখণ্ড মুসলিম সমাজ বলে কিছু ছিল না । প্রতিটি প্রদেশে পৃথক পৃথক ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত এক সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে ।

সেটাই ছিল ঐক্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু ।

কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুজাতীয়তাবাদী নেতাদের বিবেচনায় ভারতীয় সংস্কৃতি মানে হিন্দুসংস্কৃতি । মুসলিম অভিজাতরা এই দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নিতে পারেনি । ক্রমে ক্রমে তা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রূপ নিয়েছে । গান্ধীজিও জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি উপেক্ষা করেছেন ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দলিত শ্রেণীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । উচ্চ বর্ণের হিন্দু নেতারা দলিত শ্রেণীকে কি পরিমাণ অবজ্ঞা করতো ডাঃ আম্বেদ করের জীবন থেকে তা সহজেই বুঝতে পারা যায় । আম্বেদকরের বাবা ছিলেন মহারাষ্ট্রের অস্পৃশ্য মাহার শ্রেণীর লোক । বহু চেষ্টা করে একটি গ্রামের পাঠশালায় আম্বেদকরকে ভর্তি করাতে সক্ষম হন । কিন্তু আম্বেদকরের জন্য নির্দিষ্ট হয় পৃথক একটি আসন । কোন শিক্ষক আম্বেদকরের খাতা বই স্পর্শ করতো না । ফলে পড়াশুনার মূল্যায়ন হতো না ।

এই সময় আর্য সমাজ হিন্দু সমাজের সংস্কারের কাজে এগিয়ে এসেছিলো । একজন আর্য সমাজপন্থী আম্বেদকরকে বোম্বাইয়ের একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন । মেট্রিক পাশ করার পর কোন কলেজে স্থান পাওয়া যাচ্ছিলনা । বরোদার মহারাজা একটি কলেজে আম্বেদকরকে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন । বি . এ পাশ করার পর মহারাজার একটি অফিসে চাকরী পাওয়া গেল । পৃথক চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার সময় পিয়নরা অফিসের ফাইল ছুঁড়ে দিত, যাতে স্পর্শ না লাগে । অফিসে পানীয় জল স্পর্শ করতে দিতনা । অপমানে আম্বেদকর চাকরী ছেড়ে দেন । মহারাজার চেষ্টায় একটি বৃত্তি পেয়ে আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষায় যান । লণ্ডন থেকে অর্থনীতিতে এম. এ এবং আমেরিকা থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে আসেন । মহারাজার সেনাবাহিনীতে সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত হন ।

মহারাজা আশা করেছিলেন উচ্চ শিক্ষিত ও পরিচ্ছন্ন আম্বেদকরকে সেনাবাহিনী অস্পৃশ্য করে রাখবেনা । কিন্তু মহারাজার নির্দেশও কার্যকর হলনা । উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের চটাতে রাজা মহারাজারাও সাহস পেতেন না । কারণ প্রশাসন তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল । শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ আম্বেদকর অস্পৃশ্য মানুষের সামাজিক মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে সদলবলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন ।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে দলিত শ্রেণী অংশ নিলনা । বামপন্থীরা ও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দলিত সমস্যার দিকে নজর দিতে পারল না । ফলে সব রাজনৈতিক

দলের উপর দলিতরা বিশ্বাস হারিয়েছে। জগজীবনরামকে সামনে রেখে কংগ্রেস দল দীর্ঘ ত্রিশ বছর দলিতদের মোহগ্রস্ত করে রাখার চেষ্টা করেছে। মিছিলে ও সভায় সংখ্যা বাড়ানো এবং নির্বাচনে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া দলিত শ্রেণীকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রকৃত কোন কাজ করেনি কংগ্রেস সরকারগুলো।

তাই সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ভারতের দলিত শ্রেণীকে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত অধিকার আদায়ের জন্য গণ-আন্দোলন সংগঠিত করছে দলিত শ্রেণীর মানুষেরা।

ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ও পার্লামেন্টে ভারতের সংগঠিত দলিতরা বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগ্য নির্ধারক হয়ে উঠেছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতারা আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন, যে দলিতদের আর উপেক্ষা করা চলে না।

তবে আদর্শহীন, সুবিধাবাদী ও ক্ষমতালোভী নেতৃত্ব দলিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আদর্শবাদী নেতৃত্ব এবং বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচীর একান্ত প্রয়োজন। কর্মসূচীর ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে সুশৃংখল ও শক্তিশালী গণআন্দোলন। এক্ষেত্রে বামপন্থীদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। অথচ বামপন্থীরাই এ বিষয়ে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে।

রাজন্য যুগের ইতিহাসে আমরা ত্রিপুরাতেও দেখতে পাই শহরের অভিজাত শ্রেণী পাহাড়ের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষকে খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখত। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকার হয়েছিল সারা রাজ্যের প্রজারাই, তবে ত্রিপুরার প্রজারা অস্পৃশ্য বলে গণ্য হয়নি। রাজ পরিবারেও স্থান পেয়েছে পাহাড়িয়া উপজাতি কন্যারা। অনেকে রাণী বা মহারাণীর সম্মানও পেয়েছে।

কিন্তু সামন্ততন্ত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেমন বেগারখাটা, জোর করে যেকোন কাজে বাধ্য করা ও ভেট আদায় করা, পুরোহিতের নির্দেশ মানতে বাধ্য করা, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি ত্রিপুরাতেও অব্যাহতভাবেই প্রচলিত ছিল।

উপজাতি সমস্যার দুটো দিক রয়েছে (১) জীবিকার সমস্যা (২) স্বাধীনতার সমস্যা। রাজন্য যুগে অনাড়ম্বর জীবনে জীবিকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেনি। জমির উপর কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু কৃষি উৎপাদনের পথে বাধা ছিলনা। তাছাড়া বনজ সম্পদ সংগ্রহের স্বাধীনতা ছিল। প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জাতিসত্ত্বা বিকাশের ফলে নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবী তীব্রভাবেই দেখা দিয়েছে। এটা শুধু

ত্রিপুরার সমস্যা নয়, ভারতের যে সব রাজ্যে উপজাতিরা রয়েছে সে সব রাজ্যেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে ।

ভারতের উপজাতিরা এক জাতি গোষ্ঠীর নয় । উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেমন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর প্রাধান্য, তেমনি অন্যান্য অঞ্চলে নার্ডিক ও অষ্ট্রালয়েড জাতিগোষ্ঠির উপজাতিরা রয়েছে । ধর্মের দিক থেকেও হিন্দু-বৌদ্ধ ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা রয়েছে । দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য থাকলেও রাজনৈতিক সমস্যার কোন পার্থক্য নেই ।

জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হবার আকাংঙ্খা খুবই স্বাভাবিক। শিক্ষিত উপজাতি বুদ্ধিজীবীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করেছেন যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতার অংশীদার হতে না পারলে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় ।

প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেও উপজাতিদের জরুরী সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি । অর্থের অভাবে এমনটা হয়েছে তা নয়, প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং সদিচ্ছার অভাবেই এরূপ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে । এরূপ পরিস্থিতিতে হতাশা এবং বিক্ষোভ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ।

কিন্তু উপজাতিরাই উপজাতি সমস্যার সমাধান করতে পারবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই । রাজ্যের সমস্ত জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলো যাচাই করে সমস্যার কারণগুলো অনুসন্ধান করে সকলের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এমন কমসূচীর ভিত্তিতে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে । গণআন্দোলন থেকেই জন্ম নেয় জনগণের সরকার । শুধুমাত্র আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ক্ষমতার অংশীদার হওয়া যায় না ।

আফ্রিকা এক সময় অন্ধকার মহাদেশ বলে পরিচিত হয়েছিল । পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অসহায় নিপীড়িত মানুষগুলোকে নতুন পথ দেখালেন মহাত্মা গান্ধী । গণ আন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি করে জাগিয়ে দিলেন ঘুমন্ত শক্তিকে। সেই আন্দোলনের পথেই নেলসন মেণ্ডেলার মতো নির্ভিক দেশপ্রেমিক নেতাদের আবির্ভাব ঘটলো আফ্রিকা মহাদেশে, যারা অন্ধকার আফ্রিকার চেহারাটাই পাল্টে দিচ্ছেন গণআন্দোলন এবং সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে।

ত্রিপুরায় উপজাতি নেতারা বামপন্থীদের উপর আস্থা রাখতে পারছে না । কারণ শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। তাই দেখা যায়

একই শ্রেণীর মানুষ বামপন্থীদের মিছিলেও আসছে, আবার উপজাতিদের নেতাদের ডাকা মিছিলেও আসছে।

গণআন্দোলনের দুই স্রোতধারাকে একই মিছিলে যুক্ত করার পথ অনুসন্ধান করা এখন জরুরী হয়ে উঠেছে। উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানবিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নেতৃত্বই সে পথ দেখাতে পারে। ত্রিপুরায় এখনো সেরকম নেতার আবির্ভাব ঘটেনি।

ত্রিপুরা রাজ্যে জমিদার নেই, শিল্পপতি নেই, বৃহৎকোন বাণিজিক প্রতিষ্ঠান নেই, শোষিত মানুষের যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে ? এখানে দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যা সমাধানের দাবীতে ব্যাপক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ যৌথ গণআন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে হবে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে শতশত বছরের পিছিয়ে পড়া রাজ্যটিকে সবদিক দিয়ে উন্নত ও আধুনিক করে তুলতে। রাজ্যের সম্পদ এবং জনশক্তিকে কাজে লাগিয়েই রাজ্যের উন্নতি সম্ভব। এই সত্যটিক জননেতা নৃপেন চক্রবর্ত্তী সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয় কর্মসূচী তৈরী করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

লেখক শ্রী দীনেশ চন্দ্র সাহা আগরতলার প্রগতি বিদ্যা ভবনের প্রাক্তন শিক্ষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সসহ এম. এ. বি. এড., ছাত্র-জীবন থেকেই শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা শুরু করেছেন। ১৯৫০ সালে উদ্বাস্তু হিসেবে ত্রিপুরায় এসে ছাত্র-যুব উদ্বাস্তু ও জুমিয়া আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় রাজবন্দী হিসেবে কারাবাস করেন। ১৯৮৫ সালে সৌভিয়েত ইউনিয়নে ছয়মাস অবস্থান ও ভ্রমন করেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য গ্রন্থ প্রকাশ শুরু করেন। বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরা ১ম ও ২য় খণ্ড, ত্রিপুরায় গণ আন্দোলনের বিচিত্র ধারা, কিশোর গল্প গুচ্ছ ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠকদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

******

চার্বাক দর্শন ও ভোগবাদ

— ডঃ ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য

যে ভারত আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী আদর্শের আকর বলে বিবেচিত সে ভারতে জড়বাদী ও ভোগবাদী দর্শনেরও অভাব ছিল না । চার্বাক দর্শন ভারতের একমাত্র এক পূর্ণাঙ্গ ও ভোগবাদী দর্শন যাকে সংশয়বাদী ও নাস্তিক দর্শন বলে আখ্যা দেয়া হয় । এ এক সুপ্রাচীন দর্শন । ভারতের অন্যান্য প্রাচীন দর্শন সম্প্রদায়গুলির সমকালীন । কাজেই ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্বের উৎপত্তির সময় থেকেই আজও এ মতবাদটি বিশ্বেব জনসমাজে বিভিন্ন চেহারায় মাথা উঁচু করে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে ।

চার্বাক শব্দটির সাধারণ অর্থ হ'ল জড়বাদী (materialist) । তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে, ঐ 'জড়' শব্দটির প্রচলন ছিল না । সর্বদর্শন সংগ্রহ, বেদান্তসার প্রভৃতির তুলনায় পরবর্তী কালের বিভিন্নরচনায় 'জড়' শব্দটির বেশ প্রচলন ছিল । এখানে উল্লেখ কবা যেতে পারে যে ভারতের দার্শনিক সাহিত্যে (matter) ম্যাটার এর প্রতিশব্দ 'জড়' নয়, 'ভূত' ।

এ আপসহীন বস্তুবাদ বা জড়বাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ প্রচলিত চার্বাক নামে পরিচিত হলেও লোকায়ত (লোকেষু আয়ত অর্থাৎ সাধারণ লোকের গ্রহণীয়), বার্হস্পত্য (কোন কোন মতে দেবগুরু বৃহস্পতি এ মতবাদের প্রবর্তক বলে বিবেচিত) প্রভৃতি আরও বিভিন্ন নামে আখ্যায়ত হয়ে আসছে ।

চার্বাক শব্দটির সাধারণ অর্থ জড়বাদী হলেও এ শব্দটির মূল অর্থটি রহস্যাবৃত । কারও মতে চার্বাক মূলতঃ এক ঋষির নাম, কেউ বলেন চার্বাক হ'ল মূলতঃ একটি সাধারণ বর্ণনামূলক নাম যা একজন জড়বাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আবার কেউ বা বলেন এ মতবাদটি সুচারু ও মনোরম কথা বলে বলে এ'র নাম চার্বাক (চারু + বাক) । কোনমতে চর্ব (খাও, দাও পান কর ও হৃষ্ট থাক) এ কথা থেকে চার্বাক । কেউ বলেন শব্দ চার্বাক না হয়ে ব্যাকরণগতভাবে হওয়া উচিত ছিল চারুবাক্ (চারু বাক্) বা চার্বক (চব্ থেকে উৎপত্তি ধরলে) । আবার কোন কোন মতে দেবগুরু বৃহস্পতি চার্বাক দর্শনের প্রণেতা যিনি অসুরদের মধ্যে এ' নাস্তিক জড়বাদী দর্শন প্রচার করেন যাতে এ'মনোরম ও চিত্তাকর্ষক মতবাদ

অনুসরণ করে অবশেষে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । জড়বাদীকে লোকায়তিকও বলা হয় । তবে জনৈক হেমচন্দ্র বাহর্স্পত্যি বা নাস্তিক এবং চার্বাক বা লোকায়িতকদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন যদি ও পার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু বলতে পারেন নি । জড়বাদীদের নাস্তিক ও পাষণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন মনু এবং চার্বাক মতবাদের যিনিই প্রবর্তক হন না কেন চার্বাক হ'ল জড়বাদীর সমার্থক ।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ চার্বাক নাম্নীয় এক ব্যক্তিকেই চার্বাক দর্শনের প্রবর্তক হিসেবে মেনে নিয়েছেন তাঁর এক উক্তি থেকে জানা যায় । উক্তিটি হল —"The materialists are called Lokayatikas. They are also called carvakas after the name of the founder". চার্বাক দর্শনের কোন প্রামাণ্যগ্রন্থ পাওয়া যায়নি । Tucci ও Garbe কিছু লোকায়ত গ্রন্থের প্রমাণ উল্লেখ করেছেন যা আজ হারিয়ে গেছে । Tucci একটা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে জনৈক পুরন্দরকে চার্বাকমতে গ্রন্থকর্তা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । Suklaji ও Purikh নামে দুই গ্রন্থকার জনৈক জয়রাশি কর্তৃক রচিত এক লোকায়ত গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন যার নাম তত্ত্বোপপ্লবসিংহ (যে সিংহ সমস্ত তত্ত্বকে অস্বীকার করে) । অবশ্য অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন কারণে এ গ্রন্থকে জড়বাদের প্রামাণ্য পুস্তক হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন । কারণ এতে বর্ণিত তত্ত্বোপপ্লববাদ, জ্ঞানতত্ত্ব, তত্ত্বদিশা, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বকে স্বীকার করেনি । এছাড়া জয়রাশি এ'বইতে নির্দেশিত মতবাদটিকে জড়বাদী মতবাদ বলে আখ্যা দেননি এবং কোন বইতে কোন জড়বাদী গ্রন্থের ও উল্লেখ করেন নি । বিভিন্ন শাস্ত্র, গ্রন্থ ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের সমালোচনা থেকে এ মতবাদের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় ।

ঋগ্বেদের স্তোত্রে এ মতবাদের মূল কথার উল্লেখ আছে । ব্রহ্মসূত্রে এ'র উল্লেখ আছে, একটি সূত্রে এ'মতবাদের উপস্থাপন ও অন্যটিতে এ মতবাদের খণ্ডণ করা হয়েছে। মহাভারতে চার্বাকগণ নাস্তিক ও রাক্ষসরূপে মনুসংহিতায় পাষণ্ড ও নাস্তিকরূপে, বিষ্ণুপুরাণে অসুর, জাগতিক ভোগবিলাসী ও বেদের প্রতি বীতশ্রদ্ধরূপে বর্ণিত হয়েছে । বৌদ্ধধর্মের পিটকে এ'র উল্লেখ আছে । প্রাচীন বৌদ্ধ উৎস থেকে অজিতেশ কুম্বলি নামে (গৌতমের সমসাময়িক) জনৈক জড়বাদীর নাম জানা যায় এবং বৌদ্ধ ও জৈন উৎস থেকে এটাও জানা যায় পায়াসী নামে এক রাজপুত্র ছিলেন যিনি জড়বাদী । কিছু কিছু উপনিষদে ও এ'মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় । মৈত্রী উপষিদে বৃহস্পতি এক নাস্তিক শিক্ষক হিসেবে বর্ণিত । মাধবাচার্য্যের সর্বদর্শন সংগ্রহের প্রথম অধ্যায়ে চার্বাক দর্শনের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় যা অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্য তথ্য থেকে বেশী কিছু নয় । শংকরের রচনায় এ মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় । তবে চার্বাক মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রধান

উৎস হচ্ছে অন্যান্য দর্শন শাখার পূর্বপক্ষ । এ'টা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এ মতবাদের মূল্যায়ন নির্ভর করে বিভিন্ন বিরোধীদের উক্তির উপর । ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, "our chief sources are the polemical works of other schools". মোট কথায় এ দর্শন বেঁচে আছে প্রত্যাখ্যাত ও উপহসিত হবার জন্যে । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চার্বাক ও লোকায়ত শব্দগুলি ব্যবহৃত হতো অপমানজনক অর্থে ভারতবর্ষে, যেমনভাবে Sophist শব্দটি ব্যবহৃত হতো গ্রীসে ।

অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এ মতবাদকে খণ্ডণ করেছে এবং ভারতের সারা দার্শনিক সাহিত্য জুড়ে এ দর্শনের বিরুদ্ধে, ব্যঙ্গাত্মক ও অশ্রাব্যভাষা প্রয়োগ, গালাগাল ও অবজ্ঞার কোন অন্ত নেই । চার্বাকদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে তাদের ঘাড়ে এমন অনেক কথা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যা চার্বাকরা বলেনি । দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনিক অনেক পণ্ডিতেরাও নিদারুণভাবে এ দর্শনের বিরুদ্ধে এ ধরণের ব্যঙ্গাত্মক ভাষার সাহায্য নেন । অবশ্য চার্বাকরা ও মার্জিত ভাষা প্রয়োগের তোয়াক্কা করতো না । বেদ ও বেদের রচয়িতাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও অপমানজনক ভাষা প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করতো না । যেমন, বেদের ভাষা দুর্বোধ্য, পরস্পর বিরুদ্ধ এবং বেদ জর্ব্বরী ও তুর্ব্বরী জাতীয় অনেক অর্থহীন শব্দে ভরপুর । তাছাড়া অশ্বমেধ যজ্ঞের কোন কোন মন্ত্র এত অশ্লীল যে তা রুচি সম্পন্ন কোন ভদ্রলোকের পাঠেরও অযোগ্য । চার্বাক সমর্থকরা একথা বলতেও কসুর করেনি যে বেদের রচয়িতারা ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর।

'ত্রয়োর্বেদস্য কর্তারো', ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ । জর্ব্বরী তুর্ব্বরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্ ।।

ব্যঙ্গ , গালাগাল, উপহাসপ্রভৃতির তলায় এ দর্শনের মূল অর্থটি চাপা পড়ে গেছে এবং অর্দ্ধবিকৃত, ও অর্দ্ধসত্য হয়ে সবার সামনে হাজির হয়েছে । অথচ দর্শনটি মোটেই অবজ্ঞার বিষয় নয় । দর্শনের আলোচনার সমস্ত তত্ত্ব, যথা জ্ঞান তত্ত্ব, তত্ত্ববিদ্যা, নীতিতত্ত্ব ইত্যাদি এ'দর্শনে স্বাধীনযুক্তির উপর ভিত্তি করে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে এবং কয়েকটি প্রখ্যাত দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে এর মৌলিক মিল আছে । যেমন দৃষ্টিবাদ (Positivism), যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ (Logical Positivism) Mill Bentham এর সুখবাদ (Altruistic Hedonism of Mill and Bentham), হিউমের দর্শন (Philosophy of Hume) প্রভৃতি। ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুরু হয়েছিল তার তত্ত্বগত ভিত্তি বলতেও অনেকাংশে এ' আপসহীন বস্তুবাদই ।

কোন দার্শনিক মতবাদই হাওয়ায় গজায় না । চার্বাক দর্শনও তাই । তাই যুগ যুগ

ধরে বিভিন্নভাবে সাধারণলোকের কাছে বেঁচে আছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এ' মতবাদের মূল সুর আজও বিদ্যমান। কারণ চার্বাক সাধারণ লোকের দর্শন। এ' দর্শনটি সহজাত ও স্বাভাবিক শক্তির অধিকারী বলে সহজে খণ্ডন করাও দুঃসাধ্য।

চার্বাক মতবাদের নীতিতত্ত্ব সুখবাদ বা ভোগবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে জড়বাদী চার্বাক দর্শনই একমাত্র বিশুদ্ধ ভোগবাদী দর্শন। এ ভোগবাদের সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে এ মতবাদের জ্ঞানতত্ত্ব ও তত্ত্ববিদ্যার সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা আবশ্যক। কারণ চার্বাক তত্ত্ববিদ্যা তার জ্ঞানতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নীতিতত্ত্ব তার জ্ঞানবিদ্যার যৌক্তিক পরিণতি ও তত্ত্ববিদ্যার ফলশ্রুতি।

চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই একমাত্র জ্ঞানের উৎস। ভারতীয় দর্শন সমূহে এটাই একমাত্র দর্শন যা একমাত্র ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা প্রত্যক্ষযোগ্য তাই বাস্তব। যা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, তাই অবাস্তব, অলীক ও অর্থহীন। অনুমান প্রমাণ বিভ্রান্তিকর (চার্বাকমতে শব্দ ও অন্যান্য প্রমাণ অনুমানের সামিল) এবং সুনিশ্চিত ও সত্যজ্ঞান দিতে অক্ষম। অনুমান কখনও কখনও আকস্মিকভাবে সুনিশ্চিত ও সত্যজ্ঞান দিতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত জ্ঞান প্রদান করে। অবশ্য ভারতীয় দর্শনে যে সমস্ত সম্প্রদায়গুলি অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করে, বিশেষ করে যারা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান এ'দুটিকে একমাত্র প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে তারা এ মতবাদের তীব্র সমালোচনা করে। মাধবাচার্য্য চার্বাকদের অনুমান বিরুদ্ধ মতবাদকে যুক্তিসহকারে খণ্ডন করেছেন।

শব্দ বা আপ্তবাক্যকে ও চার্বাকগণ স্বীকার করেনি। এমনকি বৈদিক বাক্যগুলিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেনি। তাদের মতে শব্দ বা আপ্তবাক্য কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মিথ্যা হয়। শব্দ বা আপ্তবাক্য বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল আর বিশ্বাসযোগ্যতা অনুমানের উপর নির্ভরশীল বলে শব্দ বা আপ্তবাক্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে চার্বাকগণ একটি ক্ষেত্রে শব্দকে গ্রহণ করতে সম্মত তা হলো কোন প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করা। কারণ এরূপ শব্দের শ্রবণ চার্বাকদের কাছে প্রত্যক্ষরই সামিল এবং এতে অনুমানের কোন প্রয়োজন হয় না। শব্দ বা আপ্তবাক্য দ্বারা সমর্থিত সমস্ত অতীন্দ্রিয় বিষয় যা প্রত্যক্ষগোচর নয় যথা —ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা ও স্বর্গ ইত্যাদি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিরোধী শাখার সমর্থকদের ধারণা অনুমানকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ অনুমান অস্বীকার করলে সমস্ত চিন্তা, আলোচনা, জ্ঞানের অগ্রসরতা সবই বন্ধ হয়ে যাবে।

অনুমান প্রমাণ নয় চার্বাকদের এ মত অর্থহীন । বিরোধী শিবিরের দার্শনিকরা মনে করে যে চার্বাকরা অনুমানকে স্বীকার করে অথচ অনুমানের বিরোধিতা করে । কারণ চার্বাকদের 'প্রত্যক্ষ বৈধ, অনুমান অবৈধ', এ উক্তিটিও অনুমানেরই ফল । চার্বাকদের এ ধরণের অনেক উক্তি আছে যা অনুমান ছাড়া সম্ভব নয় ।

অবশ্য চার্বাকদের যারা সুশিক্ষিত চার্বাক বলে পরিচিত তারা অনুমানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছে । তারা অনুমানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে এবং দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনুমানকে ব্যাখ্যা করে । এক দৃষ্টিকোন থেকে বলা হয়েছে অনুমান শুধু বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে । ব্যবহারিক প্রয়োজনে তারা 'পর্বতে আগুন আছে কারণ পর্বতে ধূম আছে' এ ধরণের অনুমান লব্ধ সম্ভাব্য জ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে । তারা একথাও স্বীকার করেছে যে প্রত্যক্ষলব্ধজ্ঞান স্বল্প এবং এ'স্বল্পজ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করে । তবে অনুমানলব্ধজ্ঞান সম্ভাব্য নিশ্চিত নয় ।

আর এক দৃষ্টিকোন থেকে অনুমানকে তারা বর্জন করে, কারণ অনুমানকে অপার্থিব বা অতীন্দ্রিয় সত্তা যথা ঈশ্বর, আত্মা এবং স্বর্গ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না ।

হিরীয়ানার (Hiriyana) মতে ন্যায়দর্শনের একটি গ্রন্থে অনুমান সম্পর্কে এ ধরণের মতের একটি উল্লেখ আছে যা সুপণ্ডিত এস. এন. দাশগুপ্ত ও সমর্থন করেছেন । Tucci উল্লেখ করেছেন পুরন্দর ও এ ধরণের দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমানকে দেখেছেন । অনুমানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে চার্বাক দর্শনের এ' মতবাদ চার্বাক দর্শনের সম্পূর্ণ চেহারাই পাল্টে দিয়েছে ।

'সুশিক্ষিত' চার্বাক কথাটি নিয়ে এখানে একটু আলোচনার অপেক্ষা রাখে । ভারতীয় জড়বাদী দর্শনের অভিনব ব্যাখাকার দার্শনিক ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন জনৈক জয়ন্ত ভট্ট চার্বাকদের দুভাগে ভাগ করতে গিয়ে দু'ধরণের শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন — প্রথমে 'সুশিক্ষিতরা' (Sophisticated) এবং পরবর্তীকালে অন্য এক জায়গায় একটি ব্যঙ্গাত্মক ও নিন্দাসূচক শব্দ 'ধূর্ত' (Cunning) । সুশিক্ষিত শব্দটি তিনি ভাট্ট ও প্রাভাকর মীমাংসার উপর প্রয়োগ করেছিলেন । ডঃ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন যে আধুনিক পণ্ডিতগণই চার্বাক সম্প্রদায়কে 'ধূর্ত' ও 'সুশিক্ষিত' বলে শ্রেণীকরণ করেছেন যা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অন্যকোথাও উল্লেখিত হয়নি । এ জ্ঞানতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় চার্বাকদের তত্ত্ববিদ্যা । তত্ত্ববিদ্যার মূল কথা জ্ঞানের বিষয় কি ? ইহলোক সর্বস্ব প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকদের কাছে ঋত, অদৃষ্ট, সনাতন নৈতিক নিয়ম, আধ্যাত্মিক সত্তা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা, পরজন্ম,

জন্মান্তরবাদ, পরলোক, স্বর্গনরক, কর্মফল, শ্রাদ্ধ , তর্পন, যাগযজ্ঞ, পাপপুণ্য,— যা ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য আস্তিক ও নাস্তিক সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে স্বীকার করে, তা প্রত্যক্ষগোচর নয় বলে এদের কোন অস্তিত্ব নেই । চার্বাকদের কাছে এগুলি অর্থহীন । এসব মানুষের কল্পনার সৃষ্টি । ধূর্ত, ভণ্ড, নিশাচর, ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বেদের রচয়িতা । বৈদিক যাগযজ্ঞ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার প্রভৃতি অজ্ঞ জনসাধারণকে ঠকিয়ে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করে । সুন্দর সুন্দর যুক্তি দিয়ে চার্বাকরা এসব অস্বীকার করে । এ মতবাদের কাছে বাস্তবই বড়, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, 'Practice is the eriterion of truth'. একমাত্র প্রত্যক্ষগোচর জগতেরই অস্তিত্ব আছে।

চার্বাকমতে এ জগতের সমস্ত বস্তু চারটি উপাদানে গঠিত, ক্ষিতি, অব, তেজ ও মরুৎ । এ চারটি মহাভূতের সংমিশ্রনে জগৎ ও জীবসহ জগতের অন্যান্য দ্রব্যের সৃষ্টি ।

অন্যান্য দর্শন স্বীকৃত পঞ্চ উপাদানের পঞ্চভূতের আর এক উপাদান ব্যোম যা চার্বাক দর্শনে স্বীকৃত হয়নি । কারণ তা দৃষ্টিগোচর নয় । অবশ্য পরবর্তীচার্বাক সমর্থকরা ব্যোমকে ও উপাদান হিসেবে স্বীকার করেছে বলে জানা যায় । চার্বাক দার্শনিকগণ পরমাণুর অস্তিত্ব ও স্বীকার করেনি, কারণ পরমানু প্রত্যক্ষগোচর নয় । এখানে উল্লেখযোগ্য যে চার্বাক দর্শন যুক্তি ও পর্যবেক্ষনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ তা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিল । আধুনিক জড়বাদীদের পরমানুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে এখন আর কোন অসুবিধে হবে না, কারণ বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে পরমাণুও দৃষ্টিগোচর হয় ।

ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ —এ চারটি জড় উপাদান নিজ নিজ অন্তনির্হিত স্বভাধর্মবশতঃ ক্রিয়া করে জগতের যাবতীয় বস্তু ও জীবদেহ সৃষ্টি করে । কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সকল জড়োপাদানেই বিলীন হয়ে যায় । রূপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্যেও এ চারভূতের বিনাশ নেই, এরা নিত্য ও অক্ষয় । বিজ্ঞানের শক্তিবাদের সাথে (Energism) এর কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায় । সৃষ্টির পেছনে কোন ঈশ্বর বা উদ্দেশ্য নেই । সৃষ্টি ও পরিণতি স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম অনুযায়ী ঘটে বলে এ মতবাদকে স্বভাববাদ নামেও অভিহিত করা হয় । জাগতিক বিধির যদৃচ্ছ ক্রিয়ার ফলে এ জগৎ ও অন্যান্য বস্তু উদ্ভূত হয় বলে এ মতবাদকে যদৃচ্ছাবাদও (Accidentalism) বলা হয় । কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় বলে একে দৃষ্টিবাদ (Positivism) নামেও অভিহিত করা হয় । সৃষ্টির পেছনে কার্য কারণের কোন অনিবার্য্য সম্পর্ক নেই । কারণ, অনিবার্য্য সম্পর্ক প্রত্যক্ষ গোচর নয় । পাশ্চাত্য দার্শনিক Hume ও এ ধরণের মতপোষণ করেছেন ।

ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায় আত্মা ও দেহকে স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা বলে মনে করে । চার্বাকমতে জড়দের ব্যতীত আত্মার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই । চার্বাকগণ আত্মার চেয়ে জড়দেহের আধিপত্য ও প্রাধান্যের উপর জোড় দিয়েছে । জীবন. চেতনা, আত্মা. সবকিছুই জড়দেহ থেকে উদ্ভূত । এগুলি জড়দেহের জটিল অবস্থামাত্র জড়দেহই তাদের আশ্রয় । চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই হল আত্মা । যখন বলা হয় 'আমি কৃশ. স্থূল' তখন চার্বাকরা বলে সেই আত্মা বা আমিই দেহ, আত্মা যদি দেহ থেকে পৃথক হয় তাহলে এ ধরণের উক্তির কোন মানে থাকে না । আত্মা বা আমি দেহের বহির্ভূত কোন স্বতন্ত্র অভৌতিক সত্তা নয় । আত্মা ও দেহ অভিন্ন । এটা চার্বাকদের দেহাত্মবাদ ও ভূতচৈতন্যবাদ । যেরূপ ঠাণ্ডা চুন ও ঠাণ্ডা চিনির সংমিশ্রণে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, সেরূপ জড় চতুর্ভূতের সংমিশ্রনে চেতনা নামক এক নূতন গুণ সৃষ্টি হয় । চেতনা দেহেরই গুণ জড়দেহের উপবস্তু (by product) । চার্বাকদের মতবাদ 'দেহ থেকে চৈতন্যের সৃষ্টি', পাশ্চাত্য দার্শনিক Samuel Alexander ও Loyd Morgan এর উন্মেষবাদে (emergent theory) ও দর্শনের নীতিতত্ত্ব চার্বাক দর্শনের নীতিতত্ত্ব এ জ্ঞানবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জ্ঞানবিদ্যার যৌক্তিক পরিণতি, যা আগেই বলা হয়েছে । এ দর্শনের নৈতিক মতবাদ হচ্ছে সুখবাদ (Hedonism) এবং এ সুখবাদে ভোগবাদের এক সুস্পষ্ট চেহারা প্রতীয়মান । ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় কর্মনিয়ম, বা কর্মবাদ বা নৈতিক কর্তব্য পালনে বিশ্বাস করে । এ অলঙ্ঘনীয় নিয়মে অতীতের কর্মানুযায়ী বর্তমানের কর্মফল এবং বর্তমানের কর্মানুযায়ী ভবিষ্যতের কর্মফল নির্দ্ধারিত হয় এবং কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হয় । কর্মফল বিনষ্ট হয় না । এ কর্মবাদ জন্ম দিয়েছে জন্মান্তরবাদ ও পরজন্মের । এতে পরজন্মে সুখ পাবার আশায় বর্তমান জীবনে সুখকে ছোট করে দুঃখকে বড় করে দেখানো হয় । পাপপুণ্যের আশায় বর্তমান জীবনকে একরকম অস্বীকার করা হয় । কর্মবাদ প্রতিপন্ন করে যে কর্ম ও তার ফলের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে । মানুষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন কর্মবিধানের দ্বারা পরস্পর সম্পর্কিত, অতীত বর্তমানকে বর্তমান ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে ।

ইহলোক সর্বস্ব প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকগণ কর্মবাদ অনুসারী জীবন সম্পর্কে এ ধরণের ধারণা মেনে নিতে পারেনি, তাদের কাছে বর্তমান জীবনই একমাত্র জীবন । মৃত্যুতেই সব শেষ ("Death is the end of all") । এ জীবনেই জীবনের পরিসমাপ্তি । "Life is the end of life' । অর্থ ও সুখই একমাত্র জীবনের কাম্য বস্তু । কাজেই কর্মবাদকে অস্বীকার করে বর্তমান জীবনের সুখভোগকে গুরুত্বদিতে চার্বাকগণ সুখবাদ ও ভোগবাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। চার্বাকরা, পরজন্ম, যজ্ঞে পশুবলি, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সুন্দর সুন্দর কথা বলে । যেমন দেহ ভস্মীভূত হলে তা আবার কি করে ফিরে আসে ? 'ভস্মীভূতস্য

দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' । যজ্ঞের পশু যদি স্বর্গে যায় তবে যজমান যজ্ঞে নিজের পিতাকে বলি দেয় না কেন ? শ্রাদ্ধে মৃত ব্যক্তি যদি অন্ন পায় তবে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তির বাইরে খাওয়ার কি প্রয়োজন ? বাড়ীতে অন্ন দিলেই তো চলে । স্বর্গে অবস্থিত পিতা যদি মর্ত্তে পাওয়া অন্নে তৃপ্ত হন তবে উপরে (অর্থাৎ দোতলা) অবস্থানকারী জীবিত পিতা একতলায় বাড়া অন্ন দিয়ে তৃপ্ত হবেন না কেন ?

চার্বাকদের মতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা পুরুষার্থ হচ্ছে - ইন্দ্রিয় সুখভোগ, মোক্ষ বা মুক্তি । চার্বাক ছাড়া ভারতীয় দর্শনের সমস্ত, আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনগুলির ধর্ম অর্থ, কাম মোক্ষ চারটি পুরুষার্থ বা বর্গকে স্বীকার করে । মোক্ষ পুরুষার্থ হচ্ছে এমন কাম্য বস্তু যা পেলে পাওয়ার আর কিছুই থাকে না । তবে জীবনের চরম বা পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে এদের মতে মোক্ষ যার সাধারণ অর্থ হচ্ছে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখ হতে চির অব্যাহতি এবং আত্মার স্বরূপে অবস্থান । বাকি তিনটিকে অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামকে মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে ভোগবাদকে অস্বীকার করেনি । তবে ভোগবাদ মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে গৃহীত হয় । কারণ জীবনে ভোগেরও প্রয়োজনীয়তা আছে । ভোগহীন সংসারের কথা ভাবাই দুষ্কর । তবে শুধু ভোগ নয়, ত্যাগ করে ভোগ করতে হবে । 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা' --- মোক্ষলাভের জন্য এ ভোগের সংসারেরও দরকার আছে । 'মোক্ষায়তে হি সংসারঃ' ? তবে ভোগ শেষ কথা নয়, ভোগের সংসার হচ্ছে উপায় আর মুখ্য পুরুষার্থ বা উদ্দেশ্য হচ্ছে মোক্ষ বা মুক্তি ।

ইহলোক ও দেহ সর্বস্ব চার্বাগগণ চতুর্বর্গের মধ্যে ধর্ম ও মোক্ষকে স্বীকার করেনি । কারণ ধর্ম, পাপপুণ্য অলীক কল্পনার সৃষ্টি । মোক্ষ তাদের কাছে এক উপহাসের বস্তু । কারণ আত্মাই নেই তা'হলে আত্মার মুক্তি, আত্মার স্বরূপে অবস্থান কিভাবে সম্ভব ? অবিমিশ্র সুখ ও দুঃখ কিছুতেই সম্ভব নয় । সুখ ও দুঃখ নিয়েই জীবন । দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি একমাত্র মৃত্যুতেই সম্ভব । দেহের নাশই মোক্ষ, মৃত্যুর পর জড় চারভূতের দেহ চারভূতেই বিলীন হয়ে যায় ।

চার্বাকরা পুরুষার্থ হিসেবে অর্থ ও কামকে স্বীকার করে। একমাত্র কাম বা সুখই হচ্ছে মুখ্য পুরুষার্থ বা উদ্দেশ্য আর অর্থ বা ধনসম্পদ হচ্ছে গৌণ । পুরুষার্থ বা উদ্দেশ্য আর অর্থ বা ধন সম্পদ হচ্ছে গৌণ । পুরুষার্থ যা কাম বা সুখ লাভের উপায় । ইন্দ্রিয় সুখ বা চৈতন্য বিশিষ্ট দেহের সুখই সকলের একমাত্র কাম্য, কারণ এ সুখের তীব্রতা বেশী । হাসি, কান্না, রোগ শোক, বিরহ, বেদনা ও মৃত্যু নিয়েই এ সুখ দুঃখের জীবন ও সংসার । তবু সুখই কাম্য । জাগতিক সুখ দুঃখমিশ্রিত বলে এ'সুখ বর্জন করা মূর্খতা । পদ্মবনে কাঁটা

আছে বলে কি পদ্মতোলা থেকে বিরত থাকা উচিত ? কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয়কি মহীতে ?'

একটি মাত্র জীবন এবং একবারই এরূপ, রস, শব্দ গন্ধ ও স্পর্শের পৃথিবীতে আসা। কোন্‌দিন জীবন শেষ হয়ে যাবে তার কোন স্থিরতা নেই ।কাজেই খেয়ে দেয়ে পান করে আনন্দে দিন কাটানোই মানুষের কাজ । 'Eat drink and be marry for tomorrow you may die' । একমাত্র বোকারাই এ জীবনের সুখ শান্তি বিসর্জন দেয় আর বুদ্ধিমানরা ইন্দ্রিয়সুখে জীবন কাটায় ।

চার্বাকগণ ইন্দ্রিয়সুখ বা চৈতন্য বিশিষ্ট দেহের সুখে প্রাধান্য দিয়ে যথাসম্ভব দুঃখ পরিহার করে সর্বাধিক পরিমাণ ইন্দ্রিয় সুখলাভকেই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে । এ ধরণের সুখই সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । জীবনে সুখের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে চার্বাকদের এক বিখ্যাত উপদেশ অনুধাবনযোগ্য ; 'যাবজ্জীবেৎসুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' । ঋণ করে ঘি খাও। যতদিন বাঁচ সুখে বাঁচ । এখানে ঋণের পূর্বসর্তগুলিকে উপেক্ষা করে ঋণ করার কথা চার্বাকরা নিশ্চয়ই বলেনি । ঋণের পূর্বসর্তগুলি হল মানুষ আত্মসচেতন, ঋণ করে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে । তা না হলে ঋণ পাবে কি ? আক্ষরিক অর্থে এ উক্তিটিকে ধরে নিলে এ দর্শনের প্রতি অবিচার করা হবে । এর অন্তর্নিহিত অর্থকে ধরতে হবে । এর অন্তর্নিহিত অর্থ বর্তমান জীবনে সুখের প্রাধান্য দেয়া এবং বিভিন্ন শাস্ত্র কর্তৃক ঘোষিত প্রচলিত প্রথা নিয়ম, সংস্কার প্রভৃতি যুক্তিবহির্ভূত (চার্বাকের মতে) মিথ্যা ও অলীক কল্পনাগুলিকে (যা প্রত্যক্ষ নির্ভর নয়) আবর্জনার মত ছুঁড়ে ফেলে দেয়া ।

চার্বাকদর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব, তত্ত্ববিদ্যা সর্বোপরি নীতিতত্ত্ব বা ইন্দ্রিয়সুখবাদ বা ভোগবাদ সমস্ত বিরোধীপক্ষকে ঘাবড়ে দিয়েছিল । তাদের ধারণা ছিল যেহেতু মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভোগের দিকে, এ'মত বহু নরনারীর চিত্ত আকর্ষন করবে, মতটার মধ্যে মহত্ত্বের কোন বালাই নেই । কাজেই এমত যদি প্রচারিত হয়, তবে সমস্ত লোক অধঃপাতে যাবে, ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হবে, ব্যক্তি ও সমাজ উচ্ছন্নে যাবে । বহু শতাব্দী ধরে বহু গ্রন্থে চার্বাকের বিরুদ্ধে এ ধরণের বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় । আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ অ্যারিষ্টিপাসের (Aristippus) অসংযত আত্মসুখবাদের সঙ্গে এ মতবাদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন । কারণ এ'দুই মতবাদেই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে । কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এ কথাটা ঠিক নয় । কারণ চার্বাক দর্শন অসংযত বা স্থূল (Gross) আত্মসুখবাদের কথা বলেনি, অ্যারিষ্টিপাসের মত চার্বাকরা দেহ ও মনকে ভিন্ন সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেনি । তারা দেহকে চৈতন্য বিশিষ্টদেহ হিসেবে

গণ্য করেছে। সুশিক্ষিত চার্বাকগণ সংযত সুখবাদ সমর্থন করে। বাৎসায়ন ও তার কামসূত্রে বলেছেন যে মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মসচেতন জীব বলে তাকে ধর্মের সঙ্গে (এখানে ধর্মমানে প্রচলিত অর্থে গৃহীত হয়নি, ধর্ম বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে নৈতিক মূল্য যার অপর নাম হতে পারে মানব কল্যাণ) সঙ্গতি রেখে সুখান্বেষন করতে হবে এবং ইন্দ্রিয়সুখ কাম্য তবে তাকে সংযত, মার্জিত ও উন্নত কবতে ধর্মপুরুষার্থেব প্রয়োজন। গ্রীকদার্শনিক এপি.কিউরাসের (Epicurus) দর্শনে ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত এক সংযত সুখবাদের কথা বলা হয়েছে। কাজেই একথা স্পষ্ট যে চার্বাকমতবাদ শুধু ব্যক্তির সুখকে কেন্দ্র করে নয় সর্বসাধারনে সুখকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়।

যেহেতু ইন্দ্রিয় সুখবাদের পরিমান বেশী এবং সর্বসাধারণের হিতার্থে এ সুখবাদ সেহেতু চার্বাক সুখবাদকে Mill এবং Bentham এর পবসুখবাদ বা উপযোগবাদের (Altruistic Hedonism বা Utilitarianism) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যার মূল সূত্র হলো 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ' (The greatest happiness of the greatest number of people)'।

চার্বাকবা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে, অন্যের ক্ষতিসাধন করে, খুন ডাকাতি রাহাজানি কবে, কাজ না করে 'যেন, তেন প্রকারেণ' বর্তমান জগতে যা ঘটে চলছে, ইন্দ্রিয়সুখ পরিতৃপ্তি সাধনের মতপোষণ করেছে বলে কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি।

আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষে প্রায় সকলেরই ইন্দ্রিয় সুখভোগের আসক্তি যুগযুগ ধরে চলে আসছে। ভোগ্যবস্তু ও ভোগের সম্পর্ক ব্যক্তি সমাজভেদে বিভিন্ন হতে পারে। ভোগ্যবস্তুর প্রকার, ব্যক্তির সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। কোন ভোগ্যবস্তু, কারও কাছে বিলাসিতা আবার কারও কাছে অতিপ্রয়োজনীয়। কাজেই ভোগের পরিমাণ ও আপেক্ষিক। চার্বাকের সময় থেকে ঋণ প্রচলন ছিল এবং তা এখনও আছে। বর্তমান যুগেও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দেশে দেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ঋণ আদান প্রদানের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী ব্যবস্থা থেকে ঋণ দেয়া নেয়ার সুবিধা আছে অনেক। অতি উন্নত দেশগুলিতেও Credit card চালু আছে। তাহলে চার্বাক ঘোষিত ভোগবাদের দোষটা কোথায়?

বর্তমানে আমরা প্রায় সবাই যার যার সামর্থ্য অনুসারে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করছি। সুখভোগের জন্য অন্যকে ঠকিয়ে, অন্যের ক্ষতি করে, কাজের ফাঁকি দিয়ে অসৎ পথে 'যেন তেন প্রকারেণ' অর্থ উপার্জন করছি। ভোগের ব্যাঘাত ঘটলে যে কোন অকাজ কুকাজ করতে পিছু পা হটছি না। নিজেদের বেশী সুখের আশায় ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন এমনকি মা বাবাকে ও ত্যাগ করছি। প্রয়োজনে বৃদ্ধাশ্রম বা অন্য কোথাও পাঠিয়ে

দিচ্ছি। এক ধরণের কিছু কিছু যুবক যুবতী জীবননাশী হেরোইন ও কোকেন জাতীয় দামী বা কোরেক্স জাতীয় কমদামী নেশার ড্রাগস্ নিচ্ছে। বিয়েতে পনকে কেন্দ্র করে নারীরা নির্যাতিতা হচ্ছে, প্রতিনিয়ত বধূ খুন হচ্ছে।

বিশ্বায়নের কল্যাণে পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্যবস্তু আমাদের হাতের মুঠোয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে নূতন নূতন ভোগ্যবস্তু প্রতিদিনই তৈরী হচ্ছে কোন না কোন জায়গায়। আজকে এ বিশ্বায়নের পটভূমিতে অবক্ষয়িত মূল্যবোধের দুর্দিনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আশীর্ব্বাদ পুষ্ঠ ও নানা রোগশোক ও সমস্যায় জর্জরিত অশান্ত পৃথিবীর অসহায় মানুষের কাছে চার্বাক দর্শনের প্রায়োগিক দিকের অর্থাৎ ভোগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা অত্যন্ত কষ্টকর। বর্তমান দুনিয়ার হালচাল দেখে মনে হয় আমরা প্রায় সবাই ভোগবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছি।

পৃথিবীর কোন দর্শনই ত্রুটিমুক্তি নয়। চার্বাকদর্শন ও তার ব্যতিক্রম নয়। এ জড়বাদী নাস্তিক দর্শন সংস্কারমুক্ত এক স্বাধীন চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দর্শন অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, প্রচলিত রীতিনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, সতক করে দিয়েছিল বিরোধী শিবিরের বিচারবিযুক্ত দার্শনিকদের এবং তাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এক সবিচার স্বাধীন চিন্তার পথ, দর্শনের চিন্তাধারাকে নিয়ে এসেছিল অতি সাধারণ মানুষের দুয়ারে, সাধারণ মানুষের মনের মত করে। যুদ্ধ নয়, খুন নয়, অত্যাচার নয়, শুধু সুখভোগের বার্তা বয়ে এনেছিল এ দর্শন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।

ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও নাস্তিক মতবাদ পোষণের কারণে এমন একটি সুন্দর চিন্তাধারা বহুকাল ধরে নিন্দিত ও উপেক্ষিত হয়ে আসছে। মনে হয় এ দর্শনের অন্তর্নিহিত সত্যকে উদ্ধার করার নিরপেক্ষ, সৎ ও সরল প্রচেষ্টার অভাব ছিল বলেই এমনটি ঘটেছে। সকলের দেহ একই উপাদানে গঠিত হয়। এ কথায় প্রমাণিত হয় মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নেই। এ' দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে এ দর্শন জাতপাত জাতি, ধর্মের বিভিন্নতাকে মোটেই প্রশ্রয় দেয়নি। এদ্বারা স্বীকৃত হয়েছে সমস্ত মানুষ এক, 'একৈব মানুষী জাতি'। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতার ধারণা এ দর্শন পোষণ করে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। চার্বাকদের একমাত্র ভাবনা সবাই সুখে থাকুক, 'সর্বে সুখিনঃ ভবন্তু'।

দেখা যাচ্ছে চার্বাকরা অন্যান্য ভারতীয় দর্শন চিন্তায় গৃহীত প্রচলিত অর্থে ধর্ম পুরুষার্থ ও মোক্ষ পুরুষার্থ দুটিকে গ্রহণ করেনি, স্বাধীন যুক্তি সমর্থিত অর্থে গ্রহণ করেছে। তাদের কাছে ধর্ম হচ্ছে মানব ধর্ম বা মানব কল্যাণ আর মোক্ষ হচ্ছে একটি মাত্র জীবনেই ইন্দ্রিয় সুখভোগ করে মৃত্যু। পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে পূর্ব হতে অনুমিত বিষয় ও

ধর্মীয় কুসংস্কার মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তার প্রসার ঘটালে এ ধরণের জড়বাদের দিকে মানুষের ঝুঁকে পড়াটা মোটেই অবাস্তব নিছক কোন কল্পনা নয় ।

প্রবন্ধের বিশেষ উৎস (Reference)

১. ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে — ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

২. Indian Philosophy — ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৩. Indian Philosophy — ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

৪. Guidlines of Indian Philosophy – M Hiriyana

৫. The six systems Indian Philosophy – Maxmuller

৬. A History of Indian Philosophy – S. N. Dasgupta

৭. Introduction to Indian Philosophy – Dr. J. N. Sinha

৮. Madhavacarya - Sarvadarsana Samgraha (trans)

৯. ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা — অধ্যাপক হরিদাস বন্দোপাধ্যায়

১০. ভারতীয় দর্শন — ডঃ নিরদবরণ চক্রবর্তী ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

লেখক ডঃ ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিলোনীয়া কলেজ । জন্ম - ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪২ ইংরেজী। পিতা স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞানদা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মাতা স্বর্গীয়া স্বর্ণময়ী দেবী । নোয়াখালী জেলার ছাগল নাইয়া থানার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে এক বিখ্যাত ও শিক্ষিত পরিবারে জন্ম । শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে বিলোনীয়া কলেজে যোগদান । কলেজেরে জন্ম থেকেই অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষের দায়িতব নিয়ে কর্মজীবন শুরু । ২০০২ সালে বিলোনীয়া কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ । তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'Radhakrishan and his Philosophy; The Vedantic Idealism . Ph. D. Research Scholar হিসেবে I.I.T কানপুরে, ১৯৬৮-৬৯ সনে যোগদান । পরবর্তীকালে U.G.C. র Faculty Improvement Programme এ Ph. D করার জন্যে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেতন ও সবৃত্তি যোগদান । গবেষণার ব্যাপারে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একমাসের জন্য অবস্থান । ১৯৮১ সালে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph. D. Degree লাভ । ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর Senator হিসেবে অবস্থান ।

******

ত্রিপুরার বে-সরকারী স্কুল গড়ে ওঠার গোড়ার কথা ঃ প্রথম পর্ব

— নিধু ভূষণ হাজরা

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আগরতলা রাজধানী শহর দেখতে পেল শতাব্দী প্রাচীন তিনটি বিদ্যালয় — উমাকান্ত একাডেমি, স্থাপিত ১৮৯০, মহারাণী তুলসীবতী উচ্চমাধ্যমিক, স্থাপিত ১৮৯৪ ও বিজয়কুমার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, স্থাপিত ১৮৯২, তাদের বর্ণময় ও বৈচিত্রভরা ঐতিহ্যপূর্ণ শতবর্ষ পালন করেছে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বীরচন্দ্র মাণিক্য । এই সকল বিদ্যালয়গুলি রাজ অন্তঃপুরবাসিনী মহারাণী ও রাজমন্ত্রী উমাকান্ত দাস ও বিজয় সেনের নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিভিন্ন মহকুমা শহরে রাজ পুরুষদের নামে এক একটি বিদ্যালয় গড়ে উঠে ১৯০১ সালে । একটি কলেজসহ বিদ্যালয়গুলোর সূচনা হয়েছিল রবীন্দ্র সুহৃদ মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় । রাধাকিশোর মাণিক্যের কলেজটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয় নাই, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের কথা ভেবেই। রাজা কলেজটি অবৈতনিক করেছিলেন । পরে বন্ধ হয়ে যায় । রাধাকিশোর মাণিক্যের পৌত্রের নামে বীর বিক্রম কলেজের মাধ্যমে ত্রিপুরা ভারতের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে প্রবেশ করেছিল । উল্লেখ থাকে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের পথ ধরেই এবং কাশ্মীর থেকে আসা খাজা আলি মুল্লার ১৮৩৫ সালে ঢাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠার এক চমকপ্রদ ইতিহাস পূর্বভারতে রচনা করে আসছে শিক্ষা জগত ।

সাম্রাজ্যবাদের বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির সংগ্রাম ক্রান্তিকালের দিকে যতই এগুতে থাকে ততই নিস্তরঙ্গ পর্বত দুহিতা ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক বোধ তীব্রভাবে দেখা দেয়, স্বাধীন ত্রিপুরায় সেই সময় বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর পার্টি এবং প্রচুর কংগ্রেস কর্মী আশ্রয় নেন । তারা ত্রিপুরাকে গণতান্ত্রিক চেতনা ও দেশাত্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন । বিলোনীয়া ও উদয়পুর বিপ্লবীদের ঘাঁটি গড়ে ওঠে ।

১৯৪৫ সালে আগরতলা শহরে তিনটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে - ১) ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতি গঠনের গোড়া পত্তন করেছেন - সুধীর দত্ত, অনিল দাসগুপ্ত, সতীশ চক্রবর্তী, হরিপ্রসাদ রায় ও রমেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য । এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য থেকে যানা যায় যে ত্রিপুরার মহারাজগণ প্রতি সরস্বতী পূজার পর ঘটা করে সারস্বত সম্মেলন করতেন শিক্ষক

শিক্ষিকাদের সম্মানে। এই সময় রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এক স্থানে মিলিত হয়ে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ভাব বিনিময়ের সুযোগ পেত। ত্রিপুরাতে সরকারী শিক্ষক সমিতি গঠনের শিকড় ওখান থেকেই আরম্ভ হয়।

২) এই বৎসরই নূরুলহুদা ও গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার যুগ্ম সম্পাদনায় প্রথম বে-সরকারী চেষ্টায় প্রকাশিত হয় গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার ও সংবাদ পরিবেশনায় 'নবজাগরণ নামে পত্রিকা'। বর্তমান ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্টিং মিডিয়ার সূচনা হয় ত্রিপুরায় ঐ ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে। ছাপা হয় ১৯২৭ সালে স্থাপিত বে-সরকারি সুধাংশু দত্তের সেন্ট্রাল রোডের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রেসে।

৩) ঐ বৎসর বিদ্যালয়ের জন্য এক বিশেষ কর্মসূচী বে-সরকারীভাবে নেওয়া হয়েছিল 'শিক্ষিত স্বদেশ শ্লোগান' দিয়ে 'জনশিক্ষা আন্দোলন'। এই আন্দোলনের অগ্র পথিকদের অন্যতম ছিলেন দশরথ দেব, অঘোর দেববর্মা, সুধন্য দেববর্মা, ও হেমন্ত দেববর্মা প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তারা সামান্য সময়ের মধ্যে সারা রাজ্যে ৪৮৮ টি স্কুল স্থাপন করে শিক্ষা জগতে এক উত্তাল ঢেউ সৃষ্টি করেন। বর্তমান অনেক বিদ্যালয়ের সূতিকাগার ঐ জনশিক্ষা আন্দোলন। সবটাই বে-সরকারীভাবে গড়ে উঠে। পরবর্তী সময় ত্রিপুরা ভারতভূক্তির পর রাজ্য সরকার ধীরে ধীরে ঐ বিদ্যালয়গুলিব দায়িত্বভার গ্রহণ করে। জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু হয় ২৭ শে ডিসেম্বর (১১ই পৌষ) ১৯৪৫ ইং।

১৯৪৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জাতি দাঙ্গার ফলে নোয়াখালীর তিনটি থানা বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর ও রামগঞ্জ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন, ১৯৪৭-এ রাষ্ট্রীয় কারণে দেশভাগে বাঁধ ভাঙ্গা মানুষের প্রবেশ ত্রিপুরার অতিসাধারণ শিক্ষা পরিকাঠামোর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। তাই ঐতিহাসিক সময়ের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে ত্রিপুরায় বে-সরকারী বিদ্যালয়। তারই একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সন্নিবেশিত হল। পর্বে পর্বে ২০০৪ পর্যন্ত সব ইংরেজী মাধ্যমসহ বিদ্যালায়ের অবগুন্ঠন খোলার প্রত্যাশা রইল।

১। স্বামী দয়ালানন্দ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

আগরতল শহরের পূর্বপ্রান্তে রাজধানীতে প্রবেশের মুখেই পড়ে আশ্রম চৌমুহনী। আসাম আগরতলা রোডের পাশেই ছিল একটি রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা আশ্রম। **এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী দয়ালানন্দ গিরি মহারাজ। তিনি আশ্রমের সঙ্গে ১৯৪২ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটি আবাসিক ছাত্রাবাস ছিল। এই বিদ্যালয়টিই ত্রিপুরার প্রথম বে-সরকারী বিদ্যালয়।**

স্বামীজি ১৯৫৮ সালে বর্তমান ধান জমিটি ক্রয় করে স্বামী দয়ালানন্দ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন । প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন গুরুদয়াল পাল । দয়ালানন্দের পুত্র মণিমহারাজ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন । পরবর্তী সময় কাতলামারা বিদ্যালয় থেকে এসে প্যারিমোহন দেবনাথ প্রধান শিক্ষক হন । তিনি দীর্ঘদিন বে-সরকারী শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন । বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রী দিলীপ দে । মণিমহারাজ ওরফে স্বামী দৈবানন্দ পরে কোলকাতা গিয়ে গৃহী জীবনযাপন করছেন ।

২। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় । দেশভাগের পর ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের মত বিলোনীয়াতে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ আসে । তাদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদগণ ছিলেন । পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালী জিলার সদরে ছিল অরুণ হাই স্কুল । গুণে-মানে বিদ্যালয়টি ছিল প্রসিদ্ধ । তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন উপেন্দ্রকুমার রায় । পরে তিনি আগরতলা এম. বি. বি. কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হন এবং অবসর নেওয়ার পর শিলচরে ১৯৫৯ সনে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন । তার চেষ্টায় এবং বীরেন বৈদ্য সহ আরও কয়েকজনের প্রেরণায় বিদ্যাপীঠ স্কুল গড়ে ওঠে ।

১৯৫০ সালে বনকর রাস্তার টিলাজমিতে বিদ্যাপীঠের যাত্রা আরম্ভ হয় । কিছু দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়টি বনকর রোডের এক নম্বর টিলায় নেওয়া হয় । ঐ সময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন গুরুচরণ নাথ । তিনি ফেণী একাডেমি থেকে এসে যোগদান করেন । বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে অজিত ভট্টাচার্য্য এস-ডি-ও দায়িত্বভার নেন । ১৯৬৩ সালে ১লা জুলাই বিধানসভার প্রথম অধ্যক্ষ উপেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ সদস্য ছিলেন। এখানেও বিদ্যালয়টিকে ১৯৫৬ সালে কিছু অসৎ ব্যক্তি পুড়িয়ে দেয় । পরে ঐ সময় বিদ্যাপীঠ বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয় । এই বিরাট কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শ্রী বীরেন্দ্র বৈদ্য মহাশয় । তিনিই প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক । অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ব্রজগোপাল চক্রবর্তী প্রথমদিকের ছাত্র ছিলেন ।

১৯৬০ সালের ৭ই আগষ্ট আমি আগরতলা রামঠাকুর পাঠশালা থেকে একজন শিক্ষিকাকে অপবাদ দেওয়ার প্রতিবাদে চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠে যোগদান করি । ঐ সময় অনেকেই ছিলেন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক । প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও এক সময়ের এ বি টির সম্পাদক মণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় । তার যোগ্যতা ছিল অপরিসীম । তাছাড়া আশুতোষ মজুমদার সহ প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্র দাস, ফণীভূষণ সরকার, বটুক দত্ত, দ্বিজেন্দ্র কাব্যতীর্থ, অনন্ত মজুমদার, যোগেশ মজুমদার, সাধন

ছিলেন অন্যতম । রামবাবু ছিলেন করণিক । নিশিমালী অটল দাস ছিলেন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। এস-ডি-ও মাণিক গাঙ্গুলী ছিলেন বিদ্যাপীঠের প্রেসিডেন্ট । ১৯৬১ সালে খুবই ঘটা করে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হয় । 'কথা কও' নামে বিদ্যাপীঠের পত্রিকা সম্পাদন করি । তার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন ঐসময়ের ছাত্র ডঃ অশোক বৈদ্য । ৪ দিন বই মেলা করেন ধীরেন সাহা । সেই সময়ের ছাত্রদের অনেকের মধ্যে সত্যরঞ্জণ চৌধুরী, বর্তমান প্রধান শিক্ষক । সুনীল মজুমদার, পরিতোষ পোদ্দার, অমল মল্লিক, রণজিৎ পাঠোয়ারী, ছাত্ররা অন্যতম । ঐ সময় বিদ্যাপীঠের উপর আমার লেখা গল্প 'সাড়ে তিন হাত জমি' লেখা হয় । বিদ্যাপীঠে অভিনয় হয় 'জাহিরা বিবি' নাটক । শচীন্দ্র দেবনাথ প্রাক্তন ছাত্ররা 'রাত্রি শেষ' নিশিত রায়ের নাটক অভিনয় করেন । ৭ দিনের হলি ডে হোম করা হয় ।

১৯৬২ সলের ২৬ শে জুলাই ছাত্রদের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সিনিয়র শিক্ষকদের সঙ্গে আমার মতবিরোধ হয় এবং আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করি ও পরেরদিনই উদয়পুর রমেশ হাইস্কুলে যোগদান করি । বিদ্যাপীঠের সঙ্গে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল । শ্রীমতী আরতি রায় ও হারাধন দত্ত শিক্ষক ছিলেন ।

৩। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন, খোয়াই ঃ

খোয়াই মহকুমার নাম মনে এলেই প্রায়ই আমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের খোয়াই কবিতার শেষ চার ছত্র মনে পড়ে — "রাঙ্গামাটির রাস্তা বেয়ে/ গ্রামের লোক যাবে হাট করতে / পশ্চিমের আকাশ প্রান্তে আঁকা থাকবে /একটি নীলাঞ্জনা রেখা।"

১৯৪৮ সালের কথা । মনে হয় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি যুব কংগ্রেস নেতা কালিশঙ্কর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে একটি এম.এ স্কুল করার প্রস্তাব নিয়ে আসেন। দু এক দিনের মধ্যেই খোয়াই নাগরিকদের সভা ডাকা হল ! স্থানটি ছিল টাউন হল । এ প্রস্তাব শুনে সবাই খুশি হলে সবাই মিলে প্রথম কমিটি গঠন করা হল । কমিটির প্রথম সদস্যগণ হলেন বিপিনবিহারী মজুমদার, যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনারায়ণ চ্যাটার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, দেবেশপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, কালিশঙ্কর গাঙ্গুলী, শৈলেশচন্দ্র দাস, সমরেন্দ্র দে সরকার, বিনয় বল ও শান্তি রঞ্জন সিংহ ।

প্রথম টাউন হল ঘরটিতেই ধাড়ী দিয়ে ছয়টি কোঠা তৈরী করা হল ।

প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলেন শ্রী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিনা বেতনে । অন্যরা ছিলেন শহরের কিছু যুবক শ্রেণী, তারা ও বিনা বেতনেই শিক্ষকতা করতেন । স্কুলের জন্যে জমি খোঁজা আরম্ভ হল । শিক্ষাবিদ অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলে কয়ে তার দাদুর চারকানি ধানী জমি বিদ্যালয়কে দান করার জন্য চেষ্টা করেন । চেষ্টা সফল হল অসুস্থ

শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য জমি দিতে রাজী হলেন । বিদ্যালয়ের নাম হল শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতেন । অধ্যাপক রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য আরও একটি জমি দান করলেন ছাত্রাবাসের জন্য।

দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষক হলেন কুলেশপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং শিক্ষকরা হলেন, দেবেশ চক্রবর্তী, যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, কালিপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, শান্তিমাধব চক্রবর্তী এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। সবাই বেতন পেতেন না । প্রথম ১৫ টাকা করে তিন শিক্ষককে বেতন দেওয়া হত । কিন্তু দুষ্টলোকের অভাব হল না । এই সময় একদিন রাতে বিদ্যালয়টিকে পুড়ে দিলেন । কিছু সময় সত্যেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে অস্থায়ী ঘর করে পঠন পাঠান চলল । পরবর্তীকালে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের অনেক মর্যাদা বেড়েছে ।

৪। প্রগতি বিদ্যাভবন, আগরতলা ঃ

ত্রিপুরা বে-সরকারী বিদ্যালয় গড়ার ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলে রাখি এটা সংক্ষিপ্ত ও প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা । প্রগতি বিদ্যাভবনের পুরোনো দলিলের একটি অস্পষ্ট কপির জেরক্স থেকে কষ্টসাধ্য পাঠোদ্ধার থেকে জানা যায় যে ''২৩-০৫ ৬৮ ত্রিং আরমান আলী মুনসির সভাপতিত্বে প্রগতি বিদ্যাভবনের প্রথম সভার প্রস্তাবে বলা হয় রাজধানী শহর আগরতলায় প্রায় ১০ গুণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে । আগরতলায় যেসব বিদ্যালয় আছে তাহাতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে বহু ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করিতে পারিতেছে না। সে কারণে শ্রীযুক্ত গোপাল চক্রবর্তী পিতা মৃত গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্তী, উকিল আরও একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন বোধ করায় 'প্রগতি বিদ্যাভবন' নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগরতলার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকে আমন্ত্রণ করেন । নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বোধ করে সর্ব সম্মতিক্রমে অন্নদাকুমার বসু মহাশয়ের বাড়িতে 'প্রগতি বিদ্যাভবন' নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইল ।'' এই প্রস্তাব অনুসারে দেখা যায় যে তার আগে একটি বেসরকারী বিদ্যালয় ছিল। প্রথম বেসরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেতাজী বিদ্যানিকেতনের এই সম্মান অবশ্যই প্রাপ্য । উল্লেখ্য যে ঠিক ঐ তারিখের এক বৎসর পূর্বের ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে প্রথম ছাত্রটিকে ভর্তি করে মহারাজ বীর বিক্রম কলেজের যাত্রা আরম্ভ হয় । প্রগতি বিদ্যাভবনের প্রথম প্রধান শিক্ষক হলেন পূর্ব বঙ্গের প্রসিদ্ধ হবিগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কেদারেশ্বর দাশগুপ্ত ।

প্রগতি বিদ্যাভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণের পরেই কৃষ্ণনগরের ব্যানার্জী পাড়ার কালীবাড়ী লেনের প্রথম অংশে শ্রী অন্নদাকুমার বসু, সেই সময়ের বিশিষ্ট কন্ট্রাক্টার মহাশয়ের গুদাম ঘরে প্রাথমিক শ্রেণীর পঠন পাঠন আরম্ভ হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে ।

শিক্ষক ছিলেন শ্রী উপেন্দ্র শীল মহাশয় । সেক্রেটারী ছিলেন শ্রী গোপাল চক্রবর্তী, এই গোপাল চক্রবর্তীই তখনকার দিনে কংগ্রেস নেতা তড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত ও শ্রী সুখময় সেনগুপ্তকে প্রগতি শিক্ষাভবনে শিক্ষাদানের জন্য অনুরোধ করেন । সুখময় সেন অল্প কিছুদিন থাকলেও তড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত মহাশয় প্রগতি বিদ্যাভবনে থেকে যান । প্রথম সভায় ছিলেন উপেন্দ্র শীল, ললিত মোহন দেববর্মা, যোগেশ চন্দ্র নন্দী, জীতেন্দ্র চক্রবর্তী, মোহিতলাল ব্যানার্জী, প্রফুল্ল চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ। প্রথম সভার ৭ দিন পর যে সভা হয় তার সভাপতি ছিলেন ললিতমোহন দেববর্মা । সুকুমার দাস, হরিহর নাথ বিশ্বাস, রবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী প্রথম থেকে ছিলেন ।

অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর ছাত্রের সমাগম হলে প্রগতি বিদ্যাভবন শহরের দক্ষিণ দিকে মরা খালের দক্ষিণ তীরে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয় । শ্রী কেদারেশ্বর দাশগুপ্ত হবিগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রগতি বিদ্যাভবন উচ্চ ইংরেজীর প্রথম প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান করেন । অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পরলোক গমন করলে দায়িত্বভার নেন তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ।

৫। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন ঃ

প্রগতি বিদ্যাভবনের প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ থাকে যে আগরতলায় একটি বে-সরকারী বিদ্যালয় আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । প্রগতি বিদ্যাভবনের ৬ মাস ৩ দিন পূর্বে ৩রা মার্চ ১৯৪৮ সালে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন যাত্রারম্ভ । প্রয়াত প্রধান শিক্ষক হীরেন্দ্র নাথ নন্দী (১৯০৯-১৯৮৯) মহাশয়ের হস্তলিখিত অস্পষ্ট একটি কপি থেকে জানা যায় "১৯৪৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, আগরতলা শহরে যাত্রা শুরু করে নিতান্ত দীনহীনভাবে । এই প্রতিষ্ঠানটি যে দিন পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে তাকিয়েছিল সেদিন তার জন্ম লগ্নে দরজার সামনে মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়নি । নিতান্ত ভাড়া করা একটি কুড়ে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার উপরে তার জন্ম হয়েছিল" । প্রথম প্রধান শিক্ষক প্রয়াত নন্দী মশায় উল্লেখ করেন যে প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, ৩রা মার্চ তারিখে স্কুলটি বর্ত্তমান স্থানে উঠে আসার আগে প্রায় ছয়মাস কাল শকুন্তলা রোডস্থিত স্বর্গত ডাক্তার রাজেন দের বাড়ীতে কায় ক্লেসে দিনযাপন করেছিল । স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য প্রথম বৈঠকটিও বসে ডাঃ রাজেন দের বাড়ীতেই । প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন—ত্রিপুরা রাজ্যের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কামিনী কুমার দত্ত, আশুতোষ সিংহ, হরিদাস সেন, নীলরতন গাঙ্গুলী, শান্তি রঞ্জন শূর, শিক্ষক অনিল দাশগুপ্ত, দ্বিজেন দে, রমনী দেবনাথ, অমূল্য চৌধুরী, শান্তি পাল, কুমার কর্ণ কিশোর দেববর্মা ও অধ্যাপক

বকুল কর । ১৯৫৩ সালের পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান শিক্ষক কর্তৃক এই জন্ম কথা পঠিত হয় এবং তাহা ১৯৫৪ সালের বিদ্যালয়ের মুখপাত্র 'জয় হিন্দ পত্রিকায়' প্রকাশিত হয় । মহারাণী কাঞ্চণপ্রভা দেবীর লিজ দেওয়া জমিতে বর্তমান স্কুলটি রয়েছে। প্রথম প্রধান শিক্ষক সতীনাথ ভরদ্বাজ, দ্বিতীয় মধুসূধন চক্রবর্তী, তৃতীয় হীরেন নন্দী ।

৬। ঈশানচন্দ্র নগর পরগণা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

ঈশানচন্দ্র নগর পরগণা গ্রামটি ঐতিহাসিক । রাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য (১৮৪৯-৬২) আগরতলায় রাজ্য পাঠ উঠে এলে তিনিই হন প্রথম রাজা । তার পিতা কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য (১৮৩০-১৮৪৯) বর্ত্তমান আগরতলায় নূতন হাবেলি প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে সাব্রুম-আগরতলা রাস্তার আট কিলোমিটার অতিক্রম করে সূর্যমণি নগরের (ইউনিভার্সিটি চৌমুহনী) তিন কিলোমিটার দূরে ঈশানচন্দ্র নগর পরগণা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির অবস্থান। প্রধান শিক্ষক অনিল চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তথ্য অনুসারে দেখা যায় ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৪ ইং ২রা মাঘ ১৩৬০ বাং নেতাজী সুভাষ বিদ্যা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক হীরেন্দ্র নাথ নন্দী, জেলা শাসক এইচ এম দোবে অত্র এলাকার বিশেষ নাগরিক দুর্নিচাঁদ সরকার ও দ্বিজেন দের উদ্যোগে শতশত লোকের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর কোদাল দিয়ে মাটি কেটে উদ্‌যাপন করা হয় । ঐ সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন ভারত খ্যাত শচীন দেববর্মণ ।

বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রপথিক প্রভাত কুমার রায় (১৯১৪-৫৬) দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন হেমন্ত বিজয় রায় । তিনি আঠার বৎসর এই পদে ছিলেন। যাদের জমি দানে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের অন্যতম ছিলেন স্বরূপ চাঁদ মোহন, নিত্যবাসী সরকার, অবিনাশ সরকার, অশ্বিনী সরকার প্রমুখ ব্যাক্তিগণ । তাদের দেওয়া মোট ভূমির পরিমান সাড়ে সতের কানি । শ্রীমতী নিত্যবাসী সরকারের দৌহিত্র হারাধন সরকার বিদ্যালয়ের একজন বর্তমান শিক্ষাকর্মী । প্রাক্তন ছাত্র মানিক লাল চৌধুরীর তথ্য থেকে জানা যায় এই বিদ্যালয়টি ১৯৫১ সালে বর্তমান বিদ্যালয় থেকে দুই মাইল দূরে নিশ্চিন্দপুর গ্রাম বাসীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন তার নাম ছিল 'রাধা কিশোরগঞ্জ বিদ্যালয়'। প্রধান শিক্ষক ছিলেন মুরারী ভৌমিক ।

৭। ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ঃ

ফটিকরায় অঞ্চলটির প্রাচীনত্ত্ব 'কৃষ্ণমালা'র মতে "সেই দু নদীর 'ত্রিবেনীতে

করিঘর'। তাহাতে রয়ে যে অমর নৃপবর" ।

অমর মাণিক্য উদয়পুর থেকে বিতাড়িত হয়ে মনু ও দেও নদীর সঙ্গম বা মিলনস্থানে আশ্রয় নেন ।এই অঞ্চলটাই ফটিকরায় ।কল্যাণ মাণিক্যের সময় মোগলদের সঙ্গে পরাজিত হলে কৈলাশহর সহ এই অঞ্চল সাময়িকভাবে শাহজাহানের প্রশাসনে আসে । ঐ সময় ফটিকরায় ছিল মোগল প্রতিনিধিদের কেন্দ্র বিন্দু । প্রশাসক সোনা রায়ের 'ফটিকরায়' ছিল মোগল প্রতিনিধিদের কেন্দ্র বিন্দু । প্রশাসক সোনা রায়ের পুত্র ফটিক রায়ের নামেই এই অঞ্চল । অন্য একটি মতে বলে ফটিক রায়চৌধুরী নামে একরিয়াং দলপতির নামে অঞ্চলটি পরিচিত হয় । বৃটিশ ভারতে ফটিক রায় এক বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল । পূর্ব্ববঙ্গ থেকে প্রচুর লোক এখানে ব্যবসা করতে আসত । প্রচুর গরু কেনা বেঁচা হত ।

স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের সময় ফটিক রায়ের ছবি পালটে গেল । হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ এসে পড়ে এখানে । খাদ্যযন্ত্র বাসস্থানের মতই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অপরিহার্য্য । এমনি পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্য থেকেই বের হয়ে আসে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা। এরাই সৃষ্টির অগ্রদূত । শ্রীযুক্ত গোপেশ রঞ্জন দেব-এর অক্লান্ত আত্মত্যাগ কর্ম ও ঘর্মের ফলে এবং কিছু সহযোগীর চেষ্টায় ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারী ফটিক রায়ের সরকারী জুনিয়ার বেসিক স্কুলের সঙ্গে ৬ষ্ঠ শ্রেণী জুড়ে দিয়ে ফটিক রায় দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হল । প্রধান শিক্ষকের ভার নিলেন শ্রী হট্টের প্রীতিম পাশা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিনোদ বিহারী কিলিকদার । এভাবে পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের প্রধান ও সহ প্রধান শিক্ষকগণ যেমন শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীশ চন্দ্র দেব, পণ্ডিত নিকঞ্জু গোস্বামী, নবদ্বীপ গোস্বামী, শিক্ষকগণ পঠন পাঠনের ভার নিলেন । কোনরূপ সরকারী অনুদান ছিল না । অতি সামান্য ছাত্র বেতন, জনগণের চাঁদা ও গোপেশ দেবদের দোকান থেকে সামান্য টাকা দিয়েই মাষ্টার মশায়দের ক্ষুধা নিবৃত্ত হত । প্রতি বাজারবার দিন শিক্ষকগণ গোপেশ বাবুদের দোকানে এসে প্রথমে সামান্য অর্থের জন্য বসে থাকতেন । সরকারী বিদ্যালয়ে ক্লাশ হলেও পরে তাহা থেকে নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় । একদিন রাতারাতি বিদ্যালয়ের ঘর ছন বাঁশ দিয়ে তৈরী হল নদীর চরায় । কিন্তু পরে মনু নদীর ভাঙ্গনের মুখে পড়ার আশঙ্কায় আবার বিদ্যালয়ের স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হল । বিদ্যালয় চলে এল ফটিক রায় বাজারের দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ টিলা ভূমিতে । পরবর্তী সময় ফটিক রায়ে গড়ে ওঠে ফটিকরায় কলেজ। সে আর এক ইতিহাস, আর এক সংগ্রাম ।

৮। রমেশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

উদয়পুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও

'বিসর্জ্জন' এবং 'মুকুট' নাটকে উদয়পুরকে প্রসিদ্ধ করে গেছেন। গুপ্তধন গল্পটি ত্রিপুরার কিশোর পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় । পূর্বে তার নাম ছিল রাঙ্গামাটি । পরে মহারাজা বিজয় মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করে শশুর উদয়াদিত্য উদয় মাণিক্যরূপে রাজধানীর নাম রাখেন উদয়পুর । পরবর্তীকালে মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য সামসের গাজির কাছে পরাজিত হয়ে চলে এলেন পুরান আগরতলায় এবং তারও পরে কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য ১৮৪৪ সালে বর্তমান আগরতলা গড়ে তোলেন । ১৮৯৬ সালে রাধা কিশোর মাণিক্য রাজা হয়ে উদয়াদিত্যের উদয়পুর নাম পালটে রাখলেন রাধাকিশোরপুর ।

রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় ১৯০৫ সালে কিরিট বিক্রম ইনিষ্টিটিউসন সংক্ষেপে কে.বি.আই. প্রতিষ্ঠা হয় । ১৯২৮ সালে স্কুলটি হাই স্কুলে রূপায়িত হয় । ঐ সময় মাতার বাড়ী, শালগড়া, হদ্রা, কাঁকড়াবন অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ।

এই উদয়পুর রমেশ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা রমেশ দত্ত মহাশয় দেশ ভাগের পর ১৯৪৯ সনে পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার বলরামপুর গ্রাম থেকে ত্রিপুরায় আসেন । তারই মানস পরিকল্পনা থেকে এবং নিজের নামেই উদয়পুর কাকড়াবন রাস্তার পাশে নিজ বাড়ীর সম্মুখে ছন বাঁশ দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সময়টা ছিল ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী। প্রথমে শিক্ষক হন প্যারী মোহন দেব ও জগদীশ অধিকারী । তার দেড় বছর পর ১৯৫২ সালের ৯ই আগষ্ট রমেশ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় ছেলে ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন। বিদ্যালয়টি দুবার অসৎ ব্যক্তিরা চক্রান্ত করে পুড়ে দেয় । পরবর্তীকালে বাদশা মিঞার নিকট থেকে ১ কানি ১৭ গণ্ডা জমি ৮০০ টাকায় ক্রয় করে বর্তমান স্থানে আসে । রাজ্যের শিক্ষা বিভাগেব অধিকর্তা গোবিন্দ নারায়ণ চাটার্জী সাড়ে তিন হাজার টাকা অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করেন । ১৯৫৫ সালে রমেশ স্কুল হাইস্কুল হয় ও ১১ জন ছাত্র ১৯৫৬ সালে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসে । রমেশ বোর্ডিং ছিল বেশ জম জমাট । এই লেখক ঐ বোর্ডিং-এ ছিল । তখন তার লিখা নাটক উদয়পুর টাউন হলে ১৯৬২-র ১৫ই আগষ্ট অভিনীত হয় । হীরালাল সেন ও দিলীপ ভট্টাচার্য মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন । তাছাড়া এই বোর্ডিং থেকে নগেন্দ্র জমাতিয়া, রতিকান্ত জমাতিয়া, গোপাল দাস, আরও অনেক ছাত্র পরবর্তীকালে রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন । বিধায়ক পান্নালাল ঘোষ, কেশব মজুমদার, মুখ্যমন্ত্রী মাণিক সরকার রমেশ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন ।

৯। ধর্মনগর দীন নাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দির ঃ

মহারাজ ধর্ম মাণিক্যের নামেই ধর্মনগর এমনটাই প্রচলিত ধারণা । সাম্প্রতিক

আমার প্রিয় বন্ধু শিলং-এর অধ্যাপক মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য ও প্রিয় আত্মীয় মন্টু দাস, উত্তর ত্রিপুরার লুঙ্গাই উপত্যকা ও কালা ছড়ার প্রাচীন ইতিহাস উন্মোচন করে কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন ।

অবিভক্ত ভারতের শ্রীহট্ট জেলার এম. সি. কলেজের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশী উন্নত স্থানে ছিল । দেশ ভাগের পর ত্রিপুরার ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুরে প্রচুর মানুষ বাস্তুহারা হয়ে আশ্রয় নেয় । এই সময় ধর্মনগরের শিক্ষাপ্রেমী দীগেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় থানা রোডের স্বল্প পরিসরে তার পিতা মাতা দীননাথ ও নারায়ণীর নামে বিদ্যালয়টি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন । প্রথমেই বিদ্যালয়টি সেই প্রথম পর্যায়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য রবীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের বাড়ীতে চালা ঘরে যাত্রা পার্টীর পেণ্ডেলের ছন বাঁশ ছাত্ররা বহন করে এনে আরম্ভ করে । প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুবোধ সোম রায় । উল্লেখ থাকে যে দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রমেই দীন নাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দিবটি একটি সুস্থির অবস্থায় আসে । এই বিদ্যালয় থেকে প্রচুর কৃতি ছাত্র জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বর্তমান প্রধান শিক্ষক গৌর গোপাল ব্যানার্জী । বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল, থিয়েটার হত । বছরে দুবার দীপাবলি নামে একটি মুখপাত্র প্রকাশিত হত । বর্তমানে একটি ডিগ্রী কলেজসহ বেশ কয়টি উচ্চতর মাধ্যমিক ও গোল্ডেন ভ্যালী ইংরেজী মাধ্যম বে-সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক রয়েছে ।

১০। প্রাচ্য ভারতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

১৯৪৮ সালে আগরতলা শহরে নেতাজী ও প্রগতি দুই দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও ১৯৪৯ সনে ২৯শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হল প্রাচ্য ভারতী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ওরিয়েন্ট চৌমুহনী বলে কথিত দ্বিজেন দে ও নেপাল দে-দের বাড়ীতে । এখানে বিদ্যালয়টিতে প্রায় পনের বছরের মত ছন বাঁশের ঘরে পড়াশোনা হত । একসময় নিয়ত উদ্বাস্তুদের আগমনে লোকজন বাড়ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্ত্তির সমস্যাও বাড়ছিল । অন্য দুই দুটি বিদ্যালয়ও তখন ছোট পরিসরে চালা ঘরে চলছিল । তাই নূতন আর একটি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তীব্রতর হয়ে উঠে। শহরের বিশিষ্ট সমাজ সেবী রাজেন দে, দ্বিজেন দে তাদের আখাউড়া রোড (লেনিন সরণী) স্থিত বাড়ীর এক অংশ কাঁচা ঘরসহ ছেড়ে ছিলেন নূতন আর একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য । নূতন আর একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে প্রথম সভাটিও বসে দ্বিজেন দের ঘরে । আলোচনা করতে বসেছিলেন পণ্ডিত গঙ্গা প্রসাদ শর্মা রাজন দে, দ্বিজেন দে, ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য, অশ্বিনী কুমার আঢ্য, ডাঃ মেজর হেমচন্দ্র দত্ত, সুখলাল মজুমদার এবং খগেন্দ্র ভদ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ ।

প্রাচ্য ভারতীর প্রথম সভায় কর্ণধার, প্রধান শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ধ্রুবদাস ভট্টাচার্যই বিদ্যালয়ের নাম রেখেছেন 'প্রাচ্য ভারতী'। বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আদর্শকে সম্মুখে রেখেই এই নামকরণ। পরবর্তী সময় ষাটের দশকের শুরুতে বিদ্যালয়টি স্থান পরিবর্তন করে চলে যায় রাজধানীর সেন্ট্রাল জেলের পূর্ব্ব পাশে ধলেশ্বর অঞ্চলে। এখানে বিরাট বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, বিল্ডিং ঘর, খেলার মাঠসহ একটি সুন্দর পরিবেশ। প্রাচ্য ভারতী সাংস্কৃতিক এবং খেলাধূলার ক্ষেত্রে, রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রচুর শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর উৎস ঘটিয়ে ছিল। প্রাচ্য ভারতীর নিজস্ব একটি সংগীত রচনা করেন স্কুলেরই শিক্ষক ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ ব্রজগোপাল রায়। সঙ্গীতটি সুরারোপিত করেন শিক্ষক মাখন দে।

১১। জোলাই বাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ঃ

দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার জোলাই বাড়ীর সীমা হল— উত্তরে গর্জি, দক্ষিণে সাব্রুম, পূর্ব্বে শিলাছড়ি এবং পশ্চিমে শ্রীনগর হয়ে মতাই পর্যন্ত।

জোলাই শব্দটির সঙ্গে প্রাচীন ত্রিপুরার ইতিহাস ও সামাজিক পরিস্থিতি যুক্ত ছিল। 'রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা' বইতে উল্লেখিত আছে যে 'ত্রিপুরাতে ক্রীতদাস প্রথা ছিল।' তাছাড়া জোলাই নামে আর এক শ্রেণীর প্রজা অনেকদিন ধরে চালু ছিল যাদের প্রথানুসারে রাজ পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির অধীনে ক্রীতদাসের মতই আজীবন কাজ করতে হত। ১৮৭৮ সালে আপীল আদালতের বিচার পতি এক ঘোষণায় রাজ্যে দাস দাসী, বেচা কেনা বা বন্দক রাখা নিষিদ্ধ করেন।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে জোলাই বাড়ী অঞ্চল বাস্তুচ্যুত নামক নূতন ইহুদিদের আগমনে জোলাই বাড়ীর মত এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটিও ভারী হয়ে উঠে। তখন শিক্ষা প্রেমী শীতল চন্দ্র সরকার, নীল কৃষ্ণ মজুমদার, অমৃত চরণ বৈদ্য, আফ্রুচী চৌধুরী, যোগেন্দ্র সরকার, নীল কৃষ্ণ ভৌমিক এক স্থানে বসে প্রতিজ্ঞাই করলেন যে স্থানীয় ছেলে মেয়েদের আগামী দিনের কথা ভেবে একটা বিদ্যালয় করবেনই। কারণ বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ ও বি কে আই এবং সাব্রুমের স্কুল ছাড়া আর কিছু ছিল না। উল্লেখ থাকে যে ঐ সময় চিংলাফ্রু মগ নিজের উদ্যোগে একটি পাঠশালা করে শিশুদের পড়াতেন।

এভাবে স্থানীয় ব্যক্তিগণ নিজেরাই জঙ্গল পরিস্কার করে এবং বন থেকে ছন বাঁশ ও পালা কেটে একটি পাঁচ রুম বিশিষ্ট চালা ঘর তৈরী করলেন। ঘর-দুয়ার লেপা পোঁছার পর ১৯৫১ সালের ৯ই মার্চ পূজা দিয়ে আজকের জোলাই বাড়ী দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের

শুভ যাত্রা আরম্ভ হয় । প্রথম দিকে শিক্ষকদের বেতন দেওয়াই হত না । স্থানীয় কতিপয় যুবক বিনা বেতনে কাজ করতেন । পরে চাঁদা তুলে কিছু কিছু দেওয়ার চেষ্টা হয় । শিক্ষকতায় এগিয়ে এলেন---ক্ষেত্র মোহন মজুমদার, দেবেন্দ্র বৈদ্য, মহেন্দ্র নন্দী, কান্তি বিশ্বাস, অনাদি সেন, ধীরেন্দ্র দে, মনীন্দ্র দত্ত ও বসন্ত দেবের মত মানুষ গড়ার কারিগরগণ ।

১২। কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ঃ

রাজধানী আগরতলার দক্ষিণে ইতিহাস সমৃদ্ধ বিশালগড়, বর্তমান মহকুমা শহর এর পাশেই কৃষ্ণ কিশোর নগরের কড়ইমুড়া গ্রাম । মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য (১৮৩০-১৮৪৯) যিনি বর্তমান রাজধানী শহর আগরতলা প্রতিষ্ঠা করেছেন তারই নামে কৃষ্ণ কিশোর পরগণা । এই কড়ইমুড়া গ্রামে ১৯৫২ সনে বর্তমান স্থানে ছন বাঁশের তৈরী মাদ্রাসা ঘরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে । ১৯৫৫ এ প্রথম তিনজন ছাত্র স্কুল ফাইন্যালে পাঠানো হয় । দুইজন ছাত্র পাশ করে । এই জমিটা যিনি দান করেন তার নাম রহম আলী হাজী । এই বিদ্যালয় সৃষ্টির মূলে ছিলেন শ্যামকান্ত চৌধুরী । তার অনুদান ও সাহায্যে যারা এগিয়ে আসেন তারা হলেন প্রথম আব্দুল জব্বর মহালদার, আহাম্মদ হোসেন মাস্টার, বৈষ্ণব চরণ সাহা, চাঁন মিঞা সদ্দার, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, যোগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা ও সুরেশ চন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ ব্যক্তিগণ ।

১৯৫২ সালে স্বাধীনতা উত্তর ত্রিপুরায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় । টি. টি. সি'র প্রধান ও এডভাইসর হন শচীন্দ্র লাল সিংহ । তাঁর পরামর্শ মত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সরকারী বিদ্যালয় থেকে অবসর প্রাপ্ত শ্রী প্রহ্লাদ বর্মণ মহাশয়কে প্রধান শিক্ষক রূপে গ্রহণ করে । সে সময় মৌলাভী মনসুর আহাম্মদ, এ. এম শ্যামসুল আলম ও মনীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার শিক্ষক রূপে যোগদান করেন । বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। প্রাথমিক বিভাগের অনেক শিক্ষক বেতন পেতেন না । এই দুঃসময় পরিচালন কমিটি, কৃষ্ণ কিশোর নগর, দুর্গানগর, শিবনগর, বিশালগড় বাজার থেকে চাঁদা তুলে ও সরকারী সামান্য অনুদান দিয়ে শিক্ষকদের মাসে মাসে কিছু কিছু বেতন দিতেন ।

১৩। বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ঃ

রাজধানী আগরতলার দক্ষিণ অংশটাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিশালগড় পরগণা । নামেই বোঝা যায় অতীতে এখানে অনেক যুদ্ধ বিদ্রোহ হয়েছে । তাই গড় পরিখা এসব ছিল । বিশালগড় বাজার বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে ও মেলাঘর, ফটিক রায়ের মত উন্নত ছিল । এখানেই গড়ে ওঠে ১৯৪৯ সালে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় । এই বিদ্যালয়টি গড়ে উঠতে

প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিশালগড় থানার দারোগা হরিদাস মুখার্জী ।

শ্রী মুখার্জী থানার কাজের ব্যস্ততার মাঝে ও স্থানীয় আড্ডার লোকদের এবং অবশ্যই গন্যমান্যদের সভায় প্রস্তাব দিলেন— "চলুন একটা স্কুল খুলি" । এই মহতী প্রস্তাবকে সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে এলেন বৈষ্ণব চরণ সাহা, চাঁন মিঞা মাষ্টার, মন মোহন সাহা, অশ্বিনী কুমার ভৌমিক, সারদা চরণ সাহা ও ললিত মোহন সাহা প্রমুখ ব্যক্তিগণ । ঐ সভাতেই ললিত মোহন সাহার বাজারের ঘরেই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল । কিছুদিন পরেই বিদ্যালয়টি বর্তমান টাউন স্কুলের পাশে নদীর পাড়ে উদ্বাস্তুর জন্যে তৈরী করা ছন বাঁশ ও মুলীর তৈরী ঘরে চলে যায় ।

এরপর নদীর ভাঙ্গণ ও স্থানাভাবের জন্য এবং এপিলিয়েশনের জটিলতার প্রশ্নে উঠে যায় জাঙ্গানিয়ার সাব্রুম আগরতলা রাস্তার ধারে । এখানে কবরস্থান ছিল ।

এ সব খরচ খরচা আসতো জন সাধারণের চাঁদা ও মুষ্টি ভিক্ষা থেকে । বিদ্যালয় তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হল প্রধান শিক্ষক কে হবেন ? কর্মোদ্যোগী বৈষ্ণব চরণ সাহা আগরতলা এসে কংগ্রেস নেতা শচীন সিংহকে অনুরোদ করলেন। শচীন বাবুর অনুরোধে তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত প্রথম প্রধান শিক্ষক হন । মাস দুই'র মধ্যেই তিনি জ্ঞানেন্দ্র লোচন মজুমদারের হাতে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে দেন । উল্লেখ থাকে যে ঐ সময় তিনি প্রগতি বিদ্যাভবনের দায়িত্বে ছিলেন। বিদ্যালয় সংগঠনের মত প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করাতে যে শ্রমসংগ্রাম, সমন্বয় ও সহযোগিতার মানসিকতা দরকার তাহা এই জে. এল. মজুমদারের ছিল । ১৯৬৩ সালের ২৩শে এপ্রিল, সোমবার কড়ইয়ামুড়া বিদ্যালয়ে সস্ত্রীক আমার যোগদান করার জন্য শ্রদ্ধেয় সারদাচরণ সাহার বাড়ীতে ঘর ভাড়া নেওয়া হয় । পরের দিন সেক্রেটারী শুকলাল সাহা মহাশয়ের অনুরোধে বিশালগড় স্কুলে যোগদান করি এবং আর কড়ইয়ামুড়া স্কুলে যাওয়া হল না । এখানে বিশিষ্ট লেখক ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য, অরুনোদয় সাহাকে ছাত্ররূপে পাই । আমি বিশালগড় বিদ্যালয়ে ২৩শে এপ্রিল ১৯৬৩ থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৬৪ শিক্ষকতা করেছি । খুব কাছ থেকেই জ্ঞানেন্দ্রলোচন মজুমদারকে দেখেছি । যথার্থভাবেই জে. এল. মজুমদার একজন জ্ঞান তপস্বী ছিলেন । প্রথম জীবনে তিনি পেট্রোল কোম্পানীর পরিদর্শকরূপে কাজ করেন ।

১৪। রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৈলাসহর ঃ

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দেবগুপ্ত ওরফে ব্রহ্মচারী তাপস চৈতন্য ১৯২৯ সালে পূর্ব বাংলা থেকে কৈলাসহরে এসে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন । ৺কুঞ্জুলাল চট্টোপাধ্যায়, ৺সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, ৺কুমোদ রঞ্জন ধর, ৺মনীন্দ্র বসু, মনীন্দ্র লাল ভৌমিক প্রমুখ স্থানীয় স্বজ্জন ব্যক্তিদের সহায়তায় সেই বছরই আশ্রম প্রাঙ্গণে রামকৃষ্ণ শিক্ষা সদন নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠে । ১৯৫০ সালের ১২ই জানুয়ারী স্বামীজির জন্মদিনে রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুভযাত্রা শুরু হয় । ১৯ বছর পর ১৯৬৯ সালে রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে দ্বিতল বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয় । বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে দ্বিতল বাড়ী নির্মাণ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৺নগেশ নারায়ণ চৌধুরী, মাধব লাল চট্টোপাধ্যায়, ৺মহেশ চন্দ্র পাল, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, ৺হেমেন্দ্র কুমার নন্দী, শ্রী কমলাকান্ত দত্ত পুরকায়স্থ, ৺ফণীভূষণ আচার্য, ৺চিত্তরঞ্জন আচার্য, শ্রী সুকুমার পাল, শ্রী অর্ধেন্দুশেখর ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য । স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে প্রকৃত মানুষ তৈরী করার সাধনায় রত রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৈলাসহর তথা উত্তর ত্রিপুরার একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ।

১৫। কাতলামারা হাইস্কুল ঃ

সদর উত্তর ত্রিপুরার একপাশে ঈশানপুর, অন্যপাশে সিমনা, মধ্য অংশটাই কাতলামারা । প্রয়াত প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত, বিধানসভার সদস্য ও প্রভাত দেববর্মার নেতৃত্বে ১৯৫৮ সালে কাতলামারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয় । মেঘলিবন্দ চা বাগানের শিক্ষানুরাগী চা শ্রমিক প্রয়াত বিমা মাহির দান করা জমিতে স্কুলটি আরম্ভ হয় । স্কুলের পরিচালন কমিটির প্রথম সম্পাদক হয়েছিলেন প্রয়াত প্রমোদ দাসগুপ্ত স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । উনার নেতৃত্বে প্রয়াত মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রয়াত ললিত চৌধুরী ও অন্যান্যরা স্কুলের পঠন-পাঠনের দায়িত্ব নেন । এক সময় প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ছিলেন লেখকের অতি প্রিয় অগ্রজ কমিউনিস্ট নেতা এবং পরে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন । পরবর্তীকালে অনঙ্গ মোহন পাল, রিলিপ ডিপার্টমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, হীরালাল সেনগুপ্ত, দুজন আগরতলায় চাকরী পেয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন । প্রয়াত প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের অনলস প্রয়াসে স্কুলটি মাধ্যমিক স্তর অবধি ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন লাভ করে । ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে রাজ্য সরকার স্কুলটি অধিগ্রহণ করে এবং বিমা মাহিরের দান করা জমিতে রাজ্যসরকার স্কুলের উপজাতি ছাত্রদের জন্যে ছাত্রাবাস তৈয়ার করেন ।

১৬। মহাত্মাগান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ঃ

মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অবস্থান হ'ল রাজধানীর পূর্ব-

দক্ষিণ কোণে হাওড়া নদীর কাছে এবং এম. বি. বি. কলেজের পার্শ্ববর্তী স্থানে । এখানে এক সময় বন্য হাতীর উৎপাত ছিল । মহাত্মা গান্ধী স্কুলের পাশেই কলেজের কাঁচা হোস্টেলের কাঁটা তারের বেড়ার কাছে শিকার প্রিয় চিফকমিশনার রঞ্জিত রায় পালং দাঁতি নামের বন্য হাতিকে ১৯৪৯-র ২১শে অক্টোবর হত্যা করেন এবং ১৯৫০ এর মার্চ মাসে কলেজের অপর প্রান্তে ছাত্রদের খেলার মাঠের পশ্চিমে হত্যা করেন - 'গনেশ' নামের আর একটি হাতিকে ।

এখন যেখানে বিদ্যালয়ের ক্লাশ রুম এখানেই সমাজসেবী আইনজীবী যোগেন্দ্র দত্ত মহাশয় তার নিজস্ব বাড়ীতে একটি বড় কাঁঠাল গাছের তলায় ১৯৪৯ সনে কঁচি কাঁচাদের পাঠশালাটি আরম্ভ করেন । এই শিশুদের পড়ার স্থানটির নাম ছিল - দত্তবাড়ীর পাঠশালা। শিক্ষকরূপে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন অক্ষয় কুমার দেবরায় ও তার স্ত্রী তরঙ্গবালা দেবরায়। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন ইন্দুশ্বর সাহা । পরবর্তী সময় শিক্ষকতায় যোগদান করেন বিনা পারিশ্রমিকে জীতেন্দ্র নাথ দে, গুরুধন দত্ত ও প্রিয়ব্রত ভরদ্বাজ । ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যখন বাড়লো তখন যোগেন্দ্র দত্ত মহাশয় পাড়ার অন্যান্য গণ্য মান্যদের বিদ্যালয়টি পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন । এগিয়ে এলেন অধ্যাপক সুরেশ পালদের মত শিক্ষাদরদী ব্যক্তিরা । পরিচালন কমিটির সম্পাদক হলেন যোগেন্দ্র দত্ত, সভাপতি অনিল ভট্টাচার্য্য এবং প্রধান শিক্ষক হলেন শৈলেশ সেন এম. এ. বি. টি. । এই সময় বিদ্যালয়টি পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা হল।

১৯৫১ সালে আবার নূতন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয় । এই সময় বিদ্যালয়কে দশম শ্রেণীতে আনায়ন করা হ'ল । সেক্রেটারী হলেন অমর চক্রবর্তী, এবং সভাপতি হলেন শচীন্দ্র লাল সিংহ । এই সময় দত্ত বাড়ীর পাঠশালার নাম বদল করে রাখা হয় মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাইস্কুল। প্রধান শিক্ষক হলেন ক্ষিরোদ মোহন লোধ । ১৯৬২ সালে বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয় । পরবর্তী সময় কর্তৃপক্ষ স্বৈরাচারী দাম্ভিকতা প্রকাশ করলে শিক্ষক শিক্ষিকারা আন্দোলনে নেমে পড়েন । গান্ধী মেমোরিয়াল, রামঠাকুর পাঠশালা, কড়ইমুড়া এ পর্য্যায় এসেছিল । রামঠাকুর পাঠশালায় আমরা কয়জন একরাত কাটিয়ে দিলাম পি. জি. দত্ত হুশিয়ার হুশিয়ার শ্লোগান দিয়ে ।

১৭. প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির : (CBSE অনুমোদিত সহশৈক্ষিক ইংরেজী মাধ্যম দশম শ্রেণী বিদ্যালয়)

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ, যিনি ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষীরোদ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর

জয়নগরস্থিত বসতবাড়ীর কিছু অংশ ভারত সেবাশ্রম সংঘকে দান করেন । ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'হিন্দু মিলন মন্দির' । এর উদ্দেশ্য ছিল স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের আদর্শ ও বাণী প্রচার । হরিপদ দত্ত নামক জনৈক ভক্ত এই মন্দির নির্মাণে অর্থসাহায্য প্রদান করেন । পরবর্তী সময়ে হিন্দু মিলন মন্দিরের পরিচালন সমিতি স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ২৬শে জুন ১৯৯৫ ইং জয়নগরে স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ । বারোজন ভক্ত ১০০/- টাকা করে দান করে এই বিদ্যালয়টি চালু করেন । বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির প্রথম সম্পাদক ছিলেন মঞ্জু বিশ্বাস ।

যখন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি বিদ্যালয়ের পরিসর বাড়ানোর জন্য চিন্তাভাবনা করছেন, এমনি সময় জয়নগর নিবাসী বিমলেন্দু চক্রবর্তী মহোদয় স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কাঞ্চনপল্লীস্থিত বসতবাড়ী এবং খালি জায়গা ভারত সেবাশ্রম সংঘকে দান করেন । জয়নগর থেকে বিদ্যালয়টিকে ঐ বাড়ীতে স্থানান্তরিত করার চিন্তা ও চেষ্টা চলতে থাকে । আগরতলার ও. এন. জি. সি. কর্তৃপক্ষ ঐ বাড়ীটির দোতলা নির্মাণের জন্য ২ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করেন । পরবর্তী সময়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বহু লোকের আর্থিক সাহায্যে কাঞ্চনপল্লীর বাড়ীটির তিনতলা নির্মিত হয় এবং ২০০১ ইংরেজী বর্ষে বিদ্যালয়টি জয়নগর থেকে কাঞ্চনপল্লীতে স্থানান্তরিত হয় । জয়নগরের পূর্বতন বিদ্যালয়ভবনটিতে একটি তিন বৎসরের পাঠ্যক্রম সম্বলিত প্রাক্ প্রাথমিক (নার্সারী) বিদ্যালয় বর্তমানে প্রচলিত আছে ।

১৯৯৫ ইংরেজী বর্ষে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাপর্ব থেকে ২০০৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়টির অধ্যক্ষা ছিলেন শ্রীমতী নিভা দেববর্মণ । বর্তমানে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে রয়েছেন শ্রী নারায়ণ বণিক মহাশয় । এড্‌মিনিষ্ট্রেটররূপে দেখা শুনা করছে । বর্তমানে শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য মহাশয় ।

বিদ্যালয়টির নির্মাণ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন শৈলেশ নন্দী, নারায়ণ বণিক, ডঃ স্বপন কুমার মুখার্জ্জী, শ্রীমতী নিভা দেববর্মণ, মাখনলাল চক্রবর্তী প্রমুখ । এছাড়াও আরো অনেকের অবদান অনস্বীকার্য ।...

১৮। রাণীর বাজার বিদ্যামন্দির ঃ

রাণীরবাজার পুরাতন আগরতলার পার্শ্ববর্তী গ্রাম । এই স্থানের নাগরিকগণ রাজ আমল থেকেই শিক্ষা-সংস্কৃতিতে শহরের নাগরিকদের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না ।

রাণীরবাজার অবশ্য একটি বাজার ও মহারাণীর খনন করা দুটি দীঘিও এই বাজারের অর্ন্তভূক্ত । এই বাজারের দক্ষিণে আসাম পাড়া উত্তরে ঘোড়া ঘারা নদী, পশ্চিমে হাওড়া নদী, পূর্ব্বে দেবীনগর গ্রাম । পাশেই নলগড়িয়া । এই নলগড়িয়া গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি গোপাল চন্দ্র সাহা । তিনি এই অঞ্চলের এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকারী। রাজ আমল থেকেই রাণীরবাজারের অন্য একজন প্রবীন ব্যক্তিত্ব শচীন্দ্র বনিক । শচীন্দ্র বনিক মহাশয় গোপাল বাবুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য উদ্ধুদ্ধ করেন । গোপাল সাহা মহাশয়ের বাড়ী নলগড়িয়া । তাঁর পাশের বাড়ীর শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূষন চন্দ্র দেবনাথ ও ডাক্তার মনিন্দ্র আচার্য্য প্রমুখ শিক্ষানুরাগীদের সুপারিশে ১৯৪৫ ইং সনে নিজ বাড়ীতে একটি প্রাথমিক স্কুল শুরু করেন । দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তুদের আগমনে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্র সংখ্যা ও বাড়তে থাকে । গোপাল বাবুর নিজের খরচে এই প্রতিষ্ঠান চালানোর ক্ষমতা থাকলে ও স্থান সংস্কুলানের অভাব দেখা দেয় । তাই গোপাল বাবুর নিজস্ব আরেকটি বিস্তৃত জায়গায় ১৯৫৪ সালে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করেন । তখনই বিদ্যালয়টি প্রাথমিক থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নিত হয় । সামান্য বেতনে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তো । উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্থানীয় শিক্ষক প্রাণনাথ সরকার । প্রধান শিক্ষক হিসাবে নূতন করে গোপাল বাবু মনোনীত করেন শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম মহাশয়কে । তাঁর প্রধান শিক্ষকের পদে যথেষ্ট দক্ষতার জন্যে বিদ্যালয়ের শ্রী বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। প্রধান শিক্ষকের প্রেরণায়, তাঁর বিশেষ পরিচিত মেখলিপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার মহাশয় একটি পাকা বিল্ডিং তৈরী করে দেন । ঐ নবনির্ম্মিত দালানে বিজ্ঞান ভবনের উদ্বোধন হয় ।

গোপাল সাহা মহাশয় স্কুল পরিচালনা কমিটির সম্পাদক ও আজীবন সদস্য ছিলেন। তাঁর কায়িক শ্রম এবং প্রধান শিক্ষক শৈলেশ চন্দ্র সোমের ঐকান্তিকতায় এই বিদ্যালয় সরকারী গ্রান্ট-ইন-এইড এর অনুমোদন লাভ করে । ১৯৬৪ ইং সনে শৈলেশ বাবুর স্নাতক সার্টিফিকেট এর বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয় । ফলে শিক্ষা বিভাগ তাঁকে প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে দিতে নির্দ্দেশ দেন । পরে তিনি ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রীর পদে বৃত হন । শৈলেশ বাবুর পরে যথাক্রমে সুরেন্দ্র সিংহ মহাশয় ও হরিহর সাহা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য পরিচালনা করেন । তারপর পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার ও সম্পাদক শ্রী মধুসূদন দাস । তাঁদের প্রচেষ্টায় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন অনন্ত ধর মহাশয় ।

১৯। যতীন্দ্র কুমার উচ্চ বিদ্যালয় ঃ

সদর পূর্ব্বাঞ্চলের রাণীরবাজারের দক্ষিণ পূর্ব্বে বড়মুড়া পর্ব্বতের অন্তর্গত রঘু.

ন্দন পাহাড়ের নীচ থেকে বয়ে আসা হাওড়া নদীর দক্ষিণ পাড়ে পূর্ব্ব নোয়াগাঁও পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পার্শ্বে পাহাড়ী বসতি এলাকা। ১৯৬৪-৬৫ সনে ভূত পূর্ব্ব মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়ের প্রেরণায় ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকরা জঙ্গল কেটে এই খাসভূমিতে বসতি স্থাপন করে। ঐ এলাকার পশ্চিমাংশে চা বাগান সংলগ্ন টিলা ভূমিতে ১৯৯৬-৬৭ সালে গরীব শ্রেণীর মানুষ বসবাস করতে শুরু করে।

এদের সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক। এরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে লাগল। তিন মাইলের মধ্যে কোন স্কুল ছিল না। শিক্ষা সমস্যার সমাধানে গ্রামের কিছু উৎসাহী ব্যাক্তি চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে প্রেমচান্দ উরিয়া, রাজকুমার রবিদাস, হীরালাল উপাধ্যায়, আশ্বিনি বর্ম্মন, কমল দেবনাথ প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তাঁরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়ের নিকট শিক্ষাগার স্থাপনের আবেদন জানায়। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরে জানালেন; নিজেদের চেষ্টায় বিদ্যালয় গৃহ শুরু করার পরই শিক্ষা বিভাগ তা অধিগ্রহণ করবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দ্দেশে বিদ্যানুরাগীদের উৎসাহে সাময়িক ভাঁটা পড়লে ও তখনকার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মজুমদারকেই এই সঙ্কটে নিরাময়ের যোগ্য ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন। প্রধান শ্রীযুক্ত মজুমদার গ্রামের উন্নয়নে নিজকে আত্মনিয়োগ করেন। তাই গ্রামবাসীদের আশ্বস্থ করেলেন; যেই করেই হোক্ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করবেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রামের লোকজন সমতলভূমিতে নিজেদের অর্থ ও শ্রমে একটি বিদ্যালয় গৃহ গড়ে উঠে। এমনকি জনগণের আর্থিক সাহায্যে বিদ্যালয়ের বেঞ্চ সহ অন্যান্য আসবাব পত্রাদিরও ব্যবস্থা হয়। বিনা বেতনে কতিপয় বেকার যুবকদের নিয়োগ করেন। এদের মাঝে ছিলেন হরিপদ ভৌমিক, ফলচন্দ্র সিংহ, প্রফুল্ল দেবনাথ নারায়ণ দাস, সুনীল দেবনাথ, পরেশ সাহা প্রমুখ। গ্রামবাসীগণ যতীন্দ্র কুমার মজুমদারের কর্মদক্ষতা ও শিক্ষানুরাগে মুগ্ধ হয়ে স্কুলের নামকরণ ও তাঁর নামেই করার প্রস্তাব করেন। কালক্রমে শ্রীযুক্ত মজুমদারের ঐকান্তিকতায় এই বিদ্যালয়টি গ্রান্ট-ইন-এইড অনুমোদন লাভ করে।

২০। সরোজিনী নার্সারী স্কুল ঃ

২০০২ সালের ২রা জানুয়ারী স্থানীয় নেতাজী সেবা সংঘের পরিকল্পনায় ও দত্ত স্কুল অফ এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় ঈশান চন্দ্র নগরের কিস্‌মৎ কুড়ি গ্রামে মধুসূদন বিশ্বাসের বাড়ীতে সরোজিনী নার্সারী স্কুলটি যাত্রা আরম্ভ করে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় নাগরিক বৃন্দ সহ নেতাজী সংঘের সদস্য গণ বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিধুভূষন হাজরা, সমাজ সেবী শ্যামল

চৌধুরী, সুভাষ রায়, নেহেরু যুব কেন্দ্রের পরিচালিকা ও শ্রীমতী সাধনা দত্ত প্রমুখের উপস্থিতিতে এবং সুন্দর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শ্রেণী পঠন পাঠন আরম্ভ হয় ।

কে-জি ক্লাসের শিশুদের বই ইত্যাদি প্রদান করা হয় । প্রথমে ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে দিয়ে স্কুল আরম্ভ হয় । ছেলে মেয়েদের শ্লেট পেন্সিল ইত্যাদি দেওয়া হয় । প্রথম থেকেই বিদ্যালয়ে গান বাজনা আবৃত্তি শেখানো হয় । রবীন্দ্র নজরুল সুকান্ত জয়ন্তী পালন করা হয়। প্রথম প্রধান শিক্ষিকা রূপে কাজ করছেন শ্রীমতী কল্পনা চক্রবর্তী (সেনগুপ্ত) । ২০০৪ সালের সুনামিতে জলোচ্ছাস ও ভূমিকম্পে পীড়িত মানুষদের ২০১ টাকা সাহায্য গাঁও প্রধানকে দেওয়া হয় ।

২১। ভোলাগিরি আশ্রম স্কুল আগরতলা ঃ

১৯৫৩ ইংরেজী সন । চারিদিকে ভক্ত শিষ্যদের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছিল, পরম পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীশ্রী ১০০৮ মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ পাঁচ জন সন্ন্যাসী সহ হরিদ্বার থেকে এসে আগরতলায় বনমালীপুর পূর্ব থানার পাশে, স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র দে মহাশয়ের বাসভবনে পদার্পণ করছেন ।

মহারাণী কমলপ্রভা দেবী গুরুদেব মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজকে স্ব-সম্মানে রাজ বাড়ীর অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে আগরতলায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য অভিপ্রায় জানালেন। গুরুমহারাজের মনে মনেও এই ইচ্ছাই ছিল ।

১৯৫৪ সালে হরিদ্বার থেকে আশা হারানন্দ গিরি মহাশয় সিদ্ধান্ত নিলেন যে সেবা কার্য্যের জন্য একটি গোশালা ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে । ঐ সময়ে এই এলাকায় লোকবসতি কমছিল । শিশুদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চা একেবারেই ছিলনা বলা যায় হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার ছাড়া । কমিটির প্রচেষ্টায় আশ্রমের পাশের টিলাভূমিতে তৈরী হল ছন-বাঁশের তৈরী ঘর । ললিত মোহন দেবনাথ নামে আশ্রমেরই একজন শিষ্যকে বিনা বেতনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হল । ছাত্র ছিল ২৫/৩০ জন। রেশমবাগান থেকে তিনি প্রতিদিন পায়ে হেঁটে স্কুলে আসতেন । এ-যে কতবড় ত্যাগ, চিন্তাশীল ব্যক্তি অনায়াসে তা উপলব্ধি করতে পারবেন । ১৯৬২ ইং সনে স্কুলের প্রয়োজনে আলাদা করে একটি স্কুল কমিটি তৈরী করা হল সভাপতি হলেন আশ্রম অধ্যক্ষ । সম্পাদক হলেন হেমচন্দ্ররায় মহাশয় । ক্রমে ক্রমে ছাত্রসংখ্যাও বাড়তে থাকলো । শিক্ষকের অভাব হেতু রায় মহাশয় তাহার স্ত্রী যুথিকা রায় মহাশয়াকে বিনাবেতনে স্কুলে পাঠাতেন । দুই বছর তিনিও রামনগর ৬নং রাস্তা হতে কোনসময় রিক্সায় কোনসময় পায়ে হেঁটে নিয়মিত স্কুলে

আসতেন । সেসময় আচমকাই এলেন অমর রায় মহাশয় । তিনি হেমচন্দ্র রায় মহাশয়ের পরিচিত ছিলেন । হেমচন্দ্র বাবুর অনুরোধে অমর বাবুও বিনাবেতনে কৃষ্ণনগর থেকে পায়ে হেঁটে নিয়ামিত স্কুলে ক্লাশ নিয়েছেন । তখন অমরবাবুকে নিয়ে স্কুলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করলেন হেমবাবু ১৯৬৩ ইং মার্চ মাসে । শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন পাওয়ার জন্য 'grant-in-aid' নিয়ম অনুযায়ী দরখাস্ত করা হয়েছিল । শিক্ষক নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনজনের নামের তালিকা পেশ করে আগাম অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল । দুঃখের বিষয়, যেহেতু ললিত মোহন দেবনাথ মহাশয়ের অনেক বয়স হয়চিল এবং তিনি পাশ করা ছিলেন না তাই উনার নামে অনুমোদন আসে নাই । শিক্ষা বিভাগ থেকে ১৯৬৪ ইং সনের ১লা মার্চ হতে দুইজন শিক্ষক সহ 'grant-in-aid' নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল ।

স্কুল বাড়ী তৈরীতে সম্পাদনা হেমচন্দ্র রায় সম্পাদক সীতানাথ দে, শিক্ষক সত্যরঞ্জন দাস মহাশয়ের সহযোগীতায় নির্মাণ কাজে সহায়ক হয়েছিল । ২০০৫ সালে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে সত্যরঞ্জন দাস সম্পাদক নির্বাচিত হন ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

লেখক নিধুভূষণ হাজরার জন্ম ২২শে সেপ্টেম্বর - ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালি জেলার সোনাই মুড়ি গ্রামে । পিতা ডাঃ শিবচরণ হাজরা, মাতা-কণকপ্রভা হাজরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. বি. টি. । ত্রিপুরায় ১৯৫৯ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ে চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণ করেন । ছাত্রজীবন থেকে সাহিত্য চর্চা করেন । তাঁর গল্প প্রবন্ধ নাটক ও কবিতার ১৫ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । ১৯৭১ সাল থেকে কালান্তর পত্রিকার সংবাদদাতা এবং স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য। তিনি ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং বামপন্থী রাজনীতির উপর নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে চলছেন । তিনি বে-সরকারী শিক্ষক সমিতি, বাবাসাহেব আম্বেদকর স্যোসাইটি, শিক্ষাবাঁচাও, ত্রিপুরা শরৎ পরিষদ, নজরুল পরিষদ, ত্রিপুরা বঙ্গ-সংস্কৃতি সংসদসহ অনেকগুলো সংগঠনের সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন । হরিচরণ গবেষণাগার থেকে 'ত্রিপুরা ভাস্কর' সম্মান লাভ করেন । তিনি ত্রিপুরা স্টেট কলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য । ২০০০ সালে আসামের ধুবড়ী থেকে সাহিত্যে পুরস্কার লাভ করেন ।

******

ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেবদাসীদের অবদান

— নিরুপমা সিংহ

মানুষ সামাজিক জীব । তাই তার দৈহিক ক্ষুধা ছাড়াও সাংস্কৃতিক ক্ষুধা রয়েছে । সংস্কৃতিকে যদি সভ্যতার নির্যাসরূপে কল্পনা করা যায় তাহলে এই সংস্কৃতির চতুরঙ্গ হচ্ছে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও নৃত্যকলা । বিশ্বপ্রকৃতির চাঞ্চল্যে যে সৌন্দর্য্য নৃত্য তাই ভাষা, সাহিত্য বা অন্যান্য শিল্প মাধ্যম গড়ে উঠার আগেই নৃত্য হল মানুষের ভাবপ্রকাশের প্রাচীনতম বাহন । মানুষের সেই প্রকৃতির অনুকরণের নৃত্যের ছন্দোবদ্ধ মূর্তি চিত্রকর ও ভাস্করের মনে আনল সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পরে ভাষার আবিষ্কারে ঝংকৃত হল উজ্জ্বল ।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা, উৎকর্ষে, রূপ পরিকল্পনায় ও ভাবরসের ঐশ্বর্যে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও দর্শনের স্বভাবসুন্দর পরম অভিব্যক্তি । ভারতের নৃত্যকলা বিশ্বসংস্কৃতি-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ । ভারতীয় শিল্পকলা ও ললিতকলার সমৃদ্ধিতে সুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদ্ সাহিত্যের অবদান অসামান্য । মহর্ষি বেদ ও উপনিষদ্ সাহিত্যের অবদান অসামান্য । মহর্ষি-ঐতরেয় ছিলেন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় ।

ভারতের নৃত্যকলার অন্যান্য ধারার মতো 'ভরত নাট্যম্' নৃত্যপদ্ধতির মূল ভাবধারাও ধর্মভিত্তিক ও দেবতাকেন্দ্রিক । এই নৃত্যকলার উৎস সন্ধানে মন্দির ও দেবদাসীদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান বিশেষ প্রয়োজন । অনেকে সেজন্য এই নৃত্যধারাকে 'দাসী আট্যম্' নামে অভিহিত করতেন । অতি প্রাচীনকাল থেকে দেবমন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেবতার প্রীতি উৎপাদনের জন্যে দেবদাসীদের নৃত্যগীতি পরিদর্শনের প্রথা প্রচলিত ছিল। চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত পদ্মপুরাণে স্বর্গে পুণ্যলাভের জন্যে দেবতাকে সুন্দরী স্ত্রী উৎসর্গ করার উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে দেবতার প্রীতির জন্যে নৃত্যগীতিকুশলা দেবদাসীদের উল্লেখ আছে ঃ

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ঃ —

"ননৃতুশ্চ তথা তত্র বহবোহপ্সরসাং গণাঃ ।

পুষ্পবৃষ্টিমুচো মেঘা জগর্জ মৃদুর্নিঃনা! ।।"

ভবিষ্যপুরাণে সূর্যের উপাসনায় নৃত্যগীতিকুশলা স্ত্রীলোকদের উৎসর্গ করার বিবিধ উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবমন্দিরে নৃত্যগীতানুষ্ঠানের রীতির উল্লেখ পদ্মপুরাণ স্কন্দপুরাণ,

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপরাণ ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায় । শিবপুরাণে শিবমন্দির নির্মাণ ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অন্যান্য নির্দেশের সঙ্গে নৃত্য ও গীত এই উভয় কলায় নিপুণা শতসুন্দরী স্ত্রীলোক দেবমনোরঞ্জনের জন্যে নিয়োগের নির্দেশ আছে ।

কল্হন রচিত 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের রাজত্বকালে দেবদাসী. (৯৮৫-১০১৪খ্রীষ্টাব্দে) তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরে চারশত দেবদাসীর অস্তিত্বের কথা ইতিহাসে বিবৃত আছে । গজনীর সুলতান মামুদের সময় ১০২৪খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন তখন সেখানে পাঁচশত দেবদাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায় ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুধাবন করলে মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক অর্থাৎ পুরাণের কাল থেকে দেবদাসীদের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের এক গুহালিপিতে প্রাচীনতম দেবদাসী সুতনুকার নাম পাওয়া যায় । মধ্যপ্রদেশের রামগড় পাহাড়ে দুটি গুহা - একটি যোগীমারা অপরটি সীতাবেঙ্গা । এই গুহার প্রবেশ দ্বারে ডানদিকে মাগধী ভাষার পাঁচটি ছত্র খোদিত আছে ।

"শুতনুকানাম

দেবদাসিক্যী

শুতনুক নাম দেবদাসিকী

তং কাময়িথ বালানশেয়ে ।

দেবদিন্নে নাম লুপদক্খে ।।"

অর্থাৎ সুতনুকা নামে এক দেবদাসী বারাণাসীর (মতান্তরে তরুণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম) দেবদত্ত নামে এক শিল্পীকে ভালবেসেছিল । এই লিপিই দেবদাসী অস্তিত্বের প্রাচীন নিদর্শন।

জুনাগড়ের উপরোকোট গুহাচিত্র, পাণ্ডুলেন চৈত্য-মন্দিরের (নাসিক) নাট্যশালার ভাস্কর্য্যলিপি, অমরাবতীর ভাস্কর্য্যচিত্র, বারহুত (খৃঃ পূঃ ১৫০) সাঁচী, (খ্রীষ্টপূর্ব - ১ম শতাব্দী) বৌদ্ধ বিহারের ভাস্কর্য্যে দেবদাসীদের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় । খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় থেকে ২য় শতকের মহাযানও নৃত্য, গীত ও দেবদাসী প্রথার উল্লেখ আছে । সমগ্র মৌর্য্য যুগে বিভিন্ন ভাস্কর্য্যে ধর্ম, সামাজিক আচারে ব্যবহারে ও প্রমোদ অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যে সমারোহ সেখানেও দেবদাসীরা অনুপস্থিত নন । থেরগাথা ও থেরীগাঁথাতেও তথাকথিত Vestal Virgin, Nun বা দেবদাসীদের অনুরূপ চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়।

অপ্সরারাই মর্তে দেবদাসী । তা প্রমাণ করার জন্যে শাস্ত্রকাররা নানা মনোহর কাহিনী রচনা করেন । যেমন শাপভ্রষ্টা উর্বশী, মেনকা ইত্যাদি । মনু থেকে সকলেই এরকম নির্লজ্জভাবে রাজতন্ত্রও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর পক্ষে অবাধ বঞ্চনার সুযোগ করে দিয়েছেন ।

এই নারীমেধ যজ্ঞের ইতিহাসে বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে । রাজা যযাতি আপন স্বার্থ-চরিতার্থ করার জন্যে গালব তাঁর কন্যা মাধবীকে পণ্যশুল্ক হিসাবে ব্যবহার করবে জেনেও দেহব্যবসায়ে কন্যাকে দান করলেন । যতই মোহনীয় উপাখ্যানের মোড়কে জ্ঞানগর্ভ কথা বলা হোক না কেন, রাজকন্যা মাধবীর ভবিষ্যৎ জীবনে দেবদাসী বা গণিকা হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না । বিদেশেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে । মিসরের রাজত্ব যখন 'তানিস-এর ফারাও থিবস্ এর প্রধান পুরোহিতের হাতে, তখন তানিস-এর রাজকন্যারা থিবস মন্দিরে 'আমনদেবের স্ত্রী' রূপে রাজাজ্ঞায় উৎসর্গীকৃত হতেন । এর পিছনে একটি কূটবুদ্ধি কাজ করত, তা হল এই যে ঐ কন্যাদের সন্তানরা যাতে রাজসিংহাসনের দাবীদার না হতে পারে । কাজেই দেখা যাচ্ছে আসলে ধর্মীয় অনুশাসনের পিছনে সর্বত্রই কাজ করছে বিষয়বুদ্ধিগত বঞ্চনার ইতিহাস ।

ঋক্‌বেদে বারবণিতার উল্লেখ পাওয়া যায় । উল্লেখ আছে বৌদ্ধজাতকগুলিতে নৃত্যজাতক, ভেরীবাদক জাতক, শঙ্খ জাতক, মাস জাতক, সর্বদ্রষ্ট-জাতক, অসদৃশ্য জাতক, ভদ্রঘট জাতক, গুপ্তিল জাতক , ক্ষান্তিবাদী-জাতক, কাকবতী জাতক, পাদকুশল জাতক ও কুশ-জাতক প্রভৃতিতে এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায় । ললিতবিস্তার গ্রন্থে ''সনোকাপ্সরাঃ শতসহস্র নৃত্যগীতবাদিত পরিগীতি''— প্রভৃতি সূত্রও উল্লেখযোগ্য । 'কথাসরিৎসাগর'—এ দেবদাসী রূপিণীকার উপাখ্যান পাওয়া যায় । রূপিণীকা ছিল মথুরার মন্দিরের দেবদাসী। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, উত্তর ভারতেও দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল । তবে মুসলমান আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের থেকে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজাদের আনুকূল্যে দেবদাসীপ্রথা অনেক বেশী প্রসার লাভ করে । শ্রীপান্থের বক্তব্য ঃ রূপিণীকাকে উপলক্ষ্য করে পেনজার কথাসরিৎসাগর এর প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে দেবদাসী প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । আলোচনাটি অত্যন্ত মূল্যবান তাঁর উল্লিখিত সূত্র ধরে দেবদাসী সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানা যায় । জাতকে উল্লেখ আছে —'কুট্টিনীমতম্-এর বিবরণ পড়ে অনেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরেও এক সময় দেবদাসী বাহিনী ছিল । জৈন ধর্মগ্রন্থেও মহাবীরের অভ্যর্থনায় দেবদাসীদের নৃত্যের বিশেষ বিবরণ দিয়েছেন । কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কমলার প্রসঙ্গ থেকে বাংলাদেশে দেবদাসী প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় । কাশ্মীররাজ পুণ্ড্রবর্ধন কার্তিকেয় মন্দিরের দেবদাসী কমলাকে মন্দিরের পুরোহিতদের প্রভূত অর্থ প্রদান করে কাশ্মীরে নিয়ে যান ।

চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত পদ্মপুরাণে স্বর্গে পূর্ণ কল্পলাভের জন্যে দেবতাকে সুন্দরী নারী উৎসর্গ করার বিধির উল্লেখ আছে । দশকুমার চরিতের কামমঞ্জরী, ধোয়ীর পবনদূতে মন্দির নর্তকী দেবদাসী বারবামাদের বিবরণ আছে ।

উমাপতি ধর-এর দেওপাড়া প্রশস্তিতে বিষ্ণুমন্দিরের দেবদাসীদের বিবরণ পাওয়া যায় । দক্ষিণী প্রভাব সেন বর্মণ আমলে এই প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল বাংলাদেশে,

বিশেষতঃ নগর সমাজে। উড়িষ্যায় দেবদাসীদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাদের বলা হত 'মাহারী' বা 'সুরবেশ্যা'। 'মাহারী সেবকে কাহারি সঙ্গে অঙ্গসঙ্গনা থেকে। তুলসী কণ্ঠ গলায় বান্ধিবে। পরমেশ্বরকে দাসী তুল্য চলিবে। সুরতাল যথাযথ রক্ষা করতে হবে, ভঙ্গ করা চলবে না। শ্রীমঙ্গল বচনিকা, ঝুটি, আটতালি এই কটি তাল আশ্রয় করে নাচতে হবে, এবং গীতাগোবিন্দের অনুসরণ করতে হবে, ইত্যাদি বহুনির্দেশ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল—

একাদশ শতকে রচিত রামদেব সংহিতায় জগন্নাথের পূজায় দেবদাসীদের নৃত্যগীতের বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

'শয্যাকালেতু কর্তব্যং পুষ্পাঞ্জলি গনৈঃসহ জয় বিভাদ্বারেণ শয়নাত্রিকং চরৎে।

গায়িকা নর্তকীরম্যে গীতাঞ্জলৈঃ—''

মণিপুরের দেবদাসীরা মৈতি ভাষায় মৈবী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে কৃষ্ণদাসীরও সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিমভারতে ও দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। কুলবন্ত, ভাবিন, দেবালি, নাইকিন, ভগতানি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। ভাবিন এর অর্থ রূপসী, দেবলীর অর্থ দেবদাসী, নাইকিন্-এর অর্থ রক্ষিতা। ভগতানি এর অর্থ ঈশ্বর বা তাদের প্রতিনিধিস্বরূপ পুরোহিতদের দেবদাসী। এরা সকলেই রূপজীবিণী। কুলশীল সম্পন্ন মান্য পরিবার থেকে সংগৃহীত দেবদাসীদের বলা হতো কুলবন্তী।

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যেও দেবদাসীর উপস্থিতির

'পাদন্যাসৈ ঃ ক্বণিত-রসনা-স্তত্র লীলাবধূতৈঃ

রত্নচ্ছায়া খচিত-বলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্ত হস্তাঃ।

বেশ্যা স্তত্তো নখপদ-সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূন্

আমোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকর শ্রেণী দীর্ঘান্ কটাক্ষান্।।

ভবিষ্যপুরাণে সূর্যের উপাসনায় নৃত্য গীতিকুশলা রমণীদের উৎসর্গ করার বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। শিবপুরাণে শিবমন্দির নির্মাণ ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অন্যান্য নির্দেশের সঙ্গে মনোরঞ্জনের জন্যে নৃত্যগীতিনিপুণা স্ত্রীলোক নিয়োগের নির্দেশ আছে। বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে একই নির্দেশ পাওয়া যায়।

দেবদাসী সংগ্রহের বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যার কোরাপুট অঞ্চলের নৃত্য নিপুণা 'গুণী'দের কিভাবে দেবদাসী থেকে গণদাসীতে রূপান্তরিত করা হত সে প্রসঙ্গে নৃতাত্ত্বিক আর্সটিন এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ"Guni is the name of Oriya dancing girls and prostitutes. It is dirived from the Sanskrit 'guna' meaning

qualification and skill in reference to their possession of qualification for and skill acquired by training when young. There were the other dancing girls whose apparent function was to dance to the temples but whose actual function was prositution" অর্থাৎ এককথায় দেবদাসী প্রথার আবরণে নারীপণ্যের অবাধ বাণিজ্য ।

এই পণ্য সংগ্রহের কাহিনী সব দেশেই বিচিত্র । পশ্চিম আফ্রিকার পুরোহিতরা এক নির্দিষ্ট শুভদিনে গৃহদ্বারের বাইরে যত সুন্দরী কুমারী মেয়ে, তারা সবাই মন্দিরের সম্পত্তি । এইদিন শেষ হয়ে গেলেও তাদের অনেকেরই আর পিতৃগৃহে ফেরা হত না । দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি মন্দিরের দাসী সংগ্রহণের বিবরণও অনুরূপ । মন্দিরের পুরোহিতবৃন্দ বেঙ্কটেশ্বরের প্রতিমূর্তি নিয়ে একটি নির্দিষ্ট পুণ্যতিথিতে শোভাযাত্রা সহকারে নগর পরিক্রমা করতেন । দর্শনার্থীদের মধ্যে যাদের পুরোহিতদের পছন্দ হত ; তারা বেঙ্কটেশ্বরের নামে সেই রমনীকে সংগ্রহ করতেন । এটা নাকি পুণ্য অভিলাষও আদেশ।

দেবদাসীদের এক বিচিত্র শাখা বাসবী । এদের সংগ্রহ সম্বন্ধীয় তথ্য মহীশূর গেজেটিয়ার থেকো জানা যায় ঃ Social evils like prostitution, traffic in woman and gambling have been prohibited by law; but they do exist a certain extent especially in towns. The 'Basavi system, which involved a sort of prostitution was prevalent in the district. In a few castes, in a few cases, the daughter instead of being given in marriage was dedicated to a god, or goddess and was turned into what is known a Basavis. Some times a girl suffering from serious illness was promised to be so dedicated, if she recovered. In a few families, it was a custom to dedicate one of their daughters, often the oldest, sometimes a girl became a 'Basavi, if she was unable to get a bridegroom. The social evil is surviving in a few places in clandestine way."

স্থানীয় অধিবাসীদেরএমন একটি প্রথাও প্রচলিত আছে যে, যে পরিবারে ছেলে নেই সবই কন্যাসন্তান, সেই পরিবার থেকে একটি মেয়েকে 'গুডীবাসবী' অর্থাৎ মন্দিরে উৎসর্গ করতে হবে । এই বাসবী প্রথাটিকেই ভালোভাবে পর্যালোচনা করলেই কেমন করে সুপরিকল্পিতভাবে দেবদাসীদের পতিতালয়ে আনা হয় তার ছবিটি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় । অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের ফলেই সংগ্রহ এর ব্যাপকতা, এর সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় আবেগ ও সংস্কার। সমাজততত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দিরে দেবযাসী নিবেদন নানাকারণে সম্ভব । (১) মন্দিরে দেবতাকে কন্যাদান বিসর্জন বা বলির রকমফের মাত্র । আপন সম্প্রদায়ের জন্যে দেবতার আশীর্বাদ চাই । অতএব তার মনোজয়ের বাসনায়

প্রিয়জনকে ত্যাগেও আপত্তি নাই। (২) দেবতার সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রকারান্তরে আদিম গোষ্ঠী বা সর্বজনীন বিবাহেরই স্মারক। দেবদাসী প্রথায় আদিম আচারকেই স্বীকার করে নেওয়া হয় মাত্র। (৩) অতিথিকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় তাকে যৌন সুখদান একটি আদিম আচার। (৪) দেবদাসী প্রথা আসলে উর্বরতার অনুষ্ঠান। পৃথিবীতে মানুষ, পশু-পাখী ফসলের কামনাতেই এই ব্রত। (৫) কুমারী মেয়ের কুমারীত্ব অন্যকে দিয়ে নষ্ট করার যে আচারের চল ছিল কোনো কোনো অঞ্চলে সেই সূত্রেই ক্রমে দেবদাসী মন্দিরে বন্দী। (৬) দেবদাসী প্রথা লোভাতুর পুরোহিত সম্প্রদায় আর নৈতিকতাহীন মানুষের এক যড়যন্ত্রের ফলমাত্র। (৭) দ্রাবিড়দের কাল হইতে ভারতে লিঙ্গপূজার যে প্রাচীন প্রথা দেবদাসী তারই আর একদিক।''

স্বর্গে দেবলোকে তাদের অপ্সরা এবং মর্তে তারা দেবদাসীরূপে পরিচিত। নরলোকে এই প্রাচীন বৃত্তিকে 'প্রাচীন পেশা' বলা হত। প্রাচীন ভারতে এই বৃত্তির মধ্যে পবিত্রতার স্পর্শ ছিল কিনা, অর্থাৎ এই রূপজীবনীদের সঙ্গে ধর্মাচারের কোনো যোগসূত্র ছিল না।

দাসপ্রথার শর্তানুসারে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এদের নৃত্যগীতই উপভোগ করতেন না, রূপলাবণ্য সম্ভোগেরও তারাই অধিকারী ছিলেন।

দেবদাসী প্রথার ফলে একদিকে যেমন নৃত্যবিধির নিয়মশৃঙ্খলাগত উৎকর্ষ সাধনের সুন্দর চিত্র পাওয়া গেলেও এই পেশার মধ্যে পবিত্রতার স্পর্শ ছিল কিনা, অর্থাৎ রূপজীবিনীদের সঙ্গে ধর্মাচারের সম্পর্ক কতখানি নিবিড় ছিল তা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। হাজার বছর ধরে ভারতের অগণিত কন্যা এই প্রথার স্বীকার হয়েছেন। আজ আইনত ভারতের সর্বত্র দেবদাসী প্রথা লুপ্ত। কিন্তু সত্যি কি তাই? কর্ণাটক, গোয়া, মাদ্রাজ এর নারীমুক্তি আন্দোলনের পুস্তিকা থেকে জানা যায়, এখনও অনেক জায়গায় অন্য নামে অশিক্ষা, সংস্কার ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের বিভ্রান্ত করে এই প্রথার মূল উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চলছে। কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের আবরণে, কোথাও অন্য ছদ্মবেশে। যেহেতু আইনতঃ দেবদাসী বা তথাকথিত দেবীশিল্পী শহরে তৈরী করা সম্ভব নয়, সেজন্য এখন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুদূর মধ্যপ্রাচ্যে তাদের এই নারীপণ্যের বাণিজ্যাভিসার চলছে।

দেবদাসী প্রথা আমাদের লজ্জা, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে দেবদাসীদের অবদান ও অনস্বীকার্য্য। 'শিলপ্পদিকরম্' গ্রন্থে আমরা নট্টুয়াঙ্গম ও দেবদাসীদের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পারি। নট, আভই ও আঙ্গম এই তিনটি শব্দের সমন্বয়ে এই শব্দটি গঠিত। এই শব্দের অর্থ হল নৃত্য সম্প্রদায়ের নেতা। সাধারণ নৃত্যশিক্ষককে নাট্টুবান্ বলা হয়। এরাই চুক্তিবদ্ধভাবে দেবদাসীদের নৃত্যশিক্ষা দিতেন। বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিতেন, বিনিময়ে আজীবন দেবদাসী পারিশ্রমিকরে অর্ধেক নাট্টুবান্‌কে দিতেন বা তাঁদের পারিবারকে দিতেন। এই অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতার ফলে স্বভাবতই একটি নিয়মিত সুশৃঙ্খল নৃত্যপদ্ধতি গড়ে উঠে এবং ক্রমশঃ তার উন্নতি ও প্রসার ঘটে।

উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গোয়া, মহারাষ্ট্র — এই সমস্ত অঞ্চলেই নৃত্যের যে প্রসার তাতে দেবদাসীদেব অবদান অনস্বীকার্য্য । বিশেষ কবে বাজদেবদাসীদেব নৈপুণ্য ছিল সর্বাধিক । শিলপ্পদিকারম্ এব মাধবী মৃচ্ছকটিকেব বসন্তসেনা, মালবিকাগ্নিমিত্রেব মালবিকা এরা শুধুমাত্র কবি কল্পনা নয় । সে যুগে ভাবতীয় সংস্কৃতিব অন্যতম দিক নৃত্যকলার অভূতপূর্ব উৎকর্ষ ঘটেছিল বলেই কবিরা শাস্ত্র ও শিল্পসম্মত বর্ণনা দিতে পেরেছেন। দেবদাসীরা ভবত নাট্যম্-এ নিপুণা ছিলেন ।

কাজেই একথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করতে হবে যে, দেবদাসীবা আজীবন বঞ্চনাব স্বীকার হয়েছেন, কিন্তু তাঁবা শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে যে নিদর্শন বেখে গেছেন, তা আজও গিরিগাত্র ও মন্দির স্থাপত্যে উৎকীর্ণ হয়ে সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবছে । নীলকন্ঠের মতো হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে তারা আমার জন্যে রেখে গেছেন এই অমৃতপাত্র ।

ঃ লেখিকা পরিচিতি ঃ

১৯৪৭ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী নবশ্যাম সিংহের ঔরসে, মৈরাং সিংহের গর্ভে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহরের তিলকপুর (কলাবাড়ীতে) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা শিক্ষক, মাতা গৃহীন ছিলেন । শ্রীমতী সিংহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স, এম. এ., বি. এড পাশকরেন । তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ট্রেনিং ও সুনামের সাথে পাশ করেন । গীতা পরিষদ্ থেকে গীতাভারতী, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্ থেকে সারস্বত মধ্য, কলাপমধ্য, পু পানিনি আদ্য, পুরাণতীর্থ ও কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন সুনামের সহিত । তিনি জীবন সংগ্রামের এক সাহসী সৈনিক । সমগ্র প্রতিকূলতাকে পরাহত করে এগিয়ে চলেছেন আজও । শ্রীমতী সিংহ বর্তমানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার লেখিকারূপে এস. সি. ই. আর.টি-র ল্যাঙ্গুয়েজ সেলে কর্মরতা এবং ত্রিপুরা সরকারী সংস্কৃত বিদ্যাভবনের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে ১৯৯৫ থেকে নিযুক্তা ।

১৯৯৬ এ সংস্কৃত সাহিত্যের ওয়াডি - ১ম খণ্ড, ১৯৯৬ এ 'প্রস্ফুটন' নামে বাংলা কবিতার বই, ১৯৯৭ এ সংস্কৃত সাহিত্যের ওয়াডি - ২য় খণ্ড (কালিদাস খণ্ড) রচনা করেন । তিনি আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের সংস্কৃত কথিকা পাঠে নিয়মিতভাবে নিযুক্তা । বাংলা ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুর ভাষায় সংস্কৃতে অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেছেন ও বিবিধ পত্র পত্রিকায়, স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

অদূর ভবিষ্যতে সংস্কৃত সাহিত্যের ওয়াডি-৩য় খণ্ড হিতোপদেশ । কর্ণাকশৌর মহাভারত ও কর্ণাকশৌর রামায়ণ মন্ত্রর পাতাল - উপন্যাস, কালাপানি ভ্রমণকাহিনী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় ও বাংলায় নিরূপমার তালাক জন্মগ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল তিনি মাত্র ২৭ বছরের বয়স থেকে সমাজ সেবায় নিযুক্তা । এখনও বিভিন্ন সমাজ সেবী সংস্থার মাধ্যমে সমাজ সেবাকে জীবনের ব্রত করে নিয়েছেন । তিনি ১৯৯৫ থেকে বিলাপরসায় ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করছেন ।

******

ত্রিপুরার এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অঘোর দেববর্মা

— নীলমণি দেববর্মা

অঘোর দেববর্মা চলে গেলেন । ১৩ই জুন ২০০৪ইং একটু অপ্রত্যাশিত বলা যায় । কারণ শরীর স্বাস্থ্য ভালই ছিল । কোন হাইপারটেনশন ছিল না, ডায়াবেটিস হয়নি । দৃষ্টিশক্তি ভাল । দাঁতের কোন অসুবিধে ছিল না । চুলেও তেমন পাক ধরেনি । মুখেও তেমন বয়সের ছাপ পড়েনি । এ বয়সে যা হবার কথা । বয়স তাঁর ৮৩ বৎসর হয়েছিল । তবে ছিল পুরানো প্লুরিসি ও ফুসফুসের সেরে যাওয়া অসুখ যার চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতাল এবং রাশিয়ায় যেতে হয়েছিল । হিপ জয়েন্ট টি.বি. সেটা কলকাতার পি.জি. হাসপাতালের চিকিৎসায় ছেড়ে যায় । শেষে ফুসফুসের অসুখের শ্বাসকষ্টে তিনি মারা গেলেন ।

তাঁর মৃত্যুতে খুব খারাপ লেগেছে । কারণ অঘোর আমার সহপাঠী ছিলেন — সেই ১৯৩৯ ইং থেকে । ৬৫ বৎসর ধরে আমরা পরস্পরকে চিনি এবং কখনো খুব কাছে থেকে এবং কখনো বা বেশ দূর থেকে তাঁকে দেখেছি । পরে বৈবাহিক সূত্রে তার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ঘটে । প্রজামণ্ডপ সমিতির সভাপতি যোগেশ চন্দ্র দেববর্মণের জ্যেষ্ঠা কন্যা করবীর সঙ্গে আমার বিয়ের ঘটক ছিল অঘোর দেববর্মণ । তাঁর চলে যাওয়ার ফলে এক বৈচিত্র্যময় যুগের অবসান হলো বলা যায় । সেই দশরথ, সুধন্যা, হেমন্ত আর অঘোর — যাদের নাম ত্রিপুরার লোকমুখে এক সঙ্গে উচ্চারিত হতো, — তাদের আর কেউ রইলেন না ।

আমি ওয়াখিয়ায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নতুন ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসে এসে উমাকান্ত একাডেমিতে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হই । তখন ১৯৩৯ সাল । বংশী ঠাকুর ছিলেন তখন নতুন ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসের সুপার । সরকারী স্টাইপেণ্ড মাসে সাড়ে তিন টাকা তখনো পাইনি। বাড়ী থেকে চাল এনে কিছু টাকা দিয়ে বোর্ডিং এ খাওয়া দাওয়া চালাচ্ছি । তিন মাস পরে পরীক্ষার ফল বেরুলে তবে স্টাইপেণ্ড পাই । একটা স্টাইপেণ্ডের জন্য বেশ কয়েকজন আমরা প্রতিযোগিতায় ছিলাম । যার ফল সবচাইতে ভাল হয়েছে সেই স্টাইপেণ্ড পেত ।

তখন সস্তাদামের সূতীর জামা, কাল গাপড়ের হাফ্ প্যান্ট ছিল আমাদের পোষাক ।

পায়ে কোন জুতা ছিল না, পা ছিল খালি । মনে পড়ে হাফ প্যান্ট হাফ সার্ট পরা একজন গাট্টাগোট্টা ছেলে একদিন আমাদের বোর্ডিংএ কথা বলছিল । উদ্দেশ্য তিনি বোর্ডিং এ সিট চান । এখন তিনি তার দূর সম্পর্কের দাদা হৃদয়রঞ্জন ঠাকুরের বাসায় থেকে পড়াশুনা করছেন । আমাদের থেকে বয়সে কিছুটা বড় এবং কয়েকবছর ধরে শহরে থেকে কথাবার্তায় দেশ মাতব্বরীভাব । শেষ পর্যন্ত অঘোর ক্লাশ সিক্সে এসে রামকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত পুরাতন বোর্ডিং হাউসে সিট পেলেন । পুরাতন বোর্ডি-এর স্টাইপেণ্ডের হার ছিল মাসে পাঁচ টাকা ।

বলাবাহুল্য দুই বোর্ডিং হাউসের ছাত্রদের মধ্যে নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতায় ভাব ছিল । প্রতিযোগিতায় ছিল নানা বিষয়ে বিতর্ক সভায় এবং পরীক্ষার ফলাফলে । পুরাতন বোর্ডিং-এর সুপার ছিলেন — আনন্দমোহন দাস । পুরাতনের খাওয়া দাওয়া সব সময় ভালছিল কারণ তাদের স্টাইপেণ্ডের টাকা বেশী ছিল । যুদ্ধের পরে দু'টো বোর্ডিং এক হয়ে যায় এবং স্টাইপেণ্ডের হারও এক হয়ে যায় । নির্মল চক্রবর্তী তখন সুপার হয়ে আসেন । নূতন এবং পুরাতন বোর্ডিংএর আবাসিকদের মধ্যে নানা বিষয়ে সুস্থ প্রতিযোগিতা লেগে থাকত । নানা বিতর্ক সভা এবং বিশেষ করে পরীক্ষা পাশের হারের উপর ছিল এই প্রতিযোগিতা ।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় । জার্মানীর হিটলার চেকো শ্লোভাকিয়া দখল করে নিল । প্রথম মহাযুদ্ধের আগে সে দেশ নাকি জার্মানীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। মদমত্ত জার্মানীকে রোখার জন্য ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ষ্ট্যালিন হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমন চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন । কিন্তু জার্মানীকে রোখা গেল না । সে পোলাণ্ড আক্রমণ করল । বাধা দেওয়ার চেষ্টা নিল । এদিকে ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যাণ্ড যুগোশ্লাভিয়া পর পর দখল করে নিল জার্মানী । ১৯৪০ সালের জুন মাসে জার্মানী, রাশিয়া আক্রমণ করল । ব্রিটিশ আমেরিকা এবং রাশিয়া মিত্রশক্তি হিসাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুগপৎ যুদ্ধ ঘোষণা করল ।

এদিকে নূতন বোর্ডিং এর সুপার - বংশী ঠাকুর জনমঙ্গল সমিতি করতেন । তিনি এবং প্রভাত রায় গ্রেপ্তার হয়ে যান । দশরথদা, দ্বারিক, রবীন্দ্র দেববর্মারা বোর্ডিং সুপার আনন্দ মোহন দাসের সঙ্গে মতানৈক্য হয়ে বোর্ডিং ছেড়ে খোয়াই চলে যান । ১৯৪৪ সালের মে মাসে জার্মানীর পতন হয় । ততদিনে দুটো বোর্ডিং এক হয়ে গেছে । দশরথদার চলে যাওয়ার ফলে তখন আমরাই সকলে সিনিয়ার মোষ্ট ছাত্র । আমি ও অঘোর দু'জনেই ক্লাস টেনে । বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা তখন খুবই কাহিল । আমেরিকাকে ধরে

কোনমতে নাকটা বের করে ডুবন্ত অবস্থা থেকে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে । এদিকে কুইট ইণ্ডিয়া এবং করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে শ্লোগান নিয়ে মহাত্মাগান্ধী সমগ্র ভারতকে টাল মাটাল করে রেখেছেন । চারিদিকে একটা বিরাট পরিবর্তনের হাওয়া । একটা অনিশ্চয়তার অবস্থার বিরাজ করছে ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এক বিতর্ক সভায় আমরা ক' জনা মিলে ঠিক করলাম যদি পিছিয়ে পড়া নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাহাড়ী সমাজের লোকদের বাঁচাতে হয় তবে লেখাপড়া শোখানো ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই । সেজন্য পাহাড়ের জায়গায় জায়গায়, স্কুল-পাঠশালা খুলতে হবে । শহরে বা মফস্বল শহরে যে সব জায়গায় পাঠশালা আছে, সেসব জায়গায় স্কুলে এসে পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখা সম্ভব নয় । পাঠশালা খোলা এবং পাহাড়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষামুখী করে তোলার জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে । সেজন্য জায়গায় জায়গায় লোক জমায়েত করে মিটিং বা সভা করে লোকদের বোঝাতে হবে . সেজন্য একটা সমিতি করা দরকার । সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমরা আমি ও অঘোর ঠিক করলাম যাঁরা বোর্ডিং-এ লেখাপড়া করে গেলেন এবং এখনো যারা বোডিংএ আছেন তাদের সকলকে নিয়ে প্রথমে একটি মিটিং করতে হবে । তখন দশরথ অধুনা বাংলাদেশের হবিগঞ্জে বৃন্দাবন কলেজে বি. এ. পড়ছিলেন, সুধন্বা, ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার জিলার শ্রীফাইল কলেজে বি. এ পরীক্ষা দিয়ে এসে উমাকান্ত একাডেমীতে সাবষ্টিটিউট টিচার হিসাবে কাজ করছিলেন । হেমন্ত ছিলেন কৃষি বিভাগে চাকুরীরত । প্রথমে আমি ও অঘোর দু'জনে আখাউড়া দিয়ে রেলগাড়ী করে হবিগঞ্জে গিয়ে দশরথদার মত নিলাম । ঠিক হল ২৭শে ডিসেম্বর হেমন্তর বাড়ী দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় ঠিক করা হবে ।

নির্দিষ্ট তারিখে মিটিং হয়েছিল এবং সেদিনের জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছিল । অঘোর হয়েছিলেন সমিতির কার্যকরী সম্পাদক । যদিও হেমন্ত ছিলেন সম্পাদক দশরথদা হয়েছিলেন সহ সভাপতি । এগুলো হয়েছিল বয়সের সিনিয়ারিটি ভিত্তিতে । এরপর মহারাজা বীর বিক্রমের কাছে সুধন্বাদা অঘোর, হেমন্ত ও আমি স্কুলের জন্য দরবার করতে যাই । সেখানে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ডি. এ ডব্লিউ ব্রাউন সাহেবকে মহারাজা স্কুলের মঞ্জুরী দেওয়ার জন্য বলে দেন । সেভাবে তখন পাহাড় অঞ্চলে তিনশতেরও বেশী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করা হয় । এর ফলে সমিতির সদস্যদের অভাবিতভাবে পাহাড়ের জন্য সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ হয় । জনশিক্ষা সমিতি গঠনে অঘোরের ভূমিকার গুরুত্ব দেখাবারজন্য উল্লিখিত ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হলো । জনশিক্ষা সমিতি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ত্রিপুরার আদিবাসীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শিখিয়ে হাতিয়ার হয়ে শুধু গুরুত্ব

পায়নি, পরবর্তীকালে রাজ্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমি হিসাবে এই সমিতি বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল । এ বিষয়ে জনশিক্ষা আন্দোলন ও পটভূমি ভূমিকা বইয়ে সুধন্বা দা তার লেখা 'জাগড়নের পটভূমিকা' অংশে মন্তব্য করেছিলেন । ইতিমধ্যে প্রয়াত কমরেড ধীরেন দত্তের অনুপ্রেরণা বা উৎসাহ ছিল কিনা বলা যায় না তবে কমরেড অঘোর কমঃ নীলমনি দেববর্মা উদ্যোগ না থাকলেও জনশিক্ষা সমিতিগুলি হতো কিনা সন্দেহ । এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে কমরেড ধীরেন দত্তের কাছ থেকে আমরা কম্যুনিজমের পাঠ পেয়েছি সত্যি কিন্তু এইসব স্কুল খোলার ব্যাপারে তাঁর কোন নির্দেশ ছিল না । এই বিষয়টি সম্পূর্ণ আমাদের চিন্তাচেতনা প্রসূত এবং প্রাথমিক ভাবে আমি ও অঘোরই এ বিষয়ে ভাবি এবং বাস্তবায়নে উৎসাহ লিখা নিয়ে শুরু করি । আমরা দশরথাদা এবং সুধন্বাদাকে তাদের শিক্ষাস্থল থেকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি । হেমন্তদার কাছে আমাদের উদ্দেশ্য বিধেয় ব্যক্ত করে তার সাহায্য চাই। তিনি সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন এবং শেষে তার কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন । এরপর আমি দশরথদা এবং অঘোরদার নির্দেশে এল. এম. এফ. পড়তে চলে যাই । মূল কর্মকাণ্ড অঘোরের হাতে থাকে । নির্দেশনা এবং উপদেশ ইত্যাদি দশরথদা সুধন্বাদার কাছ থেকে সে পেয়ে যেত । যাহোক, আমাদের পটভূমিকা সম্পর্কে সুধন্বাদার মন্তব্য অবশ্যই আমাদের পক্ষে এক বিশেষ স্বীকৃতি । তবে আমাদের প্রস্তুতি বা শুরুতে বিস্তৃত কর্মকাণ্ড চালিয়ে নিয়ে গেছেন দশরথ, সুধন্বা এবং হেমন্তদারা ।

এই সমিতির আন্দোলনকে ভিত্তি করেই সমিতির সদস্যরা ১৯৪৮ সালের মে মাসে ত্রিপুরা রাজ্যে রাজনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি গঠন করেন । এই মুক্তি পরিষদ গঠনে অঘোর ছিলেন — একজন উৎসাহী কারিগর । তিনি হয়েছিলেন মুক্তি পরিষদের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ।

মহারাজা বীরবিক্রম প্রয়াত হন ১৯৪৭ সালের সম্ভবত মে মাসে । মহারাণী কাঞ্চণপ্রভার চেয়ারম্যানশিপে রিজেন্সী চালু হয় । ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে যোগদান করে । তখন দিল্লীতে এবং রাজ্যে কংগ্রেসের হাতে সব রাজনৈতিক ক্ষমতা । সমিতির এবং মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে জনপ্রিয়তাকে ভয় পেয়ে ... কংগ্রেসের নেতৃত্বে জন্য রাজা কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্য পিডি অ্যাক্ট চালু হয় এবং নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য ব্যাপক পুলিশি অভিযান শুরু হয় । কমিউনিষ্ট জজুর ভয় দেখিয়ে দিল্লী থেকে সামরিক আইন প্রয়োগ করানো হয় এবং পাহাড়ের অধিবাসীদের নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়ে দেওয়ার জন্য অত্যাচার শুরু হয় । তখন মুক্তি পরিষদের তত্ত্বাবধানে এবং পরিচালনায় সশস্ত্র বাহিনী মুক্তি সেনা গঠিত হয় । সামরিক বাহিনী এবং সরকারী পুলিশের ভয়াবহ

াত্যাচারের হাত থেকে প্রত্যাঘাত করে আত্মরক্ষারজন্য এই সেনা তৈরী হয় ।

এই সেনা ভীষণ নিয়মনীতির মধ্যে চীনের মহান নেতা মাও সে তুং এর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তি সেনাদের অনুকরণে পরিচালিত হতো । এই মুক্তি সেনারা সম্মুখ স মরে না গিয়ে গেরিলা কায়দায় সরকারী সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করে এবং পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর অত্যাচার প্রতিহত করে পাহাড় অঞ্চলে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করে । মজার ব্যাপার হচ্ছে যে নতাদের কমিউনিষ্ট মনে করে সরকার এতসব ক্রিয়াকাণ্ড চালাচ্ছিল তাঁরা কিন্তু কেউ তখনও কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যা হন নি । একমাত্র অঘোরই তখন পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন ।

খোয়াই-এ সামরিক আইন জারী করে সরকার তাইতু নিতে যে মেয়েরা অস্বীকার করেছিল তাদের গুলি করে হত্যা করে এবং এভাবে কুমারী মধু রূপশ্রী শহিদ হন । এটা সকলের জনা । এ সময় অঘোর দেববর্মা এবং অন্যান্য নেতারা আত্মগোপনে ছিলেন । আত্মগোপনে থাকা কালীনেই ১৯৫০ সালে তিনি বিয়ে করেন । পরে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি জেলে যান । ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচনের সময় অঘোর ছিলেন জেলে । জেল থেকেই তিনি ইলেকট্ররেল কলেজের নির্বাচনে চড়িলাম কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন । এই ইলেকটরেল কলেজের ৩০ জন সদস্যরা তখনকার রাজ্যসভায় একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠান । নির্বাচিত হয়েছিলেন আরমান আলামুন্সী নামকরা উকিল। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের ৩০ সদস্যের আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনেও চড়িলাম কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন । ১৯৬৭ সালের ৩০ সদস্যের বিধানসভা নির্বাচনেও চড়িলাম (তঃউঃ) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে বিধায়ক হন এবং বিধানসভায় বিরোধী নেতা নির্বাচিতহয়ে দায়িত্ব পালন করেন ।

১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিরভূক্ত হলে অঘোর দেববর্মা পুরানো পার্টি সি. পি. আইতে থেকে যান এবং পার্টির সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন । ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি, গণমুক্তি পরিষদে বিভক্ত হয় সি. পি. এম. এ যাঁরা চলে যান তারা উপজাতি গণমুখি পরিষদ গঠন করেন । অঘোর গণমুক্তি পরিষদের সম্পাদক হিসেবে থেকে যান এবং আমরণ তাই ছিলেন ।

তিনি বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক রচনা সমৃদ্ধ বই লিখে প্রকাশ করেছেন । তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ (১) ত্রিপুরার দাঙ্গা একটি পর্যালোচনা । (২) ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর । (৩) বিগত কংগ্রেস আমলে

এবং সি পি আই. (এম) এর গত ১০ বছর শাসনে ত্রিপুরার উপজাতিদের অবস্থা । (৪) জনশিক্ষা সমিতির ইতিকথা । (৫) ইনারলাইনের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও চালু হচ্ছে না কেন ? (৬) ত্রিপুরার উপজাতি জন জীবনে রাজনৈতিক ক্রম বিবর্তন । (৭) উপজাতিদের প্রতি সি পি. আই. (এম) পার্টির ঐতিহাসিক দলিল প্রভৃতি । ইংরেজীতেও তাঁর কয়েকটি বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে ।

একজন ব্যক্তির জীবনের বিশেষ করে অঘোর দেববর্মার মত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জীবনের মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন কাজ । এখানে সে চেষ্টা করা হয়নি । অঘোর দেববর্মার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সামান্য অংশতুলে ধরার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে মাত্র ।

অঘোর দেববর্মা প্রথমে একজন উপজাতি এবং উপজাতি সমাজের উন্নয়নের জন্য নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন । এজন্য তিনি উপজাতিদের কাছ থেকে নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা পেয়েছেন এবং পাবেন । রাজনৈতিক ব্যক্তি পার্টি বা দলের জীবনে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে অনেক পরিবর্জন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিবর্তন আসে। অঘোরের জীবনেও অনেক পরিবর্তন দেখা যায় । প্রথমে তিনি জনশিক্ষা সমিতি, তারপর গণমুক্তিপরিষদ ও কমিউনিষ্ট আসেন — শেষের দিকে তিনি — কমিউনিষ্ট পার্টি ছেড়ে দেন, সর্বশেষ তিনি আই. এন. পি.টি.তে যোগদান করেন । বয়সের ভার এবং কিছুটা অসুস্থতার জন্য যদিও তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক কাজ থেকে বিরত হয়েছিলেন । অনেকের মতে আই. এন. পি. টি.তে যোগদান করা অঘোরের মত একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায়নি । যে আই. এন. পি. টি.র সঙ্গে উগ্রপন্থীদের যোগ সাজস রয়েছে অনেকের এটা অভিমত ।

আগেই বলেছি — রাজনীতি ক্রম পরিবর্তনশীল এবং একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি নিজের অন্তরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগদান করে দেশ সেবার চেষ্টা নিতেই পারেন । কেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি দল বদল করেন তাঁকে সে প্রশ্ন অনেকেই করেছেন ... এবং সেই ব্যক্তির পক্ষে তাঁর মতামত প্রকাশ করার সুযোগও খুবই সীমিত থাকে । অঘোর কেন দল বদল করেছেন — এ প্রশ্ন অনেকেই করছেন, সেজন্য একথাগুলো বলা হলো ।

ত্রিপুরার জনসাধারণ বিশেষ করে উপজাতি জন সমাজের উন্নতির জন্য তাঁর আন্তরিক প্রয়াস, আত্মত্যাগ, আজীবন সংগ্রাম, ভবিষ্যতের বিচারে নিশ্চয়ই প্রশংসিত হবে এবং উপযুক্ত স্বীকৃতি পাবে । প্রথম সারির উপজাতি নেতা দশরথ, সুধন্বা হেমন্ত দেববর্মাদের সঙ্গে অঘোর দেববর্মাও চিরস্থায়ী আসন লাভ করে থাকবেন ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

ডঃ নীলমণি দেববর্মণ পেশায় ডাক্তার, নেশায় আবাল্য সাহিত্য সেবী। জন্ম ১৯৩১ সালের ১লা মার্চ। পিতা গুরুচরণ দেববর্মণ, মাতা রুক্মিনী দেবী। গ্রাম মোহনপুর, পোঃ গোলাঘাটি থানা বর্তমানে টাকারজলা। প্রাথমিক শিক্ষা কলকলিয়া পাঠশালা, এরপর আগরতলা উমাকান্ত একাডেমীতে। ছোট থেকেই সাহিত্য পাঠের ক্ষুধাছিল অসীম। খুব নীচু ক্লাসেই বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য ডিটেকটিভ এবং ভ্রমণকাহিনী পড়ে নেন। এরপর উপরের ক্লাশে উঠে রাজনৈতিক পুস্তক (কুম্যনিজম সংক্রান্ত) এবং বিদেশী বইয়ের অনুবাদের দিকে ঝুঁকেন।

ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় সহপাঠী অঘোর দেববর্মার সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ত্রিপুরায় উপজাতিদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্কল্প নিয়ে আরো কিছু যুবকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন ও উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিমান নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি দশরথ এবং সুধন্বা দেববর্মাকে তাদের দ্বারা আহুত একটি সাধারণ সভায় ডেকে নিয়ে আসেন। তখন তাঁরা দুজনেই কলেজে পড়াশোনা করছিলেন। কৃষিবিভাগে কর্মরত হেমন্ত দেববর্মাকেও তারা আমন্ত্রণ জানান এবং তার পরামর্শমত দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় জনসভা করা হয় এবং ১৯৪৫ খৃঃ জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। অঘোর ও নীলমণি দেববর্মণ স্কুলগুলির স্থান নির্বাচন থেকে তদানীন্তন ত্রিপুরার মহারাজার অনুমোদন আদায়ের প্রচেষ্টায় সংযুক্ত ছিলেন। এরা দুজনেই ক্লাশে পালা করে প্রথম বা দ্বিতীয় হতেন। এসকল উন্নয়নমূলক কাজে তাদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়। ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯৫২ সালে ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ কলকাতা থেকে এল. এম. এফ. পাশ করেন। এরপর দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৫৫ সালে এম. বি. বি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৫৬ সালে সিভিল অ্যাসিস্ট্যান সার্জন গ্রেড ওয়ান পদে ত্রিপুরা হেলথ্ সার্ভিসে যোগদান করেন। নানাবিভাগে নানাপদে কাজ করে ১৯৮৪ সালে ডাইরেকটার হেলথ্ সার্ভিস পদে উন্নীত হয়ে ১৯৯১ সালে অবসর নেন।

এরই মধ্যে ১৯৫৯ সালে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডিপ্লোমা ইন টিউবারকুলোসিস ডিজিজে ডিপ্লোমা নেন। এ বিষয়ে ব্যাঙ্গালোর বিশেষ প্রশিক্ষণ নেন এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রদত্ত বৃত্তিতে যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন ও শিক্ষাভ্রমণে চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক এবং ইওনাইটেড কিংডম যান।

১৯৬৭ সাল থেকে শাখা টি.বি. অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরার অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। রেড ক্রশ ত্রিপুরা ছাড়াও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে জড়িত আছেন। তার প্রকাশিত বই — বেমারতাই কাসুনানি কক (চিকিৎসা বিদ্যাসংক্রান্ত ককবরক পুস্তিকা), বেমারতাই বিনি হাম্বারি মুঙ (সাধারণ অসুখ বিসুখের উপর ককবরক পুস্তিকা) স্থানীয় পত্র পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনে বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং ককবরক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৯৭ সালে ১৬ই এপ্রিল গ্রামাঞ্চলে তপশীলি উপজাতির কল্যাণে নিরলস সেবার জন্য ত্রিপুরা সরকার ডঃ বি. আর. আম্বেদকর পুরস্কার পেয়েছেন। বিখ্যাত লেখক গোপাল হালদার রঙপুর কৃষক সম্মেলনে তার লেখা 'ত্রিপুরার সংস্কৃতির রূপান্তর' লেখাটির অজস্র প্রশংসা করেন।

******

'যে গিয়েছে দেখার বাহিরে'

(৯ই শ্রাবণ থেকে ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রজীবনের শেষ ১৪দিন)

— নীলমণি দত্ত

শেষ পর্যন্ত অপারেশনের জন্যই ৯ই শ্রাবণ শুক্রবার (২৫শে জুলাই, ১৯৪১) সত্তর বছরের স্মৃতি বিজড়িত শান্তি নিকেতনকে পিছনে ফেলে রবীন্দ্রনাথ শেষ যাত্রা করলেন কলকাতার দিকে। তাঁর জন্যে বিশেষ সেলুন গাড়ির ব্যবস্থাও রেখেছিলেন রেল কর্তৃপক্ষ। ভোর চারটের সময়েই তিনি পোষাক পরে তৈরী হয়ে পূর্বদিকের জানালার ধারে বসে আছেন হয়তো বা পূবগগণের সূর্য দেখবেন বলে। জীবৎকালে কখনোই তিনি সকালের সূর্যকে অবহেলা করেননি। তিনি নিজেই একস্থানে লিখেছেন ঃ"এই তো দিনের পর দিন, আলোকের পর আলোক আসছে। কতবার থেকেই আসছে, প্রত্যহ আসছে।... আলোক ... প্রত্যহ আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে, 'তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যে রকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত-হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো'।

কে জানে, হয়তো বা শেষবারের মতো নয়ন ভ'রে রূপের খেলা দেখে নিতে চান তিনি। একটু পরেই আশ্রমের ছেলেমেয়ের দল গান গাইতে গাইতে উদয়ণের ফটক পার হয়ে লাল কাকরের রাস্তা বেয়ে এসে তাঁর জানালার নীচে এসে দাঁড়ালো। তারা গাইছে, "এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার"। জানালার ধারে বসে বসে তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে তিনি সঙ্গীতের অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। কবির শরীরের ক্ষতি হবে বলে কবির কাছে আসা নিষেধ তাদের। রওয়ানা হবার সময় আবার ছেলেদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ঃ 'আমাদের শান্তি নিকেতন, সব হতে আপন'। স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, পথশ্রম যাতে ভোগ করতে না হয়। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সত্তর বছরের স্মৃতি জড়িত। সেই কবে এসেছিলেন বাবা মশাই এর সাথে হিমালয় যাত্রার প্রাক্কালে। আজ যাবার সময় বারবার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন।

বিকেলের দিকে সদলবলে পৌঁছলেন হাওড়া। সেখান থেকে জোড়াসাঁকো-আশি বছর আগে যে বাড়িতে প্রথম চোখ মেলে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন, সেখানে। তাঁকে রাখা হলো মহর্ষি ভবনের দোতলার পাথরের ঘরে। পথশ্রমে ভয়ানক ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত— স্ট্রেচারেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, বিছানায় তোলা হয়েছে রাতের দিকে। সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে

বলে উঠেছেন —" কি জানি ভালো লাগছে না আমার" । এ সময় তার সেবা শুশ্রূষার দায়িত্বে আছেন ছোট মেয়ে মীরা দেবী, নাতনি নন্দিতা, নাতবৌ অমিতা, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রবধু । রাণী চন্দ, রাণী (নির্মলকুমাবী মহলানবিশ) । তাছাড়া রয়েছেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ কর ও অনিল কুমার চন্দ । অপারেশনের সঠিক দিন স্থির না হলেও প্রস্তুতি চলছে । প্রয়োগ করা হচ্ছে নানা ওষুধ ইনজেকসন্ । তারই মাঝে দেখা করতে আসছেন সমরেন্দ্রনাথ 'অবনীন্দ্রনাথ' চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সস্ত্রীক দেবেন্দ্র মোহন বসু প্রমুখ । ডাক্তারদের মধ্যে সারাক্ষণই থাকেন ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, নিয়মিত আসেন ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, ডাঃ অমিয় সেন, ডাঃ সত্যেন রায় ।

১০ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই) ক্লান্তি কাটিয়ে কবি কিছুটা সুস্থ, হাসিঠাট্টাও করছেন । সত্তর বছরের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশি বছরের খুড়ো রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি চারণে মেতে ওঠেন । কিছুক্ষণ বাদেই ডাক্তার এসে ইনজেকশন দিয়ে চলে গেলেন । আর তার পরেই অসম্ভব কাঁপুনি, ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো । সকলে ভেবেছেন নতুন করে বুঝি জ্বর এসে গেল, তাই গায়ের উপর কাঁথা-কম্বল ইত্যাদি চাপানো হয়েছে । কিন্তু তেমনিই কাঁপছেন। রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে আসা হলো ডাক্তারকে ; বললে ওটা গ্লুকোজের রিয়্যাক্শন্ ।

১১ই শ্রাবণ সকালবেলা । কী আশ্চর্য খুশি হয়ে আছেন কবি । কারণ কী ? বোঝা গেল একটু পরেই । বললেন, একটা কবিতা লিখেছেন এরই মধ্যে । কী তুলনাবিহীন প্রাণশক্তি ও প্রতিভা । না হলে এতো শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে কেমন করে কবিতা আসে । আর সে কী যেমন তেমন ! কী তুঙ্গশীর্ষ । যেন ধরা ছোঁয়া যায় না । কবি অমিয় চক্রবর্তী ঠিকই বলেছেন —'পৃথিবীর সাহিত্যে এর তুলনা সম্বন্ধে কিছু বলা বৃথা' । কবিতাটি শোনালেন ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে । একটি ছোট্ট সুসম্পূর্ণ কবিতা । রাণী চন্দকে বললেন, সকাল বেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে গেল — কয়েক লাইন লিখে রাখ, নইতো হারিয়ে ফেলব ।

"প্রথমদিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,
কে তুমি—
মেলেনি উত্তর ।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল

পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
কে তুমি
পেলনা উত্তর ।"

এদিকে রোজ পঞ্চাশ সি. সি. করে গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে তাঁকে । ডাক্তারকে বলেছেন — বড়ো খোঁচার ভূমিকা স্বরূপ এই ছোটো ছোটো খোঁচা আর কতদিন চালাবে ? ইতিমধ্যে স্থির হয়ে গেছে ৩০শে জুলাই (১৪ই শ্রাবণ) অপারেশন হবে — কিন্তু গুরুদেবকে তা জানানো হয়নি ।

১২ই শ্রাবণ কেটে গেল । এল ১৩ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই) মঙ্গলবার । আগামীকাল অপারেশন হবে । কিন্তু কবি জানেন না, কেননা ভয় পাবেন বলে কেউই বলেনি তাঁকে । রোজই গ্লুকোজ দেয়া হচ্ছে; আর তিনি কেবলই জিজ্ঞেস করছেন, কবে আসবে সেই বড় খোঁচার দিন । সঠিক খবর কেউই দেন না, কেবলই আশ্বাস দেন ! কিন্তু সবচেয়ে মজার খবর হলো — এহেন ভয় আর উদ্বেগের মধ্যেও আরেকটি কবিতা লেখা হয়ে গেল বিকেল বেলা —

"দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ..... ।"

এসে গেল অস্ত্রোপচারের দিন, ১৪ই শ্রাবণ (৩০শে জুলাই) । সকাল বেলাতেই কাজ সাঙ্গ হবে । জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই অপারেশন হবে । কবির ঘরের পিছনের বারান্দায় আয়োজন করা হয়েছে । অপারেশন টেবিল আড়াল করে সাদা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গান হয়েছে । সবকিছু সমস্ত আয়োজনই যথাযথ । কেবল কবিই জানেন না কিছু । জিজ্ঞেস করছেন, অপারেশন কবে হবে ; জবাব পেয়েছেন, দিন কয়েকের ভিতরেই । খুব সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়েই বলে গেছেন একটি কবিতা । শ্রীমতী রাণী চন্দ কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন —

" তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী ।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে .... ।"

বেলা বেড়ে যাচ্ছে, তখন সাড়ে নয়টা। রাণী চন্দকে আবার ডাকলেন, আবার বলে গেলেন ঃ

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে

সে পায় তোমার হাতে

শান্তির অক্ষয় অধিকার।

লেখা শেষ হয়ে গেলে বললেন, "সকাল বেলার কবিতাটির সঙ্গে জুড়ে দিস।" এভাবেই জীবনের সর্বশেষ কবিতা রচিত হয়ে গেল।

কবিতা রচনার পর ক্লান্তি সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে পীড়িতা পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে দিয়ে লিখিয়েছেন চিঠি। নীচে কাঁপা হাতে সই করেছেন — 'বাবা মশায়'— জীবনের শেষ স্বাক্ষর। শেষ চিঠি বলে কিছুটা উদ্ধৃত হলো —

মামণি,

তোমাকে নিজের হাতে লিখতে পারিনে বলে কিছুতে লিখতে রুচি হয় না। কেবল খবর নিই, আর কল্পনা করি যে তুমি ভালো আছ — অন্তত এখানকার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভিতর থেকে দূরে থেকে কিছু আরামে আছ। কিন্তু তাপ এখনও শরীরে আছে সেটা ভালো লাগছে না। ... যা হোক এরও তো অবসান আছে এবং তারও খুব বেশি দেরী নেই। ঢুকে গেলে নিশ্চিন্ত থাকব।

ইতি — বাবামশাই

সাড়ে দশটার সময় আয়োজন সম্পূর্ণ হলে ডাক্তার কবির কক্ষে এলেন। এসে বললেন, "আজকের দিনটা ভালো আছে, আজই তা হলে সেরে ফেলি, কি বলেন?" ওই আকস্মিকতায় চমকে উঠলেন কবি, "আজই"? তারপর উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, " তা একরকম ভালোই। এরকম হঠাৎ হয়ে যাওয়া মন্দনা।" তারপরেই চুপ হয়ে গেলেন। অনেক পরে বললেন, সকালের কবিতাটি আবার শোনাতে। কিঞ্চিৎ মাজা ঘষার দরকার ছিল, তবু করলেন না। বললেন, "ডাক্তারতো বলেছে অপারেশনের পরে মাথাটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভালো হয়ে পরে ওটা মেজে ঘষে দেবো।" কিন্তু হায়! কবির সে আশা আর পূর্ণ হয়নি।

ঠিক এগারোটায় স্ট্রেচারে শুইয়ে কবিকে বারান্দায় এনে তোলা হয়েছে অপারেশন টেবিলে। ১১-২০ থেকে ১১-৪৫, মাত্র পঁচিশ মিনিটের অপারেশন। ললিত বাবুই ছুরি ধরেছিলেন। তাকে সাহায্য করেন সত্যসখা মৈত্র ও অমিয় সেন। তাছাড়া মাথার দিকে

দাঁড়িয়েছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। প্রসটেট গ্ল্যাণ্ড নয় শুধু ছিদ্র করে নল বসিয়ে প্রস্রাব বেরোনোর রাস্তা করে দেওয়াই হল এই অপারেশনের উদ্দেশ্য। যার ডাক্তারি নাম সুপ্রা টিউবিক সিস্টোস্টমি। এই অপারেশন ঠিক মত কার্যকরী হলে এবং সহ্য করতে পারলে পরবর্তীকালে করা হত এনলার্জড প্রসটেট গ্ল্যাণ্ডের অপারেশন। তা অবশ্য করার সুযোগ মেলেনি। যাহোক অপারেশন শেষে দিনের অধিকাংশ সময় ঘুমের মধ্যে কেটেছে তাঁর বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে বলে উঠেছেন, 'জ্বালা করছে-ব্যথা করছে।' সন্ধ্যায় অপারেশনের সময় লেগে ছিল কিনা — ললিতবাবুর এইপ্রশ্নের উত্তরে বলেছেন —'কেন আর মিছে মিথ্যে কথাটা বলাবে আমাকে দিয়ে।'

১৫ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই)। সেই একই কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। জ্বালা করছে, ব্যথা করছে। নিঃসাড় হয়ে থেকেছেন। গায়ের তাপও বেড়েছে।

১৬ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট) কবির অসাড় অবস্থা। নির্বাক। যন্ত্রণাসূচক শব্দ করছেন। হিক্কাও উঠেছে বেশ কয়েকবার। ডাক্তাররা চিন্তিত। তাদের ঘরে ফিসফাস্ পরামর্শ চলছে।

১৭ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট) ; গতরাত্রি আচ্ছন্ন অবস্থায় কেটেছে। অন্তরঙ্গ কেউ জানতে চাইলেন কষ্ট হচ্ছে কিছু ? তিনি বললেন— কি, কি করতে পারবে তুমি ? চুপ করে থাকো। কি রকম কষ্ট হচ্ছে আপনার, এই প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তারকে স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলেছেন — এর কি কোন বর্ণনা আছে ! দুপুর থেকে আচ্ছন্ন অবস্থা। হিক্কা বেড়েছে, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে কাশি। বিধান রায় দেখতে এসে বললেন — বাড়ির মেয়েরা হিক্কা কমানোর জন্য টোট্‌কা দিতে পারো না ?

১৮ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট) ; কবির অবস্থার ক্রম অবনতি হতে লাগল। খবর দেওয়ায় শান্তিনিকেতন থেকে প্রতিমাদেবী, ডাঃ শচীন মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ কৃপালিনীকে নিয়ে চলে এসেছেন। ওষুধ বা কিছু খাওয়াতে গেলেই বিরক্তি—'আর জ্বালিও না তোমরা' এই একমাত্র বুলি। দুপুর থেকে আবার আচ্ছন্ন।

১৯শে শ্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট);প্রতিমা দেবী কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলেন — বাবামশাই, আমি এসেছি — আমি বউমা বাবা মশাই। একবার চোখ দুটি জোর করে টেনে পুত্রবধূর দিকে তাকালেন আর মাথা নাড়লেন। বাড়িতে ডাক্তারের দল ভিড় করে আছে, কিন্তু রোগের উপশম নেই বিন্দুমাত্র। নতুন নতুন উপসর্গ বাড়ছে — কিডনি কাজ করছে না। রাত এগারোটায় ডান হাতখানি তুলে আঙ্গুল ঘুরিয়ে অস্পষ্টস্বরে বলেছেন —'কি হবে কিছু বুঝতে পারছিনে, কি হবে।' এরপর সারারাত্রি নীরব।

২০শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট), মঙ্গলবার। ডাকলেও কোন সাড়া শব্দ নেই। আচ্ছন্ন,

অচৈতন্য, জেঁকে বসেছে ইউরেমিয়া অপারেশনের সেলাই খুলে দিয়েছেন ললিতবাবু। সন্ধ্যের দিকে নীলরতন বাবুকে নিয়ে এলেন বিধানবাবু। নীলরতনবাবু রবীন্দ্রনাথের পাশে বসে তাঁকে দেখলেন — তাঁর অবস্থা শুনলেন ডাক্তারদের কাছ থেকে। বললেন না কিছু। কেবল কবি বন্ধুর ডান হাতখানির উপরে হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন। যাবার সময় গুরুদেবের মাথার কাছ পর্যন্ত গিয়ে আবার পিছন ফিরে দেখলেন। এর অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেল উপস্থিত সকলের কাছে। বিধান চন্দ্রও বেরিয়ে গেলেন মন্থর গতিতে ক্লান্ত পদক্ষেপে। রাত্রে দেওয়া হলস্যালাইন, এনে রাখা হল অক্সিজেন।

২১শে শ্রাবণ (৬ই আগষ্ট), বুধবার। আত্মীয় স্বজনের ভিড় বাড়ছে সমানে চলেছে হিক্কা ও কাশি। ছোটো দিদি বর্ণ কুমারী দেবী বারবার এসে ভাইয়ের মাথার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছেন, সামনে আর আসতে পারছেন না। কবির তখন ঘোর অচৈতন্য অবস্থা। তাঁকে শোয়ানো হয়েছে পূর্ব পশ্চিমে, পূর্বদিকে মাথা রেখে শায়িত। পূবের আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ, রাখী পূর্ণিমা। অনেকদিন আগে গান লিখেছিলেন —'জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে' আর 'এ কোন্ চাদের মায়া'। রাত শেষ হয়ে গেলো অচৈতন্যের ভিতর। কবি তখনও মৃত্যুর সঙ্গে শেষ লড়াই করে চলেছেন।

(৭ই আগষ্ট) বৃহস্পতিবার, ২২শে শ্রাবণ। ভোর থেকেই জোড়াসাঁকো প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। দলেদলে আসছেন নিকট আত্মীয় বন্ধু, পরিজন-প্রিয়জন-অসংখ্য ভক্ত অনুরাগী। পূবের আকাশ ধীরে ধীরে ফর্সা হয়েছে — অমিয়াঠাকুর অঞ্জলিভরে এনেছেন চাঁপা ফুল — ছড়িয়ে দেওয়া হল গুরুদেবের দুখানি পায়ের উপরে। পুরনো দিনের চাকর বনমালী এককোণে দাঁড়িয়ে অবিরাম কেঁদে চলেছে। অন্তিম শয্যায় প্রতিটি মুহূর্ত ছায়ার মতো সে এই ঘরের আশেপাশে ঘুরেছে। আজ গণ্যমান্য লোক গিশ গিশ করছে ঘরে ভিতরে। ভীড় ঠেলে কেমন করে পৌছুবে সে বাবামশায়ের কাছে? কে যেন একজন ডাক দিলো, "বনমালী, এসো, এগিয়ে এসে দেখো। ভালো করে দেখো শেষবারের মতো। আরতো দেখতে পাবে না।"

সকাল সাতটায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় খাটের পাশে দাঁড়িয়ে উপাসনা করছেন — পায়ের কাছে বসে বিধুশেখব শাস্ত্রী ওঁ পিতা নোহসি, পিত্তানো বোধি' মন্ত্র পড়ছেন। অমিতা ঠাকুর জল দিচ্ছেন মুখে। নাড়ি ধরে বসে আছেন ডাঃ জ্যোতিষ চন্দ্র রায়। ডাঃ অমিয় সেন নাড়ি দেখতে এসে কব্জির বদলে কনুয়ের কাছে তা অতিকষ্টে খুঁজে পেলেন। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ক্ষতকারক সংস্থানের পর বেরিয়ে গেলেন। বেলা ৯ টায় শুরু হল অক্সিজেন দেওয়া। শেষবাবেরর মতো দেখে গেলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ললিতবন্দ্যোপাধ্যায়। দুই পরাজিত চিকিৎসক। বাইরে বারান্দায় মৃদুকণ্ঠে কে যেন গেয়ে চলেছেন —'কে যায় অমৃতধামযাত্রী'। কানের কাছে অবিরাম পড়া হচ্ছে, তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র "শান্তম্ শিবম্

অদ্বৈতম্ ।" খুলে দেওয়া হল অক্সিজেনের নল । ধীরে ধীরে কমে এল পায়ের উষ্ণতা । তারপরে একসময় চিরতরে থেমে গেলো হৃদস্পন্দন । ঘড়িতে তখন সবেমাত্র বেজেছে দুপুরের ঘন্টা ১২টা ১০ মিনিট । বাইরে তখন জনসমুদ্র, সারা কলকাতা যেন ভেঙ্গে পড়েছে জোড়াসাঁকোর চিৎপুর রোডে । বাংলাদেশের ও বাঙালী জীবনের শেষ জ্যোতির কণিকা চিরতরে নিভে গেল । অধৈর্য জনতার কোলাহল ক্রমেই বেড়ে চলেছে । তারা কবির শেষ দর্শনলাভের জন্য উন্মুখ । ঘরের মধ্যে তখন শুরু হয়েছে কবির অন্তিম যাত্রার প্রস্তুতি। তারই মধ্যে কখন বাইরে থেকে টান মেরে দরজার ছিটকিনি খুলে একদল উন্মত্ত মানুষ ঢুকে পড়েছে সেখানে । করজোড়ে তাদের বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করেছেন শোকার্ত সেবকরা।

যাই হোক বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত চলে শোকার্ত জনতার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন । দুপুর সাড়ে বারোটায় 'আকাশবাণী' গুরুদেবের দেহাবসানের খবর ঘোষণা করে— তারপর রাত্রি পর্যন্ত আকাশবাণীতে চলে রবীন্দ্রনাথের অনুষ্ঠান । নজরুল ইসলামের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তাঁর স্বরচিত কবিতা, গান —"ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে ।" বীরেন্দ্রনাথ ভদ্রের আবৃত্তি শ্রোতাদের আরো শোকবিহ্বল করে তোলে । তাছাড়াও গীত হয় একের পর এক রবীন্দ্রনাথের গান, প্রচারিত হয় কবি সম্বন্ধে নানা আলোচনা — দীনবন্ধু এণ্ডরুজের রেকর্ড করা ভাষণ, প্রধান ধর্মযাজকের শোক নিবেদন । সবশেষে গুরুদেবের অচৈতন্য দেহকে স্নান করিয়ে পরানো হয়েছে রাজবেশ । খুলে দেওয়া হল দরজা । দর্শনের সুবিধার জন্য কবিকে আনা হল বারান্দায় । অতপর বিদায় লগ্ন আসন্ন । সাড়ে তিনটে নাগাদ কবির মরদেহ নিয়ে আরম্ভ হল শোকযাত্রা — শোক মিছিল । বারান্তরে সময় সুযোগ হলে সেই অভিনব শোকযাত্রার বর্ণনা করব । আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি । (সহায়ক গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ'— হায়াৎ মামুদ । 'হে মহামরণ'— পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।) —

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

লেখক ত্রিপুরার একজন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতী । জন্ম - ২৫শে জুন, ১৯৪২। ধলেশ্বর, কল্যাণী, আগরতলা, ত্রিপুরা । শিক্ষা - এম. এ, বি.টি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা - শিক্ষকতা । চাকুরীজীবনের প্রথম কুড়ি বছর কেটেছে সোনামুড়া, সাব্রুম ও উমাকান্ত একাডেমীতে । শেষ ষোল বছর আগরতলা বি. এড্ কলেজ, বি.টি. কলেজ। কুঞ্জবন এবং সবশেষে এস. সি. ই. আর. টিতে পপুলেশন এডুকেশন সেল প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে । প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'কিছুফুল, কিছু নদী', ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ ।

******

মালঞ্চ নিবাস

— ডঃ প্রণব বর্দ্ধন

আবার এল বাইশে শ্রাবণ । ১৪১১ সাল । আমাদের জাতীয় জীবনে ২৫শে বৈশাখ আর ২২শে শ্রাবণ জড়তাগ্রস্ত ভারতীয়দের মনে গতিশীল ছন্দ । দুটি-দিন কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে । প্রথম দিনটি কবির জন্ম তিথি আর দ্বিতীয় দিনটি তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন । মনে পড়ে আজ থেকে এক যুগ আগে (১৯১১) বাংলা ১৩৯৮ সালের ২২শে শ্রাবণ কবির তিরোধানের দিনটি আমরা পালন করেছি একটু আলাদাভাবে, কেননা সেবার ছিল তাঁর তিরোধানের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। ভারতের মহান মানবতাবাদী কবি, বাংলা সাহিত্যের অনন্য বাক পতি, কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের একশত বিয়াল্লিশ বছর পেরিয়ে গেল গত পঁচিশে বৈশাখ— তিরোধানের ও অর্ধশতাব্দী পার হয়ে আরো বারোটি বছর আজ পেরিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য! আজ এই বাষট্টিটি বছরের ২২শে শ্রাবণেও আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি এই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের স্মৃতি — বরং মনে হয় সময় কবিকে আমাদের আরো কাছে নিয়ে এসেছে । এটা আরো বেশি করে উপলব্ধি করি, যখন দেখি, মানব জাতি আজ একবিপুল পরিবর্তনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে । আজ সে সবকিছুর উপরে স্থান দিচ্ছে মানবিক মূল্যবোধকে। মহান কবি আজীবন যে আদর্শের স্বপ্ন দেখেছিলেন— মনে করা যেতে পারে, বিশ্ব আজ সেদিকেই পা বাড়াতে চলেছে । মহৎ প্রতিভার আবির্ভাব দেশ ও জাতির জীবনে অনুপ্রেরণা ও বৈচিত্র্যের সঞ্চার করে, তাঁদের ধ্যানেই হয় প্রকৃত সত্যের উন্মোচন । রবীন্দ্রনাথ জাতির জীবনে পূর্ণতার প্রতীক । আমাদের জীবনের এমন কোন অনুভূতি নেই যা রবীন্দ্রকাব্যে ও গানে ধরা পড়েনি । রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনের প্রতিদিনের আরাধ্যা দেবতা স্বরূপ-তাঁকে বিস্মৃত হওয়া তাই কোন মতেই সম্ভব নয় । তাছাড়া - বাঙালীর হাজার বছরের সাহিত্যের সাধনা যেন এই একটি মানুষের মধ্যে রূপ ধরেছিলে, কেননা, বাংলা কবিতাকে তিনি কত ছন্দে, কত অলঙ্কারে, কতভাবে সাজিয়েছেন, গদ্যকে করেছেন ঐশ্বর্যময় । তাঁর রচনা যেন অপার বিস্ময়, কবির রচনার আসল কথা — ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে, সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখলে সুখ নেই । সুখের পরশ পেতে হলে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে হবে সমগ্র বিশ্বে-বিশ্বপ্রেমেরমধ্যে ।

এই বিশ্ব প্রেমিক মহানকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক যেন আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের । রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের জীবনের ষাটটি বছর ত্রিপুরার সঙ্গে মমত্ব বোধের সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন, এই মমত্ব বোধের সম্পর্ক ছিল রাজ্যের চার রাজার সঙ্গে । তাই রবীন্দ্র স্মৃতি বুকে নিয়ে ত্রিপুরা আজ এক দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছে । পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা — ভারতের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের, ক্ষুদ্র রাজ্যের সাহিত্যানুরাগী মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এক অখ্যাত কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন— কিশোর কবি সেদিন অত্যন্ত রোমাঞ্চিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি নোবেল প্রাইজ' এ ভূষিত বিশ্বকবি তাঁর বহু বিখ্যাত রচনায় ত্রিপুরাকে সম্মান স্থান দিয়েছেন । এই রাজ্য, এই রাজ্যের রাজাদের, অধিবাসীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এমন নিগূঢ় বন্ধনে জড়িয়ে ছিলেন, যে টানে তাঁকে রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় সাত সাতবার (১৯০০-১৯২৬) আসতে হয়েছিল । বেশির ভাগ সময়েই তিনিত অবস্থান করেছিলেন 'জুড়ি বাংলায়' এবং 'মালঞ্চ নিবাসে'।

আগরতলা শহরের অদূরে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে রাজভবনের পেছনে আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি ফলের গাছে বেষ্টিত সামান্য টিলা ভূমিতে অবস্থিত স্থানটির নাম কুঞ্জবন । এখানেই মালঞ্চনিবাস । সবুজ বনানীতে ঘেরা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর— এখানেই ১৯১৯ সালে গড়ে উঠেছিল মালঞ্চাবাস ।

সে বছর রবীন্দ্রনাথ ষষ্ঠবার আগরতলায় এসেছিলেন — সেবার কবিকে রাখা হয়েছিল কুঞ্জবনে নির্মিত নতুন মালঞ্চ নিবাসে । তবে ঐ মালঞ্চ নিবাস বর্তমান মালঞ্চ নিবাসে, যা এখন জরাজীর্ণ, তার পূর্ব দিকে ছিল । ঐতিহ্যবাহী অপূর্ব সুন্দর ঐ অতিথিশালাটি আজ আর নেই । মালঞ্চ নিবাসে মণিপুরী নৃত্যগীতির মাধ্যমে কবির সঙ্গে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর সৌহার্দ্য বিনিময় করেছিলেন বলে জানা যায় । সে সময় আরণ্যক ত্রিপুরা শিল্পে বেশ অগ্রসর ছিল। জানা যায়, প্রথমবার ছাড়া, চরার-চারবার কবির অবস্থান ছিল জুরি বাংলায় — তখন এই জুরি বাংলা ছিল জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর দিকে । স্মরণীয়, জুরি বাংলোতেই কবিগুরুকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিল । রাজ পরিবার ও অন্যান্য রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের কাছে শোনা গেছে — মালঞ্চনিবাসের পাশে সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত বাঁশের গৃহ ছিল, এখন সে ঘর বিস্মৃতির আড়ালে । আজ স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি — কৃষ্ণচূড়া হীরের মত শুধুই ঝিলিক দিয়ে ওঠে । মালঞ্চ নিবাসের ভিতরের মেঝেতে পাতা নকশাওয়ালা কার্পেট, চারদিকে অজস্র বাহারি ফুল, কাঠের

বাংলোয় রাতে জ্বলে উঠত চীনা ঝাড়বাতি-আর ভেসে আসতো গানের অপূর্ব সুর, সঙ্গে বাঁশির মিষ্টি আওয়াজ। আদিবাসীদের সুমিষ্ট সঙ্গীত, মণিপুরী মেয়েদের বসন্তবাস। মালঞ্চবাসের বাইরে নয়ন বিমোহন শোভা আর ভেতরে কতকগুলি টানেল সহ অপরূপ সৌন্দর্যের নিদর্শন। একদিন কবিগুরু এই মালঞ্চনিবাসে বসে সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং নিজের নাটকের অভিনয় দেখতেন। আজ তা অতীত স্মৃতি।

কিন্তু, আজ কুঞ্জবনের ঐতিহাসিক মালঞ্চনিবাস ধ্বংসের পথে, বলা যায় ধ্বংসাবশেষ মাত্র। চারদিকে ঝোপঝাড়, জঙ্গলাকীর্ণ। মালঞ্চনিবাসের দেহের পলেস্তারা, ইট, খসে খসে পড়ছে, কাঠের অপূর্ব শিল্পগুলো ভেঙ্গে চুরে একাকার, দরজা-জানালা আর কিছুরই অবশিষ্ট নেই। শান বাঁধানো পাথরগুলো তুলে নিয়ে গেছে। কবির স্মৃতি বিজড়িত জোড়াবাংলোটি কোথায় ছিল কে জানে, মাটির সাথে মিশে গেছে। আর মালঞ্চনিবাস এক বীভৎস রূপ ধারণ করেছে— মনে হয় কঙ্কালসার জীর্ণ দেহ পড়ে আছে। ভাঙ্গা কাঁচ, বোতলের টুকরো-চারদিকে নোংরা গন্ধময় এক অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। এখানে দিনের বেলায় গরু, ছাগল, শূয়োর চরে বেড়ায় আর রাত্তিরে দুর্বৃত্তদের আড্ডাস্থল। ভূতুড়ে বাড়ির মত পড়ে আছে মালঞ্চ নিবাস — এখন কাছে যেতেই ভয় হয়।

অথচ এই মালঞ্চ নিবাসটি পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ কবি সর্বজন শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্যই তাঁর মনের মত করে ত্রিপুরার এক চিরশ্রদ্ধেয় মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য গড়ে দিয়েছিল। কুঞ্জবনের টিলায় নাতি উচ্চ শৈল শিখরে মালঞ্চ নিবাসটি রবীন্দ্র স্মৃতি নিয়ে এখন ধ্বংসের পথে, নিশ্চিহ্নপ্রায়। ভাবতে অবাক লাগে! যেখানে সর্বত্র মহান ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া অমর করে রাখার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, সেখানে এক মহান কবির জন্যে আর এক মহান রাজার নির্মিত স্মৃতি বিতান আজ শতবর্ষের দিকে যেতে যেতে পথেই হারিয়ে যাবে? অথচ এরই মধ্যে দশ বছর আগে ১৪০০ সালে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত মালঞ্চনিবাসে সপ্তাহব্যাপী কবি প্রণাম অনুষ্ঠান হয়েছে। গুণীজন সম্বর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবি সম্মেলন তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছে। সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী অনিল সরকার ও তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী কার্তিক কন্যা দেববর্মা। মন্ত্রীর কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল —'রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত মালঞ্চ নিবাস শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের হয়ে উঠুক, হয়ে উঠুক ত্রিপুরাবাসীর সংস্কৃতির সভ্যতার গবেষণা কেন্দ্র ও রবীন্দ্র স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র' কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। অথচ ত্রিপুরার সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের

সম্পর্ক নিয়ে চাপা অহংকার রয়েছে রাজ্যের মানুষের, রবীন্দ্র স্মৃতি বুকে নিয়ে ত্রিপুরা আজ এক দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছে। তাই মালঞ্চ নিবাস সংস্কারে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা রয়েছে। এখানে হবে --

এক-মালঞ্চ বাসের সংরক্ষণ। দুই-আছে মালঞ্চবাসটিকে জাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা। তিন- এখানে গড়ে তোলা হবে রবীন্দ্র-গবেষণা কেন্দ্র। চার- নির্মিত হবে রবীন্দ্র একাডেমি। পাঁচ- গড়ে উঠবে --- উপজাতি সাহিত্য, সংস্কৃতি কেন্দ্র। ছয়-এখানে সংরক্ষিত হবে কবিগুরুর ব্যবহারের জিনিসপত্র।

—কিন্তু না, কিছুই হচ্ছে না, হলোনা।

আপামর রবীন্দ্রপ্রেমিক এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে যুক্ত মানুষের মনে হয় যে কবির স্মৃতি বিজড়িত মালঞ্চ নিবাসের আজ কেমন 'নিষ্ঠুর দৈন্যদশা'! কিন্তু কেন? তার কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় রাজ পরিবার এবং রাজ্য সরকারের টানাপোড়েন। ফলে রবীন্দ্র স্মৃতিবাহী মালঞ্চবাসের সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর হচ্ছে না। মালঞ্চনিবাসসহ কুঞ্জবন এলাকাব বিশাল অংশ রাজপরিবারের। জানা গেছে, রাজ্য সরকার ও কয়েকবার রাজ পরিবারকে মালঞ্চনিবাস তাদের হাতে হস্তান্তর করার জন্যে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে, কিন্তু রাজ পরিবার তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এখনও জানায়নি। আবার শোনা গেছে, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছিলেন। ছয়-একর এলাকাজুড়ে মালঞ্চনিবাসটি রাজাদের সম্পত্তি যার মূল্য প্রচুর টাকা, ফলে রাজ্য সরকারের পক্ষে তা ক্রয় করা সম্ভব নয়, সুতরাং রাজপরিবারের কাছ থেকে এটি নিয়ে রবীন্দ্র সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়া হোক— কেন্দ্রীয় সরকারও তখন কিছু জানায়নি। তারপর ১৯৯৯ সাল। রাজ্যের সংস্কৃতি মন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী জানালেন ন্যাচারেল হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়ামের নির্দেশক মিঃ গগতে এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। এক সময় আবার খবর — কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন রাজ পরিবারের কাছ থেকে এ জমি কেনা সম্ভব নয় আর্থিক অসঙ্গতিতে — তাই কেন্দ্র আপাতত অপারগ রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত স্থানটির অধিগ্রহণে। কিছুদিন চুপচাপ-পরে জানা গেল কেন্দ্রীয় মানব উন্নয়ন মন্ত্রকের সাংস্কৃতিক সচিব কস্তুরী গুপ্তা মেনন এ ব্যাপারে এক কোটি টাকা দেওয়ার জন্যে রাজি হয়েছেন এবং বিষয়টি রূপায়ণের জন্য তিনি অনুরোধও করেছেন। শোনা গিয়েছিল, রাজপরিবারের সাথে জিতেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় 'মালঞ্চ নিবাস' নিয়ে কথা বলেছিলেন — পরে জানিয়েছিলেন 'রাজপরিবার মালঞ্চনিবাস আমাদের হাতে দিলে আমরা সংস্কার করব। সংস্কার হলে পর্যটকরা দেখতে

আসবেন'— কিন্তু সব কিছু যেই তিমিরে সেই তিমিরে। জানা যায়, প্রায় ৪২ বছর আগে, ১৯৬১ সালে আগরতলা রবীন্দ্র পরিষদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি চিহ্নিত করে সংরক্ষণ এবং অধিগ্রহণ করার প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছিল — কোন ফলহয়নি। কাজেইরাজ্য সরকার ও রাজ পরিবারের টানাপোড়েন দূর হলেই রাজ্যবাসীর মঙ্গল। নতুবা রবীন্দ্র স্মৃতিবাহী মালঞ্চ নিবাস পোড়ো বাড়ীর রূপ, ভূতুরে বাড়ীর রূপ থেকে ধীরে ধীরে এক সময় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তিনি পরিক্রমণ করেছিলেন। প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কবি - তাই তো লক্ষ্য করি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের নামে রাস্তা, সভাগৃহ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে এবং আজো হচ্ছে। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে ভবন স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর কোনে কোনে অর্থাৎ ক্ষুদ্র অঞ্চলেও কবিগুরু। প্যারিসের বার্শিলোনার কাছে 'মোলেত' নামে ছোট্ট শহরে রবীন্দ্রনাথের নামে কালচারেল সেন্টার গড়ে ওঠে। ১৩, কোয়াটার এলাকায় রবীন্দ্রনাথের নামে রাস্তা আছে। চীনের শহরেও রবীন্দ্রমূর্তি। আর অধ্যাপক ফেং জিয়াং নিজের বাড়িটিকেই রবীন্দ্রভবন হিসেবে রবীন্দ্রচর্চা করেন। ভারতের রাষ্ট্রদূত সলমন হায়দারের দেওয়া রবীন্দ্রনাথের আরক্ষ মূর্তি রয়েছে অধ্যাপকের রবীন্দ্র ভবনে। চীনের পেইচিং-এ ৫০ তম মৃত্যুবার্ষিকী ২২শে শ্রাবণ বেশ ঘটা করে পালিত হয়েছিল। চীন, আমেরিকা, রাশিয়া থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও রবীন্দ্রচর্চা হচ্ছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে। পুরনো স্মৃতির সংস্কারও হচ্ছে। ২২শে শ্রাবণের প্রাক্কালে শোনা গেল, শান্তিনিকেতনের রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত গাড়িটি সংস্কার করা হবে।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে কবি গুরুর মধুর সম্পর্ক তুলনাহীন। ত্রিপুরার প্রতি, ত্রিপুরার মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধের তুলনা হয় না। রবীন্দ্র স্মৃতি বহন করছে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ, কুঞ্জবন, নীরমহল। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। কিন্তু মালঞ্চ নিবাসের রফা হচ্ছে না।

জাতির জীবনে স্মরণীয় দিনগুলি, ঐতিহাসিক দিনগুলো ফিরে ফিরে আসে। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে আমরা আবেগে আপ্লুত হই।

২২শে শ্রাবণের ভাবনায় মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম ত্রিপুরায় এসেছিলেন ১৩০৬ বঙ্গাব্দে, ইংরেজী ১৮৯৯ সালে ফাল্গুন মাসের বসন্ত শ্রীপঞ্চমীতে, অবস্থান করেছিলেন মহিম কর্ণেলের বসতবাটিতে । রাধাকিশোরের রাজত্বকালে । চারবছর আগেই শতবর্ষ নীরবে চলে গেল । স্মরণসভা করলেন না রবীন্দ্রপ্রেমী বা তথ্যসংস্কৃতি কেন্দ্র । রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় শেষবার এসেছিলেন ১৯২৬ সালে ।তাও পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে । দু'বছর আগেই । এসব দিনগুলো নীরবেও চলে যায় । আরো মনে পড়ে কবির মৃত্যুর বছরে ১৯৪১ সালে বাংলা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ আগরতলায় এক বিশেষ রাজদরবারের আয়োজন করা হয়েছিল-তাতে মহারাজ বীরবিক্রম রবীন্দ্রনাথকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সারা শহরে সেবার সাড়ম্বরে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়েছিল। পরে এরজন্যে শান্তিনিকেতনে একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসব হয়েছিল চারদিন পর অর্থাৎ ১৩৪৮ বাংলাসনের ৩০শে বৈশাখ। রোগকাতর কবি সে সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পরে সে বছরের ২২শে শ্রাবণ, মহাকবি আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছিলেন । 'ভারত ভাস্বর' উপাধিতে ভূষিত করার দিনটি আগরতলায় কিংবা শান্তিনিকেতনে, সমাবর্তনের স্মরণীয় দিনটি, বিশেষ একটা ঢেউ না তুলেই নীরবে বয়ে যায় ।

আজ ২২শে শ্রাবণের ভাবনায় জরাজীর্ণ, অবহেলিত এই মালঞ্চ নিবাসের ছবি ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে অথচ এমন বীভৎস রূপটি ফুটে ওঠার কথা ছিল না - কেননা বিশ্বের ইতিহাসে, বিশ্বের কবি শ্রেষ্ঠের সাথে বিশ্বের কোন এক প্রত্যন্ত, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মহারাজের শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং সেই সুবাদে সাত সাতবার রাজ্যে এসে চার রাজার সঙ্গে সখ্যতা, তাদের আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, সুখের দিনে, দুখের দিনে পাশে থেকে উদ্বুদ্ধ করা এক বিরল ঘটনা । আজ শ্রদ্ধায় আমাদের মাথানত হয়ে আসে যখন শুনি ত্রিপুরার রাজপুরুষরা সুদূর অতীতকাল থেকেই তাঁদের গুণগ্রাহিতা, বিদ্যোৎসাহিতা এবং রাজোচিত গুণবত্তার জন্য সর্বজনবিদিত ছিলেন । হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার । কবিগুরু নিজেই বলেছিলেন -'ত্রিপুরার সঙ্গে আমার ক্ষণেক অতিথির সম্পর্ক নয় '।

রবীন্দ্র প্রতিভার স্ফুরণ মুহূর্তে তাঁর লেখা 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যপাঠ করে মুগ্ধ ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অভিনন্দন বাণী পাঠান । ত্রিপুরার রাজ দরবারের মন্ত্রী ও বৈষ্ণব সাহিত্যিক রাধারমণ ঘোষ মহাশয়কে দিয়ে । রবীন্দ্রনাথ সে সম্মান ও শুভেচ্ছার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন

পরবর্তীকালে । ১৩৪৫ সালের ২২শে পৌষ শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে ত্রিপুরার সর্বশেষ মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য বাহাদুরকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন --

"আজ একথা আমার গর্ব করে বলবার অধিকার হয়েছে যে, ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত, তাঁকে অনতিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্তে বন্ধুভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে ত্রিপুরা রাজবংশ গৌরব লাভ করেছেন। তেমন গৌরব বর্তমান ভারতবর্ষের কোনও রাজকূলের কেউ আজ পর্যন্ত পাননি ।" এমন কৃতজ্ঞতা বোধের কথা সত্যিই দুর্লভ ।

আবার কবিগুরুর প্রতি রাজার শ্রদ্ধাভক্তি সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক করে - সর্বশেষ নৃপতি বীরবিক্রম মাণিক্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে আয়োজিত এক বিশেষ প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করতে গিয়ে মন্তব্য করেন।

'তুমি বাংলার কবি, ভারতের কবি, বিশ্বকবি সবই সত্য বটে , কিন্তু সকলের আগে তুমি ত্রিপুরার কবি" । আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও আবেদনে সাড়া দিয়ে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য নিজ তহবিল থেকে বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুকে তাঁর পরীক্ষার এবং বিদেশে তাঁর আবিষ্কার প্রচারে আর্থিক সাহায্য দান করেন। কবির সাহচর্য রাজাকে উদারচিন্তা ও ভাবনার দিগন্তকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল । রাধাকিশোরের কথা আমাদের অভিভূত করে, তিনি বলেন "বর্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু একপদ অলঙ্কার নাইবা হইল, তৎপরিবর্তে জগদীশবাবু সাগরপার হইতে যে অলঙ্কারে ভারতমাতাকে ভূষিত করিবেন তার তুলনা কোথায় ?" রাজা রবীন্দ্রনাথকে বলেন - 'সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা ।

আমি আপনার ভক্ত বন্ধু মাত্র । এই উচ্চমঞ্চে আমারস্থান নহে ।" আবার অন্ধকবি হেমচন্দ্র অর্থাভাবে পীড়িত শুনেই কবির জন্যে আজীবন বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন । আরো জানি, প্রখ্যাত লেখক বঙ্গভাষা ও স াহিত্য খ্যাত. দীনেশ চন্দ্র সেনের মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করেছিলেন সহৃদয় রাজা রাধাকিশোর । জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রভক্ত মহারাজ ব্রজেন্দ্র কিশোরের সমস্ত সত্তায় বিরাজিত ছিলেন কবিগুরু । কবি গুরুর চিঠিপত্র, গান আর কবিতার মাঝে বারবার পথনির্দশে পেয়েছেন তিনি ।

ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরম আত্মীয়তার সূত্র ধরেই শান্তিনিকেতনেও ত্রিপুরার সেতু বন্ধ রচিত হয় । কবির আমন্ত্রণে ত্রিপুরার বহুকৃতি সন্তান বিশ্বভারতীতে

পূজারীর ব্রত গ্রহণ করেন । রাজ্যের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ অনেক মহত্তর রচনা ও বিচিত্র পত্রাবলী লিখেছেন - তাঁর অনবদ্য লেখনীপ্রসূত ত্রিপুরা ভিত্তিক রচনা রাজর্ষি, বিসর্জন, মুকুট প্রভৃতি উপন্যাস, নাটক আমরা পেয়েছি । 'কাহিনী' কাব্যটি উৎসর্গ করেন মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যকে । রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যেই মণিপুরী নৃত্যধারা আজ বিশ্ব বন্দিত । তাই ত্রিপুরার সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক প্রবাদে পরিণত হয়েছে আজ । রাধাকিশোরের পুত্র বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য ও তাঁর কনিষ্ঠ ভাই ব্রজেন্দ্রকিশোর কবির স্নেহ প্রীতি ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার পর ব্রজেন্দ্র কিশোরের প্রযত্নেই আগরতলায় অভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ ইতালি ভ্রমণে তাঁর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন ব্রজেন্দ্র কিশোর। রবীন্দ্রনাথ বারবার কৃতজ্ঞচিত্তে ত্রিপুরার রাজাদের রাজপরিবার, ত্রিপুরাবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন । রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বীরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে বলেছিলেন যে —"যে অপরিণত বয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয় সংকুল ছিল তার সঙ্গে কোনো রাজত্ব গৌববের অধিকারীর এমন অবারিত ও এহেতুক সখ্য সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ ।"

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাকে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্থান দিয়েছিলেন তাই বারবার কবি সাহিত্যের কমলকানন থেকে, সরস্বতীর আরাধনা থেকে ছুটে এসেছেন ত্রিপুরায় । ত্রিপুরার রাজকুলের চার পুরুষের আত্মীয় রবীন্দ্রনাথ । ত্রিপুরার সাথে কবির সুগভীর সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধায় বলেছিলেন যে- "জীবনে যে যশ আমি পাচ্ছি পৃথিবীর মধ্যে তিনিই (বীরচন্দ্রঃ তাঁর প্রথম সূচনা করে গিয়েছিলেন তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা ... যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না, তাঁকেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্ট কে স্পষ্ট দেখেছিলেন ।"

এমন স্বীকৃতি দুর্লভ ।

ত্রিপুরার সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির যে সম্পর্ক তা অত্যন্ত মধুর-এই সম্পর্কের কথা রাজা এবং কবির উক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে যখন, তখন গর্বে আমাদের বুক ভরে যায় ।

ত্রিপুরার রাজারা কবিগুরুকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন, কবির উপদেশ পরামর্শ গ্রহণ করেছেন । আশ্চর্য্য ! যাকে নিয়ে রাজ্যের রাজাগণগর্বিত, জনগণ গর্বিত-সেখানে

সেই বিশ্ববন্দিত মহান কবির স্মৃতিসৌধ আজো সংস্কার হলো না - এ বড় লজ্জা, বড় পরিতাপের বিষয় । আরো বলি, কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপথিক, যিনি ভারতবর্ষে, ইউরোপে, আমেরিকায়, প্রাচ্য ভূখণ্ডের কিংবা অন্য কোথাও ঘুরে বেড়িয়েছেন কিংবা একে একে জাভা, কাম্বোডিয়া, পারস্য, জাপান, রাশিয়া, চীন, ইটালী, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মাণ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং যে দেশেই তিনি গিয়েছেন - পেয়েছেন রাজার চেয়েও অধিক সম্মান এবং সম্বর্ধনা, তবুও সেই কবি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার কথা বিস্মৃত হননি - এ যে ত্রিপুরার গৌরব । পরিশেষে-সোভিয়েত রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা যাকে পৃথিবীর 'শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী' বলে সম্মান জানিয়েছেন, যিনি সর্ব দেশের, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি পুরুষ, যিনি বিশ্ব কবি, যিনি কবি সার্বভৌম, যিনি ভারতীয় হয়েও আন্তর্জাতিক এবং যিনি ভারত আত্মার পথিক, যিনি আমাদের ক্ষুদ্র পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের অলঙ্কার এবং অহংকারস্বরূপ- সেই মহান কাজ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত মালঞ্চ নিবাস কি কালের অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে ? প্রশ্ন জাগে ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

ডঃ প্রণব বর্ধন ত্রিপুরার সাহিত্যজগতে পত্র পত্রিকায় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ করে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন । সাহিত্য Stylistics বা রচনাশৈলী বিজ্ঞানে গবেষণা করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন । বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও লেখকের উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হল- বাংলা প্রবাদ প্রবচনের ইতিকথা 'সাহিত্য ক্যুইজ' ইত্যাদি । শুষ্ক-কঠিন পাণ্ডিত্য নয় গভীর অথচ সরস গবেষণাই তার সারস্বত সাধনা। সম্প্রতি সরকারী শিক্ষকতার চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে সাহিত্যচর্চায় মনোযোগ দিয়েছেন।

******

তেজপুর জেল থেকে ফিরার পথে

— প্রভাত রায়

১৯৪৮ এর ১২ই ডিসেম্বর। দৈনিক একঘেয়ে বন্দীজীবনের সকাল সন্ধ্যা ও রাত্রি আসে আর যায়। কিন্তু সেদিন সকাল বেলা ৮টায় আমাকে এবং বীরেণ দত্তকে তেজপুর জেল গেইটে তলব দেওয়া হইল। আমার বিছানাপত্র বই আনার সঙ্গে সঙ্গে জেলের গেইটে নেওয়া হইল, কিন্তু বীরেণবাবুরগুলি নেওয়া হইল না। মিশ্রিত মানসিক অবস্থা লইয়া জেলে প্রহরীদের বেষ্টনীর মধ্যে উভয়ে জেল গেইটে উপস্থিত হইলাম। সহবন্দীরা বৈপ্লবিধ্বনি দ্বারা গেইট পর্যন্ত আসিয়া বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন।

জেল গেইটের ভিতর ঢুকিতেই দেখি যমদূতের মত ডজনখানেক সশস্ত্র পুলিশ ঋজুভাব attention অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের নীরবতা ও পলকমাত্র চাহনি দেহ-মনে একটি ইঙ্গিতের শিহরণ বহাইয়া দিল। আর একটি কক্ষে পদাপর্ণ করিয়া দেখিলাম জেলারের সামনে একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর বসিয়া ব্যাপারখানা বুঝিবার পক্ষে সহজ হইতে লাগিল। বীরেণবাবুকে যে ছাড়া হইবে না, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আরমড পুলিশ কার জন্যে? আমাকেই হয়তো পুলিশ দিয়া আগরতলা পাঠান হইবে।

এসিঃ জেলার আমাদের উভয়কে ডাকিয়া তাহার সম্মুখের টুলটাতে বসাইলেন। পুলিশ অফিসার আমাদের পাশের খালি চেয়ারে আসিয়া বসিল। জেলের কর্মচারীরা সকলেই কাগজপত্র লইয়া লেখায় ব্যস্ত। একটা অদ্ভুত নীরবতায় সমস্ত ঘরটি গাম্ভীর্যপূর্ণ। আর এক কক্ষ হইতে পুলিশগুলি আমাদের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া কি যেন বলাবলি করিতেছে।

কয়েকমিনিট পরে এসিঃ জেলার আমার বিছানাপত্র, সুটকেশ ও বইগুলি পরীক্ষায় ব্যপৃত হইলেন। বন্ধুরা পথের জন্য কিছু লুচি ও আলুভাজা সঙ্গে দিয়াছিলেন তাহাও দেখা হইল। পরীক্ষা শেষ হইলে নিজের টেবিল হইতে আমার নামীয় একটা চিঠি বাহির করিয়া আমাকে দিয়া বলা হইল যে, উহা আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল। রেলওয়ে ইনটার ক্লাশের একটা ওয়ারেন্ট দেওয়া হইল এবং সরকারী অতিথির পরিচয়সূচক একটি সার্টিফিকেট পাইলাম যাতে রাস্তায় কোন বিপদে না পড়ি।

বীরেণবাবু ও আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল পুলিশ অফিসারটি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হইলে জেলার বীরেণবাবুকে ডাকিয়া একটি কাগজ দিলেন এবং পুলিশ অফিসারটিকে

ডাকিয়া বলিলেন, ইনির নামই বীরেণ দত্ত । তাঁকে আজ আমরা এখন ছাড়িয়া দিলাম । আপনি যাহা করিতে হয় করুন । অফিসাবটি বীরেণবাবুকে প্রহরী অবস্থিত হইলে লইয়া গেলেন এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিয়া পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করিলেন। আমাদের কক্ষে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার হাতের কাগজটা নিয়া দেখিলাম তাঁহার প্রতি আরও ছয় মাসের আটকাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । কোনরূপ ভনিতা না করিয়া জেলার তাঁকে পুনরায় ওয়ার্ডার দ্বারা জেলের ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন । সুদৃঢ় গেইটটা দড়াম করিয়া আওয়াজ হইল । অতঃপর জেলারবাবুর সঙ্গে শুরু হইল আমার পয়সার হিসাব । কেবল রেলের টিকিট পাইলেই চলে না, রাস্তায় খাওয়া ও কুলীখরচেরও প্রয়োজন আছে। জেলার বলিলেন, বাড়ী পৌঁছিতে দুইদিন লাগিবে, আমি বলিলাম চারদিন লাগিবে । তিনি বলিলেন, বদরপুর ও করিমগঞ্জে গাড়ী বদলের জন্য কুলীর খরচ লাগে না, আমি বলিলাম লাগিবে । আমি তাঁকে বলিলাম দেশবিভাগ হওয়ায় নিয়মকানুনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । এ লাইনে আমি কোনদিন না চলিলেও সববন্দীদের মধ্যে যারা এদিককার লাইনের কর্মচারী ছিলেন তাঁহাদের নিকট সন্ধান নিয়াছি । জেলার বলিলেন, দিন ১৲ টাকা করিয়া খোরাকী দিবার নিয়ম, এর বেশী দিবার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই ।

আমি বলিলাম, নিয়ম না থাকিলে দিতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু কুলী খরচের ব্যবস্থা থাকিলে এবং যেখানে চারিদিন লাগে সেখানে কম হিসাব ধরিয়া দিবার কোন নির্দেশ আছে ?

শেষে তিনি আমাকে ১২৲ (বার) টাকা দিলেন । ঘৃণা ও বিরক্তিতে মনটা আমার ভরিয়া গেল । ইহা যেন বাজারে গিযা জিনিষের উপর দরাদরি করা । কিন্তু তবু জেলার এমন ভাব দেখাইলেন, যেন আমাকে খুবই অনুগ্রহ করা হইয়াছে।

কিন্তু জেলারদের আমার চিনিতে বাকি নাই । ইহা আমার প্রথম অভিজ্ঞতা নয় । কয়েদীদের পয়সা এবং শ্রম এরা কিভাবে চুরি করে তাহা আমার জানা আছে । চোর, ডাকাত, বদমায়েস লইয়া কারবার করিতে করিতে ইহাদের মনোবৃত্তি দেওলিয়া হইয়া গিয়াছে । কত লোকের ফাঁসী হয় এদের হাতে, কত লোক নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এদের দুর্ব্যবহার সহিতে না পারিয়া । এদের কোন সহানুভূতি নাই । বিচার বিবেচনা নাই । ভদ্রতা বা শালীনতার বালাই নাই । সঙ্কুচিত আইনের অর্থকে অধিকতর সঙ্কুচিত করিয়া ইহারা কর্তব্যের দোহাই দিয়া থাকে, আর বন্দীদের খোরাক ও পোষাক হইতে পয়সা চুরি করার সময় কর্তব্যের কথা মনে থাকে না ।

তেজপুরের জেলারটি ২৫ বছরের উপর জেলে জেলে চাকুরী করিয়া পেনসনের

সীমায় পৌঁছিয়াছে। তিনি জানেন বেলা আট আনায় কোন ভদ্রলোকের হোটেলে খাওয়া পোষায় না। তাঁর সঠিক জানা নাই বাড়ী পৌঁছতে আমার কতদিন লাগিবে এবং পথে কতবার উঠানামা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা সঠিক জানার ব্যবস্থা করার ত কোন প্রয়োজন তাঁর নাই —অথচ আমার হিসাবমত দিতে নারাজ। ২-১ টাকা লইয়া পাছে ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়ি ইহাই তাঁর ভয়। যদি তিনি ফাঁকিতে পড়িয়া যান তবে যে জাতীয় গণতন্ত্রী সরকারের সাংঘাতিক ক্ষতিহইবে! আগে ইংরেজ সরকার ছিল এদেরই সরকার, এখন কী কংগ্রেস সরকার এদের নিজেদের সরকার না হইয়া পারে ? জেল হইতে তেজপুর ষ্টেশন প্রায় এক মাইল। জেলারকে বলিলাম, রিক্সা ভাড়া যখন দিবেনই না তখন কুলীর ত একটি ব্যবস্থা করুন।

ইহা শুনিয়া তিনি জেল জমাদারকে কুলীর ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন।

একদিন ছয় মাস পুর্বে বহির্জগৎকে পশ্চাতে রাখিয়া যে দরজা দিয়া কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই দরজাকে পাছে ফেলিয়া আবার বহির্জগতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যে লোকটিকে আমার বিছানা ও সুটকেশ বহন করিবার জন্য জমাদার ঠিক করিয়া দিয়াছিল তার সঙ্গে আর একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাড়ী কি এই তেজপুরেই।

সে বলিল, না বাবু।

কি একটা চা -বাগানের নাম করিয়া সে বলিল সেখানে সে চাকুরী করে। তার এক আত্মীয় বে-আইনী আফিংসহ ধরা পড়িয়া তেজপুর জেলে শাস্তিভোগ করিতেছ। এই দণ্ডিত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করিতে তাহারা আসিয়াছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্‌দিন দেখা হইয়াছে ?

উত্তর — আজই।

প্রশ্ন — দেখা করিতে সিপাহীকে পয়সা দিতে হইয়াছে কি ?

উত্তর — তিন টাকা দিতে হইয়াছে ?

প্রশ্ন — কতক্ষণ দেখা করিতে পারিয়াছে।

উত্তর — ১৫/২০ মিনিটের বেশী নয়। সিপাহীর তাগাদায় কাজের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিছুই বলিতে পারি নাই।

প্রশ্ন — আত্মীয়টা কবে মুক্তি পাইবে ?

উত্তর — আর তিন মাসের মত আছে ।

প্রশ্ন — দেখা করার অনুমতির জন্য কে দরখাস্ত লিখিয়া দিয়াছে ?

উত্তর — উকীলবাবু দিয়াছে ।

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, উকীলের কাছে দরখাস্ত লিখিতে কি পয়সা লাগে নাই ?

উত্তর — পাঁচ টাকা দিতে হইযাছে ।

প্রশ্ন — দরখাস্তখানাত যেকোন একজন লিখিয়া দিতে পারিত । অনর্থক উকীলকে পয়সা দিতে গেলে কেন ?

উত্তর — বাগানেরবাবু বলিয়া দিয়াছিলেন উকীলকে দিয়া দরখাস্ত লিখাইতে এবং উকীলবাবুর নাম বলিয়া দিয়াছিলেন।

দুঃসহ বন্দীজীবনের অধ্যায় শেষে বহির্জগতের মুক্ত আলো-বাতাসের স্পর্শ লাভ করিয়া মুক্ত মানুষের সহিত কথা বলিবার যে ব্যাকুলতায় সমগ্র মন মুখর ছিল প্রথম সুযোগেই যেন তাহা গুড়াইয়া গেল ।

চা-বাগানের সাধারণ গরীব মজুর । আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়া বঞ্চনা বিড়ম্বনায় সীমা নাই । দূর হইতে আসিতে রেল ভাড়া লাগিয়াছে । ফিরিতেও লাগিবে । একদিন আগে আসিয়া হোটেলে খাইতে ও থাকিতে হইয়াছে । চার পয়সার কাগজের উপর মাত্র দুই মিনিটের কাজের জন্য উকীলকে ৫ পাঁচ টাকা দিতে হইয়াছে । জেলের সিপাহীও ৩ টাকা আদায় করিতে ছাড়ে নাই আবার টাকা দিয়াও ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিল না! তারই উপর বোধ হয় চার কি ছয় আনায় আমার মালপত্র বহনের কাজটাও গছাইয়া দেওয়া হইল ধমকের সহিত, যেখানে রিক্সা বা অন্য কুলী হইলে দুই টাকার কমে মানিত না।

মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ নিরীহ মানুষের উপর সমাজের এই শোষণ ও প্রবঞ্চনার পরিচয় আমাকে যেন মুক্তির আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলিল।

ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম গাড়ীর অনেক দেরী । হাসি রায়ের কাছে বাড়ী মুখো সংবাদ জানাইয়া তার করিতে হইল । রবিবার বলিয়া ডবল খরচ দিতে হইল । টেলিগ্রাম করিতে মনে দুশ্চিন্তা হইল এক টাকা দশ আনার জন্য । মনে মনে স্থির করিলাম নিত্তির

ওজনের এই পয়সা পথে ভাত না খাইয়া চা খাইয়া পূরণ করিতে হইবে ।

তেজপুরের পরবর্তী যে ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হয় তার নাম রাঙ্গাপাড়া । গাড়ীতে উঠিয়া দেখি ৫/৬ জন ভূটানী স্ত্রী-পুরুষ বসিয়া আছে । জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম তাহারা দেশে চলিয়াছে, পৌঁছিতে ১৪/১৫ দিন লাগিবে । একটু তৃপ্তি বোধ করিলাম । ভূটানীদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনুসরণকারী স্পাই নাই । কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার কয়েক মিনিট আগে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর জায়গায় ভুলে মধ্যম শ্রেণীতে উঠিয়াছে জানিয়া তাড়াতাড়ি অন্য গাড়ীর জন্য নামিয়া পড়িল । একজন আধা-সিপাহী পোষাকপরা লোক ভূটানীদের না নামিয়ে গেলে দেড়া ভাড়া লাগার ভয় দেখাইয়াছিল এবং নিজে পরিত্যক্ত স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিল । কিন্তু অকস্মাৎ গার্ড আসিয়া টিকিট চেক করিয়া সেই পোষাকপরা লোকটাকে এখানে উঠেছেন কেন, থার্ড ক্লাশে চলে যান —বলিয়া নামাইয়া দিলেন ।

রেলে চলিতে গিয়া প্রায়ই এমন লোকের দেখা মিলে যারা নিজেরা টিকেট না করিয়াই কিম্বা নিম্ন শ্রেণীর টিকিটে উচ্চশ্রেণীতে উঠিয়া টিকেটহীন যাত্রীদের উদ্দেশ্য করিয়া নামিয়া যাইতে বলে, অথবা বাহির হইতে কেহ গাড়ীতে উঠিতে গেলে দরজা আটকাইয়া রাখে ।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে দেখা গেল আমার কামরাতে তখন সহযাত্রী মাত্র একজন । সহযাত্রীটির বয়স বেশী নয়, ২০/২২ হইবে । তার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম সেও ফাকির উপর গাড়িতে উঠিয়াছে । স্থির হইয়া সে বসিতে পারিতেছে না, কোন একটা স্থানে গাড়ী থামামাত্রই সে নামিয়া পড়িতেছে, গাড়ী চলিতে আরম্ভ, আবার উঠিতেছে । চেকার দেখিলে এড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে ।

যতই গাড়ী আগাইতে লাগিল ততই খালি কামরাখানা যাত্রীতে ভরিতে লাগিল । এক ষ্টেশনে জনৈক ভদ্রলোক সপরিবারে উঠিলেন । তাঁর সঙ্গে আলাপে জানিলাম কালীঘাটে মানত দিতে তিনি কলিকাতা চলিয়াছেন । এ লাইনেই কোন একটা ছোট ষ্টেশনে তিনি চাকুরী করেন; পাকিস্তান বাড়ী । বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে বলিলেও চলে । পাকিস্তানে বাঙালী হিন্দুর চরম দুর্দশার কাহিনী তিনি বলিতে লাগিলেন ।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন লোক গাড়ীতে উঠিল । পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থার আলোচনা রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবাহিত হইল ।

একজন বলিলেন, হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানে যুদ্ধ হইবেই তাহা ত জানা কথা । সে যুদ্ধে হিন্দস্থানের জয় সুনিশ্চিত । পাকিস্তান ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত

হইবে । তখন নিপীড়িত হিন্দুদের অবস্থা যদি আবার ফিরে । সেই আশাতেই ত হিন্দুরা এখনও পাকিস্তানে বাস করিতেছে । পাশের এক ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু যাই বলুন, আমরা হিন্দুস্থানকে যতদূর ভালবাসি, মুসলমানেরা তাদের পাকিস্তানকে আমাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী ভালবাসে । জীবন থাকিতে এরা পাকিস্তানকে ভাঙ্গিতে দিবেনা ; হাজারে হাজারে এরা দেশ রক্ষার জন্য কিভাবে আনসার বাহিনীতে যোগ দিতেছে তাহা কি দেখা যাইতেছেনা ?

এ কথার পর সকলেই সহসা কিছুক্ষণের জন্য নিঃশব্দ হইয়া গেল । কামরাটির মধ্যে একটা প্রশান্ত নীরবতা দেখা দিল । হিন্দুস্থানওয়ালারা খুব সম্ভব মনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিল না । লোকগুলি খুব সম্ভব নিজেদের মন হাতড়াইয়া দেখিতেছিল বাস্তবিক লড়াই বাঁধিয়া গেলে নিজেরা মারিতে কতখানি প্রস্তুত ।

পূর্ব বাঙ্গলার হিন্দুদের সম্পর্কিত আলোচনার মোড় ঘুড়িয়া কখন যে আসামী বাঙ্গালী বিরোধের কথায় গিয়া দাঁড়াইল তাহা বলিতে পারিনা । হয়ত হিন্দু-মুসলীম সমস্যা বা অন্য কোন বিষয় লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম । হঠাৎ খেয়াল হইল, যখন শুনিলাম কলিকাতাগামী বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, প্রাদেশিকতা থাকিলে হিন্দুস্থান কিভাবে শক্তিশালী হইবে ? গান্ধীর আদর্শ গ্রহণ না করিলে দেশে কিছুতেই শান্তি আসিবেনা ।

একজন আসামীয়া ভদ্রলোক বলিলেন, আপনারা আসামে আসিয়া ইহাকে পর ভাবেন বলিয়াই ত এমন হয় । ধরুণ আপনারা চাকুরী বা ব্যবসা করিতে আসিলেন এবং থাকিয়া গেলেন, তারপরই বাঙ্গালা স্কুল, বাঙ্গালা ভাষা লইয়া প্রভূত্বমূলক আন্দোলন শুরু করিয়া দেন ।

ইহার উত্তরে কালীঘাট দর্শনার্থী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ঠিক, ইহাত বাঙ্গালীর পক্ষে অন্যায় — বলিতে দেখিয়া আমি তাঁর ব্যক্তিত্বহীনতায় অবাক হইলাম ।

মধ্যে মধ্যে আমার খুবই ইচ্ছা হইতেছিল এই সকল প্রসঙ্গের উপর দুই চারটি কথা বলি, কিন্তু সদ্য কারামুক্ত নিরাপত্তা বন্দীর উপর পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা ভাবিয়া কোন মন্তব্য করা সমীচিন মনে হইল না ।

রঙ্গিয়া ষ্টেশনে আসিয়া রাত্র প্রায় ৮½ টায় গাড়ী থামিলে নামিয়া পড়িতে হইল । এখানে গাড়ী বদল করিতে হইবে । কিন্তু তাহা শেষ রাত্রের আগে নয় । রাত্রিবেলা আর কোন গাড়ী নাই । বাড়ীমুখো মন তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছিবার জন্য ব্যাকুল, আর এদিকে শীতের রাত্রিকাল ষ্টেশন । অনাবশ্যক এরূপ কতটি রাত্রি হইবে অপেক্ষা করিতে কে

জানে ।

ষ্টেশনের আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমের দিকে কুলীসহ আগাইয়া গিয়া দেখিলাম দরজা বন্ধ । বিছানাপত্রগুলি প্ল্যাটফর্মে নামাইয়া কুলীকে চাবীর খোঁজে পাঠাইয়া দিলাম । মনে মনে একটু হাসিলাম এই ভাবিয়া যে ইন্টার ক্লাশের ফেরৎ যাত্রী এক বন্দীর সখও ত কম নয় । বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিবার তহবিলের চিন্তায় ম্রিয়মান অথচ দৃষ্টি আপার ক্লাশের দিকে । যদি ইহাই আমার সত্যিকার মনোভাব, তবে কি দোষ করিয়াছিল ভূটানীরা — কি অন্যায় করিয়াছিল টিকেট ছাড়া যুবকটি ।

ওয়েটিং রুমের দরজা খোলার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে ভাল না লাগায় নিকটের টুলে সহযাত্রীদের পাশে বসিয়া পড়িলাম । প্লেটফর্মে উপযুক্ত আলোয় ব্যবস্থা তখন না থাকায় অন্ধকারের ভাগই বেশী দেখা গেল । যাত্রীর দল ষ্টেশনের মধ্যে রাত্রি কাটাইতে স্থান সংগ্রহে ব্যস্ত ।পান, সিগারেট খাবার বিক্রেতাদের চিৎকার, যাত্রীদের কলরব ও যাতায়াত, রেলওয়ে ষ্টাফ ও কুলীদের তড়িৎ পদক্ষেপ চলাফেরা ষ্টেশনটিকে প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত করিয়াছিল । আমার সঙ্গে শীতের উপযুক্ত কাপড় নাই । শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে অকস্মাৎ সিধাইয়ের পথে স্থানান্তরিত হইতে হওয়ায় প্রয়োজনীয় কাপড় লইবার কোন সুযোগ ঘটে নাই । নিজস্ব যৎসামান্য কাপড় চোপড় লইয়া আগরতলা জেলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা পরিয়াই তেজপুরে রওয়ানা হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম । কর্তৃপক্ষকে ইহার প্রতি আকৃষ্ট করায় প্রবোধ দিয়াছিলেন যে, তেজপুরে গিয়া স্বর্গসুখ নাকি মিলিবে. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জেল হইতে বিদায় দিবার সময় গরম কাপড় দিবার নিয়ম না থাকার অজুহাতে জেলার দয়া করিয়া আমার জন্য একটি জোড়াতালি দেওয়া ছেড়া কম্বল দিয়াছিলেন, পৌষ মাসের পথে শীত সত্ত্বেও তাহা গায়ে দিবার প্রবৃত্তি না হওয়ায় বিছানার চাদর ও একটি পাতলা বেড কভার একত্র করিয়া গায়ে জড়াইতে হইল । কাপুনির কষ্টে কাহারও সহিত বাক্যালাপের ইচ্ছাও হইলনা ।

অন্যমনস্ক হইয়া আছি ওয়েটিং রুমের কথা ভুলিয়া । এমন সময় দেখিলাম একজন জোয়ান ভদ্রলোক পরিষ্কার সীলেটী ভাষায় আমাকে সোজাসুজি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তেজপুর হইতে আখাউড়া যাইতেছেন না ?

আমিও সোজাসুজি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ কিন্তু কেন বলুন ত ?

ভদ্রলোক — আমি ষ্টেশনের ইনচার্জ পুলিশ অফিসার । আমাদের ওয়ার করিয়া আগেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে এ পথ দিয়া আপনি যাইতেছেন । আপনার সঙ্গে ত আর একজন কে ছিলেন ? Some দত্ত ?

আমি — হ্যাঁ , ছিলেন । নাম, বীরেন দত্ত । তিনি যে মুক্তি পান নাই সে খবর কি জানেন না ? দাঁড়াইয়া আছেন কেন ? বসুন — বলিয়া একটু সরিয়া তাঁহার বসার জায়গা করিয়া দিলাম ।

ভদ্রলোক বসিলেন । বলিলেন আপনার আগে আরও দুইজন তেজপুর জেল হইতে release হইয়া এই পথে যাইবার সময় আমার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে । একজনের নাম বোধ হয় দিগেন দাস ?

আমি বলিলাম, আর একজনের নাম নিশ্চয়ই Some পাল, ঠিক নয় কি? আমরা একত্রেই ছিলাম । কিন্তু আপনি আমাকে এই ভীড়ের মধ্যে বাহির করিলেন কি করিয়া ? আপনি কি আগে আমাকে চিনতেন ? এ অন্ধকারে কোন লোককে ঠিকভাবে বাহির করা ত সম্ভব নয় ।

ভদ্রলোক হাসিলেন । বেশ আত্মপ্রসাদের হাসি । বলিলেন, সেটা ঠিক, কিন্তু আমাদের অনুমান সাধারণতঃ ভুল হয় না । অনুমান করিয়াই আপনাকে বাহির করিয়াছি ।

কথাটা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে । যদি সত্য হইয়া থাকে তবে তারিফের যোগ্য বটে !

তিনি বলেন, আগরতলার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে; সেখানে আমার আত্মীয় আছে । হরিদাস চক্রবর্তীকে চিনেন ? তিনি আমার আত্মীয় হন ।

প্রসঙ্গক্রমে ভদ্রলোক বলিলেন, তিনিও নাকি একদা কংগ্রেসী ছিলেন এবং এখন শুধু পেটের জন্য চাকুরী করিয়া যাইতেছেন । পাকিস্তানেও যাইতে পারেন না ভয়ে । আগরতলা বাড়ী করিবার মত জমি কিনিতে পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন । কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে আসামে বাঙালী বিদ্বেষের জন্য চাকুরী করিয়া সুখ পাইতেছে না ।

এমন সময় চাবি আসিয়া পৌঁছায় প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমখানা খোলা হইল । আমাকে লইয়া তিনি সেখানে ঢুকিলেন এবং বিছানা পাতিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন ।

এ সকল সৌজন্যের মধ্যে আন্তরিকতার কোন কথাই উঠে না । তাই তাঁর সঙ্গ এবং আলোচনা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করাই ছিল আমার অভিপ্রায় ।

উভয়েই বিছানায় বসিলাম । আমাকে সিগারেট সাধিলেন, আমি মাথা নাড়িলাম ।

একসময়ে প্রশ্ন করিলেন, তেজপুর কি করিয়া আসিলেন ? আপনারা না স্টেটের লোক ?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক; কিন্তু অবাঞ্ছিত লোকের নিকট ইহার উত্তর দেওয়ার কি সার্থকতা ! তবু বলিলাম সেটা ঠিকই । তবে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত ত্রিপুরাতেও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণঅন্দোলন আছে এবং প্রজামণ্ডলও আছে । প্রজামণ্ডলের পরিচালকদের মধ্যে একজন হিসাবে আমার গ্রেপ্তার, আটক ও নির্বাসন । অথচ বর্তমান সরকারের উচ্ছেদের কোন কথা আমরা বলি নাই । দেশে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসায় আমরাও কংগ্রেসের আদর্শে ত্রিপুরার জনগণের হাতে ক্ষমতা আনিবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছিলাম।

তিনি বলিলেন — এখন ত কম্যুনিষ্ট ছাড়া আর কেহ গ্রেপ্তার হয় না । আপনি কি কম্যুনিষ্ট ?

ভদ্রলোকের ন্যাকামি দেখিয়া শরীরটা জ্বালা করিতে লাগিল । মিথ্যা অভিযোগ ও অন্যায় শাস্তির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ মনের মধ্যে জমাট বাঁধা ছিল তাহা বলিয়া এই প্রসঙ্গে বাহির হইতে চাহিল । এই প্রশ্নের মধ্য দিয়া আসামের আই বি অফিসারটি যেন ত্রিপুরার উচ্চ কর্তৃপক্ষরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত মনে হইল । বলিলাম — আমি কোনদিন কম্যুনিষ্ট ছিলাম না এবং তেজপুর জেলেবোধ করি আমি একজনই অকম্যুনিষ্ট বন্দী ছিলাম অতএব কম্যুনিষ্ট ছাড়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় না, ইহা মিথ্যা কথা ।

আমার কণ্ঠস্বরে হয়ত উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছিল । তাই রাজনৈতিক প্রশ্ন থামাইয়া আমাকে বলিলেন, খাইবেন না ? বলুন আমার বাসায় যাইবেন । ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলাম ভাত খাইবার ইচ্ছা নাই । ভাল চা কোথায় পাওয়া যায় বলিলে সেটা বরং খাইতে পারি ।

ওয়েটিং রুমে কুলীটিকে বসাইয়া রাখিয়া আমাকে লইয়া তিনি একটি ষ্টলে গেলেন । পাছে তিনি আমার পয়সা দেন সেজন্য আমি তাড়াতাড়ি চা-র পয়সা দিয়া দিলাম । দোকানী পয়সা না লইয়া আমার সঙ্গীর দিকে চাহিল । সঙ্গীটি পয়সাগুলি আমার পকেটে দিয়া বলিলেন, পয়সা লাগিবেনা । ব্যস্ত হওয়ার কারণ নাই ।

আমাকে ওয়েটিং রুমে পৌঁছাইয়া দিয়া তিনি বিদায় নিলেন । যাইবার সময় বলিয়া গেলেন ভোরে ৮টায় গাড়ীতে যেন উঠি ।

উপযুক্ত শীত কাপড়ে অভাবে ঘুম আসিল না । তাহা ছাড়া উচ্চশ্রেণীর ওয়েটিং রুমে স্বাচ্ছন্দ্যের যে আশা করিয়া রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পরে দেখিলাম জল, আলো ও লেট্রিনের এমনকি দরজা জানালা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নাই । যে বাতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা তেলের অভাবে নিভিয়া গিয়াছে ।

রাত্রি প্রভাত না হইতে বিছানা ছাড়িয়া জলের খোঁজ করিয়া মুখ হাত ধুইলাম, চার সন্ধান করিয়া দেখিলাম কোনও ষ্টলে তখনও চুলা জ্বলে নাই । রুম খালি ফেলিয়া বাহিরে বেশীক্ষণ থাকারও সাহস হইল না । হাস্যকরভাবে যৎসামান্য হইলেও পথের একমাত্র সম্বল ত । গাড়ীর খোঁজ করিয়া জানিলাম বেশী দেরী নাই । মাল লইয়া প্রস্তুত হইবার জন্য রাত্রিবেলার কুলিটির জন্য অনেক অপেক্ষা করিলাম । কিন্তু কোন খোঁজ না পাইয়া আর একটি কুলি ধরিলাম । অন্য লাইনের একটি গাড়ী আসিল । দেখা গেল ষ্ট্রেচারে করিয়া একজন রোগীকে অতি সাবধানে নামাইয়া আপার ক্লাশের ওয়েটিং রুমে রাখা হইল । জানিলাম গৌহাটিতে নাকি নেওয়া হইবে ।

যথাকালে নগাঁওগামী একটি গাড়ী আসিল । দেখিলাম প্রত্যেকটি কামরায় ভর্তি । কুলিটির সাহায্যে অতি কষ্টে জানালা দিয়া একটা মধ্যম শ্রেণীতে ঢুকিলাম । পায়ে চটিজুতা থাকায় কাজটা এক সময় অসম্ভব বলিয়াই মনে হইয়াছিল ।

গাড়ী ছাড়িবার বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই । আই বি অফিসারটির তখনও দেখা নাই ভাবিয়া অবাক হইতেছিলাম । ভীড়ের মধ্যে এক কোণে বসিয়া জানালা ঠেলিয়া উঠিবার পরিশ্রম লাঘব করিতেছিলাম । এমন সময় দেখি ভদ্রলোক হন্তদন্ত হইয়া একজন পুলিশসহ মধ্যম শ্রেণীতে ঢুকিলেন এবং উৎকণ্ঠার সহিত কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিলেন ।

কে যে তাঁহার উৎকণ্ঠা ও খোঁজাখুজির পাত্রটি তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য আরও জড়সড়ভাবে মুখ লুকাইয়া বসিলাম । কিন্তু আমার চেষ্টা ব্যর্থ হইল । আমাকে আবিস্কার করিতে পারিয়া তাঁহার মুখ সাফল্যে উজ্জ্বল হইল । বিদ্রুপ করিয়া বলিলাম, খুব ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন মনে হয় । কিন্তু আপনি ত সময় মত আসিলেন না । গাড়ী আসিয়া পড়ায় বড় কষ্ট করিয়া উঠিতে হইয়াছে ।

বিরক্তি চাপিয়া তিনি বলিলেন — আপনার ত এই গাড়ীতে যাওয়ার কথা ছিলনা । পরের গাড়ীর কথা ছিল । যাহাই হোক নামিয়া আসুন, চা খাইবেন।

তাহার এই অবাঞ্ছিত উদারতায় মনে মনে ভারী রাগিয়া গেলাম । একবার যে কষ্ট করিয়া উঠিয়াছি, আবার তাহা করিলে শুধু আমারই কষ্ট হইবেনা সহযাত্রীদেরও হইবে । ইহা ছাড়া পুলিশের লোকের সঙ্গে এরূপ অন্তরঙ্গতা দেখিয়া লোকে ভাববে কি ? ব্যস্ত হইয়া মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল — ঘুম হইতে উঠিয়া ৬/৭ কাপ চা হইয়া গিয়াছে আর হয় না, বলিলাম ।

তথাপি ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা । বাহিরে কাহাকে যেন ইসারা করিলেন । সঙ্গে

সঙ্গে দুই কাপ চা আসিয়া হাজির। স্টল বয়ের সঙ্গে দুইজন পোষাক পরা পুলিশ। আই. বি. অফিসারটির অনাবশ্যাক ভদ্র ব্যবহার এবং সঙ্গে দুইজন পুলিশের আবির্ভাব বিস্ময় এবং সন্দেহের সঞ্চার করেন। মনে মনে একটু ভয়ও যে না হইল, তাহা নয়।

ভদ্রলোক চা খাইতে খাইতে দাঁড়ান অবস্থায় বলিলেন — আমার সমস্ত জিনিষপত্র ঠিক আছে কিনা, রাত্রি কেমন কাটিয়াছিল ইত্যাদি। চা খাওয়া শেষ হইলে বয় চলিয়া গেল— কিন্তু পুলিশ দুটি ট্রেনের বাহিরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। চোখের কোন দিয়া তাহাদের দিকে এক নিমিষের জন্য চাহিলাম মনের ভাব বুঝিবার জন্য। কিন্তু কিছুই বুঝা গেল না।

গাড়ী ছাড়িবার ঘন্টা পড়িল, রেলের বাঁশীও বাজিল। ভদ্রলোক "আসি এখন, নমস্কার" বলিয়া নামিয়া পড়িলেন। গাড়ী যখন চলিতে শুরু করিল তখন দুই মূর্তি ইন্টার ক্লাশের পাদানিতে উঠিয়া পড়িল।

আমিনগাঁও ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। ব্রহ্মপুত্রের এ পাড়ে আমিনগাঁও, ও পাড়ে পাণ্ডু। পাণ্ডু একদিকে আসাম রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার বলিয়া জানিতাম, অন্যদিকে রেলওয়ের বিরাট এক কলোনী দেখিলাম।

মেইলে আসিলে ষ্টিমারে নদী পার হওয়া যায়। কিন্তু সাটল গাড়ীতে আসায় নৌকায় পার হইতে হইবে বলিয়া জানা গেল।

গাড়ী থামামাত্র পুলিশ দুইটি কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। একটা কুলী ধরিয়া নৌকার উদ্দেশ্যে চলিলাম। বোধ হয় অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছি, এমন সময় অনুসরণকারী পুলিশ দুইজন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া জানাইল যে আমাকে থানায় যাইতে হইবে।

থানায় যাইতে হইবে। আবার গ্রেপ্তার করা হইবে নাকি। রঙ্গিয়া ষ্টেশনে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম আমিনগাঁওয়ে বুঝি তাহা সত্যে পরিণত হইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম — থানায় কেন ?

পুলিশ — বড়বাবুর আদেশ।

প্রশ্ন — কারণ কি ?

উত্তর - জানি না।

মুটে সহ থানায় আসিলাম । সুটকেশ ও বিছানা থানার বারান্দায় রাখা হইল । একজন পুলিশ আসিয়া ভিতরে যাইতে বলিল । থানার ভিতরে গিয়া দেখি অফিস খালি । লক-আপে একটি পাগল যা খুশী প্রলাপ বকিতেছে, আর গারদের ফাঁকে হাত বাড়াইয়া সামনের টেবিল হইতে কাগজপত্র লইয়া ছিড়িতেছে । অগত্যা বসিয়া বসিয়া পাগলটির তামাসাই উপভোগ করিতে লাগিলাম ।

প্রায় বিশ মিনিট কাটিয়া যাইবার পর যখন আমার খোঁজখবর নিতে কাহাকেও দেখিলাম না তখন অফিসের বাহিরে আসিলাম । নীরবে অপেক্ষমান একজন পুলিশ বন্ধুকে বলিলাম, তোমাদের বাবুটি কোথায় ? আমাকে না ডাকিয়াছেন বলিয়াছিলে ? কুলিটার তাগিদ দেখিতেছ ত? পুলিশটি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু ১৫ মিনিটেও আসিল না । থানার আশে পাশে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র আরও পুলিশকে যার যার কাজে ব্যস্ত দেখিলাম । আমার দিক কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই । একজন শাস্ত্রীকে থানা অফিসারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না । বেচারা কুলিও আমার সঙ্গে থানায় আটক । তার মুহুর্মুহু তাগিদ । গাড়ীর জন্যও আবার চিন্তা আছে । সর্বোপরি এই থানায় যে আমাকে লইয়া কি করিবে তাহা অজ্ঞাত ।

পুলিশটা আসিল, কিন্তু একা । বলিল একটু অপেক্ষা করুন । চুল ছাটিতেছেন । বলিলাম - কুলীটা যে আপত্তি করিতেছে ?

পুলিশটা কুলীটাকে একটা ধমক দিল । আমি বলিলাম তাহাকে ধমক দিলে কি হইবে । আমাকে নিয়া কি দরকার তাহা শেষ কর নতুবা আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না ।

পুলিশ — গাড়ীর ত অনেক দেরী আছে ।

আমি — কিন্তু তাই বলিয়া থানায় বসিয়া থাকিব কেন ?

যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার বাবুর দেখা না পাই তবে বিছানা সুটকেশ ফেলিয়াই চলিয়া যাইব জানিয়ো ।

পুলিশ (বিনীতভাবে) — আচ্ছা তাহাই হইবে বাবু । ইতিমধ্যে একটু চা খাই আসুন ।

সে আমাকে লইয়া একটি সুদৃশ্য স্টলে গেল । পয়সাও সেই দিল ।

ষ্টল হইতে ফিরিয়া আসিয়া থানা অফিসার বলিয়া চোখের ইসারায় যাঁহাকে পুলিশটা

দেখাইয়া দিল, দেখিলাম থানা অফিসটি ভিতরে তিনি একটি ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড় বাহির করিতেছেন ।

কথা বলা দূরে থাকুক তিনি আমার দিকে ভাল করিয়াও চাহিলেন না । নিকটের চেয়ারে বসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম - আপনি নাকি আমায় ডাকিয়াছেন ?

উত্তর-কেন আপনাকে ডাকিব ? আমার ত কোন প্রয়োজন নাই । শুনিয়া গাটা জ্বলিয়া উঠিল । বলিলাম - আমার সঙ্গে কি ঠাট্টা করিতেছেন ? ভদ্রলোকও যেন চটিয়া গেলেন । চোখ বড় বড় করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বাড়ী কোথায়, কেন গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম, কি করিয়া তেজপুর আসিলাম প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্তু উত্তর শুনিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন ।

কুলী ও আমি অধৈর্য্যভাবে থানায় বসিয়া আছি । কুলি বিদায় হইবার জন্য, আমি পুনরায় গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় । অফিসারটি কেন যে গ্রেপ্তারের বিষয় জানাইতে দেরী করিতেছেন তাহাই ভাবিতেছিলাম । একটু পরে একজন মণিপুরী ভদ্রলোক থানায় আসিলেন । তিনি প্রথমেই একজন কনষ্টেবলকে তৈরী হইতে বলিলেন এবং অফিসের বারান্দার টুলে বসিয়া কি সব লিখিতে লাগিলেন । যে পুলিশ দুইজন রঙ্গিয়া হইতে আমাকে escort করিয়া আনিয়াছিল তাহাদেরে বিদায় দেওয়া হইল । প্রায় ২০ মিঃ পর কাগজ লেখা সারিলে একজন কনষ্টেবল সহ আমিনগাঁও থানা ছাড়িবার ছাড়পত্র পাইলাম ।

অপরপারের জন্য প্রস্তুত একটি কুঁদা নৌকায় উঠিলাম । ব্রহ্মপুত্রের হাওয়ায় ক্লান্ত শরীরটা সজীব মনে হইল । কিন্তু যদিও নৌকায় লোক বোঝাই হইয়াছে তথাপি আরও যাত্রীর আশায় নৌকা ছাড়িতে মাঝিরা দেরী করিতে লাগিল । দুয়েকজন আরোহী এই বিলম্বের জন্য বিরক্ত হইয়া নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে নৌকা ছাড়া হইল ।

নৌকাটা দশ কদমও বোধ হয় অগ্রসর হয় নাই । দেখা গেল ৩/৪ জন লোক আমাদের দিকে দৌঁড়াইয়া আসিতেছে । নূতন আরোহীর জন্য নৌকা আবার পারে লাগান হইল এবং আবার টালবাহানা চলিল । মাঝিদের যেন ইচ্ছা আরও ৬/৭ জন আরোহী আসুক । ইহাতে একজন আরোহী ভদ্রলোক নদীতে বিপদের আশঙ্কা উল্লেখ করিয়া মাঝিদিগকে গালিগালাজ, ধমক দিলেন এবং সকলে মিলিয়া নামিয়া যাইবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন ।

এবার মাঝি সত্য সত্যই নৌকা ছাড়িল । নৌকা না ছাড়িতে যে বাতাসটা স্নিগ্ধ বোধ হইতেছিল এখন যেন গায়ে কাটার মত বিঁধিতে লাগিল । আরোহীদের মধ্যে বলাবলি

হইতে লাগিল - নৌকা ডুবিলে সাঁতার কাটিয়াও বাঁচিবার উপায় হইবে না, কেন না বরফগলা জলের মত নদীর জল ঠাণ্ডা । হাত দিয়া দেখিলাম অবস্থা তাহাই । একটু শিহরিয়া উঠিলাম. হঠাৎ যদি জোর ঢেউয়ে কিম্বা ঝাপটা বাতাসে ... ।

ধীরে ধীরে কুলের ধারে যখন পৌঁছিলাম তখন ভয়ের ভাব কাটিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে নূতন স্থান দেখিবার সুযোগের কথাটাও স্মরণ হইল । তেজপুর জেলে যাইবার সময় পথে পথে কত দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি । আগরতলা হইতে যদি নির্বাসিত না হইতাম তবে ভ্রমণের সুযোগ হয়ত জীবনে ঘটিত না ।

পাণ্ডুঘাটে আসিয়া নৌকার পয়সা দিলাম । পুলিশটির পয়সা লাগিলনা । দেখিলাম সাটল গাড়ীখানা তৈরী, ঘন ধোঁয়া ছাড়িতেছে । তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম । কিন্তু জানা গেল ইহার গন্তব্যস্থল গৌহাটি পর্যন্ত ।

ট্রেনটি ছাড়িল বটে, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বারবার থামিতে লাগিল । কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিলাম ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের তুলিয়া নিবার জন্য এরূপ করা হইতেছে । গাড়িতেও বহু ছাত্র দেখা গেল । অন্যান্য যাত্রীদের উপর টিকিটি চেকিং-এর কড়াকড়ি সত্ত্বেও ছাত্রদের প্রতি ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইলেও ভাল লাগিল। মনে পড়িল এই টিকিট লইয়া ছাত্রদের সঙ্গে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের গোলমাল হইতেই অসমীয়া বাঙ্গালীতে সংঘর্ষ হইয়াছিল । গৌহাটির ট্রেন থামিল। অন্যান্য যাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীর পুলিশসহ নামিয়া পরিলাম । পুলিশ নিজেই একটি কুলীর ব্যবস্থা করিলেন।

গৌহাটি ষ্টেশনের একটি পছন্দমত স্থানে নূতন গাড়ী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিব ভাবিয়া কুলিটাকে সঙ্গে আসিতে বলিলে পুলিশটি বাঁধা দিয়া বলিল আপনাকে আগে থানায় যাইতে হইবে ।

আমিনগাঁও ষ্টেশনে থানায় আতিথ্য গ্রহণে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। ভয়. আশংকা ও সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছে । জিজ্ঞাসা করিলাম থানা কত দূরে ? সে বলিল — এই ত ষ্টেশনের উপরেই ।

থানায় গিয়া দেখি রেলওয়ে পুলিশ ষ্টেশন । থানার এক কক্ষে যে অফিসারটি বসিয়া কাজ করিতেছিলেন তাঁহার নিকট আমাকে হাজির করা হইল এবং আমার সংক্রান্ত কাগজপত্র তাঁহার হাতে দেওয়া হইল । অফিসারটি বসিতে না বলিলেও একটি চেয়ারে বসিয়া গেলাম ।

কাগজগুলি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া ভদ্রলোক আমার দিকে ভাল করিয়া

চাহিলেন । বলিলেন গাড়ীর ত অনেক দেরী । আপনি ২$^{১}/_{২}$ ঘন্টা বিশ্রাম করিতে পারেন ।

আমি বলিলাম দেখুন গৌহাটিতে আমার নামার কোন কথাই ছিল না এবং কোন প্রয়োজনও ছিল না । ভাবিয়াছিলাম পাণ্ডুতে অপেক্ষা করিয়াই গাড়ী ধরিব । কিন্তু আপনাদের আমিনগাঁও হইতে আমাকে এখানে পাঠাইয়া দিল । কুলীর খরচ কে দিবে বলুন ত ।

ভদ্রলোক বাঙ্গালী এবং চেহারায় চতুর বলিয়াই মনে হইল । বলিলেন আপনাকে এখানে পাঠাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না । যে মেসেজ আমরা পাইয়াছি তাহাতে পরিষ্কার কোন কথাই ছিল না । মুক্তির পর আপনি ঠিক ঠিক বাড়ী যাইতেছেন কিনা একমাত্র তাহার উপর লক্ষ্য রাখাই আমার উপর Instruction । আপনাকে অসুবিধায় ফেলার ত কোন দরকার নাই । তবে আসিয়া যখন পড়িয়াছেন তখন বিশ্রাম করুন ।

ভদ্রলোককে ভাত খাওয়ার অভিপ্রায় জানাইলাম এবং পাইস হোটেল নিকটে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম ।

তিনি বলিলেন যে ধারে কাছে কোন পাইস হোটেল নাই, যাহা আছে তাহাতে প্রতি মিল ১ টাকা লাগে ।

সেখানেই যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি পুলিশটাকে সেই হোটেলে খাওয়াইয়া আনিবার জন্য নির্দেশ দিলেন ।

হোটেলটির উদ্দেশ্যে যাইতে যাইতে চিন্তা করিলাম খাওয়ার উপর এরূপ খরচে পোষাইবে কিনা সন্দেহ । তাই পুরী তরকারী পাওয়া যায় এমন একটি দোকানে ঢুকিয়া পড়িলাম । ছ' আনাতেই মোটামুটি হইয়া গেল দেখিলাম । থানায় ফিরিবার পথে গায়ের বোতামহীন সার্টটির জন্য কয়েকটি সেফটিপিন কিনিয়া নিলাম ।

থানায় আসিয়া অফিসারটির সঙ্গে অনেক আলাপ হইল । ত্রিপুরা রাজ্যের খবর, আসামে বাঙ্গালীর অবস্থা, পাকিস্তানে বাঙ্গালী হিন্দুর অবস্থা, আমরা যেন চষিয়া ফেলিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তার মুখে জানিলাম আগরতলায় সেন্ট্রাল আই বি ষ্টাফ বসিয়াছে এবং সীলেটের লোকই নাকি ইনচার্জ । তিনি জানিতে চাহিলেন ত্রিপুরা রাজ্য আসামে মিশিয়াছে কিনা । আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না ।

লামডিংগামী গাড়ীটা গৌহাটি ষ্টেশনে আসিবামাত্র থানার অফিসারটি একটি কুলী ধরিয়া নিজে উপস্থিত থাকিয়া আমার জিনিষপত্রগুলি ইন্টার ক্লাশে উঠাইয়া দিলেন । সঙ্গে একজন পুলিশও আসিল । গাড়ীতে আমাকে নিজে উপস্থিত থাকিয়া উঠাইয়া দিবার পশ্চাতে আমার প্রতি তাঁহার কোন সহানুভূতি যে নাই এবং চাকুরীর দায়িত্বের দিক হইতেই যে তিনি

তাহা করিলেন তাহা আমি বুঝিলাম । কুলী যখন পয়সা চাহিল তখন ভদ্রলোককে বলিলাম— কুলীর প্রাপ্যের যেন ব্যবস্থা তিনি করিয়া দেন. কেননা আমার পক্ষে অতিরিক্ত পয়সা খরচ সম্ভব নয় ।

কম্পার্টমেন্টে যাত্রী অনেক কম ছিল । বিছানা করিয়া নিলাম । গাড়ী ছাড়িলে শুইয়া পত্রিকা পড়িতে লাগিলাম । খবরগুলি শেষ করিতে বেশী সময় লাগিল না, কারণ সংবাদ বিশেষ ছিল না । জেলে সেনসার করিয়া নির্দিষ্ট পত্রিকা দেওয়া হয় । মুক্তির পর নিজের ইচ্ছানুযায়ী পত্রিকা কিনিয়া পড়িবার আগ্রহের মধ্যে যে আনন্দটুকু ছিল — খবরের নমুনা দেখিয়া তাহা ব্যাহত হইল । তাই ঘুমাইবার উদ্যোগ চোখের উপর পত্রিকাটা রাখিয়া চক্ষু মুদিলাম।

ঘুম চাই, কিন্তু ঘুম আসিল না । গাড়ীতে সকলেই অপরিচিত । শরীরটাও ক্লান্তিতে ভরপুর । গত রাত্রে রঙ্গিয়াতে মোটেই ঘুম হয় নাই । কোন কিছু ধারাবাহিক চিন্তা করিতে পারিতেছিনা । সকলই অসংলগ্ন । বাড়ীর কথা, তেজপুরের কথা, বীরেণবাবুর কথা, রঙ্গিয়া ও আমিনগাঁও, ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা ইত্যাদি ছায়াচিত্রের মত তপ্ত মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া একের পর এক চলিয়া যাইতেছে ।

এইভাবে আর যখন শুইয়া থাকিতে ভাল লাগিল না তখন উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী উদ্দাম গতিতে যাইতেছে । বিছানার দিকে দৃষ্টি পড়ায় দেখিলাম কয়লার গুড়ায় কালো হইয়া গিয়াছে । চুলে হাত দিয়া দেখি অবস্থা শোচনীয় ।

বিছানা ছাড়িয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিলাম । তখন বোধ করি বেলা অপরাহ্ন। দেখিলাম একদিকে মাঠের পর মাঠ, অন্যদিকে তরঙ্গায়িত হিমালয় শ্রেণী । গাড়ি সশব্দে ছুটিয়াছে, কিন্তু মাঠ আর পর্বতমালার সঙ্গে পাল্লা দিয়া যেন ট্রেনটি পারিয়া উঠিতেছেনা । হিমালয় যেন দুর্ভেদ্য বর্ম্মপরিহিত সজাগ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে ।.কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই যে অপরদিক হইতে ডিঙ্গাইয়া কেহ এদিক আসিবে । রেল লাইন যতদূর গিয়াছে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়শ্রেণী ততদূর গিয়াছে । এমনকি লাইন শেষ হইলেও পাহাড় শেষ হইবে বলিয়া মনে হয় না । তেজপুর জেলে এ পথেই যাইবার সময় বর্ষাকাল ছিল বলিয়া দেখিয়াছিলাম পাহাড়ের গায়ে গায়ে আটক মেঘের পুঞ্জ, ফিরিবার পথে দেখিলাম মেঘের জটা যেন খসিয়া পড়িয়াছে । বহু সশস্ত্র সৈনিক পরিবেষ্টিত হইয়া তেজপুর জেলে যাইবার সময় হিমালয়ের শোভা দেখিয়া আমি ও বীরেনবাবু স্থান, কাল ও অবস্থা ভুলিয়া মুগ্ধ চিত্তে কত আলোচনা করিয়াছিলাম । সেই প্রকৃতি আজ অন্যরূপ লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু সহকর্মীবন্ধুকে জেলে ফেলিয়া আমি ফিরিতেছি ।

তেজপুর জেল হইতে সকালবেলা মধ্যে মধ্যে হিমালয়ের উপর জমাটবাঁধা বরফের শোভা দেখিলাম। কিন্তু রেলে বসিয়া তাহা দেখা গেল না। বোধ হয় অপবাহ্নিক আলোর রেখার পরিবর্তনে বরফের ঝলসানো রূপ চোখে প্রতিফলিত হইল না।

এক সময় হিমালয়ের দিক হইতে চোখ ফিরিইয়া মাঠের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা নির্বিশেষে চাষীরা ধান কাটায় লাগিয়া গিয়াছে। গাড়ী যতই আগাইতেছে ততই দেখি কিষাণ কাস্তে হাতে। এই দৃশ্যটা অপরূপ সৌন্দর্য লইয়া সহসা আমাকে স্থান, কাল ভুলাইয়া দিল। মনে পড়িল মাতৃপ্রধান সমাজের কথা, তাহার স্থলে পিতৃপ্রধান সমাজের অভ্যুদয় ও ক্রমেক্রমে নারী দাসত্বের উদ্ভব, বুর্জোয়া সমাজে সামাজিক সম্পদ সৃষ্টির কাজে কিভাবে নারী বঞ্চিতা হইল ইত্যাদি। তেজপুর জেলে যে শ্রদ্ধেয় ডেটেনু প্রফেসার আগ্রহ ও ধৈর্য্যের সহিত বন্দীদিগকে মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রত্যহ ক্লাশ করাইতেন তাহার কথাও মনে পড়িল। সামাজিক সম্পদ উৎপাদনে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সমকক্ষ ও সহযোগিনী দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। উৎপাদন ক্ষেত্রে যাহারা সম অংশীদার, পারিবারিক ক্ষেত্রে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কত মধুর ও সম্মানজনক। মনে মনে ভাবিলাম সমাজের এই নীচের তলার মানুষরাই তো একদিন পুরুষের দাসত্ব হইতে নারীকেও মুক্তি দিবে।

একসময় একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে চিন্তাসূত্র হারাইয়া ফেলিলাম। দেখিলাম যাত্রীরা ঠেলাঠেলি করিয়া উঠা নামা করিতেছে, আর বাহিরে কমলা, কলা, মুড়ির মোয়া, পান সিগারেট ইত্যাদি লইয়া ছোট ছোট ছেলেরা হকারী করিতেছে। ছেলেদের চেহারায় ভদ্র পরিবারের ছাপ দেখিয়া ২/৩ জন সহযাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম রেলওয়ে ষ্টাফের মধ্যে যাহাদের সাহস আছে তাহাদের ছেলেরাই হকারি করিয়া দুপয়সা কামাই করে। মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকদের আর্থিক সঙ্কটের রূপ আমার জ্ঞাত ; তাই ইহা দেখিয়া আমার বিস্ময় যে দুঃখের কোন কারণ ঘটে নাই।

সন্ধ্যার আগেই লামডিং ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিয়া গেল। কুলীর মাথায় লটবহর চাপাইয়া ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমের অভিমুখে চলিয়াছি। এমন সময় সঙ্গী পুলিশ কুলীটাকে বলিল— সেদিকে কোথায় যাইতেছ ? থানার দিকে চল।

গৌহাটিতেই আমার সাহস অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বাধা দিয়া বলিলাম, না, সে ষ্টেশনেই আমার মাল রাখিবে। থানায় যাইবার দরকার নাই।

আমার দৃঢ়তায় পুলিশটি থমকিয়া গেল। বলিল আচ্ছা আপনি ষ্টেশনে যান, আমি

থানা হইতে আসি ।

আপারক্লাশ ওয়েটিং রুমখানা ভেজান দেখিলাম । ঢুকিতে গেলে ইহার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আমার অতি সাধারণ অবস্থা দেখিয়া আমার টিকেট দেখিতে চাহিল । আমি বলিলাম আমার সঙ্গে পুলিশ আছে ! সে আসিলে টিকেট নিয়ো।

পুলিশের নাম শুনিয়া লোকটা আর উচ্চবাচ্য করিল না । ঘরের ভিতর নিজেই আগাইয়া গিয়া একটা বেশ মনোমত স্থান দেখাইয়া দিল । আমি মনে মনে হাসিলাম এই ভাবিয়া যে পুলিশ সঙ্গে থাকিলে লাভও আছে বটে । তাড়াতাড়ি উপযুক্ত স্থানটিতে বিছানা পাতিয়া নিলাম । ঘরে আর কোন যাত্রী নাই । আলো ও জলের ব্যবস্থা ভাল । মনের সুখে মাথা ও মুখ ধুইলাম । একটু পরেই শুইয়া পড়িলাম ।

ঘরের বাহিরে শীত ও কোলাহল থাকিলেও এ পর্য্যন্ত সমস্ত পথের মধ্যে ইহাই বোধ হয় বিশ্রামের পক্ষে অনুকূল বলিয়া মনে হইল । ঘুমও হয়ত আসিত কিন্তু দেখিলাম রুমটি পুলিশের আড্ডায় পরিণত হইয়া গেল । একজন আসিয়া বলিল — যদি থানায় যাইতেন তবে আপনার পক্ষে সুবিধা হইত । গরমজলে স্নান করিয়া সেখানেই ঘুমাইতে পারিতেন । গাড়ীত সেই সকাল বেলা !

আমি বলিলাম — আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত । নড়িবার মোটেই ইচ্ছা নাই । তাহাছাড়া এখানেই খুব ভাল লাগিতেছে ।

ইহার পর আর কেহ পীড়াপীড়ি করিল না । তবে প্রায় জনা ৭/৮ পুলিশ ওয়েটিং রুমটাকে ঘিরিয়া রহিল বুঝিলাম । তেজপুর হইতে রওয়ানা হওয়ার পর দুদিন হয় ভাতের সঙ্গে দেখা নাই । সেজন্য ভাত খাইবার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল । খুব যে ক্ষুধা ছিল তাহা নয়, কিন্তু চিরকালের অভ্যাসের জন্যই বোধ হয় এই আকাঙ্ক্ষা । হোটেলের সন্ধানে রুম হইতে বাহির হইব এখন সময় দরজার বাহিরে বসা পুলিশের মধ্যে একজন উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল - কোথায় যাইতেছেন ?

না থামিয়াই যাইতে যাইতে বলিলাম কাজ আছে । পাশে আর ফিরিয়া চাহিলাম না ।

হোটেলে গিয়া দেখি পাকের ব্যবস্থা চলিতেছে । তখন রাত্রি প্রায় ৭-৫০মিঃ । আমারই সমবয়সী একজন যুবক হোটেলের ভিতর দরজার ধারে চেয়ারে বসিয়াছিলেন । খরিদ্দার দেখিয়াও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে দেখিলাম না । আমি যখন ঠাকুরকে পাকের সময় জিজ্ঞাসা করিলাম তখন যুবকটি মাথা না তুলিয়াই গম্ভীরভাবে বলিলেন দেরী

আছে ।

খরিদ্দারের সঙ্গে অনাবশ্যক এরূপ দৃঢ় ব্যবহারের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলাম । আমি জানিতাম ষ্টেশনের হোটেলটি তেজপুর জেলাস্থিত আমার জনৈক সহবন্দীর ভগ্নীপতির । ইচ্ছা ছিল তাহার সঙ্গে পরিচয় করিব এবং বন্ধুর খবরটা দিব । কিন্তু আমি তখন একরকম গায়ে পড়িয়াই বলিলাম - এই হোটেলটা অমুকের ভগ্নীপতির না ?

কিন্তু এ কথায় যুবকটির কোন আগ্রহ না দেখিয়া বলিতে হল - অমুক নামে যিনি তেজপুর জেলে আছেন তাহাকে এই হোটেলে কেহ চিনে ? শুনিয়াছিলাম ইহা তার ভগ্নীপতির হোটেল ।

যুবকটির মধ্যে একটু পরিবর্তনের লক্ষনই দেখিলাম । কিন্তু তাহা মুহূর্তমাত্র । অন্যান্য লোকের সম্মুখে তিনিও আমার পরিচয় জিজ্ঞাসায় লাগিয়া গেলেন ।

মনে বড় রাগ হইল । আর কোন কথা না বলিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলাম । মনে ভাবিলাম ভাত আর খাইব না, চা-ই খাইব ।

ষ্টেশনের চা ষ্টলে যে তরল পদার্থ দেওয়া হইল তাহা এরূপ বিস্বাদ লাগিল যে দোকানীকে একটু কড়া কথা না বলিয়া পারিলাম না । কিন্তু দেখিলাম দোকানী তাহা লক্ষ্য করিতে নারাজ । পয়সা লইয়া ভাল জিনিসও দিবে না, আবার ভাল না বলিলেও রাগ করিবে।

চা খাইতে খাইতে দেখিলাম লামডিং-এর ২জন পুলিশ আমাকে ভীড়ের মধ্যে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতেছে । অনেকক্ষণ যাবৎ ওয়েটিং রুমে ফিরি নাই দেখিয়া হয়ত তারা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল ।

সহসা আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের ব্যস্ততা থামিয়া গেল । দূরে দাঁড়াইয়া অন্যদিকে চাহিয়া তাহারা কি জানি বলাবলি করিতে লাগিল ।

ভীষণ ঠাণ্ডা পড়িতে শুরু করিয়াছে । ঠাণ্ডা ও কুয়াশার মধ্যে ঘরের বাহিরের ঘুরাঘুরি সম্ভব নয় দেখিয়া ওয়েটিং রুমে ফিরিয়া শুইয়া পড়িলাম ।

একটু পরে দেখি, একপাল ছেলেমেয়ে লইয়া একজন ভদ্রলোক রুমে আসিয়া ঢুকিলেন । জানিলাম বদরপুর হইতে একটি গাড়ী আসিয়াছে ।

জিনিষপত্র গোছাইয়া, পরিবার ও ছেলেমেয়ের শুয়ার ব্যবস্থা করিয়া ভদ্রলোক বাহিরে যাইবার সময় আমাকে বলিলেন, আপনিতো আছেন, অনুগ্রহ করিয়া একটু দেখিবেন।

ভদ্রলোক কোথায় যেন আগে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল, কিন্তু স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিলাম না ।

স্ত্রী-পুরুষসহ আরো কয়েকজন যাত্রী রুমটাতে আসিল । আমি স্বস্থানে শুইয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম । বোধ হয় তন্দ্রা আসিয়াছিল । আধ ঘন্টার বেশী হইবে না । শুনিলাম ভদ্রলোকের স্ত্রী স্বামীকে বলিতেছেন, কেমন খাইলে ?

উত্তর—ভাতটা ভাল; এক টাকায় মন্দ খাই নাই । ভাত তরকারী খুবই গরম, জিহ্বায় জল আসিল । কিন্তু হোটেল ওয়ালার ব্যবহার ও মনোবৃত্তির কথা স্মরণ হওয়ায় বিরত রহিলাম ।

ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে গিয়া জানিলাম আগরতলাস্থিত আমার জনৈক আবাল্য বন্ধুর বিবাহ হইতে তিনি ফিরিতেছেন । রেলওয়েতে তিনি কাজ করেন এবং পাণ্ডুতে থাকেন । আমার পরিচয় দিলাম । তাহার পরিবারটি আমাকে অমুকের বন্ধু জানিয়া সঙ্গের মিষ্টি বাহির করিয়া এক প্লেট দিলেন । তাহার মুখে শুনিলাম পাত্রী তাঁহারই সহোদরা। বলিলেন—বোনটার যেন খোঁজ খবর রাখি ।

কথা বলিতে বলিতে কখন যে গভীর নিদ্রায় পতিত হইলাম বলিতে পারিনা । ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন দেখিলাম ভদ্রালোক সপরিবারে কখন চলিয়া গিয়াছেন । জনা ৩/৪ পুলিশ ছাড়া আর কেহ আমার সহযাত্রী নাই । ষ্টেশনের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে । আমি আবার ঘুমাইবার জন্য চক্ষু মুদিলাম ।

সকাল হইতেই তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খাইয়া নিলাম এবং প্রস্তুত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম । যে পুলিশ আমার সহগামী হইবে সেই সুব্যবস্থা করিয়া দিল ।

গাড়ী যখন ছাড়িল তখন দুই ঘন্টা লেট । দেখিলাম বহু রেলওয়ে কর্মচারী ছুটিতে অথবা পরিবর্তনে চলিয়াছেন । গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিতে চেষ্টা করিলাম ।

কত ষ্টেশন, টানেল, নদী পার হইয়া চলিয়াছি । ২২ নং টানেলে আসিয়া হঠাৎ একটা এক্সিডেন্টের উপক্রম হইল । টানেলের মাঝামাঝি গিয়া গাড়ী একেবারে থামিয়া গেল । চারিদিকে অন্ধকার । কয়লার ধোঁয়া প্রত্যেক যাত্রীকে যেন ইস্পাতের হাত দিয়া কষিয়া ধরিতেছে । ছেলেরা কাঁদিয়া উঠিল । একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল ? সকলেই কাসিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সকলের মুখে আতঙ্কের সুস্পষ্ট চিহ্ন ।

কাসিতে কাসিতে আমারও দম বন্ধ হইবার উপক্রম । শরীরে একটা অস্বাভাবিক

জ্বালা শুরু হইল । বসিয়া থাকিতে পারলাম না । দাঁড়াইয়া গেলাম । কোথায় মুক্ত আলো ও বাতাস । শেষে কি এই অন্ধ কূপেই মরিতে হইবে । ভাবলাম গাড়ী হইতে নামিয়া যেদিকে পারি দৌড় দিব কিনা । আবার ভাবিলাম যদি গাড়ী ছাড়িয়া দেয় এবং অন্ধকারে না উঠিতে পারি ।

এমন সময় গাড়ী আবার সক্রিয় হইয়া উঠিল । কিন্তু চলিতে চায় না । হিটলারের গ্যাস চেম্বারের কথা মনে পড়িল । গাড়ীর গতি আর একটু দ্রুত হইল। জীবন মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় আবার যেন আলো বাতাসের অমৃত স্পর্শ পাইলাম।

সমস্ত গাড়ীটা যেন আবার নূতন প্রাণ স্পন্দনে জাগিয়া উঠিল । আমি নিজের জায়গায় আবার বসিয়া পড়িলাম ।

লামডিং হইতে বদরপুর পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই । তবে একসময় ভীড়ের মধ্যে সহসা একটি কুলী যুবতীকে দেখিয়া খুব ভাল লাগিয়াছিল । তার নিটোল স্বাস্থ্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল । স্থানের অভাবে পুরুষের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে । কত ঠাসাঠাসি ও ঠেলাঠেলী, ভ্রূক্ষেপও নাই, । মুখে পাউডার বা লিপষ্টিক ছিল না । নিজের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সম্পর্কে গর্বিতবোধের চিহ্নটুকুও চেহারায় নাই । দিব্যি জনৈক সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলিয়া চলিয়াছে । গাড়ীর ভিতরের গোলমালে কথা শোনা না গেলেও ঠোঁট নড়ায় বুঝা গেল । আলাপ নিশ্চয়ই প্রেমের কথা বা বাজে পরিহাস নয় ।

মনে হইল তাহারাই শ্রম দিয়া সম্পদ সৃষ্টি করিতেছে । শ্রমের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান । তাই ব্যবহারেও কোন তারতম্য থাকার কথা নয়।

একটা ষ্টেশনে কিছু কমলা কিনিলাম । পুলিশটাকেও খাইতে দিলাম । পথে ভাজা বুট ও ডিম খাইবার খুব আগ্রহ থাকায় যখনই ভাজা বুট ও ডিম পাইলাম, খাইতে লাগিলাম । কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া হকাররা যাত্রীদের নিকট হইতে ডবল পয়সা আদায় করিতেছিল ।

বদরপুর ষ্টেশনে পুলিশ সহ নামিয়া পড়িলাম । আপার ক্লাশ ওয়েটিং রুমে ঢুকিয়া বিছানাপত্র রাখিয়া উভয়েই চা-এর সন্ধানে বাহির হইলাম । রাত্রি তখন প্রায় ৮টা । মিষ্টি ছাড়া অন্য কোন খাবার না থাকায় মুড়ি চা খাইলাম । মুড়িটা ভারী লোনা লাগিল । জেলের জনৈক বন্ধুর আত্মীয় সপরিবারে বদরপুর ষ্টেশনের ষ্টাফ কোয়ার্টারে থাকেন । সেখানে গেলে খাবার ও থাকিবার সুবিধা হইতে পারিত । কিন্তু আই বি-র কড়াকড়িতে বিরত থাকিতে হইল । বদরপুর ষ্টেশনে পুলিশ সামনা সামনি আসিয়া বিরক্ত না করিলেও আমার উপর কয়েক জোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সারাক্ষণ অনুভব করিতেছিলাম ।

চা খাইয়া ওয়েটিং রুমে ফিরিয়া দেখি ইহার চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে । লটবহরের ছড়াছড়ি, বেয়ারা ট্রে লইয়া ব্যস্ত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করিতেছে । আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলাম জনৈক মহিলা আয়নায় দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতেছে নিঃসঙ্কোচে এবং একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী একটা শিশুকে আদর করিতেছেন । সর্বপ্রথম আবিষ্কার করিলাম আমি মহিলাদের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিয়াছি । তাড়াতাড়ি কুলীকে দিয়ে আমার জিনিষপত্র বাহির করাইয়া আনিলাম । গাড়ীর অনেক বিলম্ব । পায়চারী করা এবং বসার পালা চলিতে লাগিল । লামডিং হইতে সমভিব্যাহারী পুলিশটি আসিয়া বিদায় লইয়া গেল ।

গাড়ীর সময় হইলে তিনজন পুলিশ আসিয়া খবর দিল এবং গাড়ী আসিলে আমাকে তুলিয়া দিল । ইন্টার ক্লাশে উঠিয়া বসিতেও পারি নাই । এমন সময় জনৈক যাত্রীকে চিৎকার করিতে শুনিলাম সর্বনাশ ! আমার মানিব্যাগ কোথায় ? কুলী বিদায় করিতে গিয়া ভদ্রলোক আবিষ্কার করিলেন যে তার পকেট মারা গিয়াছে ।

ভদ্রলোককে দেখিয়া চিনিলাম । লামডিং ষ্টেশনে তিনি ও আমি এক কামড়াতেই ছিলাম । তাহার বিবর্ণ মুখে দুঃখ ও উত্তেজনায় ঘাম দেখা দিল । মানিব্যাগে দুইশত টাকা ছিল, টিকেট ছিল — সবই গিয়াছে । টাকা অপেক্ষাও তাহার চিন্তা টিকিটের জন্য । যে পুলিশ কর্মচারী আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল ভদ্রলোককে বলিল ভয় নাই, করিমগঞ্জ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারি । ভদ্রলোক আমার নিকট ।।০ আনা হাওলাত চাহিলেন । করুণভাবে বলিলেন, ভিক্ষা চাই ।

আমি তৎক্ষনাৎ পয়সা দিয়া দিলাম । এই অসহায় লোকটির প্রয়োজনের কাছে আমার অভাব নিতান্ত তুচ্ছ মনে হইল । তাহাকে এই দুঃসময়ে সাহায্য করিতে পারিয়াছি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দবোধ করিলাম ।

করিমগঞ্জ ষ্টেশন । পুলিশ এখানে অপ্রত্যাশিত ভাল ব্যবহার করিল । বদরপুর হইতে আগত পুলিশ কর্মচারী ও কনষ্টেবলটি নমস্কার করিয়া বিদায় নিল । করিমগঞ্জের পুলিশেরা সীলেটগামী গাড়ীর একটা খালি ইন্টার ক্লাশে আমাকে তুলিয়া দিল — বিছানা পাতিয়া দিল এবং আমি ভাত খাইবার ইচ্ছা জানাইলে আমার জিনিষপত্রের জিম্মা লইয়া অন্য পুলিশের সঙ্গে হোটেলে খাওয়াতে পাঠাইল । হোটেল হইতে ফিরিয়া ৪ জন সঙ্গী পাইলাম । সকলেই যুবক । তন্মধ্যে একজন পুলিশ কর্মচারী, অন্যজন মুসলমান । কথায় কথায় হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের কথা আসিয়া পড়িল — মুসলমানের নিন্দা শুরু হইল । সেই প্রসঙ্গ যবনিকাপাত হইয়া একসময় গান শুরু হইল । আর যাহাতে নিষ্ফল অপ্রীতিকর

প্রসঙ্গ না হয় সে জন্য গানের তারিফ করিয়া নূতন নূতন গান শুনিত লাগিলাম ।এইভাবে কখন যে গভীর ঘুমে এলাইয়া পড়িলাম বলিতে পারি না ।

একসময় চলন্ত গাড়ীর ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । ঠাণ্ডার তুলনায় গায়ের কাপড় অত্যন্ত কম মনে হইল । সহসা দেখি মুসলমান ছেলে ও শীত কাপড়ের অপ্রাচুর্য্যের জন্য বসিয় কাঁপিতেছে । আমি তাহাকে বলিলাম — যদি আপত্তি না থাকে তবে আমার চাদরের নীচে আসিয়া শুইতে পার । ছেলেটাও সঙ্কোচ করিল না । সঙ্কীর্ণ স্থানে দু'জনেরই অসুবিধা হইলেও উভয়েই শীতের তীব্রতা অনেক কম অনুভব করিলাম ।

সীলেট হইতে আখাউড়া পর্যন্ত পথের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই । পাকিস্তান এলাকায় পুলিশের কোন জিজ্ঞাসাবাদ বা অনুসরণ ছিল না । আসাম পুলিশ নিরাপদে আমাকে আসাম পার করিয়া দিয়া যেন খালাস হইল । পাকিস্তান এলাকার জন্য তাহাদের কোন ভাবনা নাই। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ।

লামডিং ষ্টেশনে যে বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে মিষ্টি খাইয়াছিলাম সেই সদ্য বিবাহিত বন্ধুর সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে সস্ত্রীক দেখা । বন্ধুবর আপার ক্লাশে যাইতেছেন । আমাকে দেখিয়া নিজের কামড়ায় লইয়া গেলেন । কেলনারের চা ও টোষ্ট আসিল । খাইতে খাইতে বলিলাম যে লামডিং ষ্টেশনেও মিষ্টিমুখ হইয়া গিয়াছে । বন্ধু তাহার স্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন ।

যথাসময় আখাউড়াতে নামিলাম । মোটরের সন্ধান লইয়া জানিলাম তৈলের অভাবে বন্ধ । আমার যেন বজ্রঘাত হইল । তখন বোধ হয় বেলা এগারটা, মনে মনে আশা ছিল বাড়ি পৌঁছিয়া গরম গরম ঘরের ভাত খাইব । কিন্তু গাড়ীর কথা কেহ সঠিক বলিতে পারিল না । আগরতলাগামী যাত্রীদের কেহ কুলীর মাথায় মালপত্র চাপাইয়া হাটিয়াই রওয়ানা দিয়াছে । কেহ কেহ প্রতি মুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছেলেমেয়ে লইয়া অপেক্ষারত । আমিও মুটে ধরিয়া হাটা ধরিতে প্রস্তুত ছিলাম, কেননা বাড়ী ফিরিবার তাগিদ ছিল বেশী এবং ছিলামও একা । কিন্তু সহযাত্রী বন্ধু ও তাহার স্ত্রীকে ফেলিয়া যাইতেও যেন স্বার্থপরের কাজ বলিয়া মনে হইল । বন্ধুকে একবার বলিয়াও ছিলাম কুলী ধরিয়াই যাওয়া যাক্, তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । বুঝিলাম — স্ত্রীকে ৬ মাইল পথ হাটাইয়া নিবার চিন্তায় আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতেছে ।

আশা ও অধ্যবসায়ের ফল আছে । একটা মোটর বাস পাওয়া গেল । পাকিস্তানের কাষ্টম্স এবং আগরতলা গার্ডপোষ্টের তল্লাসী ও জিজ্ঞাসা অতিক্রম করিয়া বাড়ী যখন

পৌঁছিলাম তখন রাত্রি ৮টা ।

স্ত্রীব কাছে শুনিলাম কে বা কাহাবা আসিযা বটাইযা দিয়াছে আমাকে আবাব আখাউড়ায় গ্রেপ্তার কবা হইয়াছে ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

প্রভাত রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ ত্রিপুরার রাজবংশ সম্ভূত স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র রায়-এর তৃতীয় পুত্র প্রভাত চন্দ্র রায় আগরতলা কৃষ্ণনগরে ১৯১৪ সালে ২৬শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় প্রতাপ রায়ের বংশাবলী ত্রিপুরা 'রাজামালা' পুস্তকের শেষাংশে সংযোজিত আছে এবং উহাতে প্রভাত রায়ের নামও উল্লিখিত রয়েছে । মাতা হরসুন্দরী দেবীর পিতার নাম স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুর যিনি ত্রিপুরী ভাষায় বই 'ককবরকমা' ও ত্রিপুরী ভাষায় ব্যাকরণ 'ককসৗরৗঙমা') লিখে ত্রিপুরাবাসীর নিকট পরিচিত । প্রভাত রায়ের কৃষ্ণনগরস্থ বাসভবন বর্তমানে ত্রিপুরা জর্জকোর্ট ষ্টাফ আবাসিক হিসাবে পরিগণিত । বর্তমানে তার স্ত্রী ও পুত্র কন্যারা কৃষ্ণনগর কর্ণেল বাড়ীতে বসবাস করছেন ।

ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রভাত রায় এক অনবদ্য নাম । তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে কারান্তরালে । তাঁর ভাষায় আগরতলা সদর জেল বা **Central University of Agartala,** যেখানে জীবনকে গড়া যায় । কারান্তরালের একঘেয়ে জীবন স্রোতে পত্র পত্রিকা ছাড়াও বই একমাত্র সম্বল ছিল । রবীন্দ্র, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, পেলী, কীটস্ ছাড়াও মহিম কর্ণেল, অনঙ্গ মোহনী দেবীর লেখাও পড়েছেন এবং প্রথম কারাজীবনে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মায় । আসন থেকে লেখারও সূত্রপাত ঘটে । তাঁর রচনাগুলিতে সর্বত্রই স্বদেশ প্রেম, মানবতাবোধ, সাম্যের ভাবা, নিপীড়িত সর্বহারার প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ, অন্যায় অবহেলায় বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ফুটে উঠে । তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী পুরুষ । ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তার সাহিত্য রচনাকাল । তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান ১৯৪৯ সালে এক প্রচেষ্টায় 'চিনিহা' পত্রিকার সম্পাদনা । নিজেই নিজের পত্রিকা হকারি করেছেন । তৎকালীন সময়ে সম্পাদকীয় এর দিক থেকে উচ্চমানের পত্রিকা হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিল ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশে এই 'চিনিহা' পত্রিকা বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল । ১৯৫৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সাব্রুমে এক মিটিং এ যোগদান করতে যাওয়ার পথে শান্তিরবাজারে এক মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন ।

******

কেমন আছো যৌবন

— পার্থ আচার্য

"এসো যৌবন এসো হে ....."

হ্যাঁ, এসো যৌবন । আমি শৈশব । সন্ধ্যা বেলায় মায়ের হাত ধরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন চাঁদ মামার দেশে বুড়ির সুতো কাটাব কথা শুনি, মাকে জাপটে ধরে কেঁদে বলি ঐ বুড়ির কাছে নিয়ে যেতে। উত্তর মেলে বড়ো হতে হবে, ছুঁতে হবে 'তোমাকে' । তবেই পাড়ি দেওয়া যাবে চাঁদ মামার দেশে । হ্যাঁ, এসো যৌবন । আমি কৈশোর । পরন্ত বেলায় খোলা সবুজ মাঠে দাঁড়িয়ে যখন উপরের গোধুলীর গোলাপী নীল আকাশের দিকে তাকাই, দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল ডানা মেলে ফিরে যাচ্ছে তাদের নীড়ে, মায়ের কাছে শোনা দিগন্তে তেপান্তরের মাঠে। ইচ্ছে করে না তখন ঘরে ফিরে যেতে । মনে হয় আমিও ডানা মেলে পাড়ি দেই ঐ পাখীদের সাথে তেপান্তরে । মার উত্তর সেই একটিই । আগে স্পর্শ করতে হবে 'তোমাকে'। হ্যাঁ, এসো যৌবন , ফিরে এসো। আমি বার্ধক্য 'তোমাকে' হারিয়ে আমি একা, নিঃসঙ্গ । হারিয়ে ফেলেছি শক্তি। ভুলে গেছি স্বপ্ন দেখা । তুমিই পার আমায় ফিরিয়ে দিতে সেই হই-হল্লুর ভরা প্রাণচঞ্চল, কর্মচঞ্চল জীবন, ফিরিয়ে দিতে পার স্বপ্ন; ভালবাসা ভরা সবুজ দিনগুলি । এসো যৌবন , তোমাকে ফিরে পেতে আমি উজার করে দিতে রাজী সারা জীবনের অর্জিত সমস্ত খ্যাতি, ঐশ্বর্য, ধনসম্পদ।

ফাল্গুন ...

প্রাণচঞ্চল, কর্মব্যস্ত যৌবন, আমাদের জীবনকালের বসন্ত ঋতু স্বপ্নের ফাল্গুন । দক্ষিণা বাতাসের ছোঁয়ায় অতি চঞ্চল যৌবন সীমাহীন স্বপ্নের প্রতীক । তাই কবিগুরু লিখেন যৌবনের প্রেমগাঁথা - "হাত ধরে মোরে তুমি—লয়ে গেছ সে নন্দন ভূমি অমৃত-আলোয়, সেথা আমি জ্যোতিষ্মান - অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান ..."

নজরুল লিখেন বিপ্লব গাঁথা - "রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা/রুবীর নদীর পার হয়ে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেসা ..." সুকান্ত দেখেন স্বপ্ন —

"আকাশে বাতাসে ধ্রুব তারায়-তারা বিদ্রোহের পথ বাড়ায় ..." সেক্স পিয়র যৌবনোল্লাসে আত্মহারা —"Youth is full of pleasure, Age is full of care .../ Youth

like summer brave, Age like winter bare."

তুমি দেবে বলে ...

যৌবনের কাছ থেকে মস্ত বিশাল কিছু পাওয়ার ও চাওয়ার আশা করে বসে আছে যে সবাই । সমাজ অপেক্ষায় কবে যৌবন তারে নতুন করে সাজাবে, থাকবে না দুঃখ, দারিদ্র্যতা, বৈষম্য । ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে বিপ্লব, আসবে পরিবর্তন; অপেক্ষায় পরিবার, আশা করে বসে থাকে কখন কোন তরুণ-তরুণী তার কর্মচঞ্চলতায় নিয়ে আসবে সুখ, দেবে বাঁচার নিশ্চয়তা । প্রকৃতি তার বসন্তের ফুল বিছাইয়ে রাখে, যৌবন সেই ফুল দিয়ে তার প্রেম-নৈবেদ্য সাজাবে বলে । দেশ, সমাজ, পরিবার, প্রকৃতি সবার হাজারো চাহিদা, স্বপ্ন, আশা । মেটানো কঠিন । বড় দুষ্কর। তবুও কাউকে নিরাশ করতে শেখেনি যৌবন । সবার আশা, স্বপ্ন পূরণ করতে যৌবন করে চলে ক্লান্তিহীন কর্ম । অজস্র বাঁধা, সহস্র প্রতিরোধ, প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থা । তবুও এসব কিছুকে তুচ্ছ মনে করে যে ঘোড়া দাপিয়ে চলে পৃথিবীর বুকে তার নামই যৌবন । তাই যৌবন জীবনের প্রতীক, বিপ্লবের প্রতীক, অনাবিল প্রেমের ধারার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার প্রতীক ।

আছে প্রেম- জীবন যুদ্ধে 'প্রেরণা', দু-দণ্ডের শান্তি

"হাজার বছর ধরে আমি পথে হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে; সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে ... আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকের জীবনের সমুদ্র সফেন-আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন ।"

কবির এই কথাগুলি মিলে যায় ক্ষণে ক্ষণে, প্রতিটি অনুভূতিতে, যৌবনের জীবন যুদ্ধে যখন কোন বনলতা সেনের মিষ্টি হাসির স্নিগ্ধ প্রেম নিয়ে আসে 'দুদণ্ডের শান্তি' । জীবনের বসন্ত, অথচ পালে প্রেমে হাওয়া লাগবে না, কোনও বণলতা সেনের হাসিতে পাগল হয়ে উঠবে না যৌবন তাও কি হয় ? "জীবন আছে যার, সেই তো ভালবাসে, প্রতিটি মানুষেরই জীবনে প্রেম আসে ..." আর মনে এই প্রেমের উঁকি ঝুঁকি তো এই বসন্তেই । বসন্তের এই ছোঁয়াতেই প্রেমে পাগল হয়ে উঠা, পালের হাওয়ায় কাঙাল হয়ে তরুণীর ডাকবাক্সে তরুণের প্রেম নৈবেদ্য —

"মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী
দেবো খোপায় তারার ফুল
কর্ণে দুলাব তৃতীয়া তিথির
চৈতী চাঁদের দোল..."

প্রেমে কখনো আসে সফলতা, আবার কখনও ব্যর্থতা, স্বপ্ন ভঙ্গ, নিঃসঙ্গতা। তবুও 'বিরহ বড়ো ভাল লাগে', 'বিরহে' মিলন বা বিচ্ছেদ দুটিই যে এক মিষ্টি অভিজ্ঞতা, কষ্ট ও সংগ্রামের প্রতিদিনের দিনলিপিতে 'দু-দণ্ডের শান্তি'।

বসন্তের চৈত্রের খরা ...

কিন্তু যাকে নিয়ে এত স্বপ্ন, এত আশা, এত জয়গাঁথা, এত প্রেমগাঁথা, সে আজকের সমাজ ব্যবস্থায় কেমন আছে ? সেই প্রাণ চঞ্চলতা, কর্মব্যস্ততা ভরা যৌবন, বিপ্লবের ও সমাজ পরিবর্তনের কাণ্ডারী, আজকের এই সমাজ ব্যবস্থার উপরে দাঁড়িয়ে হেলিয়ে পড়ছে না তো ? যদি তা না হয় তবে আজকের যুবকের মুখে কেন এই নিরাশার কলি ? — "সকাল থেকে লুকোচুরি — খেলা শুরু করি - আমরা চোর — আর সূর্য সিপাহী - হয় রোটেশন - গুরুপদের দোকান— যেখানে পাই - ঠাঁই ... লুকাই ..."— হে কবিগুরু, হে নজরুল, হে সুকান্ত , জীবনের বসন্ত যৌবনের মুখে একি হতাশার কলি ? সকাল না হতেই যৌবনকে মুখ লুকুতে হয় এখানে, ওখানে, পাড়ার ক্লাব ঘর অথবা চা এর দোকানে, সূর্যের আলোর শেষে কর্মব্যস্ত লোকেরা দেখে না ফেলে তার হতাশগ্রস্ত , কর্মহীনতার লজ্জায় নত চেহারাটা ! দেখলেই তো মাথা-নত করে, মুখ লুকুতে হবে এদিক ওদিকে, চায়ের দোকানে অথবা পাড়ার ক্লাব ঘরের অন্দরমহলে কর্মহীনতায় পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তোলে না নিতে পারার লজ্জায়, আর কর্মব্যস্ত লোকদের তীক্ষ্ণ চাউনি এড়াতে । বসন্তের মুখে চৈত্রের খরা আর হতাশার কলি যারা এনে দেয় তাদের আমরা কিভাবে ক্ষমা করি ?

আমার দেখা যৌবন —

মনের ক্যামেরায় আমার জীবনে দেখা কিছু তরুণ তরুণীর জীবনের গল্প তুলে ধরছি যা আমার প্রবন্ধে যৌবন সম্পর্কে বলা কথাগুলির সঙ্গে জানি না কেন মিলে যায় মুহুর্তে মুহুর্তে, প্রতিটি অক্ষরে । চরিত্রগুলির নাম অবশ্যই পাল্টে দিলাম ।

অনির্বাণ, সফল যুবকদের জীবনের আয়না ঃ

"মন দিয়ে পড়াশুনা করে যেজন, বড় হয়ে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেইজন"- ছোট বেলায় মায়ের কাছে শোনা গানটি আজও বাজে অনির্বাণের কানে । আর যখনই এ গান বাজে, মনে হয় যেন তাকে নিয়ে উপহাস করছে মার এই গান । মায়ের বলা পথেই তো চলছিল অনির্বাণ। মোটামুটি ভাল রেজাল্ট করেই অনির্বাণের নামের পাশে আজ তক্‌মা লেগেছে বি.কম. অনার্স' । ব্যাস্‌, এটুকুই। আর এগুতে পারছে না সে । এগুনো মানে নিজের পায়ে দাঁড়ানো, বড়লোক হওয়া, মায়ের বলা গাড়ীতে চড়া, কিছুই হয়নি তার।

এখনও চাকুরী নেই, নেই রোজগার । শার্ট-পেন্ট পরে রাস্তার মোড়ে আর কতদিন । সঙ্গে প্রকৃতির আরেক 'মিষ্টি বিষাক্ত' ছোবল প্রেম। কোনও একচঞ্চল, মিষ্টি, নীলাঞ্জনার ভালবাসা পাওয়ার আকাঙখা । কিন্তু নীলাঞ্জনার ঐ মিষ্টি হাসি নিজের পকেটে পুড়তে হলেও পকেটে চাই টাকা, রোজগার । তাই নীলাঞ্জনার স্বপ্নে বিভোর অনির্বাণকে হঠাৎ তার ভেতরে অন্য এক অনির্বাণ ডাক দিয়ে যেন প্রশ্ন করে "এই তুমি বসে বসে কার কথা ভাবছো ? প্রেম ? তোমাকে সাইডে রেখে, মোটা মানি ব্যাগ দেখে , সোজা পালাবে প্রেম!" কথাটা অনির্বাণের কানে বেজে উঠলেই সে যেন আরও বেশী জেদী হয়ে পরে, কিছু একটা করতে চায় । নিজেকে প্রমাণ করতে চায় । কিন্তু পথ খুঁজে পায়না । দিনের কয়েকটা টিউশন সেরে ক্লান্ত শরীরে অন্ধকার রাত্রিতে মিটমিটে আলোর নীচে লিখতে বসে কবিতা — "সামনের অজানা অচেনা বিশাল লক্ষ্যটা পেতে/ যখন ক্লান্ত ঐ যুবক চা ষ্টলে বসে হাফ কাপে চুমুক দেয় / নীল শাড়ীর ঐ লাল যুবতীর হাসি তাকে যেন উপহাস করে চলে যায় /... তবুও হারে না যুবক / লিখে "আসবে আমারও সেদিন " ... । হ্যাঁ, হয়তো কিছু সময় নিয়েছে, কিন্তু সে প্রমাণ করেছে নিজেকে চার-পাঁচ বছর বাদেই । আজকের সমাজব্যবস্থায় সফল পুরুষ বলতে যা বোঝায় তাদের দলের তালিকায় অনির্বানের নামটি অবশ্যই আছে, থাকবে । ক্লান্তিবিহীন প্রচেষ্টা জীবনে একদিন সফলতা আনে । তারই উদাহরণ অনির্বাণ।

সদ্য কলেজ পাশ করা গ্রামের যুবক ঃ

কলেজের পড়া শেষ । হাতে বি. এ পাশের সাদা হলদে রঙ এর সার্টিফিকেট কিন্তু এরপর ? এর পরের রুটিনতো সদানন্দের জানা নেই। ছোট বেলায় শুনেছিলাম কলেজ পাশ করলেই চাকুরী ! কিন্তু কোথায় ? তার বড় জ্যাঠতুতো ভাই বি. এ পাশ করেছে দশবছর । ওরও তো কিছু হল না । তাহলে ? এদিকে তার নীলাঞ্জনা বলেছিল কলেজ শেষ হলেই ওর বাবা-মা তাকে বিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে । সুতরাং, নীলাঞ্জনাকে পেতে হলে এখনই কিছু করতে হয় । গ্রামের ছেলে সদানন্দ কোথায় পাবে সে আলাদিনের চাবি-কাঠি যা দিয়ে সে তার স্বপ্ন পূরণ করবে ? নিজের পায়ে দাঁড়ানো, নীলাঞ্জনাকে পাওয়া, বাবা-মা যারা তার দিকে চেয়ে আছে তাদের স্বপ্ন পূরণ করা । সদানন্দ কলেজ শেষ হতে না হতেই বুঝে গেছে সামনের দিনগুলি ভয়ঙ্কর । নীলাঞ্জনাকে পাওয়া দূর-হস্ত ! জীবন এখন দিশাহীন !

গ্রামে ফিরল সদানন্দ । নেতাদের পেছনে ছুটলো কয়েক বছর । দেখতে দেখতে বয়স আঁঠাশ । ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যাওয়া বৃদ্ধ পিতা বুঝে গেছেন সদানন্দের ভবিষ্যত । তাই একদিন সদানন্দকে বৃদ্ধ পিতার নির্দেশ —"কাল থেকে চলবি আমার সঙ্গে, কাজ করবি ক্ষেতে" । চোখের জলটা বেড়ুতে চাইলেও বেড়ুতে দিল না সদানন্দ । লাঙ্গল নিয়ে নামল

ক্ষেতে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কাল মার্কস, মহাত্মাগান্ধী, সবাইকে জানা ও বোঝা, নোট মুখস্থ করা। মনে নীলাঞ্জনার প্রেম, প্রেরণা। হাই সেকেণ্ড ক্লাশ নিয়ে পাশ করা। বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা সবকিছুর পুরস্কার- হাতে লাঙ্গল নিয়ে ধান ক্ষেতে সদানন্দ। " মন দিয়ে পড়াশুনা করে যে জন ...!"

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা যুবক ঃ

নাম তার অনিমেশ। জীবন বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী করেছে দু'বছর আগে। সংস্কৃতি মনস্ক। ছবি আঁকে, কবিতা লেখে তার নীলাঞ্জনাকে, তার ভালবাসা, তার জীবনকে —

"... গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দু'টি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে
... প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।"

কিন্তু প্রাণচঞ্চল অনিমেশেরও নেমে আসল চোখের জল হাতে নীলাঞ্জনার চিঠি— "অনেকদিন ধরেই বলছি চাকুরীর চেষ্টা কর। বাবা-মারা অন্যত্র বিয়ে ঠিক করছে। কিন্তু শুধু বই এর পৃষ্ঠাই পড়ে গেলে। জীবনের পৃষ্ঠা খুলে দেখনি। সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে আমি। অনেক কিছু করব, তোমার প্রেরণায় নিজের পায়ে দাঁড়াব স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু সাধারণ ঘরের মেয়ে বলে কথা। বাবা-মারা বিয়ে দিলে বাঁচে। তাই অপূর্ণই রয়ে গেল আমাদের কাহিনী।"

মিষ্টি নীলাঞ্জনার কাছ থেকে এরকম ঝাল চিঠি কখনো আশা করেনি অনিমেশ। সত্যিই, জীবনের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখার সময় পায়নি সাহিত্য সংস্কৃতি প্রেমী অনিমেশ। জীবনের পৃষ্ঠা মানে লাল-সাদা পতাকার তলে দাঁড়ানো, নেতাদের পেছনে ছুটা, রাজনৈতিক আদর্শে দিক্ষীত হওয়ার ভান করা। অতএব ... !

অল্প শিক্ষিত উদ্ধত যুবক ঃ

নাম তার বিপ্লব। তিনবার মাধ্যমিক দিয়েও পার পায়নি। কিন্তু তাতে বয়েই গেল। নামের সঙ্গে কাজেও তার মিল। সবসময়ই উদ্ধত, একটা উগ্রমেজাজী ভাব। ক্লাবের কর্তা থেকে শুরু করে রাজনীতির মাঠে সবার 'সব ধরণের' শক্ত কাজ খুব সহজে করে দেয় বিপ্লব। ক্লাবের হয়ে চাঁদা তোলা, পার্টির হয়ে ভোট আদায় করা, রিগিং করা, পিস্তল উঁচিয়ে মানুষকে ভয় দেখানো সবই সে করে নেয় অনায়াসে।

সমাজের দৃষ্টিকোন্ থেকে দেখলে তো তাকে বলতে হয় সমাজ বিরোধী! কিন্তু বলে

সাধ্য কার ? তাকে তো সবারই প্রয়োজন । বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতাদের । ভোটের সময় সে যে ভোট আনার মেশিন । রাষ্ট্র তখন ভুলে যায় তার পরিচয় "ভয়, ভয়, ভয়, পাছে ভোট নষ্ট হয়।" আর এ রকম বিপ্লবের চাকুরী বা ভালবাসা 'আদায়' ? সে এক নিমিশেই হয়ে যায় । তার সাহসী কাজের পুরস্কার হিসেবে খুব সহজেই পেয়ে যায় সে চাকুরী অথবা বিশাল অঙ্কের ঠিকাদারি। তার পয়সা ও উদ্যমী জীবনে সহজেই তার হাত ধরে নেয় কোনও নীলাঞ্জনা কারণ বুদ্ধিমতি নীলাঞ্জনারা জানে আজকের পৃথিবীতে তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারে ঐ বিপ্লবরাই ।

সরকারী চাকুরে যুবক ঃ

নাম তার মানিক । ইতিহাসে এম. এ । পিতৃবিয়োগের পর বাবার চশমা পরা কেরাণীগিরির চাকরিটা পায় অনেক কষ্টে, নেতাদের পেছনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে । সবাই তাকে এখন ভাবে খুব ভাগ্যবান । সরকারী চাকুরে বলে কথা ! কিন্তু মানিকই জানে তার জীবনের ট্র্যাজেডি ! তার রয়েছে মা, দু-ভাই, দু-বোন, সবারই জীবন তার আয়ের উপর দাঁড়িয়ে । তারও রয়েছে, নীলাঞ্জনা, যে ছিল একসময়ে তার বনলতা সেন –– যাকে সে লিখত চিঠি ––" হবে তুমি আমারই একদিন "

পাত্তা দেয়নি তখন তার বনলতা । অথচ আজ হাতের মুঠোয় সেই বনলতা । তবুও তাকে নিয়েই দুঃশ্চিন্তা । সেই বনলতা চিঠি লিখেছে — "চাকুরী যখন হয়েই গেছে বিয়েটা তাড়াতড়ি সেরে নাও । নতুবা বাবা, মায়েরা ...।" হায়রে টাকা ! লোকে বলে প্রত্যেক পুরুষের সফলতার পেছনেই কোন নারী । মানিক বুঝছে নারীরা সফল পুরুষের প্রেরণা কারণ নারীরা সফল পুরুষের পেছনেই যে ছুটে । বোনের বিয়ের আগে নিজে বিয়ে করার কথা ভাবতেও পারে না সে । তবুও ভাবতে হল । জীবন হয়ে উঠল আরও জটিল, বিষময় ... ।

বিপ্লবী যুবক ঃ

সুভাশীষ গ্রেজুয়েট ছেলে । সুভাশীষ বিপ্লবের দীক্ষায় দীক্ষিত তরুণ । ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আশ্রয় - এসবের লোভ তাকে সামলে রাখতে পারেনা । সে চায় পরিবর্তন । পরিবর্তন পুরো সিস্টেমটার । কেন কারও ঘরে থাকবে খাবারের অফুরন্ত ভাণ্ডার, কেনই বা খাবারের খালি বাটি নিয়ে ভিখারিরা হাঁটে রাস্তায়, কেন এত বিশাল অট্টালিকার সারি, অথচ এত লক্ষ লক্ষ গৃহহীন নর-নারী এই প্রশ্নটিই তেড়ে বেড়ায় সর্বক্ষন তাকে । শুভাশিষ পাড়ার উঠতি কিশোরদের নিয়ে দল বাঁধে, তাদের ডেকে কবিতা শোনায় —

"কাঁচের চুড়ি ভাঙার মতন
মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে
দুটো-চারটে নিয়ম কানুন ভেঙে ফেলি
যাদের পায়ের তলায় আছি
তাদের মাথায় চড়ে বসি ।"

হ্যাঁ, সমাজে সুভাশীষেব মত বিপ্লবীরা আছে । তাই সমাজ পরিবর্তন না হলেও সমাজে বিপ্লবের ছোঁয়া আছে ।

রিক্সা চালায় যে যুবক ঃ

নাম তার কালাচাঁদ । (বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর রিক্সায় বসে তার সঙ্গে কথা হয়েছিল) । সবাই ডাকে কালু। বয়স কুড়ি-একুশ । মুখে সবসময়ই হিন্দি গানের কলি । ভাই বোন মিলে পরিবারে সাতজন। বাবা কখনও মেস্তরী, কখনও দা-কামলা, কখনও বা সহজে টাকা রোজগারের লোভে জুয়ারী। কালু প্রাণচঞ্চল । হাসতে হাসতে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিয়েছে । সারাদিনের রোজগারের প্রায় সবটাই দিয়ে দেয় পরিবারকে । মাঝে মাঝে সিনেমা দেখে. লটারী খেলে, বড় বাবুদের মত বড় হবার স্বপ্ন দেখে । অজস্র বঞ্চনা, সীমাহীন দারিদ্রাতায় আচ্ছন্ন হয়েও কালুরা কাঁদে না । তাদের চাহিদা শুধু অন্ন, বস্ত্র আর একটা ভাঙ্গা কুটির । আর কখনও বা বস্তিরই কোন দরিদ্র ষোড়ষী যুবতীর সঙ্গে প্রেম, ভালবাসা, বিয়ে ... । মানুষকে ঠকিয়ে তিনতলা যারা বানায় তাদের মতো দুশ্চরিত্র, চোর নয় তারা । তবুও রিক্সা ভাড়া আট এর জায়গায় দশ চাইলে তাদের নিয়ে সারা শহর উত্তপ্ত ; তোলাপাড় ... ! কথা বলতে বলতে বাড়ীর কাছে এসে যখন তাকে দশটি টাকা দিলাম বলে উঠল, 'স্যার, টাকা লাগবেনা'-অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি করে আমাকে চেন ? উত্তর দিল "আপনে যেবছর গান্ধী ইস্কুলে ঢুক্‌ছিলেন ঐ বছরই আমি ক্লাশ এইট -এ ফেইল কইর‍্যা আর ইস্কুলে গেছিনা ।" তার ঐ কথা শুনে নিজের মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে উঠেছিল । মনে হচ্ছিল তাকে রিক্সা হাতে নিতে যারা বাধ্য করেছে তাদের মধ্যে আমিও তো হয়তো বা একজন ... ।

যৌবনের শেষ প্রান্তে যে যুবক ঃ

সত্যেন । পাড়ার সত্যেন দা । বয়স পঁয়ত্রিশ পেরুণোর পথে । সেই গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর থেকে টিউশন করে চলেছেন বাড়ির টোলে । ছোট বোনের বিয়ের পরই পিতৃবিয়োগ । মা ও ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব কাঁধে । ছোট-ভাই এম. এ পড়ছে শহরে । তার পড়াশুনার দায়ভার সত্যেনদারই । পাড়ার ভাল ছেলে হিসেবেই সত্যেন পরিচিত । কিন্তু 'ভাল' সত্যেনের চাকুরিটা আর হল না । সত্যেনদার কাছে টিউশন নিয়েছে এমন বেশ কয়েক পাড়ার যুবকেরই চাকুরি হয়ে গেছে । তারা যখন তাকে এখন স্যার বলে ডাকে

মনের এক কোনে একটু ব্যথা হয় । ওরা চাকুরী পেয়েছে সেজন্য নয়। নিজের চাকুরিটা হল না সেজন্যই । চাকুরি পাওয়ার আশা অবশ্য ছেড়ে দিয়েছে সে অনেক আগেই, টিউশনের রোজগারটা মোটামুটি ভালই। প্রতিদিন রাত্রিতে মার জন্য ঔষুধ বা ফল কিনে নিয়ে আসে। মা ৬৫ উর্দ্ধ। মা তাকে একদিন কাছে ডেকে বলে 'সত্যেন, তুই শুধু শুধুই আমার এত যত্ন করছিস্। তোর মনের কথা আমি জানি । তুই চাস্ তোর সাথে চিরদিন আমি থাকি । পাগল! এও কি সম্ভব, বুড়ি হয়েছি । মরতে তো হবেই । তাই বাবা বারবার বলছি বিয়েটা সেরে নে । আমিও নিশ্চিন্তে বউ এর হাতে তোকে তুলে দিয়ে যেতে পারি ।" মার কথা শুনে চোখের জল আসে সত্যেনের । না, সত্যেন বিয়ে করবেনা । আদর্শবাদী সত্যেন একবারই বিয়েব কথা ভেবেছিল যখন তার নীলাঞ্জনা তাকে বিয়ে করার কথা দিয়েছিল । কিন্তু হঠাৎ-ই একদিন নীলাঞ্জনা চিঠি দিল তার পক্ষে আর সত্যেনকে বিয়ে করা সম্ভব হচ্ছেনা কারণ তার বাবার বন্ধু তার জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান এনেছে । আমেরিকাতে ইঞ্জিনিয়ারিং এর চাকুরী করে "যদি তুমি চাকুরী করতে তবে না হয় মাকে বলে দেখতাম. কিন্তু ." কথাটা মনে আসলেই হাসিখুসি সত্যেন রাত্রিব গভীরতায় তাব ছোট্ট টেপ রেকর্ডারে তার প্রিয় গানটি শুনে —

"যখন সময় থমকে দাঁড়ায়/নিবাশায় পাখী দু'হাত বাড়ায়/খোঁজে নিয়ে মন নির্জন কোন্ / কি আর করে তখন / স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন, দেখে মন ... ।"

<u>ইট-ভাঙ্গনির মেয়ে ঃ</u>

সুন্দরী ষোড়শি সারিকা । বস্তির এক যুবকের প্রেমে হাবুডুবু । হরিয়া নাম তার । সবাই 'হরি' 'হরি' বলেই ডাকে । বয়স চব্বিশ কিংবা পঁচিশ । বস্তিতেই বাস । তবে হরিয়া বাবা মায়ের মতো ইটভাঙেনা । সে নেতাদের পেছনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে, লাঠি বানিয়ে তার উপরের দলের পতাকা লাগিয়ে এবং আরও কত কি করে একটা সরকারী চাকুরী পেয়েছে, হাসপাতালে ঝাড়ুদার । তার এই বিশাল সফলতার পেছনে কিন্তু তার সারিকা । সারিকা তার প্রেমে হাবুডুবু, যেমনটি হরিয়া নিজেও। কিন্তু সারিকার মা তার এই যৌবনের পরশে উর্ব্বশী সারিকাকে তার সঙ্গে নিয়ে যায় ইট ভাঙতে। "এই জোয়ান বেটিকে কেন সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলস ? বিয়া-টিয়া দিবি না ?" এরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে , সারিকার মা উত্তেজিত হয়ে পরে "আমার আদরের সারিকার যৌবনের লোভে বস্তির ছেলেগুলি শকুনের মত রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকে । কার ভরসায় রাইখ্যা যাই এই পোঁড়া কপালীরে ? এত রূপ লইয়া কি কেউ গরিবের ঘরে জন্ম লয় ?" সারিকার মা জানে না সে তার সঙ্গে প্রত্যেকদিন সারিকাকে নিয়ে গিয়ে দু'টি যুবক-যুবতীকেই কষ্ট দিচ্ছে । হরিয়া তার বন্ধুরে বলে, "কবে যে সারিকা আমার হইব ।" মনের কষ্টে কবিতা লেখে (ভালবাসা সবাইকে যে কবি করে তোলে)—

"মনে পড়লে গা-ডা জইল্যা যায়
ভোর বেলা সে উইঠ্যা যায়
ইট ভাঙ্গনের কামে;
মোর সখীর ঐ কপালের টিপ
মুইছ্যা গেছে ঘামে ।

■ ছয়শ কোটিরও বেশী মানুষের এই পৃথিবীতে শত শত কোটি যুবকের উপাখ্যান এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে তোলে ধরা অসম্ভব তা বলাই বাহুল্য। তবুও উপসংহার যদি টানতেই হয় তবে বলা যায় এত সংগ্রাম, এত শোষণ এত কষ্ট, তবুও পৃথিবীর বুকে দাপিয়েই বেড়ায় যুবকদের দল ! কারণ কষ্ট পাওয়ার মধ্যেই, সংগ্রামের মধ্যেই তারা খুঁজে পায় নিজেকে । শিক্ষার সঙ্গে জীবিকা অর্জনের পথ লাভ করার মধ্যে রয়েছে বিশাল ফারাক। কিন্তু তবুও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আস্তে আস্তে জীবনটাকে গুছিয়ে যে নেয় তাকেই তো বলে সফল যৌবন ! কখনও টক্, কখনও ঝাল, কখনও বা মিষ্টি ! সব কিছু বুঝে সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে নিরাশ না হয়ে চলার নামই জীবন । তাই সফল যৌবনের মুখে সবসময়ই থাকুক এই গানের কলি —

"এ জীবন টক্-ঝাল মিষ্টি
আছে ঝড়, আছে রোদ্, বৃষ্টি
যদি থাকে সুন্দর দৃষ্টি
খুঁজে পাবে বাঁচার মানে ।"

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

'অন্বেষা' গোষ্ঠীর সর্বকনিষ্ঠ এই লেখকের জন্ম ১৯৭১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী আগরতলায়। পেশায় রাজধানীর মহাত্মা গান্ধী দ্বাদশ বিদ্যালয়ে ইংরেজী বিষয় শিক্ষক। শিক্ষাগত যোগ্যতা ইংরেজী (অনার্স) এম. এ, বি. এড। মাস্টার ডিগ্রীতে বিশেষ বিষয় ছিল আমেরিকার সাহিত্য। রাজ্যের অগ্রণী সংবাদপত্র পত্রিকায় ইতিমধ্যেই এই প্রবল সম্ভাবনাময় লেখকের লেখা বহু প্রবন্ধ, রম্য, ও কবিতা বেরিয়েছে যেগুলি পাঠক ও লেখকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে । [illegible] এই লেখকের পিতা [illegible] তিনি B. B. Evening College এ U. D. C পদে কাজ করতেন ।

******

প্রয়োজন তীব্র গণ-আন্দোলন

— প্রশান্ত দেব

এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বব্যবস্থা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। আমরা তার আগে IMF, World Bank, GATT ইত্যাদির নাম প্রায় শুনিইনি বলা চলে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির সুযোগে গোটা বিশ্বকে — বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বকে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে পদানত করার লক্ষ্যে আমেরিকা সক্রিয় হয়ে উঠে।

৮০-এর দশককে নির্দ্বিধায় "আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যের দশক" নামে অভিহিত করা যায়। চরম মন্দার ফলে এই দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে দারিদ্র্য যেভাবে বিস্তার লাভ করে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। আর দারিদ্র্যের এই সুযোগ নিয়ে মন্দায় আক্রান্ত আমেরিকাও সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় বিশ্বায়ণের নামে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাংককে তার পক্ষে ব্যবহারের সমস্ত কাজ পাকা করে ফেলে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর ঋণ দেবার নামে একটি কর্মসূচী চাপিয়ে দেয় যার নাম "কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচী (Structural Adjustment Programme)" সংকটময় পরিস্থিতি সামাল দিতে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলি কাঠামোগত পুণর্বিন্যাস কর্মসূচী মেনে লক্ষ কোটি ডলার ঋণ IMF ও World Bank থেকে গ্রহণ করে এবং বলাবাহুল্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফলাফল হয়েছে ভয়াবহ। পুণর্বিন্যাস করতে গিয়ে সবকটি দেশের অর্থনীতি হয় ভেঙ্গে পড়েছে, নয় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

এই কর্মসূচীর মূলনীতি হল ছয়টি। ঋণগ্রহীতা দেশকে এই নীতিগুলি কার্যকরী করতে হবে। এক, দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ণ। কর্মসূচী প্রণেতাদের দাবি হল, এর ফলে রপ্তানী বৃদ্ধি হবে এবং আমদানী হ্রাস পাবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা হল (রাষ্ট্র সংঘের সমীক্ষা অনুযায়ী) ★ রপ্তানী আয় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে ★ একই বাজার দখল করার জন্য বহু রপ্তানীকারক ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে পণ্যের দাম হ্রাস পেয়েছে। ★ যে সব দেশের অর্থনীতি অতিমাত্রায় আমদানীর উপর নির্ভরশীল তাদের ভরাডুবি হয়েছে।

দুই, রপ্তানীতে উৎসাহদান । দাবী করা হয়েছে, এর ফলে বিদেশী মুদ্রার আয় বেড়ে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ অগ্রগতি ঘটবে । কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হল — ★ খাদশস্য উৎপাদনের চেয়ে রপ্তানীযোগ্য শস্য উৎপাদনের ফলে অনাহার মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে । ★ বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধিতে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির চরম ক্ষতি সাধিত হয়েছে । ★ রপ্তানীশস্যের উপর নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে । ★ রপ্তানী থেকে যা আয় হয়েছে, ঋণ করতে নিঃশেষ হয়ে গেছে, দেশের উন্নয়ন ঘটেনি । বড় বড় বাঁধ ও সেচ প্রকল্প, খনি, পাঁচতারা হোটেল, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রভৃতি নির্মাণ করতে গিয়ে বহু গ্রামের মানুষ বাস্তুহারা হয়েছেন । পরিবেশের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে ।

তিন, সরকার ব্যয় সংকোচন এর ফলে নাকি মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হবে । কিন্তু এর ফল হয়েছে মারাত্মক । সরকারী ব্যয় সংকোচনের কোপ যেসব ক্ষেত্রে পড়েছে সেগুলি হল —শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, জল সরবরাহ ও নিকাশী ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র সেচ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সড়ক পরিবহন ইত্যাদি। অর্থাৎ সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীই ছাঁটাই হয়ে গেছে ।

চার, বেসরকারীকরণ । দাবী করা হয়েছে যে, এর ফলে শিল্পসংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানুষ গুণমানসহ আধুনিক পরিষেবা পাবে । কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে, শিল্পপতিরা সেইসব ক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন যেখানে মুনাফার হার বেশী । অর্থাৎ মুনাফাকে সামাজিক অগ্রাধিকারের উপরে স্থান দেয়া হয়েছে। এর ফলে, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, যোগাযোগ প্রভৃতি প্রাথমিক অধিকার থেকে গরীব মানুষদের বঞ্চিত করা হয়েছে ।

পাঁচ, অবাধ ও উদার আমদানী নীতি । এর দ্বারা দাবী করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রেতা আন্তর্জাতিক মানের পণ্য ব্যবহারের সুযোগ পাবেন । কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে যে এর দ্বারা ★ স্থানীয় সর্বনাশ হয়েছে । ★ খাদ্য স্বনির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। ★ দরিদ্র জন সাধারণের জীবনযাত্রার মানের অবনতি হয়েছে । ছয়, নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা সরবরাহ দাবী করা হয়েছে । এর দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে । কিন্তু বাস্তবে যা হয়েছে তা হল, ★ অর্থনৈতিক মন্দা ★ বেকারী বৃদ্ধি ★ পরিকাঠামো ব্যবস্থার অবনতি ★ মুদ্রাস্ফীতি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে না।

উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির চরম দারিদ্র্যের কারণে এসব জনবিরোধী

শর্ত মেনে এবং চড়া সুদে লক্ষ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় । ফল যা হবার তাই হয়েছে । এই দেশগুলি তীব্র বেকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে । নতুন কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে পড়েছে । ভর্তুকী প্রত্যাহারের ফলে নিত্যপ্রায়োজনীয় জিনিষের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে । কৃষক দিশাহারা হয়ে পড়েছে । আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে । অথচ উন্নত দেশগুলি কিন্তু জনকল্যাণ ও কৃষি খাতে চড়া ভর্তুকী দিয়ে থাকে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান অভিযোগ হল যে তারা অত্যধিক হারে ভর্তুকী দেবার জন্য ও সরকারী অনুৎপাদক খাতে ব্যয় বেশী করার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে । কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যে তা নয়, নিম্নের সারণীটি দেখলেই তা বোঝা যাবে ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়ের অনুপাত	তৃতীয় বিশ্বের দেশ	শিল্পোন্নত দেশ
ভর্তুকী খাতে	জি ডি পি-র ৬%	জি ডি পি-র ১৮%
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বেতন বাবদ	জি ডি পি-র ২.৪%	জি ডি পি র ৪%
সমাজ কল্যাণ খাতে	বাজেটের ৮%	বাজেটের ৫৬%
মূলধনী খাতে	বাজেটের ১৬%	বাজেটের ৬%
সামগ্রিক খাতে	জি ডি পি-র ২৬%	জি ডি পি-র ২৯%
বাজেট ঘাটতি	৪.৮%	৫.১%

তৃতীয় বিশ্বের মানুষ খুব স্বাভাবিক কারণেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে । তার ধাক্কা পড়ছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সরকারের উপর । তাই দেখা যায়, শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকীর প্রশ্নে মেক্সিকোর কানকুন শহরে গত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত WTO বৈঠক ভেঙে গেছে । অবশ্য এই বিক্ষোভ শুরু হয় সিয়াটেলে, তারপর একে একে প্রাগ্, ষ্টকহোম, শিকাগো, গেটেবুর্গ, জেনোয়া হয়ে কানকুন । সিয়াটেলে শুরু, কানকুন তা সর্বব্যাপী । ভারত, চীন মালয়েশীয়াসহ ৯০ টি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যে কৃষিখাতে ভর্তুকীর সুযোগ দিতে এই সব দেশের অধিকার থাকবে, নতুবা ইউরোপ ও আমেরিকা কৃষিখাতে যে উচ্চহারে ভর্তুকী দেয় তা প্রত্যাহার করতে হবে । G-৪ সরকারগুলির ক্ষমতা হয়নি কানকুন বৈঠকে তাদের মনোমত প্রস্তাব পাশ করতে ।

১৯৯১ সালে উরুগুয়ে রাউণ্ড নামে পরিচিত সম্মেলনে GATT এর ডিরেক্টর জেনারেল আর্থার ডাঙ্কেল কতগুলি প্রস্তাব পেশ করেন । সেই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে GATT এর অবলুপ্তি ঘটে এবং জন্ম নেয় WTO । এই প্রস্তাবের অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে কৃষি ছাড়াও বাজারের উপর অধিকার, বস্ত্র বাণিজ্যভিত্তিক বিষয়,

পরিষেবা, এমন কি মেধাশক্তির অধিকার ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল । দুনিয়ার যত কিছু আছে, তার সব বিষয়েই যাতে দুর্বল দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করা যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই এই চুক্তি তৈরী করা হয়েছিল। প্রস্তাবে একথাও বলা হল যে, এই চুক্তিটি একটি Single Package অর্থাৎ এর কোন অংশকেই পৃথকভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা যাবে না । ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল । জেনে বুঝে এক বিষবৃক্ষের রোপন করা হল সেদিন ।

কিন্তু WTO -এর কানকুন বৈঠকে এসব দেশের বিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল। পূর্বে প্রত্যেক দেশই তার বাজার নিজে নিয়ন্ত্রণ করত । নিজস্ব পণ্য এবং আমদানীকৃত বিদেশী পণ্যের সব দেশেই শুল্ক ব্যবস্থায় তারতম্য করত । সব দেশেই লক্ষ্য রাখত যাতে বিদেশী পণ্য তার বাজার দখল করতে না পারে । এ জন্যেই দেশীয় পণ্য ভর্ত্তুকী এবং আমদানীকৃত পণ্যে শুল্কের ব্যবস্থা থাকে । দরিদ্র দেশে চালু এই সব শুল্ক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কথা বলা হল ১৯৯১ সালে ডাঙ্কেলের চুক্তিতে । বলা হল যে কৃষিসহ সমস্ত পণ্যের উপর থেকে ভর্ত্তুকী বন্ধ করতে হবে বা কমাতে হবে এবং আমদানীকৃত পণ্যের উপর থেকে ভর্তুকী বন্ধ করতে হবে বা কমাতে হবে এবং আমদানীকৃত পণ্যের উপর কোনরূপ শুল্ক বসানো চলবে না । অপরদিকে উন্নত দেশগুলিতে চালু উচ্চহারে ভর্ত্তুকী ব্যবস্থা সম্পর্কে চুক্তিতে একটি কথাও উচ্চারিত হল না । এখানেই অবাধ বাণিজ্যের ধাপ্পাটা ডাঙ্কেল প্রস্তাবের অন্যতম শর্ত ।

দরিদ্র দেশগুলিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার যেহেতু কম, তাই কৃষি উৎপাদনকে স্থিতিশীল রাখতে সার, বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ- এই সব ক্ষেত্রে কৃষককে সাহায্য করার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতেই হয় । নতুবা শুধু বাজার অর্থনীতি দেখলে কৃষি ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়বে । ডাঙ্কেল প্রস্তাব এই জায়গাটিতেই আঘাত করেছে । মার্কিন সরকার কিন্তু উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানির জন্য ভর্তুকী দিয়ে থাকে । ভর্তুকী বন্ধ হওয়ায় দরিদ্র দেশগুলির কৃষকরা মার খাবে এবং কৃষিপণ্যের বাজারটা চলে যাবে অন্যের হাতে—এই একটি বিষয় নিয়ে কানকুন বৈঠক ভেঙে গেল ।

ইউরোপের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ Michal Rowbothan তাঁর বহু আলোচিত ও বহুবিক্রীত Good bye America বইটিতে উন্নত দেশগুলির নিকট তৃতীয় বিশ্বের ঋণকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট আখ্যা দিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বে উন্নত দেশগুলির আগ্রাসন নীতিকে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছেন এবং বলেছেন, যে কোন মূল্যেই হোক এই ঋণকে বাতিল করে তৃতীয় বিশ্বকে ঋণমুক্ত করতে হবে. তিনি লিখিছেন, 'Globalisation and debt. ... debt and globalisation ... are there really no answers and

no alternatives ? This book is written in the conviction that the tangled developmental disaster of the third world debt can be tackled and that this can be done directly and rapidly. Third world debts, the Globalisation is direct product of the debt crisis; it is also the price we all now pay for the inequities in international trade and finance that created the scandal of third world debt And far being inevitable, globalisation is best described as a deliberate policy বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সরাসরি দায়ী করে লিখেছেন—The issue being discussed here is power. It is the power to control and direct economic activity and thereby ultimately, people. This is the power of money and of banking, the power of the Federal Reserve and especially the dollar, the power of few hundred chief Executive Officers of the most powerful multinational organisations and the power of dominant governments. It is today's imperialism. And in the end, the apex of the power can with full justification be identified with America, American history, American corporate interests and American political influence.

বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের জনগণের খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতিও বদলে দিতে চাইছে। এশিয়ার থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশে আমেরিকার বহুজাতিক ফাষ্ট ফুড কোম্পানি MCDonald's, Burger King, KFC (Kentuki Fried chicken) ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে । এমনকি ভারতের মুম্বই ও পুনে শহরেও McDonald's, জাঁকিয়ে ব্যবস্থা করছে। এ সম্পর্কে Michael Rowbotham তাঁর Goodbye America ! বইটিতে লিখেছেন — There is also a cultural dimension to globalisation. The loss of distinctive national and regional cultures and their replacement with a brash consumer ethic born in a thousand corporate ad-campaigns is epitornised by the global spread of the donald's Pepsi-co and Nike One does not want to be over-puritanical. There is no reason
food. But why Mc Donalds' ? Why not an Indian company ? And why not a company that offers eastern delicacies ?

এসব বিষয় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কছে যতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানুষ

বিশ্বায়ণবিরোধী সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন ।

বিশ্বায়ণের সংকট উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে গ্রাস করেছে । বেপরোয়া কর্মচ্যুতি, ক্রমবর্দ্ধমান বেকারবাহিনী, মূল্যবৃদ্ধির উচ্চহার ইত্যাদির ফলে উন্নত দেশগুলির মানুষ ক্রমশ আন্দোলনমুখী হচ্ছেন । বৃটেনের মার্গারেট থ্যাচারের আমলে রেলওয়েকে বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল । আজ ২/৩ বছর ধরে বৃটেনের রেলওয়ে শ্রমিকরা রেলওয়েকে পুনরায় সরকারীকরণের দাবি করে আন্দোলন সংগঠিত করছেন ফ্রান্স, ইটালি, অষ্ট্রিয়া, জার্মানী শ্রমিক ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে পড়েছে । জার্মানী, ইটালি প্রভৃতি দেশে দক্ষিণপন্থী সরকারগুলি বামপন্থীদের কাছে পরাজিত হয়েছে । কিন্তু সংস্কারপন্থী বামপন্থীরা বিশ্বায়ণের কোন বিকল্প রাস্তা দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে । সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পুঁজিবাদি শিবির উল্লাসে ফেটে পড়ে বলেছিল যে — সমাজবাদ শেষ-পুঁজিবাদই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। আজ পুঁজির বিশ্বায়ণের কুফলগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে পুঁজিবাদ সমাজবাদের বিকল্প হতে পারে না । বিশ্বায়ণের এই টালমাটাল অবস্থানের মধ্যেও চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া এবং কিউবা সমাজতন্ত্র নিয়েই টিকে আছে । অবশ্য তাদের নানাবিধ সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়েছে ।

আমেরিকা একদিকে যেমন গোটা বিশ্বকে অর্থনৈতিকভাবে পদানত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত, তেমনি তার কথা অমান্য করে এমন দেশকে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে কুক্ষিগত করতেও দ্বিধা করছে না । ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবাদী ভয়ংকর আক্রমণে আমেরিকার অহংকার বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধূলিসাৎ হয়ে যায় । এ জন্য ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করা হয় । আফগানিস্তানের সরকারকে বলা হয় ওকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে। আফগান সরকার অস্বীকার করলে আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং তালিবানদের ক্ষমতাচ্যুত করে । তার ফলে সেখানকার অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, মানুষ এক অনিশ্চিতের মধ্যে দিন যাপন করছেন । ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয় । সন্ত্রাসবাদকে পর্যুদস্ত না করে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা যাবে না । তাই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই অপরিহার্য। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে অপর দেশ আক্রমণ আরও বেশি নিন্দনীয়।

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন যেহেতু আমেরিকার কথায় উঠতে বসতে রাজি নন, তাই তাঁকে শায়েস্তা করতে হবে । কথায় বলে খলের নাকি ছলের অভাব

হয় না। আমেরিকা অভিযোগ করল যে সাদ্দাম হুসেন প্রচুর কেমিক্যাল মারণাস্ত্র মজুত করেছেন মানুষকে ধ্বংস করার জন্য। রাষ্ট্রসংঘ থেকে ইন্‌স্পেক্টর পাঠানো হলো ইরাকে। তাঁরা ফিরে এসে রিপোর্ট দিলেন যে, উল্লিখিত অস্ত্রের কোন সন্ধান তারা পাননি। আমেরিকা সে রিপোর্ট মানল না এবং রাষ্ট্রসংঘকে সম্পূর্ন অবজ্ঞা করে ইরাক আক্রমণ করল এবং সাদ্দাম হুসেনের সরকারকে পরাস্ত করে ইরাক দখল করল। শতশত শিশু, নারী, বৃদ্ধ নিহত হল। বিপুল সম্পত্তি ধ্বংস হল। অর্থনীতি তছনছ হয়ে গেল। ইরাকের যোদ্ধারা আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই কয়েকশত মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। আমেরিকা ইরাক থেকে পালাবার পথ পাচ্ছে না। ইরাক আরেকটি ভিয়েনাম সৃষ্টি করছে।

আমরা মনে করি আফগানিস্তান এবং ইরাকে আমেরিকার সামরিক আগ্রাসন দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ। একবিংশ শতাব্দির মানুষ তা মেনে নেবে না। অত্যন্ত আশার কথা দেশে দেশে শ্রমজীবি মানুষ বিশ্বায়ণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। মানুষ এটাও বুঝতে পারছেন যে, বিচ্ছিন্নভাবে কোন দেশের আন্দোলন বিশ্বায়ণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, দরকার আন্দোলনের বিশ্বায়ণ। তাই আমরা দেখি ১৩০ টি দেশের ৮০ হাজার প্রতিনিধি বিশ্বায়ণবিরোধী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গত ১৭—২১ শে জানুয়ারী, ০৪ইং ভারতের মুম্বাইতে মিলিত হয়েছিলেন।

আমাদের দেশে বিশ্বায়ণের শুরু ১৯৯১ সালে নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনোমোহন সিং IMF এর কাছে থেকে ২২০ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে নতুন শিল্প ও বাণিজ্য নীতির ঘোষণার মাধ্যমে GATT নির্দ্ধারিত কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী মেনে নেন। শর্ত একটাই ১৮ মাস ধরে এই সংস্কার কর্মসূচীর তত্বাবধান করবে স্বয়ং IMF তার থেকে ১৮ মাসে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সরকার যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছিলেন তা মোটামুটি এই রকম ঃ

২১ শতাংশ হারে টাকার অবমুল্যায়ণ করে তাকে সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করে তুলেছেন।

নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে অবাধ বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতির যেসব মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের জন্য সংরক্ষিত ছিল তাদের বেশীর ভাগকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে বেসরকারী

উদ্যোগের অংশগ্রহণে অনুমতি দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে রুগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলিকে Bureau of Industrial Finance and Restructuring এর মাধ্যমে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া কিংবা যাদের বেসরকারী উদ্যোগের হাতে প্রায় বিনামূল্যে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে ।

লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার শেয়ার বিলগ্নীকরণের নামে বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া ।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার ক্ষেত্রে 'বিদায় নীতি' প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাপকহারে কর্মী সংকোচন এবং কর্মস্থানের সরকারী দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়েছে ।

নরসিংহম কমিটির সুপারিশের বকলমে আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করে একদিকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় নতুন করে বেসরকারী উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠা করা, অন্যদিকে বিদেশী বহুজাতিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবাধ বাণিজ্যের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে ।

আমদানির উপর বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছে । বিদেশী সংস্থাদের এবং তাদের ভারতীয় মিত্রদের সাহায্য করার জন্য বিদেশী মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপকারি Foreign Exchange Regulation Act (FERA) প্রত্যাহার করা হয়েছে ।

রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহদানের নাম করে বিভিন্ন রপ্তানিকারক সংস্থাকে কার্যত যথেচ্ছারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে ।

বিগত প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন আছে বি.জে.পি.র নেতৃত্বে ২৪ দলের জোট । বি.জে.পি. তার দলীয় কর্মসূচীতে স্বদেশীয়ানা ও স্বনির্ভরতার প্রবক্তা হলেও তাদের নেতৃত্বে এন. ডি. এ. সরকার কোন কোন শরিকদলের আপত্তি সত্বেও বিশ্বায়ণের জোয়াল কাঁধে নিয়ে রীতিমত জোরকদমে ভারতীয় অর্থনীতির জমিটাকে তছনছ করে ফেলেছে । বিলগ্নিকরণ মন্ত্রক নামে একটি নতুন মন্ত্রক সৃষ্টি করে একজন পূর্ণমন্ত্রীকে এর দায়িত্ব দিয়ে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্তসংস্থাগুলিকে একের পর এক হয় বেসকারীকরণ করা হয়েছে বা বেসরকারীকরণের সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে । ৬৪টি কয়লাখনির উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে । ৭৬ হাজার কয়লাখনি শ্রমিকের সামনে নেমে এসেছে এক অন্ধকার ভবিষ্যৎ ।

আমেরিকার বিখ্যাত Fortune পত্রিকা প্রতিবছর বিক্রী ও উৎপাদনের দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম ৫০০ টি কোম্পানীর তালিকা প্রকাশ করে । গুরুত্বপূর্ণ এই

তালিকার মধ্যে ১৯৯০ সালে ছয়টি ভারতীয় সংস্থা জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এগুলি হল Indian Oil. Corporation, Oil and Natural Gas Commission (এর আংশিক ইতিমধ্যেই বেসরকারী হয়ে গেছে) Steel Authrotity of India, Coal India (কয়লাখনির দুরবস্থার কথা তো আগেই বলা হয়েছে) Hindustan Petroleum এবং Bharat Petroleum. গত বছর মাঝামাঝি সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম ও ভারত পেট্রোলিয়ামকে বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্ট গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৩, এর রায়ে বলেন যে যেহেতু ১৯৭৪ সালে হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম ও ভারত পেট্রোলিয়াম সংস্থা দুটি সংসদে আইনের দ্বারা সরকার অধিগ্রহণ করেছে, তাই সংসদের অনুমোদন ছাড়া এ দুটি বেসরকারীকরণ করা যাবে না। সরকার আপাততঃ পিছিয়ে এসেছে, কেননা, রাজ্যসভায় তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলে সবকার যা চাইছে তাই করবে, তখন সুপ্রিম কোর্টের কিছুই করার থাকবে না।

এবার স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সরকারী সংস্থায় সংখ্যা ও তাদের পুঁজির পরিমাণের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখা যাক :

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংস্থা (সংখ্যায়)	সরকারী শিল্প পুঁজির পরিমাণ	মোট (কোটি টাকা)
১ম (১৯৫১-৫৬)	৫	২৯
২য়	৪৮	৯৫৬
৩য়	৮৪	৩৮৯৭
৪র্থ	১২২	৬৩৫৭
৫ম	১৭৯	১৮২০০
৬ষ্ঠ	২১৫	৪২৬৪৩
৭ম	২৩৭	৯৯৩১৫

১৯৯২ সালে বেসরকারী শিল্প সংস্থা পৌঁছয় ২৬২টিতে এবং তার মিলিত পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৫০৬৮ কোটি টাকায়। কিন্তু তারপর থেকে নতুন অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির ফলে বেসরকারীকরণের ধাক্কায় উন্নয়নের উল্টোরথ শুরু হয়। অর্থাৎ সার্বজনিক ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের জায়গায় এগুলিকে বিক্রী করে দেওয়ায় পাকা ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯২-২০০০ এর মধ্যে ২৫৮০০ কোটি টাকার সরকারী সম্পত্তি বিলগ্নীকরণের পথে ব্যক্তি মালিকের হাতে চলে গিয়েছে।

উপরের সারণী থেকে এটা জলের মত স্পষ্ট যে শত অপবাদ সত্বেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী সংস্থা এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে । এগুলিকে বেসকারীকরণের একটি মাত্রই অর্থ হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে ইতিহাসের চাকাকে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া । ভারতীয় বাজারকে সম্পূর্ণ লাগামহীনভাবে বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেয়া । যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে বিদেশী পণ্যের বাজার তৈরী করা।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলিকে কি রকম সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে তা পরের পৃষ্ঠায় বর্ণিত সারণীটিতে পরিষ্কার ঃ

অংশীদারের শতকরা হার

বহুজাতিক সংস্থার নাম	উদারনীতির পূর্বে %	উদারনীতির পরে%	মূল সংস্থা কোন দেশের
১. কাইনেটিক হুণ্ডা	২৯	৫১এর উপর	জাপান
২. মারুতি উদ্যোগ	৪০	ঐ	জাপান
৩. অশোক লেল্যাণ্ড	৪০	ঐ	বৃটেন
৪. কালার কেম	৪০	ঐ	জার্মাণী
৫. ক্যাডবেরী ইণ্ডিয়া	৪০	ঐ	বৃটেন
৬. ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন	৪০	ঐ	বৃটেন
৭. ইণ্ডিয়ান শেভিং প্রোডাক্টস্	৪০	ঐ	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
৮. প্রোক্টর এণ্ড গ্যাম্বল	৪০	৬৫	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
৯. ইণ্ডিয়ান সিউয়িং মেশিন	৪০	৫১এর উপর	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
১০. বাটা ইণ্ডিয়া	৪০	ঐ	কানাডা
১১. এ. কে. জি. ইণ্ডাষ্ট্রিজ	৪০	ঐ	অষ্ট্রিয়া
১২. মাদুরা কোট্স্	৪০	ঐ	বৃটেন
১৩. গ্ল্যাক্সো	৪০	ঐ	বৃটেন
১৪. নেসলে	৪০	ঐ	সুইজারল্যাণ্ড
১৫. ফিলিপ্স	৪০	ঐ	নেদারল্যাণ্ড
১৬. লিপ্টন	৪০	ঐ	বৃটেন
১৭. ব্রুক বণ্ড	৪০	ঐ	বৃটেন
১৮. পেপ্সী কো	৪০	ঐ	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
১৯. পি. এস. আই	৪০	ঐ	ফ্রান্স
২০. এল. এম. এল.	৪০	ঐ	ইতালি

আমাদের দেশে মোট ৪০টি বহুজাতিক কোম্পানি অবাধে ব্যবসা করছে। স্থানাভাবে এদের মধ্যে মাত্র ২০টিকে বেছে নেয়া হয়েছে মোটামুটি একটি চিত্র পাওয়ার জন্য।

আসলে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির নজর ভারতের সুবিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর যাদের সংখ্যা অন্ততঃ ২৫ কোটি যা বহু শিল্পোন্নত দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার যোগফলের চেয়েও অধিক এবং এদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব অনেক বেশী। ৮০-এর দশক থেকে এদেশে এই বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটেছে। যেহেতু এদেরই ক্রয়ক্ষমতা আছে তাই এদিকে লক্ষ্য রেখেই ভোগ্যপণ্য অর্থাৎ দামি গাড়ি, ওয়াশিং মেশিন, রঙ্গীন টেলিভিশন, ভি. সি. আর. রেফ্রিজারেটর, অডিও-ভিডিও সিস্টেম ইত্যাদি উৎপাদনে এই সংস্থাগুলি অর্থ লগ্নী করছে। গত এক দশকে ভোগ্য পণ্যের বাজার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ দেশী শিল্প সমৃদ্ধ হয়নি, কারণ এইসব পণ্যের প্রযুক্তি ও পুঁজি বিদেশ থেকে আমদানি করার ফলে একদিকে দেশীয় উৎপাদকগণ মার খেয়েছেন, অন্যদিকে বহুমূল্য বিদেশী মুদ্রার বড় অংশ এইসব পণ্য আমদানী করার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ঋণের জালে বাঁধা পড়েছে। এক কথায় শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের ভাগ্যকে ঠেলে দেয়া হয়েছে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় দেশের কোন বিদেশী বা আভ্যন্তরীণ ঋণ ছিল না। বিশ্বব্যাঙ্কের ১৯৯১-৯২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৯১ সালের মার্চ মাসে ভারতের বৈদিশিক ঋণ ছিল ৭,০০০ কোটি ডলার আর ২০০৩ সালের মার্চ মাসে মাসে এসে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৪২০ কোটি ডলার। অর্থাৎ ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী।

কৃষিতে ভর্তুকী প্রত্যাহারের ফলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের উৎপাদন মূল্য অনেক বৃদ্ধি পায়। সেই অনুযায়ী ন্যায্য দাম না পেয়ে হাজার হাজার কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান থেকে কৃষকের আত্মহত্যার সংবাদ আজ নৈমত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০০৩, জানিয়েছে ভারতে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৭৫ টি দেশের উপর সমীক্ষা চালিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মানব সম্পদ উন্নয়ণ সূচকের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী ২০০১ সালে উন্নয়নের দিক থেকে ভারতের স্থান ছিল ১২৭ তম স্থানে। অথচ ২০০০ সালে ছিল ১২৪ তম স্থানে। এক বছরের ব্যবধানে ভারতকে ১২৪ থেকে ১২৭-এ নেমে যাওয়ার কারণ হল — বসনিয়া, বত্সোয়ানা এবং অধিকৃত প্যালেস্টাইন এই তিনটি দেশ ভারতকে টপকে গেছে উন্নয়নের সুবাদে। এর পরের বছর হয়তো শোনা যাবে ভারত নেমে গেছে অধিকৃত কাশ্মীরেরও নীচে। ১৪২৯ টি বিদেশী পণ্যের

ভারতে প্রবেশের উপর বাধা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। এমনকি মুড়িও বিদেশ থেকে আসছে 'রাইস্ ক্রিস্‌পি' নাম নিয়ে । বাজেটের বাইরে প্রশাসনিক নির্দেশে ঘনঘন পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাস ইত্যাদির দাম বাড়ানো হচ্ছে । জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বেড়েই চলেছে । অথচ বেশীর ভাগ মানুষেরই কাজ নেই । ২০০১-২০০২ আর্থিক বছরে পরিবার পিছু খরচ এবং কর্মসংস্থান ও বেকারি নিয়ে Sample Survey Organisation সারা দেশে এক সমীক্ষা চালায় । তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০২ সালের ৩০ শে জুন শেষ হওয়া বছরে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ মানুষই বেকার । অন্যদিকে শহরাঞ্চলের ৬৪ শতাংশ মানুষের কোনও ঠিকে কাজও নেই ।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বছরে ১ কোটি বেকারের কর্ম সংস্থান হবে । অর্থাৎ তাদের পাঁচ বছরের শাসনকাল ৫ কোটি বেকার চাকরী পাবে । এখন ভোটের মুখে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে পত্রিকায় বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান হচ্ছে যে, বছরে গড়ে ৮৪ লক্ষ বেকারের নাকি চাকরী হয়েছে । ত্রিপুরাতে তথাকথিত এই ৮৪ লক্ষের মধ্যে অন্ততঃ ৮৪ জনের চাকরী হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । ত্রিপুরাতো ভারতের বাইরে নয় । সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তার দপ্তরগুলিতে নতুন নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে । অবসর গ্রহণের ফলে ১০ লক্ষ শূন্যপদের অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে । যাওবা ছিটেফোঁটা হচ্ছে তাও হচ্ছে কন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বছরে ৮৪ লক্ষচাকরী দেবার বিষয়টি যে কত বড় ধাপ্পা তা একটি মাত্র উদহরণেই যথেষ্ট ।

সম্প্রতি রেলের চাকরীর লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে বিহারী ও অহমিয়া বেকার যুবকদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাঁধে । বহু যুবকের মৃত্যু হয়েছে এর ফলে । হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছে । এই মুহূর্তে রেলে চতুর্থ শ্রেণীর শূন্যপদের সংখ্যা ৭৬ হাজার । এর মধ্যে মাত্র ২০ হাজার শূন্যপদে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় রেলদপ্তর । এ ব্যাপারে পরীক্ষা ছিল ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে । শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ । ২০ হাজার ছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিং-এর স্নাতক । ৩ হাজার ছিলেন বিজনেস ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর । তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল বছরে ১ কোটি অর্থাৎ ৫ বছরে ৫ কোটি বেকারকে চাকরী দেয়ার । এই মুহূর্তে দেশে নথিভূক্ত বেকারের সংখ্যা ৪ কোটি ১৬ লক্ষ । জোট সরকারের দাবি অনুযায়ী যদি বছরে ৮৪ লক্ষ বেকারকে চাকুরী দেয়া হয়ে থাকে তবে বর্তমানে দেশে কোন বেকার থাকার কথা নয় । তাহলে প্রশ্ন উঠবেই যে, রেলের চতুর্থ শ্রেণী একটি পদের জন্য যে ৩৭০ জন আবেদন করলেন তারা কোথা থেকে এলেন ? সাম্প্রতিক আরেকটি

তথ্য থেকে জানা যায় যে, ২০০২-০৭ সালের মধ্যে আরও ৩ কোটি ৫২ লক্ষ মানুষ নতুন করে বেকারের খাতায় নথিভূক্ত হবেন । তা হলে ২০০৭ সালে নথিভূক্ত বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ । বিশ্বায়ন ও কর্ম সংস্থান পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না । বিশ্বায়ণের শর্তগুলি যে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই চাপিয়ে দিচ্ছে তা নয়, বিভিন্ন রাজ্য সরকারও বিপুল উৎসাহ নিয়ে বেসরকারীকরণ কর্মী সংকোচন, ছাঁটাই ইত্যাদি জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে চলেছে । উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িষা, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে হাসপাতাল পরিষেবা, ডেয়ারী প্রকল্প, বিভিন্ন বোর্ড, কর্পোরেশন এমন কি কোন কোন সরকারী দপ্তরও বেসরকারীকরণ করে ফেলেছে । যার ফলে ঐ সমস্ত রাজ্যগুলিতে ব্যাপক সংখ্যক কর্মচারী তাদের কাজ হারিয়েছেন । আরও হাজার হাজার চাকুরীচ্যুতির আশংকায় দিন গুণছেন।

ভারতের রাজনীতি ও দুর্নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে । কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারী সৃষ্টিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিগণ ইতিমধ্যেই রেকর্ড করে ফেলেছেন । রাজীব গান্ধীর আমলে বোফর্স, নরসিমা রাওয়ের পুত্র ইউরিয়া, লালুপ্রসাদ যাদবের পশুখাদ্য, জয়ললিতার হোটেল, হর্ষদ মেহেতার শেযার, সুখরামের টেলিকম, নরসিমা রাওয়ের হাওলা, বি.জে.পি. সভাপতির প্রতিরক্ষা বিষয়ে ঘুষ গ্রহণ, ঘুষ গ্রহণে অভিযুক্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্ণাণ্ডেজের মন্ত্রীত্বপদে ইস্তফা, ইউ, টি. আই-র দুই হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ইত্যাদি ঘটনা জনমনে আতংকের সৃষ্টি করেছে । ভারতের সর্ববৃহৎ দুর্নীতিমূলক ঘটনা মহারাষ্ট্রের ৩০ হাজার কোটি টাকার জাল ষ্ট্যাম্প কেলেঙ্কারী ধরা পড়েছে গত বছর নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে । অথচ এই জাল ষ্ট্যাম্পের ব্যবসা নাকি গত ১০ বছর ধরে [illegible] । এ [illegible] ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ [illegible] কমিশনারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । আরেক কীর্তিমান বি.জে.পি. নেতা ও কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রীর দিলীপ সিং জুদেও নয় লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন । উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী জড়িয়ে পড়েন ১৩৫ কোটি টাকার তাজ করিডোর কেলেঙ্কারীতে। দেখা যাচ্ছে, [illegible] উপরতলার ব্যক্তিবর্গ যাদের উপর দেশের কল্যাণ, অগ্রগতির, নিরাপত্তার ভার ন্যস্ত তাদেরই একটি অংশ বড় বড় দুর্নীতিতে জড়িত । এটা দেশের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। উপরতলার দুর্নীতি সংক্রামিত হচ্ছে নীচুতলায় । এভাবে গোটা সমাজ দেহ কলুষিত হয়ে পড়ছে । অথচ আমরা জানি যে, দুর্নীতির মূল উৎপাটন না করে সুস্থ, সুন্দর,

নির্মল সমাজ গড়া যায় না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমিক হিসাবে তৈরী করা যায় না।

বিজেপি-র নেতৃত্বে জোট সরকার যে কেবলমাত্র বিশ্বায়নের আগ্রাসন নীতি কার্যকর করছে এবং দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করছে তাই নয়, দেশে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াতেও প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। বি.জে.পির তিন শাখা সংগঠন বিশ্ব হিন্দুপরিষদ, বজরং দল ও আর. এস. এস. উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে দেশের ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতার মূল ভাবনাকে নষ্ট করছে। যার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর উপর আক্রমণ সংঘঠিত হচ্ছে। গুজরাটে বি.জে.পি. সরকারের রাষ্ট্রীয় মদতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর দেশের বৃহত্তম আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়। গোধরায় ট্রেনে করসেবকদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু বি.জে.পি. নেতৃত্বের দাবী অনুযায়ী গুজরাটের পরবর্তী ঘটনা গোধরার প্রতিক্রিয়া এটা কোন অবস্থাতেই মানা যায় না। গুজরাট ঘুরে এসেছেন এমন বিশিষ্ট সমাজসেবীরা বলেছেন যে, গুজরাটে যা ঘটেছে তা কিছুতেই দাঙ্গা নয়। রাষ্ট্রের মদতে সন্ত্রাসবাদীদের সংঘঠিত বর্বরতা। সুসংবদ্ধ, পরিকল্পিত গণহত্যা, নিশ্চিদ্র প্রস্তুতির অকল্পনীয় ধ্বংসলীলা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হল গুটরাটে। টানা একমাস ধরে একতরফা সন্ত্রাসে একহাজারেরও বেশী মানুষ নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। আহত হয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। ১০৫০ টি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট হয় জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে নয় লুট করা হয়েছে। চার হাজারেও বেশী বাড়ী পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। দুহাজার স্কুটার এবং এক হাজার ট্রাক জ্বালিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। চার হাজারেরও বেশী গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও লুট করে সংখ্যালঘু জনগণকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ২৯টি ত্রাণ শিবিরে ৫৩ হাজার শিশু, নারী, পুরুষ আশ্রয় নিয়েছেন। গোধরা অজুহাত মাত্র — দীর্ঘদিন প্রস্তুতি ছাড়া নৃশংস বর্বরতা এমন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা যায় না। এর ফলে সংখ্যালঘু মৌলবাদীরাও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সব ধরণের মৌলবাদই বিপজ্জনক। তবে সংখ্যাগুরু মৌলবাদ সংখ্যালঘু মৌলবাদের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক। গণতন্ত্রে, সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব হচ্ছে সংখ্যালঘুকে রক্ষা করা — তার বিকাশে সাহায্য করা। পাকিস্তান আমাদের দেশের সংখ্যালঘু মৌলবাদীদের সমর্থন ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। কাশ্মীরে মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে সাধারণ মানুষ এবং প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ভারতীয় জোয়ানরাই নিহত হচ্ছেন। ভারতের পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণ আমাদের দেশের নিরাপত্তা এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী। আমাদের দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কারগিলে পাকিস্তানী সেনারা ঢুকে পড়েছে। অবশ্য ভারতীয় বাহিনীর তৎপরতায় পাক সেনারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

আসলে জন্মলগ্ন থেকেই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাবই এ সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী । উভয় দেশের সাধারণ মানুষ শান্তির পক্ষে এটা বারবার প্রমাণ হয়েছে। এই দুটি দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক এই উপমহাদেশে চিরস্থায়ী শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করবে । আশার কথা বরফ গলতে শুরু করেছে । বন্ধ হয়ে যাওয়া ট্রেণ, বাস এবং প্লেন আবার চলতে শুরু করেছে । উভয় পক্ষেই নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছে । প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে । আশা করা যায় শীঘ্রই রাজনৈতিক স্তরেও আলোচনা শুরু হবে এবং স্থায়ী শান্তিস্থাপনের যাবতীয় উদ্যোগ নেয়া হবে ।

এবার শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক । এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা, স্বাধীনতা ৫৭ বছর পরেও পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী বাস করেন ভারতবর্ষে । অথচ বহু উন্নয়নশীল দেশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করে আমাদের থেকে অনেক বেশী । একদিকে নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে দেশ ন্যুব্জ হয়ে পড়ছে । অপরদিকে শিক্ষাখাতে খরচ ক্রমশঃ কমছে । নীচের সরণীতে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের একটি চিত্র তুলে ধরা হল ।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	শিক্ষাখাতে বরাদ্দ (মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের)
প্রথম	৭.৮৬ %
দ্বিতীয়	৫.৮৩ %
তৃতীয়	৬.৮৭%
চতুর্থ	৪.৯০ %
পঞ্চম	৩.২৭ %
ষষ্ঠ	২.৭০ %
সপ্তম	৩.৭০ %
অষ্টম	২.৮৬ %
নবম	২.৭১ %
দশম	২.৬৬ %

আসলে স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কোন সঠিক পরিকল্পনা করা হয়নি । ৮৬ সাল পর্যন্ত চলেছে কোঠারী কমিশনের কোন কোন সুপারিশকে ভিত্তি করে । আবার ৮৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ণ করে । কংগ্রেস সরকারের পতনের পর জাতীয় ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ৮৬ সালের শিক্ষানীতির পর্য্যালোচনার জন্য রামমূর্তি কমিটি নিয়োগ করে । কিন্তু এই কমিটির কার্য্যকাল শেষ হবার আগেই সরকারের পতন ঘটে এবং কমিটি বাতিল

ঘোষণা করা হয় । ১৯৯১ সালে পুনরায় ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস সরকার রামমূর্তি কমিটির সুপারিশ পর্য্যালোচনার জন্য আরেকটি কমিটি গঠন করেন এবং ৮৬ সালের শিক্ষানীতিই বহাল রাখেন । পরবর্তী সময়ে বি.জে.পি-র নেতৃত্বে জোট সরকার শিক্ষানীতি পর্য্যালোচনার জন্য যদিও কোন কমিটি নিয়োগ করেননি কিন্তু UGC এবং NCERT-র মাধ্যমে শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে উদ্যোগ নিয়েছে তাদের রাজনৈতিক দর্শনের অনুকূলে । পুরনো ইতিহাস বাতিল করে নতুন করে ইতিহাস লেখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যেখানে মুসলিম আমলকে নস্যাৎ করার কথা বলা হয়েছে । জনসংঘের নেতাদের জাতীয় বীর হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে । শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয় হবে বি.জে.পি.-র দর্শনের মূল কথা অর্থাৎ উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে উগ্রহিন্দুত্ববাদ যার উদ্দেশ্য ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা । এজন্য স্কুল কলেজে সরস্বতী বন্দনা দিয়ে দিনের কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে । শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেব মনে এই ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ একটি সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির দেশ । দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম আমল এবং পরবর্তী আরও প্রায় দুইশত বছর ইংবাজ আমল এইসব ইতিহাস ভুলে যেতে হবে — ভুলে যেতে হবে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশে এদেরও ভূমিকা আছে এবং ভারত একটি মিশ্র সংস্কৃতির দেশে পরিণত হয়েছে । হিন্দুত্ববাদীদের বক্তব্য হল ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শেষ কথা হলো ৫ হাজার বছর পূর্বেকার বেদ ও উপনিষদ ।

সনাতন সংস্কৃতির কথা বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু কার্যতঃ বিশ্বায়ণের মহাপ্রভুদের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাদের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষার মত অনুৎপাদক ক্ষেত্র থেকে সরকার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে । শিক্ষাকে বেসকারীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্যাপিটেশন ফি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে । বিপুল অংকের অর্থের বিনিময়ে বিত্তশালী পরিবারের ছেলেমেয়েরা মনোমত শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে এবং এভাবে তৈরী মেধাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে পাড়ি দেবে । কথাটা আশ্চর্য্যের হলেও সত্য যে, এই মুহূর্তে বিদেশে যত ইঞ্জিনীয়ার আছে তার এক তৃতীয়াংশ ভারতের । গোটা বিশ্বে যেভাবে ভারতীয় IT ইঞ্জিনীয়ারদের কদর বাড়ছে তাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যে সংখ্যাটা ৫০ % হয়ে যাবে । আর হবে নাই বা কেন, উন্নত দেশগুলি এত সস্তায় শ্রমিক আর কোথায় পাবে। এভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের ক্ষতি করে বিদেশী অর্থনীতিকে পুষ্ট করছে। সম্প্রতি NCERT বলেছে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে Fashion Desinging নামে একটি বিষয় পড়ানো হবে । এটিও করা হয়েছে ঐ

২৫ কোটি মধ্যবিত্তদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে । এর মধ্যে বাকি ৮০ ভাগ মানুষের চাহিদার কোন সম্পর্ক নেই । কেননা ঐ ৮০ ভাগ মানুষ তাদের জামাকাপড় শহরের ফুটপাথ আর গ্রামের মেঠো বাজার থেকেই ক্রয় করে । এই শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক নেই ।

শিক্ষার সঙ্গে আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি । আমাদের সংস্কৃতির মূল উপাদান মূল্যবোধ আজ হারিয়ে যেতে বসেছে । সংস্কৃতির বিশ্বায়ণের ফলে সিনেমা ও টিভি সিরিয়ালে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মহিমা প্রচার করা হচ্ছে । নর-নারী খোলামেলা জীবনযাপন, বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, বিবাহ না করে একসঙ্গে বসবাস করা ইত্যাদি এসব সিনেমা বা নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় । শিশুমনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে । শিশুর যথার্থ মানসিক বিকাশ হচ্ছে না । তাছাড়া রক ব্যাণ্ড নামে কুৎসীত অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে নাচ গান যুবকযুবতীদের বিপথে পরিচালিত করছে । সিনেমায়, টিভি-র বিজ্ঞাপনে অশ্লীলতা প্রদর্শন করা হচ্ছে । সংস্কৃতিতে যখন অবক্ষয় শুরু হয়, তখন বুঝতে হবে যে, জাতি ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে । এই অবক্ষয়ের সক্রিয় বিরোধীতা না করে একটি জাতি টিকে থাকতে পারেনা । রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পরস্পর মারামারি করছে । তাহলে এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়বে কে ? সচেতন জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে তার সংস্কৃতিকে বাঁচাতে। শিক্ষকদের দায়িত্ব নিতে হবে

কেন্দ্রীয় জোট সরকারের অর্থনীতি, বাণিজ্য নীতি, শিল্পনীতি, বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের ফলে শ্রমজীবি মানুষ যখন আক্রান্ত তখন তার আন্দোলন ধর্মঘট করার অধিকারের উপর আদালতের হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে দেশের শাসকবর্গ ও বিশ্বায়নের প্রভুদের অনুকূলে নিয়ে গেছে । শ্রমজীবি মানুষ হতবাক হয়ে গেছেন । পেনশন এবং অন্যান্য অর্জিত সুবিধাগুলির কাটছাঁটের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর ১২ লক্ষ রাজ্য সরকারী কর্মচারী শিক্ষক যৌথভাবে ২০০৩ সালের ২রা জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেন । জয়ললিতা সরকার আলোচনায় না গিয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য অভাবনীয় আক্রমণ শুরু করে । দুই হাজার ধর্মঘটীকে গ্রেপ্তার করা হয়, দুই লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়, দপ্তরে দপ্তরে দেড় হাজার বেকারদের চুক্তি নিয়োগ করা হয় । এই নিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা এবং তার কর্মচারী বিরোধী রায় এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে আপীল এবং তার শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী রায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক নজীরবিহীন ঘটনার সৃষ্টি করেছে। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলেছেন যে, সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার নেই । সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট আরেকটি রায়ে বলেছেন যে, শিক্ষকরা নাকি কর্মচারী

নন। তাই তারা অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি পাবেন না । বিশ্বায়নের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে আদালতের রায় মিলে যাচ্ছে । তবে আশার কথা রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সর্বস্তরেই এনিয়ে তুমুল প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং সর্বস্তর থেকেই এর তীব্র বিরোধীতা করা হয়েছে । দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং অন্যান্য রাজ্য সরকারী ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সংগঠনগুলি এর বিরুদ্ধে আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান করেছে । এই ধর্মঘটে আমাদেরও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে । তাছাড়া বিশ্বায়ন বিরোধী প্রতিটি সংগ্রামে আমাদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে ।

১৯৭৮ সাল থেকে (১৯৮৮-৯২ এই পাঁচ বছর বাদে) বামফ্রন্ট এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্টিত । ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারী নির্বাচনেও আবার তারা ক্ষমতায় এসেছে । বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সরকার শাসন ক্ষমতায় থাকলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেও যে শ্রমজীবি গরীব জনগণের জন্য কিছু করায় যার তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বামফ্রন্ট সরকার। কৃষি, শিক্ষা, জনপরিষবোমূলক কাজ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার লক্ষ্য করা গিয়েছিল ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি ঘাঁটি মূলত বাংলাদেশ, মায়ানমার ও ভূটানে অবস্থিত । ভারতের মাটিতে অপারেশন চালিয়ে তারা বিদেশে অবস্থিত ঘাঁটিগুলিতে নির্বিঘ্নে চলে যায় । সম্প্রতি ভূটান সরকার ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের ভূটানে অবস্থিত ঘাঁটিগুলি ভাঙ্গার ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য পেয়েছে। ভূটানে সেনা অভিযানের পর ৫০-৬০ শতাংশ আলফা, কে. এল. ও-র নেতা ধরা পড়েছে । এই অভিযান চলাকালে এক হাজারেরও বেশী জঙ্গী ভূটান এবং ভারতীয় সেনার হাতে ধরা পড়েছে । বাংলাদেশ সম্বন্ধেও ত্রিপুরার অভিযোগ আছে যে, বাংলাদেশে ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের ২৯ টি ঘাঁটি রয়েছে । আমাদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার যেন অবিলম্বে এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এবং ঘাঁটিগুলি ভেঙ্গে দিয়ে অনুরোধ করে । ত্রিপুরার স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য, এর সামগ্রিক উন্নতির জন্য এটা ভীষণ জরুরী ।

সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হল শিক্ষা । এটা একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এর ফলিত প্রয়োগ দেশে দেশে হয়েছে এবং ফলও পেয়েছে । বামপন্থীরাই এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে বিশ্বাস করেন । তাই বামপন্থী কর্মসূচীর একেবারে প্রথমেই স্থান পায় শিক্ষা । ত্রিপুরাতে এর ফলিত প্রয়োগের সাফল্য আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে । প্রতিটি ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার জন্য রূপায়িত হয়েছে অনেক কর্মসূচী । সত্যি, তখন শুষ্ক নদীদে যেন জোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল । গ্রাম-পাহাড়ের হাজার হাজার নতুন পড়ুয়া স্কুলমুখী হয়েছিল । অভিভাবকরা খুশীতে আত্মহারা হয়েছিলেন, তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্বান হবে, দেশের উন্নতিতে অংশ নেবে এবং সেই রেশ ধরে রাজ্যে

বর্তমানে প্রাথমিক / নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০৭১ টি, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ৪৪৩ টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৩৭০, উচ্চতর বিদ্যালয় ১৮৮, কলেজ ১৪ এবং কারিগরি ও বৃত্তিগত কলেজের সংখ্যা ১৮টিতে দাঁড়িয়েছে । মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮ লক্ষের মত। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা (বিদ্যালয়ে) ৩৬১৫৬ জন । ৩২ লক্ষ মানুষের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরায় শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিরাট আয়োজন অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হতে পারে । পরিকাঠামো ছাড়া কোন পরিকল্পনা সফল হয় না । একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে তার ন্যূনতম পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন । যেমন, ঘর, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের বসবার জায়গা, শিক্ষক-শিক্ষিকার বসবার জায়গা, শিক্ষা-সরঞ্জাম ইত্যাদি ছাড়া একটি স্কুল চলতে পারে না ত্রিপুরার ৮০ শতাংশ স্কুলেই এগুলির অভাব অত্যন্ত প্রকট । সংস্কারে অভাবে স্কুল ঘর ভেঙ্গে পড়ছে।

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটি শিক্ষা কমিশন বসিয়েছিল রাজ্য সরকার । ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল প্রাক প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও অসঙ্গতিগুলোকে চিহ্নিত করা এবং প্রতিকারের উপায় সন্ধান করা। এই কমিশনের সুপারিশগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ আয়োজন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে । গত বছরের ডিসেম্বর মাসে এক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত করা হয় সিপার্ড-এ (SIPARD) যেখানে আমাদের দুজন প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয় । সেই ওয়ার্কশপের সুপারিশ-এর একটি সারাংশ প্রদান করা হয় সরকারীভাবে যার মধ্য থেকে এই শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি । এ থেকে আমাদের এ ধারণাও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষা কমিশন স্বাধীনভাবে তার মতামত ব্যক্ত না করে, সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সরকারের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে প্রকাশ করেছে ।

শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ১ঃ৪০ এ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে, জাতীয় স্তরে পূর্বেকার শিক্ষা কমিশনগুলোর (মুদালিয়রা ও কোঠারী) সুপারিশ যেখানে ছিল ১ঃ২০। যদি শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত সম্পর্কে এই সুপারিশ কার্যকর করা হয় তাহলে রাজ্যে বহু শিক্ষক উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বে কারণ বর্তমানে রাজ্যে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত রয়েছে ১ঃ১৯ । এখানে উল্লেখ করতে হয়, সুষ্ঠু বদলী নীতির অভাবে ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষক যথেষ্ট থাকলেও বিভিন্ন বিদ্যালয় শিক্ষকের সংখ্যাল্পতায় ভুগছে আবার কোন কোন স্কুলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে ।

স্কেলগুলির গঠন যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ফলে ১.১.৯৬ তারিখেই অনেক শিক্ষকের বেতন সীলড্ হয়ে যায় । পে-কমিশন কার্যকরী করা হয়েছে ১.১.৯৬ থেকে অথচ এই তারিখ থেকে ৩০.৯.৯৮ পর্যন্ত যারা অবসর নিয়েছেন তাদের পে-কমিশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে । পে-কমিশনের সুস্পষ্ট সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও

২১দিন অর্জিত ছুটি দেয়া হচ্ছে না ।

Stangnation Increment, Training Incentive এবং তৃতীয় CAS এর জটিলতা নিয়ে দফায় দফায় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা হয় । CAS-এর মাধ্যমে উচ্চতর স্কেলে বেতন ফিক্সেশনের সময় Stagnation Increament যুক্ত করার নির্দেশ জারী হয় এবং এটি চালু হয় ১.৪.২০০১ থেকে । দ্বিতীয়তঃ Training Incentive নিয়ে বক্তব্য ছিল যারা ট্রেনিং নিয়েছেন, তা যখনই হোক না কেন, এবং যারা ট্রেনিং-এর কারণে কোন বাড়তি সুযোগ পাননি তারা সকলেই Training Incentive পাবার অধিকারী। অর্থ দপ্তরর থেকে যে নির্দেশ জারী হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ১.১.৯৬ এর পরে যারা ট্রেনিং নিয়েছেন একমাত্র তারাই এই সুযোগ পাবেন এবং তাদের এক বছরের ট্রেনিং এর ডিগ্রী থাকতে হবে। গত বছর থেকে বি. এড. ট্রেনিং ছয় মাসের জন্য করে দিয়েছে । অর্থাৎ গত বছর থেকে ছয় মাসের কোর্সে যারা ট্রেনিং পাশ করছেন তারাও এটি পাচ্ছেন না ।

পরিবর্তিত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ । যেখানে আমরা দুর্বল, সেখানকার নেতৃত্ব বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসুন - শিক্ষক আন্দোলনের সুমহান ঐতিহ্যকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে । স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব আমরা কাঁধে তুলে নিয়েছি । পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইউনিট থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত সকল নেতৃত্বকে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুরোধ করছি ।

ঃ লেখকের পরিচিতি ঃ

প্রশান্ত দেব অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক । তিনি ছয়ের দশক থেকেই ত্রিপুরার শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন । বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ।

******

দুর্গম গিরি কান্তার মরু

— বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

আগস্ট শব্দের অর্থই হলো মহিমান্বিত । আজ শতাব্দির আরেকটি শ্রেষ্ঠ দিন । পরমকরুণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও শুভ আবির্ভাব তিথি । আজকের দিনেই ১২৫ বৎসর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঋষি অরবিন্দ; আর আজকের দিনেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সমাহিত হয়ে পরমাত্মায় বিলীন হন । ভারত আমার প্রিয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব । দিনের তাৎপর্য্যের অংশ হিসেবে ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন 'The 15th August is the day of the Assumption of the virgin Mary. It implies that the physical nature is raised to the devine nature, the virgin Mary refers to Nature; Jesus is the devine soul born in Man, he is the son of God as well as the son of Man.' আজকের দিনটিতেই এই ত্রিপুরার কোথাও কোথাও উঠবে কালো পতাকা, কোথাও বা জাতীয় সংগীত গেয়ে পতাকা উত্তোলনের সময় নরখাদক দেশদ্রোহী শুকুনের হাতে প্রাণ দেবেন প্রধান শিক্ষক কিম্বা দুর্ভাগা কোনও এক ভারতীয় নাগরিক । বেসরকারী দুর্ভাগা কোনও এক ভারতীয় নাগরিক । বেসরকারী অনেক বিদ্যালয়ে পতাকা অবশ্য কোনও দিনই উঠেনি । বিশেষতঃ মিশনারী বিদ্যালয়সমূহে স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র দিবসে পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত কোনও এক অজ্ঞাত কারণেই বন্ধ হয়ে আছে, কেই বা তার খবর রাখে । পিওন বা Contigent employee -র হাতে পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব দিয়ে বেকসুর নির্লজ্জ খালাস হয়ে ইতিমধ্যে স্যার স্যার বলে যার যার মজলিসে এসে লায়লা-মজনু মুড়ে আছেন তার হিসাব রাখেন !

কথাগুলো মনে পরেছে একটি ঘটনা থেকে । ছোটবেলায় এই ত্রিপুরাই একটি অফিসে ঘটনাবশতঃ আমি উপস্থিত ছিলাম ১৫ই আগস্টের উৎসবে । অতিথি হিসেবে নয় চকলেটের প্রার্থী হিসাবে । তখন বেলা ১১টা । সব অনুষ্ঠান সেরে অতিথিবৃন্দের কয়েকজনের সামনে একজন নির্দেশ দিলেন একজন কর্মচারীকে 'ঐ যা দু'ইউা হুইস্কি লইয়ায়' । Peon বলল 'দাদা আজকের দিনডা বাদ দিলে হয় না? একজন অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ সিভিলসার্ভেন্ট বললেন আজকা কি তোর বাপের ছাদ্দ' । সঙ্গে একজন জনসেবক বললেন 'ঐ তালুছোলা বাপ'- ঘটনাটা আমার এখনও মনে পীড়া দেয় । যিনি মহাত্মা তাকে আজও মনের দিক থেকে এক

শ্রেণীর লোক ভালবাসতে পারেননি । এটা অত্যন্ত দুখঃজনক ।

সংখ্যায় নগণ্য হলেও এ ধরণের লোকের দুর্গন্ধ স্বপ্নের ভারতের আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই । মতের অমিল গ্রহণীয়, কিন্তু মনের অমিল বর্জনীয় বলেই আমার মনের হয় ।

একের পর এক আঘাত, পরাঘাত হটকারিতা পায়ে পায়ে ছিল এই ভারতমাতার। তথাপি গোটা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর সারিতে আমার এই প্রিয় দেশ নিখিল বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তার অধ্যাত্মবাদ-আগামী পৃথিবীর পথদ্রষ্টা । আজ অত্যন্ত আনন্দের দিনেও একশ্রেণীর নাগরিকের কথা মনে করলে লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নত হয়ে আসে । এই দলে সবধরণের সেবক-ই আছেন ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে, শহরে, অফিসে বন্দরে মানবিক জীবনেব অবক্ষয় শঙ্কা আর প্রার্থনার দাবি জানাই জনতার আদালতে । 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে.....বাঁচিবারে চাই' । এই ভারতেরই অনেক জায়গায় আজ ঘুষের বদলে চাকরির খবর শোনা যায়, ঘোড়া কেনা বেচা হয়, চাপটে ভোটবাক্স ভরে যায়, নরখাদকের বেক্‌সুব খালাস হয় পয়সার বিনিময়ে অথবা টেলিফোনে । আমরা এই দেশেরই অনেক জায়গায় আজকের দিনেও অনাহারে মৃত্যু হবে কারু না কারুর । শিক্ষার মর্যাদা নেই । গুণীর প্রশংসা আছে তাও রাজনৈতিক অনুমোদন সাপেক্ষ । সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মচাবীর পোড়া কপালে লাথি । স্বাধীনতা সংগ্রামীর শিক্ষিত সন্তান পথে পথে ঘুরেন জাগা-জমি গুরু ছাগল বিক্রি করে স্বাধীনতা সংগ্রামীর চিকিৎসা ব্যবস্থা হয় Brilient ছাত্রদের চাকরির জন্যে ঘুরতে হয় রাজ্যের বাইরে, কেউ বা চলে যায় দেশের বাইরে সখে সখে- 'অমৃত' ফেলে 'মৃতের' সন্ধানে ।

এই আর্থসামাজিক এবং আত্মিক অবক্ষয়ের মূল কারণ 'The Greed of power and power of politics. অর্থাৎ যেমন করেই হোক একটা চেয়ার দখল করা চাই । পরবর্তী পদক্ষেপ যেমনিভাবেই হোক সেটা অনুপযুক্ত হলেও রক্ষা করা চাই আর তৃতীয় পদক্ষেপ - 'আমারই' কাউকে এ চেয়ারটা হস্তান্তরিত করা চাই তাও আবার নিজে যখন ব্যর্থ হব তখন । যোগ্যতমের উৎকর্যনের প্রয়োজন নেই । সুবিধা বুঝে Certificate মূলে সবচেয়ে উচ্চ আসনে বসতে পারে-আপনাকে মানাক আর নেই মানাক তাতে কি ? কেউ প্রতিবাদ করবে না।

অসদ উপায়ে ক্ষমতার লোভ প্রসঙ্গে গয়া কংগ্রেস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন- "The truth is that love of power is a formidable factor to be reckoned with and those who secure that power by violence will retain power by violence.

The use of power degenerator those who use it and it is not easy for them, having seized the power to surrender it. And they findit easier to carry on the work of their predecessions, retaining power in their own hands. Non violence does not carry with it that degeneration which inheritent in the use of violence তিনি আরও বলেছেন 'The dignity of Man requires obedience to a higher law....to the strength of the spirit'-.

তৎকালীন সময়ে যিনি ফ্রান্স এ কাপড় পাঠাতেন ধোয়া ও ইস্ত্রির জন্য, যার মাসিক হয় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) নূন্যতম, সেই চিত্তরঞ্জন 'সাধের বৃন্দাবন' (বাড়ির নাম) ছেড়ে সর্বত্যাগী হয়ে বুক ফুলিয়ে সারা পৃথিবীর লোককে বলেছেন, 'দেশই আমার ধর্ম বলিলে আমি আমার ঐ দেশ, দেশ বলিতে আমি আমার ভগবানকে দেখিতে পাই' । নিঃসন্দেহে বলা যায় নিত্যানন্দ চরণ আশ্রয়ই বিলাসী চিত্তরঞ্জনকে এমনই ত্যাগী হয়ে চিরস্মরণীয় হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছিল । আর আজকের অনেক জনসেবকরা প্রতিপত্তি বাড়িয়েই চলছেন । দেশ সেবার নাম করে ঠকবাজ আর চাটকদাড়ি করে যাদুকরের মতো যাদু দেখিয়ে হাততালি পাচ্ছেন জনগণের ।

বৈপ্লবিক চেতনায় সিদ্ধিলাভের পথে প্রথম শর্ত হতে হবে জনগণের নিষ্কাম সেবা, তারপর যোগসাধনা (আশা করি এর কদর্য করবেন না) তারপর সাধু-সঙ্গ সান্নিধ্য । আমার মনে হয় এই পথে চললেই একটি গ্রাম তথা শহর তথা রাজ্য তথা দেশের সেবক বা একজন কর্মচারী তার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে । তাদের মানসিকতা হতে হবে বৈপ্লবিক চেতনাসমৃদ্ধ । আজ আমাদের দেশে দিশেহারা যুবকদের এই বৈপ্লবিক চেতনা সমৃদ্ধ । আজ আমাদের দেশে দিশেহারা যুবকদের এই বৈপ্লবিক চেতনা আসা অত্যন্ত প্রয়োজন । এই চেতনার দুটি পর্যায় আছে 1. Scepticism 2. Reconstruction. অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয় পৃথিবীব্যাপী গত ৫০০ বৎসর আগে এই চেতনার উৎস যিনি সকলকে একটি পাদপ্রদীপের তলায় আনতে চেয়েছিলেন সেই চৈতন্য মহাপ্রভূকেই ভুলে গেছে ভারতবাসী । সেইজন্য সমস্ত স্তরের কর্মচারী তথা নেতৃবর্গের বেশীর ভাগই Scepticism stage এ বসে পরিকল্পনা করেন, বাজেট করেন আর এতেই নির্ধারিত হয় শতকোটি ভারতবাসীর ভাগ্য । এটাই কি যুদ্ধের ভারত, এটাই কি মহাপ্রভুর ভারত, এটাই কি রবীন্দ্রনাথের ভারত, এটাই কি দয়ানন্দ সরস্বতীর ভারত এটাই কি মহাত্মা গান্ধী আর নেহেরুজীর ভারত ! এটাই কি সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের ভারত ? হে মহাত্মাগণ আজ তোমাদের বড় প্রয়োজন ছিল । 'তোমারি স্নেহে পালিত গেহে'-রং নাবালিকার আজ সুবর্ণ

জয়ন্তী উৎসব। এই উৎসবের অংশীদার আমিও 'আমি' এই গর্বিত ভারতের সন্তান আমি।

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'The foregin policy of the British Government is son utterly bad and hopeful that I want my country to have nothing to do with such a Govt.' মেদিনীপুরে মহিলাদের উপর অত্যাচার আর জালিয়ানওয়ালাবাগকে ভারতবাসীর প্রতিটি নাগরিক মনে রাখা উচিত। সময় বদলে গেছে। এখন সমস্ত দেশের বড় মানুষরাই বলেন 'We are following the path of Gandhi' তাহলে অবশ্য সমস্যা অনেকটা সরল হয়ে আসবে।

ভারতে স্মাট রোগে আক্রান্ত জাহাজ ভর্তি গম সরবরাহের দরুণ আমেরিকার বিরুদ্ধে সেদিন Neheru-parliament- এ ঝড় তুলেছিলেন। কমরেড এ কে গোপালন সফল হয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতের এই ত্রিপুরায় রেশনশপে এখনও যে চাউল সরবরাহ হয় কোনও জনপ্রতিনিধি আছেন যিনি তার প্রতিকার করতে পারেন? এই ত্রিপুরায় হরিয়ানা দিল্লীর বাসমতির ক্ষুদের বাজার এখন রমরমা কারণ ক্ষুদ ওখানে কেউ কেনেন না। কোথায় সেই পাইজাম আর নাজেরশাইল ? শ্রীমন মহাপ্রভু সংকীর্তনের মাধ্যমে সমগ্র ভারতবাসীকে একটি জাতি হিসাবে দেখেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও একটি জাতির কথাই বলেছিলেন, 'মানুষ'। সুভাষচন্দ্রও একজাতি একপ্রাণ একতার কথা বলেছেন, পৃথিবীর মনীষীগণ যে কোন দেশের জন্য যে চিরকল্যাণময়। তাদের সব কিছুরই মূলধারা 'ভারত, আমার ভারতবর্ষ'। আবার স্বামীজীর কথাই মনে হয়, 'In India religious life forms the centre, the key note of the whole music of National life'- অর্থাৎ ভারতবর্ষে ধর্মজীবনই জাতীয় জীবনপ্রভা সংগীতের প্রধান সুর। তবে হ্যাঁ আজকাল ধর্ম শব্দটাতে অনেকেরই এলার্জি আছে। যাদের আছে তাদেরকে বলব আপনারা ধর্ম অর্থে এখানে অধ্যাত্ম অনুভূতি বা সেই 'চেতনা'কেই ধরে নিতে পারেন। মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র কবিগুরুকে লিখেছিলেন "যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তাহা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র। আমরা চাই এক নূতন সমাজ ও এক রাষ্ট্র যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলো ... । আমরা ব্যবসা করি, নেতৃত্ব দেই, স্কুলে পড়াই ওকালতি করি গবেষণা করি" উপরের শেষ লাইনটির চারটি শব্দের সঙ্গে আমাদের একটু বরাবর মিলিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

১৯৫০-৫১ সালে ভারতে হেক্টর প্রতি ধান উৎপন্ন হত ৬৬৮ কেজি। আজ ২০০০

কেজি। মিলিয়ে দেখুন জাপানের সঙ্গে। বর্তমানে জাপানে হেক্টর প্রতি ধান হয় ৬৫০০ কেজি আর চীনে ৫৫০০ কেজি। কেন ? প্রতি বৎসর কতজন ডক্টরেট পান কৃষি খাতে !

রাস্তায়, মহলে, হাটে-বাজারে, গ্রামে, শহরে আজ আমরা সবার একটি সুস্পষ্ট পরিচিতির জন্য উৎগ্রীব-মানুষটা কোন দলের ? সে যে প্রথমতঃ একজন মানুষ, দ্বিতীয়তঃ কারো না কারো সন্তান বা ভাই বা বোন, তৃতীয়তঃ সে একজন ভারতীয় নাগরিক, চতুর্থতঃ সে একজন সরকারী কর্মচারী/সহপাঠী/গ্রামবাসী এই পূর্ববর্তী ধাপগুলো সবাই ভুলে যায়। আর সেখানেই বিদ্বেষাপন্ন মনোভাব জন্ম নেয়।

ভারতবর্ষের গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখতে আজ সমস্ত শ্রমিক সংগঠন ও কর্মচারী সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। সমস্ত সংগঠনই কেবলমাত্র দাবী দাওয়া, একে অপরের দোষারোপ আর অধিকার রক্ষায় ব্যস্ত। কর্তব্য পালনের নামে টা টা। বেশী'র ভাগ সংগঠনের নেতারাই হেড কোয়ার্টার-এ বসে সুযোগের পর সুযোগ নেন, বৎসরের পর বৎসর দাদাগিরি করেন বা পিতোস হয়ে বসে থাকেন জীবনের শেষে যদি একবার মন্ত্রী হতে পারেন তার প্রতিক্ষায়। এরজন্য যে কোন ধরণের কুপরামর্শ কু-প্রস্তাব যে কোনও গালি দিতে পারেন। এ সবই তিনি করেন তার দুর্বল চরিত্রের প্রতিরক্ষার কবচ হিসেবে, মানুষ হিসেবে নয়।

আজ সমস্ত কর্মচারী কুলকে সেবার প্রতি ব্রতী হয়ে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার পরিবেশ করে দিতে হবে তাদেরকে Extension work-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে - দুটি বিষয় ১) দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনা ২) জীবিকা শুধু জীবিকা নয় একটি সামজিক কর্তব্য। শিক্ষার বাহন হিসাবে থাকবে ভারতীয় চেতনা। তা না হলে বেতন গুণে দিন কাটানোই সার হবে। (কোনও রাজনৈতিক দল, কোনও সংগঠন কোনও ব্যক্তি, কোনও উপজাতি, জাতি, শ্রেণী, বা কোনও 'ইজম'ই ভারত আমরা ভারতবর্ষ' এই Concept-এর উপরে স্থান নিতে পারে না কোনও মতেই তা অখণ্ড এই 'দেশ' ভারতের চাইতে বড় হতে পারে না।) গুণীর সমাদর, যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতার সঠিক মূল্যায়ন না থাকলে অবশ্যই Professional Ethics. আর সেবার মনোবৃত্তি দুটোর একটা থাকবে সিকেতে ঝুলে আরেকটা থাকবে-চুলোয়। তখন নুন দিয়ে সাঁচিপান সাজাবে আর ডালনায় যাবে চুন।

যে কর্তব্যনিষ্ঠা আর সেবা এবং কর্মদক্ষতার পথিকৃত আর্যাবর্ত সেই নিষ্ঠা, সেবা, দক্ষতা এবং ত্যাগের মনোভাবই "জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন" লওয়ার পথ মসৃণ করবে। এটাকে আমরা এই হিসাবে যদি গ্রহণ করি তবেই আমরা সবার মুখে তুলে দিতে পারব

দু'মুঠো ভাত আর স্বতঃস্ফূর্ত হাসি।

পাহাড়ী এই ত্রিপুরার লোকরা পবিচিতি হতেন 'আদিবাসী' হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে। জাতি থেকে উপজাতি হলেন রাজনৈতিক ডামাডোলে। এইসব আইন প্রণেতাগণও প্রকৃত বৃহৎ অর্থে দেশপ্রেমী ছিলেন কিনা আমার সন্দেহ। প্রকৃত শিক্ষার সমস্ত স্তরে স্তরে যোগ্যতার ধাপগুলো পার হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত সমগ্র অনগ্রসর মানুষের শ্রেণীকে। অনগ্রসরতা নির্ধারণের মাপকাঠি বর্তমানে কেবলমাত্র অর্থনীতিই হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। যদি যোগ্যতা নির্ধারক কমিটি আত্মিক মানসিক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হন - তখন সবার মাঝে যোগ্যতমের যে উৎকর্ষন হবে, এরাই হবে ভারতেব গৌরবান্বিত সন্তান। বৈষম্য প্রসঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজা কুমিল্লায় বলেছিলেন ''যাহাদিগের ভাগ্য আমরা নিজেব ভাগ্যের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত, হিন্দুই হউক আর সুমলমানই হউক আমি তাহাদিগকে এই বুঝাইয়া দিতে চাই যে, বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে অথবা বর্ণে বর্ণে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্যেব স্থান নাই প্রতি সম্প্রদায় একই আদর্শ লক্ষ্য এবং পবিণতিব সুনিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত আমি চাই হৃদয়ের অন্তঃস্থলের অনুভূতি দ্বারা প্রত্যেকে এইটুকু উপলিব্ধ করুক যে ধর্ম কেবলমাত্র পন্থা বিশেষ-যাহার অনুরণেই একমাত্র সার্বজনীন গন্তব্য গৃহে আমবা বিশ্বপিতার পদপ্রান্তে উপনীত হতে পারি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যিনি 'ফেজ' ব্যবহাব কবেন তিনি 'ফেজ'ই এবং যিনি পাগরী ব্যবহার কবেন তিনি পাগ্রীতে অনুরক্ত থাকুন। কিন্তু আমি চাই প্রতি মানবের প্রাণ এই অনুভূতিতেই স্পন্দনমান হউক যে দৃশ্যমান বৈযম্য কেবলমাত্র বহিবাববণেই পর্যবসিত, এই বৈষম্যের অন্তবালে মানবাত্মা সাম্য মৈত্রীব অনুপ্রেবণায় পরস্পরের নিকট পূজা এবং প্রণয়ের দাবী রাখে'।

তাহলে কাদের বিরুদ্ধে 'Tripura for Tribes' পোষ্টার বৃন্দাবনঘাটের পানের টং-এ, আর চেবরীতে লাগানো হয়। কেন ? আমরা 'Mother India'- এর চোখে জল নাই? না বুকে কান্না নেই যে বিদেশের হাতে ঠেলে দেবে নিঃষ্পাপ আবাল-বৃদ্ধা-বণিতা সরল সহজ সদাশয়ী উপজাতি ভাই বোনদের আর কাদের গর্জনে ? শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের ধিক্কার এলাকা চিহ্নিতকরণ আর গুলীর আওয়াজে সফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা অখণ্ড ভারতে নাই। উন্নয়নের জন্য চাই শান্তির নিরাপত্তা বাতাবরণ এবং সেই মহারাজার নির্দেশ। আজ থেকে ঠিক ৫০ বৎসর আগে ১৫ই আগষ্টে ঋষি অরবিন্দ লিখেছেন Message- 'India today is free but she has not achieved unity but whatever means, in whatever way the division must go, unity must and will be achieved, for it is necessary for the greatness of Indias future.'

সেই একতাবোধ আজও আমাদের মধ্যে আসেনি । কারণ এই একতাবোধ, সম্মানের অযোগ্য ব্যক্তিকেও সম্মান করা (অমানি না মান দেন) সৌভ্রাতৃত্ববোধ, হৃদয়গ্রন্থী ভালবাসা, সংবেদনশীলতা (Reciprocative sensitivity), সদালাপ, সৎচিন্তা, পরোপকারবৃত্তি, আত্মত্যাগ, বিশ্বাস, সেবা এই সব কিছুরই আধার গ্রন্থির মালিক যিনি সেই বিশ্বপিতাকে আমরা ভুলে গেছি । মনীষীদের ছবিগুলো সরিয়ে ফেলে আপন ছবি টাঙিয়েছি, মহাভারত, রামায়ণকে শালু কাপড়ে বেঁধে কোথাও সিংহাসনে, কোথাও বাথরুমের store sopac রেখে দিয়েছি, কিসের বিনিময়ে? তাস, জুয়া, এণ্ডিং, মদ, পরনিন্দা, পরচর্চা, কুশিক্ষা, অজ্ঞানতা, অপপ্রচার, দেশদ্রোহিতা, প্রলোভন, দুর্নিবার ক্ষমতার লোভ, আকণ্ঠ অর্থের লালসা, ঠকবাজি, পদের লোভ, হিংসা, দ্বেষ, ভায়োলেন্স, মেলো ড্রোমা আর সস্তা জনপ্রিয়তার বিনিময়ে । আজকের দিনের জন্য ভুলে যাই, ভুলে গিয়ে সবাই সমস্বরে বলি 'বন্দে মাতরণ' পৃথিবীর জন্য মানুষ হিসেবে আমাদের একটাই পরিচয় 'আমরা ভারতবাসী, আমরা ভারতবাসী'। আসুন মা বোনেরা সবাই এগিয়ে আজ সন্ধ্যায় একটি করে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালাই । এটাই হবে বিশ্বপিতার কাছে সমগ্র বিশ্বের চিরশান্তির 'মঙ্গলদীপ' ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

লেখক বিজয় কৃষ্ণ দত্ত ১৯৬০ সালে কুমিল্লার শিলমুরী অধুনা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার নাম ছিল প্রয়াত ও প্রয়াতা কালীমোহন দত্ত ও কুসুমলতা দত্ত, স্থানীয় নেতাজী বিদ্যানিকেতন থেকে প্রথম বিভাগে পাশ করার পর কেরালার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগ্রি-বি এস সি পাশ করে ভারত সরকারের রাবার বোর্ড ডেভলাপমেন্ট অফিসাররূপে কর্মরত । সঙ্গীত ও সাহিত্যে অনুরাগী ।

******

সাহিত্য সমালোচক শরৎচন্দ্র

— মঞ্জরী চৌধুরী

১৩১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী পত্রিকায় লেখক পরিচয়হীন একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনার স্রষ্টারূপে রসগ্রাহী সাহিত্য বোদ্ধাগণ রবীন্দ্রনাথকেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করলেন। একই সঙ্গে তিনি 'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে ডেকে বললেন- ''যেমন করে পারো, তাঁকে আনাও সৌরীন, তাঁকে ধরে এনে লেখাও, বাংলাদেশে এঁর জোড়া লেখক পাবে না।''[১]

পরপর তিনটি সংখ্যায় গল্পটি শেষ হল। শেষ কিস্তিতে জানা গেল লেখকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যিনি 'ভাবতী' পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশের বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। সেই গল্প 'বড়দিদি'র প্রথম পাঠে শরৎচন্দ্র এর নাম রেখেছিলেন 'শিশু', যার লক্ষ্য নিঃসন্দেহে সুরেন্দ্রনাথ, কিন্তু পরে সে নামকরণ সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে স্থানবদল করে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হলেও 'বড়দিদি' লেখা হয়েছিল আরো অনেক আগে, আর পত্রিকায় 'বড়দিদি' প্রকাশের সময় তার লেখক এই ভারতবর্ষেই ছিলেন না।

শরৎসাহিত্যের আগ্রহী পাঠককুলের কাছে এসব তথ্য নতুন নয়। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিক হলেও তা পূর্বাপর প্রস্তুতিবিহীন ছিল না। এই প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাস অনেকটাই আমাদের অজানা থেকে যাবার কারণেই পাঠক সমালোচকদের একটা বড় অংশ শরৎচন্দ্রকে স্বয়ম্ভু লেখক বলে প্রচার করতে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে কোনো লেখকই স্বয়ম্ভু হতে পারেন না। কবিরা এককালে 'গজদন্ত মিনারের' বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু কথাসাহিত্য তার জন্মলগ্ন থেকেই গভীরভাবে মৃত্তিকা সংলগ্ন। তার স্রষ্টাকেও তাই চলিষ্ণু জগৎ ও জীবনের অংশীদার হয়েই অগ্রসর হতে হয়। পূর্বসুরীদের অনুসরণে যত্নবান হওয়া সেই অংশীদারিত্বের এক আবশ্যিক শর্ত।

বঙ্কিম, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের তৃতীয় প্রবল পুরুষ শরৎচন্দ্র, তরুণ বয়সে তো বটেই, এমন কি পরিণত বয়সেও তাঁর দুই অতিবিখ্যাত পূর্বসূরীর উত্তরাধিকার নিজের সৃষ্টির মধ্যে বহন করেছেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মনোভূমি গঠনের ইতিহাস কৌতুহলবহ তিনি নিজেই জানিয়েছেন, ১৪ বছর ধরে রোজ ১৪ ঘন্টা পড়াশোনা করেছেন। সে

পাঠ্যতালিকাও বিচিত্র, বিবিধ ক্ষেত্রে প্রসারিত ।

সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশের মাত্র দশ বছরের মধ্যেই শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব ঘরানায় হয়ে উঠলেন 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' । আবার শুধুমাত্র সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে নিরত না থেকে বেশ কিছু মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যও শরৎচন্দ্র রচনা করেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার তুলনায় সে সবের পরিমাণগত এবং গুণগত মান আমাদের উৎসাহিত করে না। সমালোচনা এবং প্রবন্ধ নিবন্ধ জাতীয় রচনায় শরৎচন্দ্র তেমন আগ্রহী ছিলেন না । নির্দিষ্টভাবে সাহিত্য সমালোচনামূলক কোন লেখাও তিনি লেখেননি । বিভিন্ন সভায় সভাপতিরূপে প্রদত্ত তাঁর অভিভাষণগুলি এবং তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আহুত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ থেকেই বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নানাবিধ চিন্তা চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় । ক্রমশঃ তিনি বিবিধ সাহিত্যিক বিতর্কে জড়িয়ে পরেন । এক সময় রবীন্দ্র বিরোধী আধুনিক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি । সেই সঙ্গেও তাঁর সাহিত্যভাবনা এবং সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত ধ্যানধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রবন্ধে । সাহিত্য সমালোচনা বলতে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থন এবং চরিত্রচিত্রণ নিয়ে শরৎচন্দ্র কিছু প্রশ্ন তুলেছেন । নিজস্ব রীতিতে ব্যাখ্যা দিয়ে সে সব প্রশ্নের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন । সেই সব লেখালেখির ভিত্তিতে 'সাহিত্যসমালোচক শরৎচন্দ্র'কে বুঝে নেবার কিছুটা প্রচেষ্টা এই নিবন্ধে করা হবে ।

মূল আলোচনায় যাবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে এবং তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে যেসব ধারণা শরৎচন্দ্রের মনে দৃঢ়বদ্ধ ছিল, সেসব একটু নেড়ে চেড়ে দেখা যেতে পারে । বঙ্কিমের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল ছাত্র জীবনেই । সেই বিমুগ্ধ পাঠকের স্বীকারোক্তি বহুবার দিয়েছেন তিনি —

"উপন্যাস সাহিত্যে এরপরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না । পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল । বোধ হয় ও আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি এমন নয় ।"[১] অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ শরৎচন্দ্রের প্রথমদিকের বেশ কয়েকটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর প্রভাবের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন । 'শরৎসাহিত্য সমগ্র'র ভূমিকায় সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বার বার পড়ে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরসে জারিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের রচনাতেও তাই সেই রসই নিজস্ব পাক খেয়ে ক্ষরিত হতে থাকে । সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যগুরু তাতে সন্দেহ নেই ।"

আবার পরবর্তী সময়ে এই শরৎচন্দ্রই লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাব-ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধাবোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙলা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্তব্যবোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্তিত সাহিত্য সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, ত সে তাঁহার মর্যাদা হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ, চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আজ আমরা ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকিত দুঃখ করিবারও কিছু নাই"।[৩]

এধরণেরই আরেকটি মন্তব্য, সেটিও তুলে আনা যেতে পারে - "বঙ্কিম চন্দ্র ও তাঁর চারিদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী একদিন বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু মানুষ চিরজীবী নয়, তাঁদের কাজ শেষ করে তাঁরা স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি, প্রায় সকল বিষয়েই"।[৪]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে স্পষ্টই জানা যায় শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনার 'অন্ধ অনুকরণ' (বঙ্কিমের) থেকে খুব তাড়াতাড়িই সরে আসতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্র একথাও জানাতে ভুলেননি যে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সীমাবদ্ধতার দিকগুলিকেও তিনি অতিক্রম করে এসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অবশ্য বিষয়টা অনেক বেশি জটিল ছিল। বঙ্কিম-সাহিত্য-রসে আপ্লুত শরৎচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায়-এ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রকাশিত হতে দেখলেন, তাঁর তখনকার প্রতিক্রিয়াকে শরৎচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন এভাবে-"ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নতুন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সেদিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না। এতদিনে কেবল সাহিত্যে নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম"।[৫]

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আকস্মিক আগমন এবং দীর্ঘ সুফলপ্রসূ সাহিত্য সাধনার পর জীবন রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ, এই দুই-ই ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই দুই মহৎ সাহিত্যিকের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ চিরকালীন। সেই বিস্তৃত জটিলতায় না গিয়েও বলা যায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ,

বিরোধে বিমুগ্ধতায় বারবার ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে, পারস্পরিক মূল্যায়ন করেছেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অনেক সময়ই শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যনীতির প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু এতে তাঁর রবীন্দ্রভক্তিতে কিছুমাত্র ন্যূনতা আসেনি। অনেককাল পরেও তিনি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন —

"আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই, আমার চাইতে কেউ বেশি মক্সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশি বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস, তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এতো লোক আমার লেখা পড়ে ভালো বলে, সে তাঁরি জন্যে।"[৬] শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদির পরিচয় নিলেও দেখা যায় তাঁর ভাবনার ভুবন ভরে ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গান। বঙ্কিমচন্দ্রের চাইতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক আত্মীয়তা ছিলো আরও নিবিড়।

এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে এবার সাহিত্য সমালোচক শরৎচন্দ্রকে আনা যেতে পারে। বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রতি একদার মুগ্ধতাকে ছিন্ন করে পরবর্তী সময়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের গুণাগুণ বিচার করতে গিয়ে, নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমের দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করেছেন। প্রয়োজনে লেখককে কঠোর ভাষায় বিদ্ধ করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। কখনো কাহিনী গঠনে, কখনো বা চরিত্র নির্মাণে, আবার কখনো কাহিনীর পরিণতি সাধনে নানাবিধ ত্রুটির উল্লেখ করে সমালোচক শরৎচন্দ্র সাহিত্য সম্রাটকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এইসব মতামত অনুসরণ করলে এমন ধারণাই জন্মে যে, সাহিত্য সমালোচক শরৎচন্দ্রের বিচারে সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিম কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাশ নম্বর পান নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র রোহিনীর বিন্যাসে লেখক যথাযথ আত্মস্থতার পরিচয় দিতে পারেন নি, এই অভিযোগ শরৎচন্দ্র একাধিকবার বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে তীব্রভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বঙ্কিম সাহিত্যের 'অন্ধ' অনুরাগী পাঠক কিশোর শরৎচন্দ্র যে বছর কলেজে ভর্ত্তি হলেন, সেই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হলো বঙ্কিমচন্দ্রের। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বোধ বুদ্ধিতেও পরিবর্তন আসতে লাগলো। কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের মনে হলো, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ রোহিণীকে গুলি করে মারা খুবই অসঙ্গত ঘটনা। আবার বিষবৃক্ষে "নিরীহ ভালমানুষ কুন্দকে বিবাহ করার পর তার প্রতি 'চকিতে নির্বিকার' হওয়া নগেন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্ত অমানুষের কাজ।"[৮]

বহুবৎসর পর, ১৩৩১ সালের ১০ আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে, এই প্রসঙ্গটি আবার তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন 'সাহিত্য ও নীতি' নাম দিয়ে। ''ছেলেবেলায় কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়াছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী কিছু তার রইল না। ... আমার আজও যেন মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে। রোহিণীর মৃত্যুর জন্য দুঃখ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ, অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে, হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির Convention সমস্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই। কিন্তু মরল সে, আর তার সঙ্গে সত্য, সুন্দর art। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানিতে তার মরা চলে না।'' এ প্রসঙ্গে আরো বহু কথাই তিনি নানা সময় বলেছেন, প্রয়োজনে তা নিয়ে আসা যাবে।

বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস সম্পর্কেও শরৎচন্দ্রের কিছু অভিযোগ রয়েছে। 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' নামীয় প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, 'ধরা যাক তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' বই, শৈবলিনী সম্বন্ধে লেখা আছে -- ''এমনি করিয়া প্রেম জন্মিল'। এই ''এমনিটা হইতেছে — নক্ষত্র দেখা, নৌকার পাল গণনা করা, মালা গাঁথিয়া গাভীর শৃঙ্গে পরাইয়া দেওয়া, আরও দুই একটা কি আছে, আমার ঠিক মনে নাই। কিন্তু তাহার পরবর্তী ঘটনা অতিশয় জটিল। গঙ্গায় ডুবিতে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সাহেবের নৌকায় চড়িয়া পরপুরুষ কামনা করিয়া, স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়া অবধি, সে সমস্তই নির্ভর করিয়াছে শৈবলিনীর বাল্যকালে 'এমনি করিয়া' যে প্রেম জন্মাইয়াছিল তাহারই উপর। তখনকার দিনে পাঠকেরা লোক ভাল ছিল এবং বোধ করি তখনকার দিনের সাহিত্যের শৈশবে, ইহার অধিক গ্রন্থকারের কাছে তাহারা চাহে নাই এবং এই দুষ্কৃতির জন্য শেষকালে শৈবলিনীর যে সকল শাস্তি ভোগ হইয়াছিল, তাহাতেই তাহারা খুশি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখনকার দিনের পাঠকেরা অত্যন্ত তার্কিক, তাহারা বিচার করিয়া দেখিতে চায় শৈবলিনী লোক কিরূপ ছিল, তাহার কতখানি প্রেম জন্মিয়াছিল, জন্মানো সম্ভবপর কিনা এবং এতবড় একটা অন্যায় করিবার পক্ষে সেই প্রেমের শক্তি যথেষ্ট কিনা। প্রতাপ অতবড় একটা কাজ করিল, কিন্তু এখনকার দিনের পাঠক হয়ত অবলীলাক্রমে বলিয়া বসিবে-কি এমন সে করিয়াছে? শৈবলিনী পরস্ত্রী, গুরুপত্নী, - নিজের ঘরে পাইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে নাই, এমন অনেকেই করে না,

এবং করিলে গভীর অন্যায় করা হয় । আর তার যুদ্ধের অজুহাতে আত্মহত্যা ? তাহাতে পৌরুষ থাকিতে পারে, কিন্তু কাজ ভাল নয় । সংসারের উপরে নিজের স্ত্রীর উপরে এই যে একটা অবিচার করা হইয়াছে, আমরা তাহা পছন্দ করি না । আর তাহার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত? তা আত্মহত্যায় আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের ? অথচ, সেকালে আমি লোককে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিতে শুনিয়াছি, "তুমি প্রতাপের ন্যায় আদর্শ পুরুষ হও ।" মানুষের মতিগতি কি বদলাইয়াই গেছে।"[১১]

৫৫তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম শরৎ সমিতি প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র যে অভিভাষন পাঠ করেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছেন — "বঙ্কিমের ন্যায় অতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা, যিনি তখনকার দিনেও বাংলা ভাষার নবরূপ, নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-বঙ্গসাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দুটি যিনি বাঙ্গালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য পরিণত বয়সে কথা সাহিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে আবার 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' লিখতে গেলেন? কোন্ প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল ?"[১২]

'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কে কলেজের ছাত্র তরুণ শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে । সাহিত্য সমালোচক শরৎচন্দ্র বঙ্কিম সাহিত্য সম্পর্কে যেসব মতামত পোষণ করেছেন প্রকাশ করেছেন, সেগুলি নিয়ে এবার কিছুটা নাড়াচাড়া করা যেতে পারে ।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র যে বলেছেন, 'এখনকার দিনের পাঠকেরা অত্যন্ত তার্কিক' । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা আজকের দিনে আরো বেশি মাত্রায় সত্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হয় । বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে সব মন্তব্য করেছেন, আজকের পাঠক মুক্ত মন যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তাদের প্রত্যেকটিকে বিচার করে দেখে, নিছক গুরুবাক্য বলে শিরোধার্য করে নেয় না । 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ঘটনাক্রম বিচারে শরৎচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র বাক্যবন্ধকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন—'এমনি করিয়া প্রেম জন্মিল' । বিবিধ যুক্তির চাপান উতোর বহুদিন ধরে চলে এসেছে এর পক্ষে বিপক্ষে । কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে কোথাও 'এমনি করিয়া প্রেম জন্মিল', বাক্যটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না । উপন্যাসটির উপক্রমণিকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'ডুবলি বা কে, উঠিল বা কে' । পরিচ্ছেদটির শুরু হয়েছে এইভাবে, "এইরূপে ভালবাসা জন্মিল, প্রণয় বলিতে হয় বল না বলিতে হয়, না বল । ষোল বৎসরের নায়ক-আট বৎসরের নায়িকা । বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না" । প্রেম এবং ভালবাসা, শব্দ দুটির অর্থ ও তাৎপর্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে । প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, ভালবাসা, এই শব্দগুলি কখনোই একটি অপরটির প্রতিশব্দরূপে গৃহীত হতে

পারে না । শরৎচন্দ্র এখানে প্রথমেই একটা বড় ভুল করে ফেলেছেন । প্রতাপ শৈবলিনী স্থির করেছিল এ জগতে তাদের মিলন হবে না , তাই তারা জলে ডুবে মরবে । কিন্তু 'প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিল না' এখানেই উভযের চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রথম ধরা পড়ে। শৈবলিনীর গৃহত্যাগের বিষয়টি শরৎচন্দ্র খুব লঘু করে দেখেছেন । তার স্বামী চন্দ্রশেখর বয়সে অনেক বড়, জ্ঞান তপস্বী, গৃহকর্মের সুবিধার জন্য বিয়ে করে ঘরে স্ত্রী এনেছেন। কিন্তু নবযৌবনা শৈবলিনীর দেহেমনে জাগ্রত জীবনতৃষ্ণা সম্পর্কে তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই ।এ সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন - 'আমি নিতান্ত আত্মসুখ পরায়ণ, সেইজন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল'—মধ্যযামিনীতে নিদ্রিত রূপসী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রশেখরের এই স্বগত চিন্তা একটি গভীর সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ।

প্রতাপের বিচ্ছেদ কাতরতা শৈবলিনী হয়তো সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারতো, যদি স্বামী তাকে আদরে-সোহাগে-ভালবাসায় প্রেমে যথার্থ জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতেন । এক বিশাল শূন্যতা নিয়ে শৈবলিনী দীর্ঘ আটবছব নিবানন্দ কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে স্বামীর ঘর করেছে। দিন রাতের প্রতিটি মুহূর্তে এই নিষ্ফল অস্তিত্বের সার্থকতা নিয়ে তার মনে নানা প্রশ্ন তোলপাড় করেছে । তারপর সহ্যের সমস্ত সীমা অতিক্রান্ত হলে শৈবলিনী স্বামীব ঘর ছেড়েছে । লরেন্স ফষ্টরেব সঙ্গে গেলে যে প্রতাপেব দেখা পাবে, আবাব আগের জীবন ফিরে পাবে, এই আশা শৈবলিনী কিসের ভিত্তিতে করেছিল তা পাঠকের কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য থেকে যায় । কিন্তু একথা নিশ্চিত যে লরেন্স ফষ্টর সে সময় সেখানে উপস্থিত না থাকলেও শৈবলিনীর স্বামী গৃহবাস আর সম্ভব ছিল না । ''মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না'', শৈবলিনীর এই গৃহত্যাগ তার জীবনতৃষ্ণারই এক রূপ, সে ভুল পথ ধরেছে, কিন্তু তার গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তকে কোনভাবেই লঘু বিচারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না ।শরৎচন্দ্র শৈবলিনী চরিত্রের অভ্যন্তরে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি ঠিকমতো নিক্ষেপ করতে পারেন নি বলেই মনে হয়।

প্রতাপ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নও অগভীরতা দোষে দুষ্ট । বাংলা সাহিত্যে এই অতিবিশিষ্ট চরিত্রটির বিশেষত্ব মহত্ত্ব বুঝবার কোনো চেষ্টাই শরৎচন্দ্র করেন নি একথা বোঝা যায় তাঁরই উক্তি থেকে, যেখানে তিনি প্রতাপের মহত্ত্ব দেখেছেন শুধু 'শৈবলিনী পরস্ত্রী, গুরুপত্নী, নিজের ঘরে পাইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে নাই'' তে । একই নিঃশ্বাসে আবার একথাও জানাতে ভুলেন নি যে, 'এমন অনেকেই করে না' । বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তির স্তর পার হয়ে আত্ম বিসর্জনের মুহূর্তে প্রতাপ চরিত্র যে সমুন্নত ট্রাজিক মহিমা অর্জন করেছে, একজন সহৃদয় পাঠকের কাছে তা এক বিরল প্রাপ্তি । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাঠক সমালোচক

শরৎচন্দ্র একে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন ।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিম মানবজীবন ও মানবভাগ্যের আর একদিক উন্মোচন করেছেন । সুখী দাম্পত্যজীবনে নগেন্দ্রনাথের কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি জন্মে । একসময় এমনও মনে হয় যে, কুন্দকে না পেলে নগেন্দ্রনাথ পাগল হয়ে যাবেন । এই অবস্থায় স্বামীগত প্রাণা সূর্যমুখী নিজে আগ্রহ করে বিধবা কুন্দর সঙ্গে স্বামী নগেন্দ্রনাথের বিয়ে দেন । ঘটনায় বেশ কিছু ওঠা পড়া থাকলেও এ পর্যন্ত মোটামুটি মসৃণভাবেই কাহিনী এগিয়েছে । কিন্তু এরপরই সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করলেন । কারণ "আমার স্বামী কুন্দর হইলেন, তাহা চক্ষে দেখিতে পারিব না" । যে নগেন্দ্রকে কুন্দ প্রাণাধিক ভালবাসে, যে ভালবাসা সে সযত্নে নিজের মনের গোপনে বহন করেছে, সেই ভালবাসার পাত্র আজ তার স্বামী, হৃদয় মনের অধীশ্বর ।" কিন্তু সেই রাতেই সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করে । সূর্যমুখীকে খুঁজে পাবার জন্য নগেন্দ্র সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন । যে কুন্দকে না পেলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন বলেছিলেন, তাঁর সেই সদ্যবিবাহিত পত্নী কুন্দনন্দিনী অনাদরে অবহেলায় অন্তঃপুরের এক প্রান্তে পড়ে রইল । কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রর এই ব্যবহার তরুণ সমালোচকের কাছে মনে হয়েছে 'অমানুষের মত' । কিন্তু পরিণত মন ও মনন নিয়ে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কার্যকারণ শৃঙ্খলা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মানব জীবনে নিয়তির দুর্লক্ষ্য অথচ অমোঘ প্রভাবের ছবি লেখক এখানে অসাধারণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন । তবে কোনো কোনো অংশে ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ আশানুরূপ গভীর না হওয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে ।

'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর স্রষ্টা কেন 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'সীতারাম' লিখতে গেলেন, এই প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের একার নয় । সাহিত্যবোদ্ধা বহু পাঠক এই প্রশ্ন করেছেন । রবীন্দ্রনাথও বলেছেন 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর তুলনায় 'আনন্দমঠ'-এর সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই । বঙ্কিম এখানে সাহিত্যিকের চাইতে বেশি মাত্রায় প্রচারক ও শিক্ষক ।

আখ্যায়িকা হিসাবে আনন্দমঠ যে খুব উচ্চশ্রেণীর শিল্পগৌরব সমন্বিত বস্তু তা বলা যায় না । বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বলেছেন, 'উহাতে আর্ট বড় কম' । উদ্দেশ্যমূলকতা 'আনন্দমঠ'-এর শিল্পগুণকে খর্ব করেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না । কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে 'আনন্দমঠ' -এর প্রকৃত গৌরব বাস্তব উপন্যাসরূপে নয় । প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন, 'আনন্দমঠ' আধুনিক বাঙলার জন্মদান করিয়াছে, আধুনিক বাঙালীর হৃদয় ও মনোবৃত্তি গঠন করিয়াছে । যে দেশাত্মবোধ আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর মানসসম্পত্তি, 'আনন্দমঠ' -এ বঙ্কিম তাহার প্রথম অঙ্কুর রোপন করিয়াছেন ।" আনন্দমঠের

পাত্রপাত্রীদের এক পা বাস্তবের মাটিতে, অন্য পা আদর্শের জগতে । কিন্তু তা সত্ত্বেও. নিবিড় পাঠে দেখা যায়, কোন চরিত্রই একেবারে অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য হয় নি । বাক্যে, ব্যবহারে, পারস্পরিক সম্পর্কে চরিত্রগুলির মধ্যে সুন্দর ঐক্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে । 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপন্যাস দুটিতে. ধর্মতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের বিশ্লেষণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বাস্তব চরিত্র চিত্রণকে তা নিষ্প্রভ করে দেয় নি । দুটি উপন্যাসেই চরিত্রের সূক্ষ্ম পরিবর্তন সংঘটনে এবং এর কারণ বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য নিপুণতা দেখিয়েছেন। 'সীতারাম' উপন্যাসে একটি স্বভাব-মহান চরিত্রের উপর পাপের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং চরম পরিণতির চিত্র রয়েছে । "সীতারাম চরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি, শেক্‌সপীয়রের উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডিগুলির মত 'সীতারাম' মানবমনের দুর্জ্ঞেয়তার, উহার রহস্যময় প্রকৃতির উপরে একটি উজ্জ্বল আলোক রেখাপাত করে"[১১], বিশিষ্ট সমালোচকের এই অভিমত, সাহিত্য সমালোচক শরৎচন্দ্রের সীমাবদ্ধতার দিকটি নজরে এনে দেয় ।

"বঙ্কিমচন্দ্র কেন পরিণত বয়সে 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম' লিখতে গেলেন ? কোন্ প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল ?" — শরৎচন্দ্রের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে লেখা হয়েছিল —"লেখার মধ্যে লেখকের যদি কোনও উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় এবং সেই কারণে যদি রসসৃষ্টি হতে সেই লেখাকে বরখাস্ত করতে হয়, তাহলে শরৎচন্দ্র এবং তস্য গুরু রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখাটা টেঁকে শুনি ? 'পল্লী সমাজ' লেখার মধ্যে শরৎবাবুর কোনই উদ্দেশ্য ছিল না ? 'দত্তা'র গূঢ় উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার । 'বামুনের মেয়ে' যদি উদ্দেশ্যমূলক না হয়, তাহলে উদ্দেশ্যমূলক আর কি হতে পারে জানি নে "।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বিশেষ করে রোহিণী চরিত্রের পরিণতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছেন । শরৎচন্দ্রের সেই বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে অনেক সমালোচক রোহিণী চরিত্র তথা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করেছেন । আবার রোহিণী প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলেছেন কিছু সমালোচক । বাংলা সাহিত্যের বহু আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে এটি অন্যতম ।

'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় শুরু হয়েছিল ১২৮২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে । একনাগাড়ে তিনমাস প্রকাশিত হওয়ার পর চৈত্রমাসের 'বঙ্গদর্শনে' যে কোনো কারণে 'কৃষ্ণকান্তের উইল, দেখা যায় নি । তারপর একবছর 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ বন্ধ ছিল। আবার ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়ে ধারাবাহিকভাবে

মাঘ মাস পর্যন্ত চলে সমাপ্ত হয়েছিল । শরৎচন্দ্রের মতোই কৃষ্ণকান্তের উইলের তৎকালীন পাঠকবর্গ রোহিণীর এমন অতর্কিত মৃত্যু মেনে নিতে পারেন নি । অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় রোহিণীর মৃত্যুদৃশ্য বর্ণিত হবাব পর থেকেই পাঠকদের অবিরত জিজ্ঞাসা 'রোহিণীকে মারিলেন কেন'? বিব্রত বঙ্কিম এর উত্তরে এমনও বলেছেন, 'আমার ঘাট হইয়াছে ।' মাঘসংখ্যা বঙ্গদর্শনে উপন্যাসেব সমাপ্তি ঘটলে এর নীচে বঙ্কিম লিখেছিলেন — 'কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যা সমূহের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধিত হই ।'' আজকের পাঠক প্রসাদ প্রত্যাশী লেখককুলের কাছে বঙ্কিমের এই ঘোষণাটি আশ্চর্যজনক মনে হবে । কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে সাহিত্যিক বঙ্কিম শিল্পী বঙ্কিমের মন মানসিকতার অনেকখানি পরিচয়ই এখানে পাওয়া যাবে ।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বঙ্কিম এই পাদটীকা বর্জন করেছিলেন। কাহিনীতে কিছু পরিবর্তনও এনেছিলেন । পরবর্তী সংস্করণে আবারও কাহিনী পরিমার্জিত হয়েছিল । বঙ্কিম সর্বাধিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন রোহিণী চরিত্রে। বঙ্গদর্শনের পাতায় পাঠক প্রথম যে রোহিণীকে দেখেছিলেন, তার সম্পর্কে 'পাপিষ্ঠা' বিশেষণ অবশ্যই প্রয়োগ করা যায় । হরলাল উইল চুরি করতে ব্রহ্মানন্দকে রাজী করাতে না পেরে বিমর্ষভাবে যখন ফিরে যেতে উদ্যত, তখন রোহিণী নিজে থেকেই এগিয়ে এসে এই কুকর্মের দায়িত্ব নেয় । শুধু তাই নয়, পারিশ্রমিকের এক হাজার টাকা সে অগ্রিম গ্রহণ করে এবং পরে উইল চুরি করে আনে । কিন্তু গ্রন্থের সর্বশেষ চতুর্থ সংস্করণে লেখক রোহিণীকে আমূল বদলে দিয়েছেন। সেখানে দেখা যায়, বালবিধবা রোহিণী উইল চুরি করতে সম্মত হয়েছে হরলাল তাকে বিয়ে করবে, শুধু এই আশায়। অসাধারণ কৌশলে বঙ্কিম রোহিনীর অর্থ পিপাসাকে জীবন পিপাসায় রূপান্তরিত করেছেন । 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস তথা রোহিণী প্রসঙ্গে কোনরকম আলোচনা বর্তমানে প্রচলিত, গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের ওপর ভিত্তি করেই করতে হবে ।

শরৎচন্দ্র এখানেই বড় রকমের ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছেন । তিনি বলেছেন ''রোহিণী পাপিষ্ঠা, যে পাপিষ্ঠার প্রতি আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, তাহারও প্রতি কিন্তু এতবড় অবিচার করিতে আমাদের হাত উঠে না ।''[১৪] অথচ পরিবর্তন পরিমার্জনের পথে রোহিণীর মনের ময়লা অনেকখানি ধুয়ে মুছে দিয়েছেন তার স্রষ্টা, এ বিষয়ে সচেতন না থাকলে উপন্যাসের আস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে । নতুন রোহিণীকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন বঙ্কিম পরম মমতায়, পরম যত্নে । তার প্রতি লেখকের বিরূপতার চিহ্নমাত্র নেই । ঘটনাচক্রে রোহিণী ক্রমশঃ পাপের পথে নেমে গেছে, রসাতলে যাত্রা করেছে । সেই কার্যকারণসূত্র

অতি সংক্ষিপ্ত হলেও অদৃশ্য নয়, যা শরৎচন্দ্রের চোখে পড়েনি ।

'গোবিন্দলালকে রোহিণী অকপটে এবং অকৃত্রিমভাবেই ভালবাসিয়া ছিল' — শরৎচন্দ্রের এই অভিমতও গ্রহণ করা যায় না । বিয়ের প্রলোভনে রোহিণীকে দিয়ে উইল চুরি করিয়ে হরলাল বিশ্রীভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করল । মনের গোপনের সুপ্ত বাসনাকে জাগিয়ে দিয়ে এভাবে তার মূলোচ্ছেদ, রোহিণীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে । রোহিণী তার ব্যর্থ জীবনের হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে ভেবেছে, "কোন দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল ? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী, মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী, তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী ? কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ — আমার কপাল শূন্য ? দূর হোক, পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন ? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি ?" রোহিণীর এই চিন্তাধারাকে সতর্কভাবে অনুসরণ করলে শরৎচন্দ্র এত সহজে এই মন্তব্য করতে পারতেন না । আবাল্যপরিচিত গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর এই নব অনুরাগ, পরিবেশ পরিস্থিতির সম্মিলিত যোগফল ।

"বারুণীর জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল সে এমনই প্রিয়তমের জন্য", শরৎচন্দ্রের এই ধারণাও আজকের পাঠকের সমর্থন পায় না । গোবিন্দলালের সদয় ব্যবহারকে রোহিণী ভালোবাসা বলে মনে করেছিল। কিন্তু যখন সে বুঝতে পেরেছে ভ্রমরের ভালোবাসার সুরক্ষিত আবেষ্টনী থেকে গোবিন্দলালকে সে সরিয়ে আনতে পারবে না, কেবলমাত্র তখনই, নিজের দুর্দমনীয় নিস্ফল বাসনার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য রোহিণী এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গোবিন্দলালের একান্ত চেষ্টায় জীবন ফিরে পেয়ে রোহিণীর স্বীকারোক্তি— "রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে — সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না । আশাও নাই ।" ভীরু প্রণয়ের মাধুর্য বা বেদনাকম্পিত আত্মনিবেদনের সৌরভ এখানে লেশমাত্র নেই ।

বারুণীতে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টার ঠিক আগেই রোহিণীর মনের ছবি বঙ্কিম দেখিয়েছেন এইভাবে-"কখনও ভাবিল, গরল খাই; কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পাদপ্রান্তে পড়িয়া; অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি; কখনও ভাবিল, পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল, বারুণীতে ডুবে মরি; কখনও ভাবিল, ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই ।" স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে বারুণীর জলতলের ঠিকানা তার চিন্তায় রয়েছে, ভ্রমরের পরামর্শ সে চিন্তাকে কাজে পরিণত করতে সাহায্য করেছে মাত্র ।

এরপর ঘটনা ধাপে ধাপে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে । মুহূর্তের চোখের দেখায়

নিশাকরের প্রতি রোহিণীর আকৃষ্ট হবার বিষয়টি শুধু শরৎচন্দ্র নয়, প্রায় কোন সমালোচক পাঠকই মুক্তমনে সমর্থন করতে পারেন নি । বিষয়টি একটু গভীরভাবে দেখা যেতে পারে। প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর মিলিত জীবনযাত্রার চিত্রটি বঙ্কিম যখন প্রথম পাঠকের সামনে নিয়ে এলেন, তার আগেই সতর্ক পাঠক এই দুটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছে ।

রোহিণীর দিক থেকে বলা যায়, গোবিন্দলালের উপর তার এমনই বিশ্বাস যে, সেখানে যদি সে ভুল করে থাকে, তবে তার পায়ের তলায় মাটি থাকবে না। বৈধব্যের সকল সংস্কার পেছনে ফেলে সে গোবিন্দলালকে আশ্রয় করেছে, কিন্তু অচিরেই রোহিণী বুঝতে পেরেছে যে গোবিন্দলাল ভ্রমরের চিন্তায় নিবিষ্ট । এই অবস্থায় পড়ে, বেশির ভাগ দুর্ভাগা মেয়েই যেমন পুরুষের কাছে হাত বদল হতে হতে, একসময় পতিতালয়ে গিয়ে আশ্রয় পায়, রোহিণীও পুরুষ প্রধান সমাজের সেই গাণিতিক নিয়মেই তার নারীত্বের অপমান, আত্মার অপমান থেকে উদ্ধার পেতে, নিশাকরের ইশারায় সাড়া দিতে এসেছে । এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও ভাবা যায় । ভ্রমরমুখী গোবিন্দলালের সঙ্গে রোহিণীর প্রসাদপুরের বর্ণাঢ্য জীবন যে কোন সময় তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়তে পারে । এই আশংকা থেকেও রোহিণী নতুন বন্দরের খোঁজে নেমেছে ।

অন্যদিকে গোবিন্দলালের মানসিকতার বিস্তৃত পরিচয় উপন্যাসে একাধিকবার দিয়েছেন লেখক । 'রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন — যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই । ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন । রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে— এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে — এ ভোগ, এ সুখ নহে — এ মন্দারঘর্ষণ পীড়িত বাসুকিনিঃশ্বাস নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে ।"

মনের এই অবস্থায় রোহিণীকে যখন প্রসাদপুরে সদ্যআগত নিশাকরের সঙ্গে অন্ধকারে নির্জনে দেখতে পেলেন গোবিন্দলাল, যখন শুনলেন সেই রূপবান পুরুষের প্রতি রোহিণীর নিবেদন—"আজ তোমাকে ভুলিতে না পারিয়া এখানে আসিয়াছি", সেই মুহূর্তেই গোবিন্দলাল তাঁর ইতিকর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন । এই বিষয়টি পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে দেবার জন্য রোহিণীর মৃত্যু প্রসঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত বঙ্কিম 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে জানিয়েছেন — "যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সংগীত স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী - ভ্রমর অন্তরে রোহিণী বাহিরে । তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া, রোহিনী অত্যাজ্যা, — তবুও ভ্রমর

অন্তরে, রোহিণী বাহিরে । তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল'' । যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম ।

কিন্তু এত সবের পরেও, বাংলা কথা সাহিত্যের জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ শরৎচন্দ্র যখন একাধিকবার এই প্রসঙ্গে তাঁর অসমর্থন জ্ঞাপন করেন, তখন বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতেই হয় । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কবিকল্পনার যে ধর্মভ্রষ্টতা আছে, রোহিণী চরিত্রের পরিণাম তারই অন্যতম উদাহরণ, শরৎচন্দ্রের এই অভিযোগ প্রকৃতপক্ষে অগভীর এবং লঘু চিন্তাধারার ফল । রোহিণী চরিত্রের পরিণাম চিত্রিত করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন । পরিণাম হয়েছে বড় আকস্মিক । উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে রোহিণী চরিত্র যে গুরুত্ব পেয়েছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে তা নেই । সেখানে লেখকের সমস্ত মনোযোগ অধিকার করে রেখেছে ভ্রমর । শিল্পীর পক্ষে যেটি বড় ধরণের ত্রুটি । কিন্তু এজন্য রোহিণীর পরিণাম যে এরূপ হতে পারে না, তা যে মানবচরিত্রের জ্ঞানের বিরোধী, একথা বললে ভুল হবে । মাঝখানে তার কয়েকটি দৃশ্য যুক্ত করে লেখক যদি পরিণতির ধাপগুলি স্পষ্ট করতেন, তাহলেই আর কোনরকম ভুল বুঝবার অবকাশ থাকতো না ।

রোহিণীর এমন মৃত্যু আসলে আর্টের মৃত্যু এই যুক্তিতেও সারবত্তা কম । ''বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাইকোলজিক্যাল নভেল বা প্রব্লেম নভেল নয় । তাঁর জীবন-দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তিনি মানুষের মনের অহংচেতনা অপেক্ষা, তার দেহের নিয়তি ও প্রাণের রহস্যময় চেতনাকে তাঁর কবিদৃষ্টির লক্ষ্য করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎ অপর কোনও কবির ধারণার সহিত মেলে না বলিয়াই সে জগৎ মিথ্যা নহে । রসসৃষ্টিতে সত্যমিথ্যার নিরিখ কোনও একটা বিশেষ তত্ত্ব বা যুক্তিমার্গের অধীন নয়; কারণ সে সৃষ্টিতে জীবনের কোন তত্ত্ব নয় — সুগভীর রহস্যই প্রতিফলিত হয় । অতএব, সাহিত্য সমালোচকের পক্ষে কোনও মতবাদ বা ব্যক্তিগত ভাবতন্ত্রের শাসন সর্বদা পরিহার করা উচিত ।।[১১] সমালোচকের এই বিচারধারা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয় ।

শরৎচন্দ্র যে অল্প বয়সে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ধ অনুকরণ করেছেন তা নয়, জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার বহু ক্ষেত্রেই বঙ্কিমের প্রভাব কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট, কখনো বা অদৃশ্যরূপে বর্তমান রয়েছে ।

'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার' গ্রন্থে অজিতকুমার ঘোষ শরৎচন্দ্রের জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাস-এর বিস্তারিত আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন, ''বিপ্রদাস চরিত্রটির স্রষ্টা কে তাহা জানা না থাকিলে অনেক বলিবেন ইহার স্রষ্টা

বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেহই নহেন।"

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবলগ্নেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। এর পরের দীর্ঘকাল ধরে সমাজ সাহিত্য রাজনীতি ইত্যাদিকে কেন্দ্রে করে এই দুই মহৎ লেখকের সম্পর্কে নানারূপ ওঠা-পড়া হয়েছে। তবে ব্যতিক্রমী কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া শ্রদ্ধাভক্তি এবং প্রীতির সম্পর্কটি প্রায় অটুট ছিল বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের প্রভাব শরৎচন্দ্রের রচনায় কতো গভীরভাবে পড়েছে, সাহিত্য অনুরাগী মাত্রেই সে কথা জানেন। শরৎচন্দ্র নিজেও রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

শরৎ সাহিত্যের মৌলিক বিশেষত্ব কি, তা রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে অনুভব করেছেন, বলেওছেন একাধিক বার। শরৎচন্দ্রের পঞ্চান্নতম জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সি কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি আয়োজিত অভিনন্দন সভায়' রবীন্দ্রনাথ 'শরৎচন্দ্র' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। এতে তিনি লিখেছেন, "বিষবৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তের উইলের পর অনেকদিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্প সাহিত্যে আরেকটা যুগ এসেছে। অর্থাৎ আরও একটা পর্দা উঠল।... তেমনি উৎসাহ, তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবারে নিমন্ত্রণ কর্তা শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্পে যে রসকে তিনি নিবিড় করে জাগিয়েছেন, সে হচ্ছে সুপরিচয়ের রস। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।"

বঙ্কিম উপন্যাস সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব ক্ষেত্রবিশেষ যত কঠিন এবং তীক্ষ্ণ, রবীন্দ্র রচনা সম্পর্কে সেরকম কিছু দেখা যায় না। এমনিতে সাহিত্য সংক্রান্ত নানা প্রশ্নে উভয়ের মতভেদ বারবারই হয়েছে, শরৎচন্দ্রের একাধিক উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময় যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, সেসব তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়। আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তিরিশের দশকে বাংলাসাহিত্য জগতে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে আধুনিক সাহিত্যিকদের মুখপাত্র হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। সে সময় ব্যক্তিগত কিছু কারণেও শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছুটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি সম্পর্কে তাঁর দু-একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে।

১৩৪০ বঙ্গাব্দে দিলীপ কুমার রায়কে লেখা এক চিঠিতে আদর্শ ভাষারীতির বিবরণ দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র রচনাশৈলীকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন— "কথোপকথন

(ডায়ালগ) যেখানেই থাক খুব সহজ ভাষা ব্যবহার কোরো। তর্ক বিতর্ক যেন ছোট হয়, ... উপমা উদাহরণ কোনটিই যেন রবীন্দ্রনাথের মত নিরর্থক ও অসম্বন্ধ না হয়। এখানে লজিক যেন কিছুতেই বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে ওঠে। মানুষকে অলংকার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং স্যাকরার দোকানে অলংকার দিয়ে শো-রুম সাজানোর রুচি এক নয়।"[১৭]

আরো রুক্ষভাষা ব্যবহার করেছেন ২৩ বৈশাখ ১৩৩৭ রাধারাণী দেবীকে লেখা একটি পত্রে "দেখছ না তোমার গুরুদেবের কলমের কাণ্ড! একটা পয়েন্টে কথা শুরু করে কোথায় কোনদিকে কোনপথে যে চলে যান তার আর হালহদিশ খুঁজে মেলা দায় হয়। এইটাই হলো বুড়ো হওয়ার সবচেয়ে নিঃসন্দেহ লক্ষণ।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অতুলানন্দ রায়কে লেখা এক পত্রে শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেছেন — " সাহিত্যের মাত্রাই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ কথা অস্বীকার করি নে যে এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার, হাতী ঘোড়া, জন্তু জানোয়ার—ভেবেই পাইনে, মানুষের সামাজিক সমস্যার, নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে, ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগসই হলেই তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।"

উপরোক্ত মন্তব্যগুলিতে সাহিত্য সমালোচনার মানসিকতার তুলনায় একটা তাচ্ছিল্যের মনোভাবই যে প্রাধান্য পেয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। নাম উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস সম্পর্কেই শরৎচন্দ্র বিরূপ মন্তব্য করেছেন। সেটি হল 'যোগাযোগ'। সেই সময়ে আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত 'সাহিত্যের মাত্রা' আলোচনা উপলক্ষে কিছুটা বিক্ষোভ নিয়েই '[illegible]চারক' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে, শরৎচন্দ্র নিজের সাহিত্যিক মতামত জ্ঞাপন করেন। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের রচনায় প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, এমনি একটি প্রসঙ্গের সূত্রে শরৎচন্দ্র লেখেন —

"উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ... 'ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা 'যোগাযোগ'-এর কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। 'যোগাযোগ' বইখানা যখন বিচিত্রায় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গমা বাঁধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্ধর্ষ প্রবল-পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ-অব-ওয়ারের শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্তে এসে!"

'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিভিন্ন ধরণের সমালোচনা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে । এর আরম্ভ ও শেষ, দু জায়গাতেই অতর্কিত আকস্মিকতা লক্ষ্য করা যায় । কাহিনীর তুলনায় অযথা দীর্ঘ উপক্রমণিকা, আবার কাহিনীর ভেতর থেকে উঠে আসা নানারকম অনিবার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা না করেই অতর্কিত পরিসমাপ্তি, আর্টের দিক থেকে বড় রকমের ক্রটি বলেই মনে করা হয়ে থাকে । কিন্তু এই ক্রটি নির্ণয়েই 'যোগাযোগ'-এর বিচার শেষ হয়ে যায় না ।

'যোগাযোগে'র নায়িকা কুমুর ব্যক্তিসত্তার পরীক্ষা খুব কঠিন । কারণ একদিকে কুমু, 'দেনাপাওনা' গল্পের অশিক্ষিত অসহায় হতভাগিনী নিরুপমা নয়, আবার সে 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণালের মত নিতান্ত সাদা চোখে সংসারকে দেখতে শেখেনি, দেখতে চায়ওনি । সে আদর্শ ও স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল । নারীত্বের সবটুকু ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দিয়ে এক আদর্শ দাম্পত্য জীবন গড়তে চেয়েছিল । কিন্তু ভাগ্য তাকে স্ত্রী রূপে যখন মধুসূদনের একান্ত কাছে এনে দিল, তখনি তার সমগ্র ব্যক্তিসত্তা বিদ্রোহ করে উঠল । পুরুষের স্থূল প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, সূক্ষ্ম সংবেদনশীল নারীসত্তার এই বিদ্রোহ, উপন্যাসে ব্যর্থ হলেও, এখানেই নারীমুক্তির অভিযানে 'যোগাযোগে'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এইখানেই 'যোগাযোগে'র আধুনিকতা ।

'আমি ওদের বড়ো বউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই'— ব্যক্তিসত্তার এই করুণ আর্ত প্রশ্নই নানা ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে । অদৃষ্টের এমনি যোগাযোগ যে, মধুসূদনের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেই কুমুদিনীকে আবার স্বামীর সংসারে ফিরে আসতে হয়েছে । এখানেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিনী কুমুর ব্যক্তিসত্তার বেদনাময় ট্রাজেডি । কাহিনীর এই পরিণতি শেষভাগে অনেকটাই আকস্মিকভাবে ও দ্রুত নেমে এসেছে । এজন্য অনেকেই এই পরিণামকে উপন্যাসের বাস্তবতার পক্ষে হানিকর বলে মনে করেছেন । প্রসঙ্গত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ রোহিণীর মৃত্যুর অংশটির কথা মনে পড়বে । উপস্থাপনার কৌশলের দিক থেকে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের এই ক্রটি কিছুটা হলেও স্বীকার করে নিতে হয় । কিন্তু সমগ্র উপন্যাসের মূল বক্তব্য —কুমুর অখণ্ড ব্যক্তিসত্ত্বার সমস্যা রূপায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই পরিণাম মোটেও অসঙ্গত বলা চলে না। দেহতৃষ্ণা সংস্কার আদর্শবোধ স্বাধিকার-প্রমত্ততা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনা- সব কিছুর সংযোগে সংঘাতে গড়ে ওঠা আধুনিক মানুষের জীবনবৃত্তের এক করুণ কাহিনী 'যোগাযোগ' ।

এমন একটি উপন্যাসের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা মেনে নিতে কষ্ট হয় । কবি কল্পনার সমুচ্চ শিখর স্পর্শ করেছে, পূর্বসূরীদের এই জাতীয় রচনার

যথাযথ মূল্যায়ন তিনি করতে পারেন নি। 'যোগাযোগ' প্রসঙ্গে তাঁর মতামত 'স্বদেশ' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। পরে দিলীপ কুমার রায়কে লেখা এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র কিছুটা অনুতাপের সুরেই স্বীকার করেছেন, "কবির স্বম্বন্ধে স্বদেশের চিঠিটা কি বিশ্রীই হয়ে গেছে !"[২০]

এই সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে মনে করা যায় শরৎচন্দ্রে সাহিত্যিক প্রতিভা সমালোচনা-শক্তির তেমন অনুকূল নয়। অনুভূতির দিক দিয়ে তিনি সাহিত্যের বিষয় ও প্রেরণা সম্বন্ধে, খবু সত্য ও গভীর কথা-সূক্ষ্ম যুক্তি বিচার না মেনেও বলতে পারেন একথা ঠিক। কিন্তু সে বলা সমালোচকের মত নয়। তিনি জীবনকে বুঝতেন গভীরভাবে, নিজে বড় আর্টিষ্ট ছিলেন, নিজের রচনা কার্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন, কিন্তু ক্রিটিক বা সমালোচক ছিলেন না। নিজের দেখা বস্তুকে অপূর্ব রূপ দিতে পারতেন, কিন্তু পরের দেখা বস্তুর রূপ অর্থাৎ পরের রচনা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি খুব একটা স্বচ্ছ এবং সজাগ ছিল না।

এই মূল্যায়নে শরৎচন্দ্রের মহত্ত্বে কিছুমাত্র খর্বতা আসে না। সাহিত্যসৃষ্টি এবং সাহিত্যবিচার দুটি পৃথক ধারা। দুটি সমান্তরালভাবে চলে বেশির ভাগ লেখকের ক্ষেত্রে। ক্বচিৎ কদাচিৎ এরা একটি বিন্দুতে এসে মিশে১০৪জর লেখার শ্রেষ্ঠ বিচার করতে পারেন না, সাহিত্যক্ষেত্রে এমন উদাহরণও যথেষ্ট রয়েছে। তাই অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক না হলেও এতে শরৎচন্দ্র বা বাংলাসাহিত্য, কারো গৌরবেই কিছুমাত্র হানি ঘটে নি।

উল্লেখসূচী

১) উদ্ধৃত, শরৎ রবি, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

২) ১৩৩৮ সাল সত্তরতম রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে পঠিত প্রবন্ধের অংশ, স্বদেশ ও সাহিত্য।

৩) শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার, অজিত কুমার ঘোষ।

৪) আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ, স্বদেশ ও সাহিত্য।

৫) অভিভাষণ, সাহিত্যে আর্ট ও নীতি।

৫) রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শরৎ সাহিত্য সমগ্র ২

৭) অমল হোমকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি, শরৎচন্দ্র (৩য় খণ্ড), গোপাল চন্দ্র রায়।

৮)	শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ।

৯)	আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ, স্বদেশ ও সাহিত্য ।

১০)	ললিতচন্দ্র মিত্রের এক প্রশ্নের উত্তর, সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ ।

১১)	বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১২)	স্বদেশ ও সাহিত্য, শরৎচন্দ্র ।

১৩)	সাহিত্যবিতান, মোহিতলাল মজুমদার ।

১৪)	শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা ।

১৫), ১৬), ১৭), ১৮) শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, গোপালচন্দ্র রায় ।

ঃ লেখিকা পরিচিতি ঃ

লেখিকা মঞ্জরী চৌধুরী ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা এবং বিভাগীয় প্রধান ।

*****
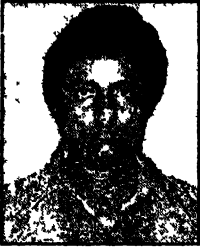
শ্রীহট্টরাজ্য ও দেবরাজ বংশ

· মন্টু দাস

ভাটেরা তাম্রশাসন ঃ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের মৌলভী বাজার জেলার ভাটেরা গ্রামে একটি অনুচ্চ টিলার আটফুট মাটিব নীচে দু'টি তাম্রপত্র পাওয়া যায় - ইতিহাসে ভূগর্ভে প্রাপ্ত এই দু'টি তাম্রপত্রকে ভাটেরা তাম্রশাসন (Bhatera Copper Plates) বলা হয় । ভাটেরা নামক গ্রামের দূরত্ব ধর্মনগর শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণে মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার-যা 'আকুলুকি হাওর' এর দক্ষিণে এবং কুলাউড়া শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত । এই দু'টি তাম্রপত্রের মাধ্যমেই খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে শ্রীহট্ট নামক একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্যেব অস্তিত্বের কথা জানা যায । ফলে শ্রীহট্ট ইতিহাসে এই দু'টি তাম্রপত্রের মূল্য অসাধারণ । যদিও শ্রীহট্টে আরো চাবটি তাম্রপট্টোলী আবিষ্কৃত হয়েছে । কিন্তু সেই পট্টোলীগুলিতে শ্রীহট্ট নামে কোন স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ নেই। বর্তমানে আলোচ্য পট্টোলী দু'টি কলকাতায় ইণ্ডিয়ান মিউজিযামে রক্ষিত ।

তাম্রপত্র দু'টি দেববংশীয় রাজা কেশব দেব ও ঈশান দেবের । পট্টোলী দুটিতে উল্লিখিত রাজা কেশব দেবকে অনেকে গোবিন্দ কেশব নামে উল্লেখ করেছেন । আসলে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের গৌড়রাজ গোবিন্দের সঙ্গে আলোচ্য দেববংশীয় কেশব দেবকে এক ব্যক্তি কল্পনা করে অনেক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন — যা নিতান্তই একটি ভ্রম। কেশব দেব ও রাজা গোবিন্দকে পরিহার করে শুধু কেশব নামেই আলোচনা করব ।

পট্টোলী দু'টির মধ্যে কেশব দেবের পট্টোলীটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এটি ১১ ইঞ্চি x ১২.৭৫ ইঞ্চি । এতে একদিকে ২৭ পঙ্ক্তি ও অন্যদিকে ২৮ পঙ্ক্তি উৎকীর্ণ আছে । ভাষার বিচারে এটিকে ত্রি-ভাষিক বলা হয় । সংস্কৃত, বাংলা ও অজ্ঞাত কোনও এক ভাষার ব্যবহার রয়েছে অর্থাৎ প্রাচীনকালে সংগঠিত বৃহৎ আত্তিকরণ সঞ্জাত নব ভাস্কর্য বিশিষ্ট মিশ্রভাষা । গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এখানে সে সময় তৈরী হচ্ছিল একটি মিশ্র সংস্কৃতি — যেখানে বাংলা ভাষার একটি আড়ষ্টরূপ প্রকটিত । যেমন 'শ্রীপদ' রয়েছে 'শৃপদ' রূপে আর 'শ্রীহট্ট' রয়েছে 'শৃহট্ট'রূপে । কিছু কিছু অস্পষ্ট শব্দ থাকায় পাঠভেদ দেখা দিয়েছে পণ্ডিত মহলে । ভারততাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র যাকে 'গোকুলদেব' বলে পাঠ করেছেন, অধ্যাপক কমলাকান্ত গুপ্ত তাকে পাঠ করেছেন 'কোঙ্কন' বলে । এই পট্টোলীতে

কালনির্দেশক 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' ও ব্যবহৃত অস্পষ্ট চারটি সংখ্যা নিয়ে ঘোরতর বিতর্ক সৃষ্টি করেছে । এই বিতর্কের অবসান বর্তমানেও হয়নি । অসংখ্য পণ্ডিত এই বিতর্কে জড়িয়েছেন ও ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দিয়েছেন । তাদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্যরা হলেন — শ্রীনিবাস শাস্ত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ও কমলাকান্ত গুপ্ত । এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' নামে কোন সালের উল্লেখ ভারত ইতিহাসে দেখা যায়নি ইতোঃপূর্বে । তাই পণ্ডিতগণ 'যুধিষ্ঠিরাব্দ' এর সাথে 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ'কে সম্পৃক্ত করে যথাক্রমে চারটি তারিখ দিয়েছেন কেশব দেবের তাম্রশাসনের প্রচারকাল সম্পর্কে । তারিখগুলো হলো ২৯২৮, ৪৩২৮, ২৩২৮, ৪১৫৯ ।

চারটি তারিখের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অধ্যাপক গুপ্ত নির্দেশিত তারিখ দু'টির ব্যবধান কম । 'যুধিষ্ঠিরাব্দে'র নিরিখে বিচার করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কেশবদেবের তাম্রশাসনের কাল নির্দেশকরেছেন ১২২৭ খৃষ্টাব্দ বলে । কমলাকান্ত গুপ্তের মত তারিখটি হলো ১০৫৭ খৃষ্টাব্দ । আবার আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে তারিখটি হলো ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ । উল্লিখিত তারিখগুলোর মধ্যে রাজেন্দ্রমিত্র নির্দেশিত ১২২৭ সালকেই অধিকতর যুক্তিসংগত বলে মনে হয় । কারণ কলমাকান্ত গুপ্ত ও আচার্য সুনীতিকুমারের তারিখগুলো গ্রহণ করলে বিভিন্ন অসঙ্গতি দেখা দেয় ।

কমলাকান্তের নির্দেশিত তারিখ গ্রহণ করলে পূর্ব বাংলার ইন্দোমঙ্গোলীয় শক্তিশালী চন্দ্ররাজবংশের শাসনকালেই ভাটেরা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধরে নিতে হয় । এটা কষ্টকল্পনা মাত্র ।

পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ইন্দো-মঙ্গোলীয় বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী চন্দ্রবংশ পূর্ব বাংলায় একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে । চট্টগ্রাম পট্টোলীতে উল্লিখিত কান্তিদেব ও চন্দ্ররাজ ত্রৈলোক্য চন্দ্র সমসাময়িক ছিলেন । ত্রৈলোক্য চন্দ্রের সময় (৯০৫-৯২৫খৃঃ) হরিকেল বা শ্রীহট্টে স্বাতন্ত্র্য ছিল। পালদেরসঙ্গে যুদ্ধে হরিকেলকে চন্দ্ররা মিত্র হিসেবে পেয়েছিল । এই সময়টা ছিল পাল'আধিপত্যের শেষের যুগ । ত্রৈলোক্য চন্দ্রের মৃত্যুর পরতাঁর পুত্র সুযোগ্য শ্রীচন্দ্রের সময় হরিকেলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় ও বিখ্যাত 'পশ্চিমভাগ তাম্রপত্র' প্রচারিত হয় । শ্রীচন্দ্র প্রবল বিক্রমে শাসনকার্য, সংস্কার ও ভূমিদান করে নিজস্ব ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের মাধ্যমে ইতিহাসে আপন স্থান করে নিলেও তাঁর পরে চন্দ্ররাজবংশ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি । তাঁর তৃতীয় উত্তর পুরুষ গোবিন্দ চন্দ্রের (১০২০-১০৫৫খৃঃ) সময়কালের কিছু পূর্বে প্রথম মহিপাল (৯৭৭-১০২৭ খৃঃ দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । এই দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের সময়েই গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলায় পুনর্বার পাল

প্রভাব বৃদ্ধি পায় । যদিও সুরমা বারক উপত্যকায় পাল প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । পালদের দুর্বলতার দুর্বলতার সুযোগে পরাজিত চন্দ্রবংশের কোনও উত্তর পুরুষ আরেকটি ক্ষুদ্ররাজ্য গড়ে তোলে । কীর্তিপাল এই বংশের শেষ রাজা । কীর্তিপালের পরই দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্বাধীন শেষ রাজা । কীর্তি পালের পরই দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্বাধীন স্বতন্ত্র শ্রীহট্ট রাজ্য গড়ে উঠে । তাই রাজেন্দ্র লাল মিত্র নির্দেশিত তারিখটিই অধিকতর যুক্তি সংগত ।

আলোচ্য তাম্রপত্রে জানা যায় দেববংশের পাঁচজন রাজার নাম তাঁরা হলেন — নবগীর্বান, গোকুলদেব, নারায়ণ দেব, কেশব দেব, ঈশান দেব । ঈশান দেবের পরবর্তী আর কোন রাজা এই বংশে রাজত্ব করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি । খুব সম্ভবত ঈশান দেবের পরে দেব বংশের পতন ঘটে । প্রথম যে রাজ্যটি পাই তাঁর নাম মগধ । পাথারকান্দির সন্নিকটে আদম আইল পাহাড়ের নিম্নভাগে এটি গড়ে উঠে । এর পরেই আমরা তিনটি শক্তিশালী রাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানতে পারি — রাজ্যগুলো হলো (১) গৌড়, (২) লাউড় ও (৩) জয়ন্তীয়া । প্রথমটি অনেকটা শক্তিশালী ছিল । বর্তমান সদর শ্রীহট্ট ছিল এ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত । পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল । যাক্ এ সম্পর্কে আলোচনায় না গিয়ে মূল প্রতিপাদ্যে ফিরে আসা আবশ্যক ।

তাম্রপত্র পাঠে আমরা অবগত হই রাজা কেশব দেব কংসনিসূদন কৃষ্ণের জন্য একটি গগনচুম্বি মন্দির নির্মাণ করেন —'কংস নিসূতনস্য শিলাভিরুচ্চৈর্বিদধে মহৌজা' । আবার তিনি তুলা পুরুষ দান সজ্ঞত সম্পাদন করেন —'তুলাপুরুষ দানেশ্র সংপ্রাপ্য দ্রবিনং দ্বিজাঃ' । এতে দেখা যাচ্ছে এই রাজবংশ বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় পুষ্ট । আবার তুর্কি আক্রমণ এখানে সংঘটিত হয়নি এবং এর সম্ভাবনা ও তেমন প্রকট নয় তাই উপরিউক্ত কার্য্যাবলী সংগঠিত হয়েছিল । এমনকি ঈশান দেবের শাসনকালেও নয় । তিনিও একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন ।

আবার কেশব দেব ৩৭৫ ভূহল (হাল) ভূমি, ২৯৬ টি বাটী (বাড়ী) ৭২ টি কুটীর ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে দান করেন বটেশ্বর শিবের নামে । এখানে এই রাজবংশের শৈব ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রাজবংশ শৈব-বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় পুষ্ট । এই মিশ্র ভাবনার প্রকাশ আমরা সাম্প্রতিক কালে আবিস্কৃত প্রত্ন সভ্যতা কালাছড়ায় দেখি । এখানে একাধারে শৈব বৌদ্ধ সংস্কৃতি যেমন হাত ধরে চলেছিল, তেমনি পরবর্তী সময় বৈষ্ণবীয় ধারাও ক্রিয়াশীল ছিল এর সবকটি পাথুরে প্রমাণ আবিস্কৃত হয়েছে । অন্যদিকে তাম্রপত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো — সর্বপ্রথম এই উপত্যকায় আমরা পশ্চিমে

গুজরাটে ব্যবহৃত ভূমির একক 'হাল', 'কেদার' ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচিত হই যা এখনও এই উপত্যকায় প্রচলিত ।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, গুজরাট অঞ্চলের সঙ্গে এই উপত্যকার পরিচয় ছিল এবং গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণদের (লাটদ্বিজ) হাত ধরে ভূমির এই এককগুলো এসেছে । এ সম্পর্কে 'Copper Plates of Sylhet' গ্রন্থে অধ্যাপক কমলাকান্ত গুপ্ত জানাচ্ছেন —"It is interesting to note that in the sunaka great inscription of chalukya king Karmadeva of Gujrat, Hala measurement of land ... This ancient record discored in far west Gujrat has its interpretation supported even by the modem state of things at far east Sylhet' আর এই আগমন প্রক্রিয়ার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের নিধনপুর তাম্রপট্টোলী (Nidhanpur copper plate) ও দশম শতকের পশ্চিমভাগ পট্টোলী (Pashchimbhag copper plate) তে ।

পট্টোলী পাঠে আরেকটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় দানকৃত ভূমি যারা পেয়েছিল তাদের মধ্যে আর্যায়িত নাম যেমন আছে তেমনি অনার্য নামও আছে । যেমন আর্যায়িত নাম শৃপদ (শ্রীপদ) নিকুড়ে, দিবাকর, গোবিন্দ ইত্যাদি । আবার স্থানীয় নাম যেমন আরু, গট্টপ, জোগা, পানাক, বজরি, হড্ডিপ, দ্যোতো ইত্যাদি । তাহলে দেখা যাচ্ছে সুদূর অতীতকাল থেকে আলোচ্য উপত্যকায় প্রটো-অষ্ট্রোলয়েড, মঙ্গোলয়েড, আলপাইন, নর্ডিক ধারার মিলনে ও সহ্যবস্থানে যে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তারই ইঙ্গিত দ্বাদশ শতকের পট্টোলীতে ধরা পড়েছে । কিন্তু কালের আবর্তে বৈষ্ণবীয় ধারাসজ্জাত ব্যক্তি নাম কিংবা স্থান নাম অনেকটা আবিস্কৃতভাবে টিকে থাকলেও অনার্য নামগুলো অনেকটাই মুছে গেছে । তবে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার সর্বগ্রাসিতা যে অবয়ব তৈরী করল, তার মালমশলার বেশীর ভাগই এল অষ্ট্রোমঙ্গোল-আলপাইন' যারা থেকে । এরই শত সহস্র উপমা ছড়িয়ে আছে এই উপত্যকার জনমণ্ডলীর ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে ।

পট্টোলীতে উল্লিখিত ভূমিদান যে সকল গ্রামে হয়েছিল তা ছড়িয়ে আছে সুরমা-বরাক উপত্যকার চারদিকে । প্রায় আটশ বছরের ব্যবধানে ও গ্রাম নামগুলোর অনেকটিই আবিস্কৃত আছে । যেমন ভাটপাড়া (ভাটেরা) মহুরাপুর, গুড়াবয়ী, আখালিকূল, পিথায়িনগর, (পোষাইনগর) শঘর, কউড়িয়া, ভাস্করটেঙ্গরী, নাটোয়ান (নর্তন), শলাচাপড়া (শালচাপড়া), দোহালিয়া, বাসুদেব শাসন ইত্যাদি গ্রাম বর্তমান হবিগঞ্জ মৌলভীবাজার, শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ, কাছাড়, হাইলাকান্দি ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে । আবার কৈবাম, দেগিগাম, বড়সো, নড়কোটিগাম ইত্যাদি কালের আবর্তে মুছে গেছে ।

তবে লঙ্গজোট্রি গ্রামের নামের সাথে লঙ্গাইবাগানের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। খুব সম্ভবত 'জোটি' শব্দটি জোট্রিতে রূপান্তরিত হয়েছে। জগৎ সম্ভবত লঙ্গাই এলাকায় কোনও নৌবন্দর ছিল যা লঙ্গজোট্রি নাম দ্বারা অনুমিত হচ্ছে। আবার 'কান্দি' অন্ত গ্রাম নাম দ্বারা শ্রীহট্টের প্রাচীন জলভূমির ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে তোলছে। বর্তমানেও এইসকল কান্দি অন্ত নাম ছড়িয়ে আছে। যেমন — পাথারকান্দি, ...কান্দি, হাইলাকান্দি ইত্যাদি। নদী নামগুলোও আমাদের বিশেষ পরিচিত যেমন — জুড়িগাঙ, কালিয়াণী, ধামায়ি ইত্যাদি।

তাম্রপত্রে উল্লিখিত গ্রাম নাম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেও ....., ইতিহাসের ভিত্তিতে ও বর্তমানে আবিস্কৃত প্রত্নতত্ত্বের আলোকে দেববংশ শাসিত শ্রীহট্ট রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল, আধুনিক ধর্মনগর, কৈলাসহর, সহ অবিভক্ত শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার বেশীর ভাগ এলাকাজুড়ে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক কমলাকান্ত গুপ্তের অভিমত হলো – Govinda Kesava's rule extended also over the Southern part of the district at Sylhet, south of the river of the Kushiyara, portions of Cachar distgrict (including Karimganj Sub-Division) and possibly portions of Tripura also.'

অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত ভূষণ ভট্টাচার্য এই রাজ্যের নিম্নোক্ত সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করেছেন — সুরমা-বরাক উপত্যকাসহ কুমিল্লা ময়মনসিংহের কিয়দংশ নিয়ে। এখানে একটি কথা বলে নেয়া আবশ্যক — ভাটেরা রাজবংশের শাসন পর্যন্ত উত্তর ত্রিপুরা শ্রীহট্ট রাজ্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর তিব্বতে বার্মিজ ভাষা ধারার বোড়োশাখার অর্ধস্তন ককবরক ভাষি ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী গোষ্ঠীকেন্দ্রিক কৌমব্যবস্থা থেকে রাজনৈতিক ইউনিটের দিকে ধাবিত হয় ও সুরমা বরাক উপত্যকার কাছাড় হয়ে, ধর্মনগরে রাজপাট তৈরী করে। ধর্মনগর থেকে তারা গোটা উত্তর ত্রিপুরা সহ কাছাড়ের কিয়দংশ ও দক্ষিণ সিলেট শাসন করতে থাকে। দেববংশের পতন হয়েছিল মূলতঃ এই ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর আক্রমণে। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে দক্ষিণ শ্রীহট্ট ইন্দো-মঙ্গোলীয় ত্রিপুরা গোষ্ঠীর শাসনমুক্ত হলেও উত্তর ত্রিপুরা চিরস্থায়ীভাবে শ্রীহট্ট থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে গেল।

সূত্র ঃ

1. Kamalakanta Gupta - copper plates of Sylhet.

2. Land grants, Land Management and the nature of social formation in Srihatta during the 7th to 11th Century A.D. - The Nort'ı Eastern Hill University journal of Vol. Vi No. 2, 1985.

3. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্ববিধি - শ্রীহট্টে ইতিবৃত্ত

4. ডঃ কামালুদ্দীন আহমেদ - প্রাচীন যুগে শ্রীহট্টের রাজনৈতিক সংযুতি

5. জনাজিৎ রায় - ভাটেরা তাম্রশাসন ঃ প্রেক্ষাপট, বিতর্ক ও ব্যাখ্যাসূত্র

6. নীহার রঞ্জন রায় - বাঙালীর ইতিহাস আদিপূর্ব ।

7. ডঃ জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য - বরাক উপত্যকার ইতিহাসের রূপরেখা ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

লেখক মন্টু দাস ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগে সরকারী চাকুরী করেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় আন্তরিক আগ্রহ থেকেই উত্তর ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছেন । বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । জন্ম ঃ ৪ঠা অক্টোবর ১৯৬৭ সালে, ধর্মনগরের কালাছড়া । ছাত্রজীবনেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেছেন । সাহিত্য চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা থেকেও পুরস্কার ও সম্বর্দ্ধনা পেয়েছেন এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু রাজ্যে আলোচনাচক্রে অংশ নিয়েছেন। তিনি একজন শিক্ষক ।

******

মহারাজা বীরবিক্রমের স্বপ্ন ও ধূসরিত ১৫ই আগষ্ট

— মোহন লাল সাহা

সেই দিনের অপেক্ষায় আমি বসে থাকবো। দেশ ততদিনে স্বাধীন হবে। ... সেদিন সমাজে বঞ্চনা থাকবে না, শক্তিমানেরা দুর্বলদের শোষণ করে সম্পদ জমিয়ে তোলার সুযোগ পাবে না। সেদিন একটি লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘট্‌লে সারা দেশ কেঁদে উঠবে, একটা শিশু শুকিয়ে মায়ের কোল থেকে ঝরে গেলে রাষ্ট্র টল্‌মল্ করবে। ভাববেন না আপনাকে একটা কাহিনী শোনালাম, স্বপ্নে দেখা কোন ছবি এঁকে তুললাম। কাহিনী নয়, এ স্বপ্নও নয়। সত্যই সে দিন আগত ..., (কালো টাকা/ শচীন সেনগুপ্ত)[১]

১৯৪৮ সালের অতি জনপ্রিয় একটি নাটকের এ সংলাপ। এ সংলাপে কেবল প্রেক্ষাগৃহই মুখর হয়ে সে দিনে উঠতো না, স্বাধীন ভারতের এক মনোরম স্বপ্নের ছবি দর্শকদের হৃদয়ে গেঁথে যেতো। বিশাল এ ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ও জটিল স্বাধীনতার সংগ্রামে এই স্বপ্ন ছিল ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে, অসংখ্য দেশপ্রেমিক ও শহিদের প্রেরণাস্বরূপ।

শেষকালে যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম তা নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক, কিন্তু এ নিয়ে আজ আর কোন বিতর্ক নেই যে— মুক্ত দেশ জাতির সেই স্বপ্ন, আকাঙ্খার কোন স্বর্গই রচনা করতে পারে নি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুদূর পরাহত। বিদেশী দেনার দায়ে জাতি আষ্টে-পৃষ্ঠে এমনভাবে এখন বাঁধা পড়েছে যে— এখন স্বাধীন ভারতের প্রতি দুই সেকেণ্ডে যে শিশুটি সূর্যের প্রথম আলো দেখে সেও তিন শত পঞ্চান্ন টাকার বিদেশী ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রথম চোখ মেলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

হিসাব জানেনা সে অবোধ শিশু, কিন্তু বিদেশী ঋণের অক্টোপাসের বন্ধন থেকে মুক্তি সে পায়না অন্তিম নিশ্বাস পর্যন্ত। ধনী-গরীব, আদরে-অনাদরে যে শিশুই এ দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, এ তাদের অদৃষ্ট লিখন। এই বেড়াজালের গোলক ধাঁধায় পাক খেতে খেতে আমাদের স্বাধীনতার এতগুলো বছর পার হয়ে গেল আজ। ভাইয়ে-ভাইয়ে অবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা, খণ্ডিত স্বদেশ, অসংখ্য শহিদের আত্মবলিদান এবং লক্ষকোটি ভারতবাসীর বুভুক্ষা ও অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকারের পথ বেয়ে সেদিন যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম আজ তা মরীচিকা এবং বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে কালোটাকার পাহাড় অন্যদিকে মৃত্যু যন্ত্রণার হাতছানি। এই দুইয়ের যাঁতাকলে আট্‌কা

পড়ে মুখ দিয়ে যাদের রক্ত ঝর্‌ছে এদের নাম ভাগ্যহত ভারতের আমজনতা ।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব থেকে সরে গিয়ে মুস্‌লিমলিগ পাকিস্তান রাষ্ট্রের লক্ষ্যে সরাসরি সংগ্রামে নামার ডাক দিল মুস্‌লিম জাতিকে । ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট ছিল উদ্দিষ্ট দিন । আগেই ওইদিন ছুটি ঘোষিত হয়েছিল । বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি ময়দানে এক সমাবেশে পুলিশ ও সেনা বাহিনীর কাছ থেকে কোন বাধা আসবে না বলে জানান । ও দিন থেকেই কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় । চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোলকাতা এক আতঙ্ক নগরীতে পরিণত হলো । মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব দুই প্রধান দল, হিন্দু আর মুসলমানের বুকের ভিতরে ভেদ ও বৈষম্য এত গভীর শিকড় গড়ে গেলো যে কোন কথার বা তত্ত্বের প্রলেপ আর তাদের মিলনসূত্র খুঁজে পেলো না । ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান কি শহরে কি পল্লীতে বরাবর পাশাপাশি বাস করে এসেছে যুগযুগ ধরে । ধর্মে - মুসলমান হলেও এদেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জনেরই পূর্বপুরুষ যে এককালে হিন্দু ছিল — এ কথা আজ তাদেরে বুঝাবে কে ?

ত্রিপুরাকে আমরা গণতন্ত্রের তীর্থভূমি বলে জেনে এসেছি । রাষ্ট্রীয় জীবনের সীমা রেখায় কেবল নয়, ধর্মীয় জীবনের মানদণ্ডেও এ রাজ্যের আমজনতা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক । কোটি থেকে এক সংখ্যায় কম হয়ে এ রাজ্যের পাহাড়তীর্থ ঊনকোটি হয়েছে তা কেবলমাত্র নয়, এখানে চৌদ্দজন দেবতা এক সাথে, একই আসনে পূজিত হন । মাতা সতীর অঙ্গধন্য, অপর তীর্থভূমি, প্রাচীন ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরের মাতাবাড়ী । কথিত আছে পতি নিন্দা সহ্য করতে না পেরে পিতার যজ্ঞস্থলের দেহত্যাগের পর ক্রোধের উন্মাদনায় কৈলাসপতি সতী নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে যখন তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করেন, ধরাধাম তখন ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়। শ্রীবিষ্ণু তখন সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডিত করতে আরম্ভ করেন । তখন একান্ন খণ্ডিত দেহের ডানপায়ের বুড়ো আঙ্গুল পড়ে উদয়পুরের তীর্থভূমি এই ত্রিপুরেশ্বরীর মাতাবাড়ী । ওই তা একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম আরাধ্য স্থান । চাক্‌লা রোশনাবাদের সুর্বণ সুফলা উর্বরভূমি অংশ এই পার্বত্য ত্রিপুরার সাথে সংযুক্তভাবে যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য ছিল আমাদের, তার প্রাণ ভোম্‌রা ছিল কিন্তু চাক্‌লা রোশনাবাদের আবাদ ভূমি । তার খাজ্‌না থেকেই এ রাজ্যের রসদ চলতো। সারা ভারতের বহু গুণী জ্ঞানী জন এ রাজ্যে এসেছেন, বিশ্বকবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা বলাই বাহুল্য ।

রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে আমাদের উত্তরণ হয়েছে । কিন্তু আমাদের প্রজন্মকে গণতন্ত্রের শিক্ষায়ই দেয়া হয়নি । তাই আমাদের দেশের ভাগ্যে সুশৃঙ্খল জাতি গড়ে উঠে প্রগতির পথ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি । এই শিক্ষাবিহীন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের দেশের এক বরেণ্য শিক্ষক তথা বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ভারতের প্রাক্তন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ অশনি সঙ্কেত দিয়ে

বলেছেন — "Democratization degrades every things" অর্থাৎ শিক্ষাবিহীন গণতন্ত্র সবকিছু অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায় সে সতর্ক বাণী ও আমাদের সম্বিত ফিরে আনতে পারেনি ।

অন্যদিকে আমরা রাজা শব্দটির অর্থ খুঁজে পেতে চেষ্টা করি । রাজা কেবল রঞ্জন করেন না । তিনি 'রজ' গুণের প্রতিমূর্ত্তি । রজগুণ মানেই গতি । তাই রাজাকেই বলে অগতির গতি । অর্থাৎ যারা জড়ত্বের প্রতিবাদী তাহাই রজ। শিক্ষার আলোকে সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা খণ্ড এবং ক্ষুদ্র সীমা রেখাকে অতিক্রম করে জাতির সামগ্রিক দৃষ্টি ও কল্যাণমুখী ভাবনার দিকে নিজের চিন্তা এবং কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারেন তারাই জনসেবক হিসাবে শ্রদ্ধাভাজন হন এবং তখন গণতন্ত্রের প্রকৃত সাধনা স্বার্থক হয়, সাধারণ মানুষের ভূমি থেকে জননেতা তৈরী হয়ে দেশের হাত ধরেন । আজ আমাদের দেশের জনপ্রতিনিধিদের দিকে তাকালে এ সমস্ত কথাগুলি বড়ই অর্থহীন হয়ে পড়ে । কিন্তু তারচেয়েও নিরর্থক হয়ে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় গণচেতনা । যারা দেশ শাসন করেন, তাদের শোষকরূপের ভয়াল চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম ইংরেজ শাসনকালে । আর তখনই গণচেতনা গণরোষে পরিণত হয়ে বৃটিশ সিংহাসনের ভিত নড়বড়ে করে দিয়েছিল । এর ফলে তাদেরকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিলো । আজ স্বদেশী গণতন্ত্রে স্বদেশবাসী যখন জনপ্রতিনিধিদের প্রবল স্বার্থপরতা এবং তাদের সঞ্চিত গণতহবিলের অবাধ লুণ্ঠন প্রতিনিয়ত খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাওয়া যায় তখনই এ গণতন্ত্রের প্রতি আত্মধিক্কার আসে । শতশত শহিদের রক্তস্রোত হিমেল ধারায় বয়ে যায় ধমনীর মধ্য দিয়ে । শ্রদ্ধার অবসান গণতন্ত্রের প্রতি । রাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন —"King is not one who rules only, but one, who backons the way a head", যিনি কেবল রাজ্যশাসন করেন তিনিই সত্যিকারের রাজা নন, রাজা বলতে তাকেই বুঝায় যিনি ভাবী কালের জ্যোতির্ময়ী পথে এগিয়ে নিয়ে যান রাজ্যকে । ত্রিপুরার শাসকদের মধ্যে যে মহারাজা বীরবিক্রম অন্যতম দূরদর্শী নৃপতি ছিলেন, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । আগরতলা শহর নির্মাণ পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে রাজকর্ম পরিচালনা সব কিছুতেই তাঁর দূরদর্শিতার ছাপ আজও আমরা দেখতে পাই । কিন্তু তাঁর মূল্যায়ন জীবদ্দশাতে হয়নি এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আত্মদহনে অকালে ঝরে গেলেন তিনি । ফলে এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মহারাজের রাজ্য শাসনের পূর্ণরূপ আমরা দেখতে না পেলেও তাঁর স্বপ্নের একটা ছবি আমরা— মুগ্ধ হয়ে ব্যথিত হৃদয়ে উপলব্ধি করে সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁর মূল্যায়ন করার সুযোগ পাবো নিম্নলিখিত ভাষনের অংশ থেকে । (উৎস ঃ রাজগী ত্রিপুরা সরকারী বাংলা - ৫৬ পৃঃ, তারিখ ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ আগষ্ট ১৯২৮ ইং।)

বৃটিশ ত্রিপুরা, কুমিল্লা শহরে

'আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়া' প্রতিষ্ঠানের সভামণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের অভিভাষণ

(৮ই ভাদ্র, ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ)

আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়া প্রতিষ্ঠানের সভ্যমণ্ডলী,

আপনাদিগের প্রদত্ত অভিনন্দনে আপনারা আমার প্রতি আপনাদের আনন্দোচ্ছ্বাসের যে ঔদার্য্য এবং সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পৃথিবীব্যাপী বিদ্রোহী সাম্প্রদায়িক বিরোধের এই ক্ষণে, ব্যক্তিগতভাবে এবং শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি স্বরূপে ইহাই আমার পরম সম্মান যে, সমাজ, সম্প্রদায় বিস্মৃত সম্মিলিত জনসাধারণ কর্ত্তৃক আজ আমি অভ্যর্থিত এবং সে অভ্যর্থনা অকৃত্রিম উৎসাহেরই সার্থক সমাবেশ। একদিকে আমার নিকট এদৃশ্য চিরস্মরণীয় — অপর দিকে বর্ত্তমান জগতের সমক্ষে ইহা প্রাচীন পন্থার প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থনজ্ঞাপকও বটে।

আমার মনে হয়, যেন একটা তাড়িত সঞ্চারিত অস্বস্তি এবং অশান্তির গুরুভাবে ভারতীয় বায়ুমণ্ডল আজকাল অত্যধিকরূপে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা জানেন, বিভিন্ন গুণসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিমিশ্রণে অকস্মাৎ একটা উদ্বেলিত ফেনাপুঞ্জ সম্ভূত হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের বিরুদ্ধবাদিতা-রূপ উন্মাদনার উপাদান এবং মতবাদের বিষমরূপ প্রক্রিয়া হইতে এই ফেনিল উত্তেজনা প্রসূত হইয়াছে। আমার আশা এবং সর্ব্বান্তঃকরণ প্রার্থনা, — এমন দিন অচিরে আসিবে, যখন এই দ্বন্দ্ব এবং কলহ শান্তিতে রূপান্তরিত হইবে এবং সেই প্রগাঢ় এবং সুচতুর শান্তির কোলে, বিদ্বেষ ভুলিয়া বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় উত্তরোত্তর স্ব-স্ব উৎকর্ষ-সাধনে লিপ্ত হইবে।

আমি আজ সরলভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি আবহাওয়া আমার রাজ্যে সৃষ্টি করা — ইহাই আমার সর্ব্বোচ্চ এবং একমাত্র আকাঙ্খা। যাহাদিগের ভাগ্য আমার নিজের ভাগ্যের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত — হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, আমি তাহাদিগকে এই বুঝাইয়া দিতে চাই যে, বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে অথবা বর্ণে বর্ণে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্যের স্থান নাই। প্রতি সম্প্রদায় একই আদর্শ, লক্ষ্য এবং পরিণতির সুনিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত। আমি চাই, হৃদয়ের অন্তঃস্থলের অনুভূতি দ্বারা প্রত্যেকে এইটুকু উপলব্ধি করুক যে, ধর্ম্ম কেবলমাত্র পন্থা বিশেষ—যাহার অনুসরণেই একমাত্র, সার্ব্বজনিক গন্তব্য গৃহে আমরা বিশ্ব-পিতার পদপ্রান্তে উপনীত হইতে পারি। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যিনি 'ফেজ' ব্যবহার করেন তিন 'ফেজ'ই এবং যিনি

পাগড়ী ব্যবহার করেন তিনি পাগড়ীতেই অনুরক্ত থাকুন । কিন্তু আমি চাই, প্রতি মানবের প্রাণ এই অনুভূতিতে স্পন্দমান হউক যে, দৃশ্যমান বৈষম্য কেবলমাত্র বহিরাবরণেই পর্য্যবসিত; এই বৈষম্যের অন্তরালে মানবাত্মা সাম্য-মৈত্রীর অনুপ্রেরণায় পরস্পরের নিকট পূজা এবং প্রণয়ের দাবি রাখে ।

আমার ত্রিপুরা রাজ্যে, আমার আদর্শের সাধনা যেদিন সার্থক হইবে, আমার আশা আছে, সেই পরম শুভদিনে, যে সম্প্রদায়-বিচারের উপর বর্তমান মানববুদ্ধি আজ অর্থ আরোপ করিতেছে, সে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান, ভাস্কর নবীনের বিমল প্রভায় তিরোহিত হইবে । সেদিন, হিন্দু অথবা মুসলমান আমার প্রিয়পাত্র - একথা নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা ভিন্ন সম্পূর্ণ অর্থশূন্য প্রতিপন্ন হইবে । আজ আমি একজন রাজভক্ত হিন্দুর তত্ত্বাবধানে রাজ্যস্থ অপরাপর জাতিবর্ণের কল্যাণের ভার সমর্পণ করিতে পারিতেছি— আমাব সে কাঙ্খিত দিনে, আমার আদর্শ-বিশ্বাসী একজন মুসলমানের সেবা তৎপর তত্ত্বাবধানে, সমভাবেই আমার রাজ্যস্থ হিন্দু প্রজার ভার আমি হৃষ্টচিত্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব ।

রাজা ও রাজখান্দান, কুলাচার ও চিরাচরিত প্রথা, রাজপ্রসাদ এবং রাজসংসার তৎকাল পর্যন্ত শিক্ষাবিস্তার-একমাত্র শিক্ষাবিস্তার কার্য্যই যে আমাদেব কর্ত্তব্য ও প্রচেষ্টার কেন্দ্র হওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে আপনাদিগের সঙ্গে আমার মতের সুন্দর ঐক্য আছে ।

আধুনিক আড়ম্বর-বাহুল্যদৃষ্ট মতবাদ ও পদ্ধতির নিখুঁত অনুসরণে পাশচাত্য শিক্ষা নহে, কিন্তু যে শিক্ষার-প্রতীচ্যকে উৎকর্ষ সাধনে আংশিকরূপে শক্তিমান স্বীকার করিবার উদারতা আছে, প্রাচ্য আদর্শকে অধিকতর সম্পদশালী করিবার নিমিত্তই যে শিক্ষা আগুয়ান হইয়া প্রতীচ্যকে আলিঙ্গন করে, আমি আপনাদিগের সম্মুখে সেই সুশিক্ষারই আদর্শ উপস্থাপিত করিতেছি । ইহা বলা হইয়াছে, ''প্রাচী চিরদিনই 'প্রাচী' এবং 'প্রতীচী' চিরদিনই 'প্রতীচী' ; কিন্তু আমার মত এই যে, পরিণামে একমাত্র সম্মিলিত প্রাচী-প্রতীচীই জয়শ্রীমণ্ডিত হইবে । যদিচ, আপনাদিগের প্রত্যেকেরই মত আমিও উপলব্ধি করি যে, ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি, প্রাচীনত্বের গৌরবে গরিষ্ঠ-বিজ্ঞান দর্শনের সম্পদে সম্পন্ন ধর্ম্মের ঔদার্য্যে মহিমান্বিত প্রাচীন অবিমিশ্র আদর্শদ্বারাই সুদৃঢ়ভাবে রচিত হওয়া অবশ্য সঙ্গত ।

মহোদয়গণ, আপনারা আমাকে ভাবপ্রবণ অথবা স্বপ্নবিহারী মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি সেই শুভদিনেরই অপেক্ষা করিতেছি - যেদিন আমার এই স্বপ্নই সত্য হইবে-সুন্দর হইবে-সার্থক হইবে ।

স্বাধীনতা দিবসের প্রায় তিন মাস আগে ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ ত্রিং ঃ উৎসর ত্রিপুরা ষ্টেট্ গেজেট সংকলন । ত্রিপুরা সরকার ৩১৩ পৃঃ) মহারাজা বীর বিক্রম প্রয়াত হন, মাত্র

উনচল্লিশ বছর বয়সে । রাজ্যের নিয়মানুযায়ী নাবালক মহারাজা কুমার কিরীট বিক্রম কিশোর রাজ্যে অভিষিক্ত হন এবং মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে রাজকীয় অভিভাবকত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হলো । দুঃসহ বেদনাসিক্ত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো । এই উপলক্ষ্যে কাঞ্চনপ্রভা দেবী নিম্নোক্ত ভাষন প্রদান করেন । (উৎস ঃ ত্রিপুরা ষ্টেট্ গেজেট সঙ্কলন - ৩১৫ পৃঃ)

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে

"রিজেন্ট" শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মহোদয়া

— বাণী —

আজ আমাদের রাজ্যে বৃটিশ সার্ব্বভৌমত্বের অবসান হইল । তাই ত্রিপুরা আজ অপ্রতীক হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ শাসন ক্ষমতার স্বাধীনতার নূতন পথে অগ্রসর । এই প্রাচীন রাজ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দীর অশান্তির ইতিহাসের মধ্যে ইহাই প্রকট হইয়াছে যে আমরা আমাদের অমূল্য সম্পদ স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্যই দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করিয়াছি । স্বাধীনতার ন্যায় বহুমূল্য উপহারে আজ ভারত ও পাকিস্থানবাসীদের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে । আজ তাই এই উপলক্ষ্যে সবিশেষ গম্ভীর্য্যপূর্ণ ও সম্মানজনকভাবে স্মরণীয় করিয়া তোলা শুধু আমাদের উচিত নয়, কর্ত্তব্যও বটে ।

যদিও ভারতের নানাস্থানে সকলে এই বিশষ্ট কালকে নানা উৎসব আনন্দে ভরপুর করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; আমি আমার প্রজাবর্গসহ আজ পূর্ণ উৎসাহে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে পারিতেছি না । কারণ আমাদের প্রাণের অধীশ্বর আজ আমাদের মধ্যে নাই । কিন্তু আমার এই একমাত্র সান্ত্বনা যে আপনারা সকলে আমার এই শোকে অংশগ্রহণ করিয়াছেন ।

কাজেই আজ আমার প্রতি যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র আপনাদের সহানুভূতি নহে, সক্রিয় সহযোগিতা আমি আশা করিতেছি।

আপনারা অবগত আছেন যে, আমার নেতৃত্বে রাজ্যের কার্য্যভার পরিচালনার্থে একটি 'রাজপ্রতিনিধি শাসন পরিষদ' (Council of Regency) গঠিত হইয়াছে । কিন্তু আপামর জনসাধারণের অভিপ্রায়ানুযায়ী আমি এখন হইতে আমার স্নেহাস্পদ পুত্র ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ কিরীটবিক্রম কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরের পক্ষে "রিজেন্ট" অথবা 'রাজপ্রতিনিধি' গ্রহণ করিতেছি । আমার স্থির বিশ্বাস যে আমি আপনাদের পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য লাভে বঞ্চিত হইব না । আপনাদের শক্তির মধ্যে আমার ক্ষমতা । আপনাদের ভালবাসা ও আনুরক্তির উপরেই আমি ভবিষ্যতের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করিতে পারিব বলিয়া আমি আশা রাখি ।

স্বর্গীয় মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর তাঁহার স্নেহভাজন প্রজাপুঞ্জের জন্য যে শাসন সংস্কার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাই কার্যকরী করা আমার প্রাথমিক কর্ত্তব্য। যে শাসন সংস্কার ব্যবস্থা তিনি গত ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বযুদ্ধের অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থায় কার্য্যকর — হইতে পারে নাই। যদিও এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিরতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদেশে আর্থিক অসঙ্গতি পূর্ণভাবে চলিত থাকায় এতকাল শাসন সংস্কার সম্বন্ধে অভিনিবেশ দান করা সম্ভবপর হয় নাই। এই নব শাসন-সংস্কারে মূল ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বহু বিষয়ে নিয়োজিত থাকিতে হইতেছে। ইতিমধ্যে আমার পুত্রতুল্য বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাবৃন্দও কতিপয় পরিবর্ত্তন উপস্থাপিত করায় সে সমস্ত বিষয় বিবেচনাধীন আছে। আমি আমার প্রজাবৃন্দের সহনশীলতায় ও আনুরক্তিতে নিজে সবিশেষ আনন্দিত। আমি আজ দৃঢ়ভাবে আপনাদিগকে আশ্বাস দিতে পারি যে গ্রাম্য-প্রতিনিধি ভিত্তিতে যাহাতে সর্ব্বসম্প্রসারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপ্রতি আমার পূর্ণ দৃষ্টি থাকিব। এই সংস্কার ব্যবস্থা যাহাতে অতি সত্বরতার সহিত নিষ্পাদিত হয় তজ্জন্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞগণের সহিত যথাসময়ে আলোচিত হইবে।

কিন্তু আমার এই আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ "কাউন্সিল অব রিজেন্সির" পরামর্শ অনুযায়ী আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছি — বর্ত্তমানে তিনজন বেসরকারী মন্ত্রী - দুইজন হিন্দু ও একজন মুসলমান মন্ত্রী পরিষদের নিয়োগ করা যাইবে। অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণীতে যাহারা বিশিষ্ট প্রভাবশালী তাহাদের মধ্য হইতেই মন্ত্রীত্রয় মনোনীত হইবেন।

আর একটু বিশেষ বিষয়-রাজধানী আগরতলায় যাহাতে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের প্রতি বিশেষ নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কলেজের স্থান নির্ধারিত আছে, কেবলমাত্র সুবৃহৎ অট্টালিকাটি প্রায় সমাপ্তির পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কতিপয় বৎসর যাবত জনশিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমানে নয়টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ইহার মধ্যে একটি কেবল বালিকাদের জন্য ২৫টি মধ্য ইংরেজী ও ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাজ্য মধ্যে ছড়াইয়া আছে। উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্খা অধিবাসীদের মধ্যে প্রবলভাবে অনুভূত হওয়ায় কলেজিক শিক্ষা কার্য্যকরী করিয়া আমাদের শিক্ষাকে রাজ্য মধ্যে পূর্ণ করিতে ইহাই একমাত্র উপায়; অন্যথায় শিক্ষা পদ্ধতি বালুকার ইমারতের তুল্য হইবে। এই কারণেই আমি আমার উপদেষ্টাদের সহিত একমত হইয়া এখনই কলেজের ক্লাশ চালু করিবার নিমিত্ত উদগ্রীব হইয়াছি। এই ব্যবস্থায় ব্যয় বন্ধনও বর্ত্তমান বর্ষের বাজেটে ধরা হইয়াছে। আমি আনন্দ সহকারে আরও জ্ঞাপন করিতেছি যে কলেজের নিমিত্ত চাক্‌লা রোসনাবাদ তহবিল হইতে আমার স্বর্গতঃ স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একলক্ষ টাকা বিশেষ বৃত্তি হিসাব দান করা যাইতেছে।

পরিশেষে — এই দুর্যোগ সময়ে আমি আপনাদের সকলের শুভ কামনা করিতেছি

এবং শ্রীশ্রী ভগবৎ পাদপদ্মে আমি সর্বদা আপনাদের সহিতই আন্তরিকভাবে শুভ প্রার্থনা করিতে রত থাকিব ; ইতি — সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৯শে শ্রাবণ্‌ ।

শ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা দেবী

'মহারাণী রিজেন্ট অব ত্রিপুরা '

বহু দশক ধরে শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে ত্রিপুরায় বসবাস করে আসছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী । এই মহামিলনের ফলে এ রাজ্যে বর্তমান ঐতিহ্যময় মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এদের সম্মিলিত প্রয়াসেই আধুনিক ত্রিপুরার উন্নয়নের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে । অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের এই শান্তরাজ্যে উগ্রসশস্ত্রবাদ বিগত আশি দশক থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে ভয়ালরূপে । কোন সন্দেহ আজ আর নেই যে এর পিছনে প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে যাদের, তাদেরে আমরা অতি শ্রদ্ধার সাথে জননেতার আসনে একদিন বসিয়েছিলাম । তিল তিল করে যে হিংস্র মনোভাবের বীজ এরা সযত্নে রোপন করে ভাইয়ের বুকে ভাইকে ছুরি বসাতে নিত্য প্ররোচিত করেছে, আজ তা স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে জাতি দাঙ্গার রূপ নিয়েছে ।' আজ তাই এই শান্ত সমাহিত জীবনের মাঝে দেখা দিয়েছে হাহাকার । নিহত, আহত, লাঞ্ছিত,আক্রান্ত, বাস্তুচ্যুত ও বিধ্বস্ত জনগোষ্ঠীর বুকফাটা আর্তনাদ । সাধারণ মানুষ ভাবছেন আর কত রক্ত গঙ্গা বইতে হবে শান্তির ভগীরথের শঙ্খ ধ্বনির অপেক্ষায়। আজকের এই অবস্থার সাথে ১৯৪৬ সালের অবস্থার কত মিল । জোর করে বিপথে পরিচালিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা । অথচ এই বঞ্চিত সাধারণ চিরকালই শোষিতের মাঝে থেকে যায় । প্রভু তাদের নিত্য বদল হয় । বিভিন্ন পোষাক পরে এসে তাদেরে কত আশা ভরসার স্বপ্ন দেখায় । সে সব সোনালী স্বপ্ন যে চিরকাল মরীচিকাই থেকে যায় সে কথা জেনেও তারা বারবার প্রতারিত হয়, আবার বিশ্বাস করে । ভোটের মহড়ায় সামিল হয়, গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয় না । নতুন জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন । আবার এই আমজনতাই গণতন্ত্রের নামে প্রতারিত হয় । এই অভিশাপ থেকে বোধ করি আর মুক্তি নেই । এইভুলের শিকারীরা হয়ত বা ৪০/৫০ বছর পর তাদের এই মহান ভুল স্বীকার করে নেয় । কিন্তু এই স্বীকারোক্তি জনতার হারানো অভিশাপের দিনগুলিকে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারে না । ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় তাদের এই মহাভুল স্বীকারের কাহিনী । কিন্তু তা থেকে যে সৎ শিক্ষা পাওয়া উচিত, আমাদের কিন্তু সে শিক্ষা হয় না । তাই ভুলের পথেই আমাদের জীবনের চলার গতিপথ নির্দিষ্ট হয়ে যায় । আর তাকেই ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিয়ে দুঃখ, দারিদ্র, বঞ্চনা, অবহেলা আর নির্যাতনে শিকার হয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় আমজনতার । আর নির্বাচিত প্রভুরা বাস করেন আরাম আয়াসে এই বঞ্চিত মানুষগুলির অস্থিমজ্জার কাঠামোতে, শোষিত রক্তের মশলায় তৈরী করা সুরম্য অট্টালিকায় । "বঙ্গভূমির প্রতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বেদনার্ত হৃদয়ে

বহুকাল আগেই লিখেছিলেন —

> "তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি
>
> স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি !
>
> জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী ।
>
> এরা কী দেবে তোরে কিছু না কিছু না —
>
> মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে ।।"

ভালবাসার কোন রূপ নেই, সে রূপের মাঝেই অরূপরতনকে খুঁজে বেড়ায়। এই খোঁজার মাঝেই সাধক দেশ জননীর স্তন থেকে অমৃত সুধা পান করেন । ফলে তার ধমনীতে যে ঝঙ্কার শাশ্বত কাল যাবৎ নৈবদ্যের রূপ নিয়ে দেশ জননীর পদাম্বুজে নিবেদিত হয়, তা তিনি গেয়ে চলেন প্রাণের একতারাতে নিরবধিকাল । যেন তা কবিগুরুর সুরে ধ্বনিত হয়—

> "জানি নে তোর ধন রতন আছে কিনা রাণীর মতন
>
> শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে
>
> স্বার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে
>
> স্বার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে ।"

স্বাধীনতার এই পুণ্য দিবসের এই ধ্বনিব ঝঙ্কার যেন সদা রণিত হয প্রয়াত মহারাজা বীর বিক্রমের স্বপ্নের স্বার্থক রূপায়ণে, আছেন হৃদয়ের মাঝে ।

ঃ লেখকের পরিচিতি ঃ

জন্ম ঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী - ১৯৪১ খ্রীঃ । মূলতঃ প্রাবন্ধিক ৬০ এর দশক থেকে । মাঝে মাঝে কবিতাও রচনা করেন - তির্যক ও প্রেমাত্মক । দৈনিক সংবাদসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । সত্তর দশকে প্রকাশিত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্রিকা 'আর্থিক বিচিন্তা'-র প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক । গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে— 'রাঙা মাটির ধুলায় ধূসর', যুগ দিশারী মহানামব্রত ও মানব ধর্ম সম্মেলন । প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি জাতীয় অধ্যাপক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির প্রশংসা লাভ করেছে। লেখক যমুনালাল বাজাজ পুরস্কার, ভগবান মহাবীর ফাউণ্ডেসন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত । পেশা ঃ ব্যবসাবাণিজ্য । কিন্তু নেশা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ।

******

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের জীবন দর্শণ ও সংগ্রাম

— মৃণাল রায়

বাংলার ভৌগোলিক এংবং সামাজিক পরিবেশ ও বাংলার উর্বর মাটি যুগে যুগে অগণিত বিপ্লবী মানবাত্মার জন্ম দিয়েছে। ধর্মীয় সমাজ জীবনে ব্রাহ্মণ্যবাদী অনাচার, স্বার্থপরতা ও শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। তাঁর আন্দোলনের সময়কাল ছিল ১৪৮৫ থেকে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। তেমনি ভারতবর্ষে যখন ঘোর অন্ধকার, তখন বৃটিশ শাসন ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতের দলিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও দলিতদের মুক্তি আন্দোলনের জন্য যে ক'জন পুরুষ-সিংহ আমরণ লড়াই করে গেছেন, তাদের মধ্যে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, ছত্রপতি, শাওজী, পেরিয়ার রামস্বামী, রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুণ্ডা, গুরুচাঁদ ঠাকুর, বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর, অখণ্ড বাংলা তথা পূর্ব ভারতের মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাদের মধ্যে অন্যতম।

১৯০৪ সালের ২৯শে জানুয়ারী বরিশাল জিলার গৌরনদী থানার মৈস্তারকান্দি গ্রামে এক নমঃশূদ্র কৃষক পরিবারে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামদয়াল মণ্ডল এবং মাতার নাম সন্ধ্যা দেবী।

তাঁর বাবা ছিলেন একজন কৃষক। কৃষক পরিবার হওয়াতে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল একটু বেশী বয়সে লেখাপড়া শুরু করেন। কিন্তু তাঁর জীবনানুভূতি ও বাস্তবজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। অল্প কিছুকালের মধ্যে তিনি পাঠশালার পড়াশুনা শেষ করেন। তার গ্রাম থেকে দূরের গ্রামে "বার্থী তারা ইনষ্টিটিউশন" নামক হাইস্কুলে যোগেন্দ্রনাথ ভর্তি হন। এবার তাঁর পড়াশুনার প্রতি আরও মনোবল বেড়ে যায়। অল্পদিনের মধ্যে মেধাবী যোগেন্দ্রনাথ বার্থী তারা ইনষ্টিটিউশন থেকে ১৯২৪ সালে ১ম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে আই. এ. ক্লাশে ভর্তি হন। সেই যুগে তপশীলি জাতির লোকদের (জেলে চাষীদের) পায়ে জুতো পড়া, উচ্চবর্ণের লোকদের সামনে দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে যাওয়া, পঞ্চায়েতের বিচার সভায় উচ্চবর্ণের লোকদের থেকে দূরে বসা ইত্যাদি ঘটনাগুলি যোগেন্দ্রনাথের মনে দাগ কাটত। লেখাপড়া শেখার সাথে সাথে দরিদ্র জেলে চাষীদের জাতপাতের বেড়াজাল

থেকে মুক্ত করে সমঅধিকার ও সমমর্যাদা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা তিনি ভাবতেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ১৯২৬ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে আই. এ পাশ করেন ।

গৌরনদী থানার অন্তর্গত খাগবাড়ী গ্রামের এক ধনী ব্যক্তি প্রহ্লাদ চন্দ্র বাড়ৈ এর দ্বিতীয় কন্যা কমলাদেবীকে ১৯২৬ সালে আই. এ পাশ করার কিছু দিন পূর্বে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিবাহ করেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের শ্বশুর মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকার ফলে তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভের কোন অসুবিধা হয়নি। বিবাহের পর তাঁর পড়াশুনায় মনোযোগ আরও বেড়ে যায় । ১৯২৯ সালে তিনি ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন । তারপর তিনি আইন বিষয়ে নিয়ে পড়ার জন্য কলিকাতায় চলে আসেন । ১৯৩৪ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন । তারপর তিনি আবার চলে আসেন অন্য বিষয়ে । কিছুদিন কলিকাতায় শিক্ষকতা করেন ।এরপর আইন বিষয় নিয়ে মনোযোগ দেন । ১৯৩৬ সালে বরিশালের সদর আদালতে ওকালতি শুরু করেন এবং তখন থেকে তিনি অনেক দরিদ্র কৃষকদের মামলা বিনা খরচে নিষ্পত্তি করে দেন ।

১৯৩৪ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে যোগেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় আইন পরিষদে যোগ দেন এবং তপশীলি জাতির জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংরক্ষণের দাবিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন । বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে বাখরগঞ্জ উত্তর পূর্ব নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন। বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হিসাবে ব্যক্তিগত প্রয়াসে অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার কর্তৃক তপশীলি জাতির ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন হয় ১৯৪০ সালে ।এই নির্বাচনে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে বটতলা ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন । ড. বি. আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নাগপুরের সম্মেলন থেকে "সারা ভারত তপশীলি ফেডারেশন" গঠিত হয় । ১৯৪৩ সালে উক্ত ফেডারেশনের বঙ্গীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তার সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন । দূরদর্শী যোগেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বর্ণবাদী মুষ্টিমেয় হিন্দুদের দ্বারা বৃহৎ বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু তপশীলি জেলে চাষী নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছেন । তপশীলি জাতির সামজিক ও আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে মোর্চা গঠনের প্রয়াস নেন । ১৯৪৩ সালে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তপশীলি সম্প্রদায়ের সুযোগ সুবিধা আদায়ের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লীগ নাজিম উদ্দিন সরকারকে সমর্থন করেন । তাঁর চেষ্টায় এই মন্ত্রী সভায় ৩জন তপশীলি মন্ত্রী গ্রহণ করা হয় ।এই সুযোগে তিনি সরকারের সহযোগিতায় তপশীলি ছাত্রদের

জন্য ২টি ছাত্রাবাস তৈরী করার ব্যবস্থা করেন। একটি ছাত্রাবাসের নাম 'উদয়ন ছাত্রাবাস' এইটি বর্তমানে এখনও চালু আছে । অপর ছাত্রাবাসটির নাম 'ভারতী ভবন ছাত্রাবাস' সেটি পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকার বন্ধ করে দেয় ।

এই সময় তপশীলি ফেডারেশনের মুখপাত্র 'জাগরণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয় । এই পত্রিকার মাধ্যমে তপশীলি জাতির লোকের লাঞ্ছনার কাহিনী, তপশীলি সমাজের আন্দোলন সংগ্রাম গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া হয় । পত্রিকাটি ছাপানো এবং পৌঁছানো ইত্যাদি বাবদ যা খরচ হত তার সবটাই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বহন করতেন ।

১৯৪৬ সালে সারা ভারত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত নির্বাচনে তপশীলি ফেডারেশন থেকে একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নির্বাচিত হন । ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর বাংলার সুরাবর্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয় । তপশীলির স্বার্থ সুরক্ষিত করতেই তিনি মুসলিম লীগের আহ্বানে অন্তবর্তী সরকারে যোগদান করেছিলেন । যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের এই ধারণা জন্মেছিল যে—মুসলিম লীগ শুধুমাত্র তপশীলি সম্প্রদায়ের নয় — ভারতের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতি লাভের ও স্বাধীনতা আদায়ের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করবে । আম্বেদকরের চিন্তাধারায় সম্পৃক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিশ্বাস করতেন ''সমস্ত তপশীলি জাতি আদিবাসী ও মুসলমান যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে এই দেশে এমন কেউ নেই যে তাদের রুখতে পারে ''

১৯৪৬ সালে ৫ই নভেম্বর মহম্মদ আলি জিন্নাহ নিমন্ত্রণ পাঠান যোগেন্দ্রনাথকে । বিশেষ নিমন্ত্রণ পেয়ে মণ্ডলসাহেব ঈদের জমায়েতে সাক্ষাত করেন । তখন জিন্নাহ সাহেব তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন — ''আমি আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং এখনও করিতেছি যে আপনার সম্প্রদায় অন্যের নিকট থেকে যতটা সম্ভব সাহায্য পাওয়ার অধিকারী । এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ৬ কোটি লোক অস্পৃশ্য বলে ঘৃণিত হয় । আমি গোলটেবিল বৈঠকে আমার জাতির জন্য যতটা না যুদ্ধ করেছি তার চেয়ে বেশী যুদ্ধ করেছি আপনার সম্প্রদায়ের জন্য । বড়লাটের নিকট লেখা আমার সাম্প্রতিক পত্রেও আমি আপনাদের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি । আমি অনুভব করেছি যে, আপনারা দুর্বল বলেই আপনাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছে । কংগ্রেস ও গান্ধীর যুক্তিতে আপনাদের বলি দেওয়া হয়েছে । মহান মুসলিম জাতি কোন কিছু না করে এসব ব্যাপারে নীরব দর্শক হিসাবে থাকতে পারে না । আমি অনুভব করি যে, শুধু কথা না বলে এখন কাজ করে দেখানোর সময় এসেছে । আমরা আপনাদের সাহায্যে করতে চাই ।'' পাকিস্তান অর্জনে সফল হওয়ার জন্য যোগেন্দ্রনাথ তখন জিন্নাকে অভিনন্দন জানান ।

ডঃ আম্বেদকরের রাজনৈতিক জীবন গঠনের মূলে বাংলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সেই সময় গণপরিষদের নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হবে। নিজ রাজ্য মহারাষ্ট্র থেকে ১৯৪৬ সালে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়া যখন ডঃ আম্বেদকরের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে, তখন বাংলার নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের আমন্ত্রণে তিনি বাংলায় চলে আসেন। ডঃ আম্বেদকরকে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত করে পাঠাতে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রামে যে সব নেতৃবৃর্গ মহাপ্রাণের সহযোগী হিসাবে তাঁর পাশে ছিলেন তাদের মধ্যে মনোহর ঢালী, রসিক লাল বিশ্বাস, কামিনীপ্রসন্ন মজুমদার, রাজকুমার মণ্ডল, ডাঃ মনোহর রায় প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ডঃ আম্বেদকর নির্বাচনে জয়ী হন এবং বাংলাদেশ থেকে গণপরিষদের সদস্য রূপে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক রাজনৈতিক জীবন শুরু করনে। ডঃ আম্বেদকরের একান্ত সহকর্মী শ্রী পি. এন. রাজভোজ ১৯৬০ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে এক বক্তৃতায় বাংলাদেশের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এই ঐতিহাসিক অবদান অকপটে স্বীকার করেন।

১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের অন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়। প্রথমে মুসলিম লীগ অন্তবর্তী সরকারবয়কট করলেও ১৫ই অক্টোবর সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ৫ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করেন। উক্ত তালিকায় মহাপ্রাণ আইনমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হন। মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন তপশীলি ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। তিনি ডঃ আম্বেদকরের সম্মতি নিয়েই মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মধ্যবর্তী মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। কেন্দ্রের অন্তবর্তী সরকারের আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে পাকিস্তান অর্জনের জন্য মি. জিন্নাকে অভিনন্দন জানান। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তখন বলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে পাকিস্তানে তপশীলি জাতি সমূহের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তিনি আশাঙ্কা প্রকাশ করেন যে, অবশিষ্ট ৫ কোটি ২০ লক্ষ লোক বর্তমানে যে সামান্য রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করছে। তারা তাও হারাবে। যেহেতু তপশীলিজাতি সমূহের প্রতি কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকার ভবিষ্যৎ আচরণ বিধি কি রকম হবে সে সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নি। আপাতত এই আশা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকব যে, মিঃ গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরু প্রমূখ কংগ্রেস নেতৃবর্গের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং পাকিস্তানে মি. জিন্নার হাতে তপশীলি জাতি সমূহ যে রকম ন্যায় বিচার পাবে সে রকম ন্যায় আচরণ কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাঁদের প্রতি করবে।

ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় "আইন ও শ্রমমন্ত্রী" হিসাবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনিই ছিলেন এই মন্ত্রীসভার একমাত্র হিন্দু মন্ত্রী । পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তাঁর যোগদানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল । পাকিস্তানের বসবাসকারী সংখ্যালঘু তপশীলিদের স্বার্থ রক্ষা করা । কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের মত্যুর পর মুসলমান নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং এই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের কথা চিন্তা করে তাঁর মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল । যে আশা নিয়ে তিনি মুসলীম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যে তাঁর কৃষিজীবি দরিদ্র ও নিরক্ষর আপনজনেরা প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী । তাদের পক্ষে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে জীবনযাপন করা খুব কঠিন । কিন্তু সাম্প্রতিক কালে খুলনা, ঢাকা বরিশালে সংগঠিত দাঙ্গা সমূহের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা দেখে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এসবের কোন প্রতিকারে অক্ষম হওয়াতে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর কথায় কোন গুরুত্ব আরোপ না করাতে মুসলিম লীগের কথায় বিশ্বাস হেতু তিনি তাঁর রাজনৈতিক ভুল বুঝতে পারলেন এবং নিজেকে অপরাধী মনে করতে থাকেন । তাঁর দিনের আহার বিস্বাদ এবং রাতের নিদ্রাভঙ্গ হল ।

যোগেন্দ্রনাথ নিজেকে আরও বিপন্নবোধ করলেন এই কারণে যে, তাঁর হাতে গড়া বঙ্গীয় তপশীলি ফেডারেশনের মধ্যেও আজ নেতৃত্বের লড়াই শুরু হয়ে গেছে । ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগের কট্টর পন্থীদের চক্রান্তে ফেডারেশনের এম. এল. এ রা তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু করে দিয়েছে । জাতির স্বার্থ কিংবা সংমষ্টিগত স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থই আজ তাঁদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ।

যোগেন্দ্রনাথ বরাবরই ছিলেন স্পষ্টবাদী — কখনও কোন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে অন্যান্য পেশাদার রাজনীতিবিদদের মতো কোনরূপ স্বার্থ বোধক কথাবার্তার আশ্রয় নেন নি । পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত সাম্প্রতিক ভয়াবহ দাঙ্গার পর থেকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ তাঁর বিভিন্ন বন্ধুদের কাছে ব্যক্ত করতেন ।

১৯৫০ সালে জুন মাসে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত ৩৩তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে পাকিস্তানের আইন ও শ্রমমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে না পাঠানোর সিদ্ধান্তে তিনি ক্ষেপে গেলেন । এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করতে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং মালিক মহম্মদ আনোয়ার নামক জনৈক আমলাকে দায়িত্ব দেন । ১০ই জুন তারিখে তিনি করাচি থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন এবং সচিবালয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন । পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সেচ মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারের সঙ্গেও দেখা করে তাদেরকে বুঝিয়ে বললেন যে, পূর্ববঙ্গে যে হিন্দুদের বসবাসের অনুপযুক্ত এবং ভবিষ্যতেও ইহার কোন পরিবর্তন হইবে না । উপরন্তু তার পক্ষেও বেশী দিন যে পাকিস্তানে বসবাস করা সম্ভব হইবে না এবং সে অবস্থায় তাঁহার কি করণীয় সে ব্যাপারেও দীর্ঘ আলোচনা হয় ।

১৯৫০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাঞ্জাবের শৈলাবাস মারীতে যোগেন্দ্রনাথের বিচার বিভাগ সম্বন্ধীয় উপসমিতির একটি সভায় সভাপতিত্ব করার নির্ঘন্ট তৈর হয়েছিলো। করাচি থেকে মারীতে রওয়ানা হওয়ার মাত্র একদিন আগে হঠাৎ কলিকাতা থেকে টেলিগ্রাম এলো যে, যোগেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র জগদীশচন্দ্র ভয়ানক অসুস্থ ।

তিনি নিজেও জানতেন না যে, তাঁর পাকিস্তানে বসবাসের দিন এত দ্রুত ফুরিয়ে যাবে । পুত্রের অসুস্থতার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান থেকে কলিকাতায় চলে আসেন। পুত্র শিগগীরই সুস্থ্য হয়ে উঠলো, তিনি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েন । ইতিমধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, তিনি আর পাকিস্তানে ফিরে যাবেন না । দীর্ঘ পদত্যাগ পত্রের মুসাবিদা তৈরী করতে বেশ কিছুদিন কেটে যায় । অতঃপর ১৯৫০ সালের ৮ই অক্টোবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে পাঠিয়ে দেন ।

যোগেন্দ্রনাথের পদত্যাগ-পত্রখানা একটি ঐতিহাসিক দলিল বিশেষ। সুদীর্ঘ এই পদত্যাগ পত্রটিতে নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের জিন্নাহ পরবর্তী কর্ণধারদের সঙ্গে তাঁর অ-বনিবনার বিবরণও বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন । পত্রখানা পাঠ করে পাঠকেরা অতিসহজেই তৎকালীন পাকিস্তানের হাল হকিকত সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণাগঠন করতে পারবেন । যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের এই পদত্যাগ পত্রের কথা বি বি সি বেতারের ৮ই অক্টোবরের রাতের সংবাদ বুলেটিনে প্রচারিত হয় । ৯ই অক্টোবরের তারিখে ভারতের প্রায় সমস্ত দৈনিক সংবাদ পত্রে এই পদত্যাগ পত্রের সংবাদ প্রচারিত হয় । কলিকাতার বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক 'আনন্দবাজারে' ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই পদত্যাগ পত্রের পূর্ণাঙ্গ বাংলা তর্জমা প্রকাশিত হয় । যোগেন্দ্রনাথের পদত্যাগ সারা ভারতে, এমন কি পাকিস্তানেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এবারে আসা যাক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভূমিকা কি ছিল। বঙ্গীয় তপশীলি জাতি ফেডারেশন বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয় । বাংলা বিভক্ত হলে বাংলার অধিকাংশ তপশীলিগণ নবগঠিত পূর্ববঙ্গের বা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত

হইবে এবং কিছু তপশীলি জাতির লোক ভারতবর্ষে থাকিবে । তপশীলি দুইভাগে বিভক্ত হইলে তাদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের পথে কি রূপ অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি হবে তা সহজেই অনুমেয় । ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বঙ্গ বিভাজনের বিরুদ্ধে গ্রামে গঞ্জে সভা সমিতি করে জনমত গড়ার চেষ্টা করেন । কিন্তু বৃটিশ চক্রান্তে বিভাজনবাদী কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলাকে দুই টুকরো করে চিরদিনের জন্য বাংলার তপশীলি জেলে চাষী ও মুসলমানদের সহবাবস্থান ও ঐক্যের প্রীতি ভেঙ্গে দিয়ে যোগন্দ্রনাথের মহান চিন্তাধারাকে ব্যর্থ করে দেয় । আজো আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলার তপশীলি জাতির লোকেরা এই দুঃখ দুর্দশার কথা ভুলতে পারছে না । আজ যদি বাংলা ভাগ না হত তবে সব তপশীলির বাস্তুচ্যুতির কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থের শিকার হতো না । বঙ্গভঙ্গকারী কাপুরুষদের উদ্দেশ্যে করে উচ্চকণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ প্রশ্ন রাখেন — ''এই সমস্ত স্বার্থান্ধ কাপুরুষর দল পূর্ব বঙ্গের ঐ সব অসহায় হিন্দুদের অবস্থা একবারেও চিন্তা করিয়া দেখেছেন কি ?'' বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতাকরায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে অনেক ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ নিন্দা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয় । তপশীলি জাতি সম্প্রাদায়ের কিছু নেতা ব্যাক্তি ও তাঁদের 'প্রভুদের' ইন্ধনে তাঁকে 'মুসলিম লীগের দালাল', 'ঘরের শত্রু বিভীষণ', 'মীরজাফর', ''নমঃশূদ্র জাতির কলঙ্ক' ইত্যাদি কুৎসিৎ ভাষায় গালাগলি করেছেন । আর মনুবাদী পত্রপত্রিকাগুলি যোগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এসব নিন্দা মন্দ ফলাও করে প্রচার করেছে । তবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, তপশীলি জাতি ফেডারেশন এবং পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট তপশীলি ব্যক্তি ও নেতা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে নানাহ খবরের কাগজের তাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন ।

১৯৬৬ সালে বনগা (কলিকাতা) থেকে ভোটে লড়বেন বলে এখানে এসেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকরা তাকে নমিনেশন দেয়নি । পরে তিনি ঠাকুর নগর হাঁসখালি বিধানসভাতে এককভাবে নিজখরচে ভোটে লড়েছিলেন । ঠাকুরনগরের শতকরা ৯০ ভাগ তপশীলি ভোট তিনি পেয়েছিলেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমাজের কিছু বিশিষ্ট নাগরিক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে আনবে কথা দিয়েও কথা রাখেন নি । তারা যদি একটু সহযোগিতা করত তবে তিনি জিতে যেতেন । তাঁর পরাজয় মানে সমাজের পরাজয় ।

১৯৬৮ সালের ৫ই অক্টোবর লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।

তিনি ছিলেন একজন সমাজ্যবাদী, সর্বত্যাগী এবং সৎ মানুষ । তিনি তিন/চার বার

মন্ত্রী হয়েও শেষ জীবনে নিঃস্ব সন্ন্যাসীর মতন জীবন যাপন করেছেন । একবেলা ভাত এবং লাউয়ের ডগার চরচরি খেয়ে জীবন যাপন করেছেন শেষ জীবনে । আজ তপশীলি জাতির সামাজিক মর্যাদা ও সংরক্ষণ (অর্থনৈতিক, গণতান্ত্রিক, চাকুরী ও শিক্ষাক্ষেত্রে) সুযোগ সুবিধা বা অধিকার লাভ করার জন্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের অপরিসীম অবদান । তিনি তার সমস্ত উপার্জন সমাজের নিম্নবর্ণের মা নুষের সার্বিক অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গছেন । সেজন্যই তিনি চিরস্মরণীয় প্রাণের চেয়ে মহাপ্রাণ ।

ঃ লেখকের পরিচিতি ঃ

লেখক পরিচিতি ঃ মৃণাল রায় অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ার এবং তবলায় বিশারদ । বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত । বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত । সুরপঞ্চম কালচারেল এণ্ড সায়েন্স ফোরামের সহ-সভাপতি, জেনেসিস সংস্থার সক্রিয় সদস্য, ভারতী দলিত সাহিত্য একাডেমি, ত্রিপুরা রাজ্য শাখার যুগ্ম সম্পাদক । বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেন । প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলো ১) পেরিয়ার রাম স্বামীর জীবনী ২) পেরিয়ার রাম স্বামী ক্যুইজ ৩) দলিত নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের জীবন দর্শণ ও সংগ্রাম । আগরতলার মিলন সংঘ নিবাসী এই তরুণ লেখকের জন্ম -১৯৭২ সালে । পিতা অবনী মোহন রায়, মাতা শ্রীমতী বেনুপ্রভা রায় ।

******

রবীন্দ্রকাব্যে শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ ও পরিপাক

— ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশশাস্ত্রী

(প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, আগরতলা)

পণ্ডিত প্রবর বিষ্ণু শর্মা বিরচিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের শব্দশাস্ত্র সম্পর্কিত মন্তব্যটি দীর্ঘকাল ধরে ভাষাতাত্ত্বিক মহলে সমাদর লাভ করে আসছে, যাতে করে বলা হয়েছে যে,

"অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ ।
সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু,
হংসৈ র্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ ।"

মূলতঃ অনন্ত শব্দশাস্ত্র, স্বল্প আয়ুষ্কাল, বিঘ্ন বহুতার মধ্যে হংসের মত জল আশ্রিত বা মিশ্রিত ক্ষীর বা দুগ্ধরূপী সারটা গ্রাহ্য । এ কথাটি শুধু সংস্কৃতের জন্যই নয়, জগতের তাবৎ সমৃদ্ধ ভাষা ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, গ্রীক, লেটিন, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, বাংলা প্রভৃতির জন্যও স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত । কারণ সমৃদ্ধ ভাষাসমূহের বিশাল শব্দ সাম্রাজ্যে চিরন্তন চাতুর্য ও 'মনের মতন' মাধুর্য অবিসংবাদিত । আর শব্দ ভাণ্ডারের উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে তার অর্থের আনুকূল্যে। শব্দ ও অর্থের এই নৈকট্য হচ্ছে শিবের অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তির মত একই অঙ্গে দুই রূপ । মহাকবি কালিদাস একটি শ্লোকে এই রূপটি অপরূপ রূপে এঁকেছেন।

"বাগর্থাবির সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে ।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী— পরমেশ্বরৌ ।।"

ফলে, শব্দ ও অর্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়াতে শব্দের তাৎপর্য দাঁড়ালো সর্বাগ্রে। এরই জন্য বলা হল "শব্দব্রহ্মৈব কেবলম্" । শব্দের এত শক্তি এত সামর্থ্য, এত সব ব্যবহার-বৈভব ।

বস্তুতঃ শব্দ প্রয়োগ - বৈচিত্র্য, শব্দপ্রয়োগ-সৌন্দর্য, শব্দপ্রয়োগ-চাতুর্য, তথা শব্দ প্রয়োগ মাধুর্য্যই কাব্যকলানির্ণয়ে শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী । আর শব্দ প্রয়োগ প্রাধান্য ও শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্য কাব্যনির্মাণের মূল্যবান উপাদান ।

মহামতি পাণিনি তার ব্যাকরণ-অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম সূত্রটির নামাকরণ করেন - "অর্থ

শব্দানুশাসনম্ ।'' এটা শব্দশাস্ত্রের বিভূতির ইঙ্গিত বহন করছে । মহাভাষ্যেও আছে[৬] ''মহান্ শব্দস্য প্রয়োগ বিষয়ঃ'' । যাস্কাচার্য বচনে তারই সম্যক্ অনুরণন দৃষ্ট হচ্ছে যে,[৭] ''অর্থবন্তঃ শব্দ-সামান্যাৎ'' । তৎ প্রভাবে বৈদিক ও লৌকিক শব্দের অর্থবহতা স্বীকৃত । তাই শব্দ হবে সদৈব অর্থযুক্ত ।

আবার তর্কশাস্ত্রাদিতে শব্দকে বলা হয়েছে, ''আপ্তবাক্য শব্দঃ'' অর্থাৎ আপ্তব্যক্তির বাক্যই শব্দপ্রমাণ ।[৮] অবশ্যি ন্যায়দর্শনে আবার আপ্তকে বলা হয়েছিল,[৯] 'আপ্তো যথার্থবক্তা'। অন্নংভট তো মন্তব্য করেন যে, ''বাক্যার্থজ্ঞানং শব্দ-শব্দ-জ্ঞানম্ । তৎকরণং শব্দ ইতি ।''[১০] ব্যুৎপত্তি হল - শব্দ + অ(ঘঞ্) - ভা, শপ্ + (দন্) ভাবে, প্ ব আদেশ ।[১১]

এখন প্রবন্ধের ভিন্ন শিরোনামের 'পরিপাক' শব্দটি নিয়ে একটা বিপাকে পড়া গেল। প্রথমতঃ এটিকে কবিরাজী শব্দ বলে ভ্রম হয় । তবে পূর্ব পুরুষদের যারা কবিরাজী করে জীবিকার্জন করেছেন ঘরের বৃহৎ খলাদি সহযোগে যে বটিকা প্রস্তুত হতো তাদের মুখে এটির অর্থ দাঁড়াতো বড়ীর পাক বা পরিমেয়তা । তার থেকেই পরবর্তী আসরে বাংলায় 'সন্দেশের পাক ধরা'— এরূপ বাগ্রীতির সন্ধান মিলে । তবে এতদ্বিষয়ে অমর, হলায়ুদ ও মেদিনীর মত মহামান্য কোষকারগণ নীরব রয়েছেন । কিন্তু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ''তারানাথ ভট্টাচার্য্য বাচস্পতিকৃত শব্দস্তোম মহানিধিতে এর অর্থ সঠিক নির্ধারিত হয়েছে,[১২] ''পরি - পচ্ + ঘঞ্ , পুং , অর্থাৎ নৈপুণ্যে, উত্তম পাকে চ' এখানে প্রথম অর্থই গ্রাহ্য ।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল সম্ভার পাঠকালে পরিপাক শব্দটি আমাদের চোখে পড়ে মহাকবি কালিদাসের মালবিকাগ্নি মিত্রে[১৩] মহাকবি মাঘের শিশুপাল বধে১৪ ও মহাকবি শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিতে ।[১৫] তা হলে কথাটির মানে হল, - রবীন্দ্রকাব্যে শব্দ ব্যবহার নৈপুণ্য।

মহাকবি মাঘ ব্যবহৃত শব্দটি এরূপে 'সেট' করা হল যে, ''পরিপাক পিশঙ্গলতা রজসা বোধশ্চকান্তিক পিশঙ্গলতা ।''[১৬] এখানে spot meaning-টা হচ্ছে,—''অসংখ্য লতা পেকে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করেছে ইত্যাদি । তা হলে পরিপাক হল পেকে যাওয়া যেটা আমরা বলছি-পরি পক্ব । এর নৈপুণ্য অর্থ নিপুণভাবে কোষগ্রন্থাদিতে পরিপুষ্ট না হলেও প্রাচীন আলংকারিকরা এ বিষয়ে শব্দার্থকে 'কাব্যস্য আত্মা' হিসেবে অনুধাবন করে পরিপাকের প্রাধান্য মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন ।

ক) কাব্যালংকারে - 'শব্দার্থৌ কাব্যম্' ।

খ) কাব্যপ্রকাশে - 'অদোষৌ শব্দার্থৌ' ।

গ) কাব্যাদর্শে - 'ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলিঃ কাব্যম্' ।

ঘ) রসগঙ্গাধরে - 'রমণীয়ার্থ— প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্ ।

আলংকারিক বামনাচার্যের একটি শ্লোকের শেষ চরণটির চারুতা এ বিষয়ে সর্বাধিক সমলংকৃত হল, যাতে রয়েছে, [১৭] "তং শব্দন্যাসনিষ্ণতাঃ শব্দ পাকং প্রচক্ষতে।" সর্বোপরি শব্দ পাকের অভিধা, শব্দন্যাসে বা বিন্যাসে নিষ্ণাত বা কোবিদ হল কাব্যিক।

তাহলে বুঝা গেল, কবির যোগ্যস্থানে যোগ্য শব্দ সংযোগ বা সংস্থাপনের যে কৃতিত্ব, যে মহত্ত্ব, যে বিভুত্ব বা আত্মিক স্বকীয় অভিব্যক্তির শক্তি, তাই কবির শব্দ-পরিপাক। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে কবি সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করে পৃথ্বীতলে শ্রেষ্ঠাসন লাভে সমর্থ হয়েছেন। তৎকৃত কাব্যে পদে পদে পরিপাক শক্তির উৎকর্ষ লক্ষণীয়। মণিকার অলংকারে রুচি বা চারুচিন্তার দ্বারা খণ্ড খণ্ড মণি একে একে সেট (Set) করে সেই মণিহার তৈরী করল, তা থেকে সুষ্ঠু সংলগ্ন একখণ্ড মণি খসিয়ে নিয়ে গেলে পুরো সেটটাই বিকল হয়ে যাবে, - ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনির্মিত কাব্য রত্নমাল্যের একটা শব্দ বা শব্দাংশ যদি তা থেকে বিচ্যুত হয় তা হলে মণিহারের মতো তার কাব্যহারও হতশ্রী হয়ে যাবে। এটা কবির সমগ্র শাশ্বত ও সারস্বত উপলব্ধির রঙে রাঙা ঐশী শক্তি সমুদ্ভূত। তাই প্রীত, নীত, অভিনীত ও অভিভূত। শব্দতত্ত্ববিদ্ রবীন্দ্রনাথের এটাই বিশেষত্ব।

রবীন্দ্রকাব্যে 'শব্দপ্রয়োগের মধ্যেও আয়াসের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। [১৮] অন্যদিকে শব্দযোজনার মানসিক পরিমণ্ডল আমরা বালক রবীন্দ্রনাথেব মধ্যেও লক্ষ্য করতে পারি। তাই শিশু বয়সে যখন তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোটে করে বেড়াতে বের হয়ে গীত গোবিন্দ পড়ে ছন্দ ও কথার যে গাঁথুনি তাঁর মনের মধ্যে লগ্নীভূত হচ্ছিল তা থেকে তার শব্দবিন্যাসের আত্যন্তিক অনুভূতি অনায়াসেই অনুভূত হবে।[১৯] এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, [২০]

"ছন্দে, শব্দবিন্যাসের তির্যক ভঙ্গিতে যে সঙ্গীত-রসপ্রকাশ পায় অর্থের কাছে অগত্যা তার জবাবদিহি আছে। কিন্তু ছন্দের নেশা, ধ্বনির প্রসাধনের নেশা, অনেক কবির মধ্যে মৌতাতি উগ্রতা পেয়ে বসে, গদ্গদ আবিলতা নামে ভাষায় স্ত্রৈণ স্বামীর মতো তাদের কাব্য কাপুরুষতা দৌর্বল্য অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠে।"[১১] তা হলে শব্দে ও ছন্দে থাকবে একটা স্বাভাবিকতা।

তা হলে কাব্যে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা পোক্ত মন প্রয়োজন। আবার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, 'কাব্যে যেমন আছে শব্দের বাছাই তেমনি আছে ভাবপ্রকাশের বাছাইয়ের কাজ।"[২১]

স্বতঃ সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত রবীন্দ্র-কবিতাবলী থেকে কিছু কিছু ললিত লহরীর উপস্থাপনা করা যাক্।

বিশ্ববর্গ ঃ

ক) "যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী !
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ চঞ্চলা ।।
সুর সভাতলে যবে নৃত্য করে পুলকে উল্লসি
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্য শীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা ।"

(উর্বশী, চিত্রা)

এখানে প্রতিটি শব্দের প্রয়োগে নৈপুণ্য স্বর্গীয় নর্তকী উর্বশীর পদে পদে মনোহরতি। এরূপ রূপবৈভব ব্যাখ্যানে ছন্দে ছন্দে আমাদের মনোরাজ্যে শিহরণ সঞ্চার করে । কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এ অভিনব শব্দ প্রয়োগ - রহস্য এটা তাঁর নিজস্ব প্রতিভার প্রভা । এ বক্তব্যে শব্দ ও ভাবের মণি-কাঞ্চন যোগ হয়েছে ।

খ) 'কণিকা'র উপদেশ কণা কি অপূর্ব পদানুগ ;
চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যাহা আছে তাহা আছে মোর গায়ে ।

গ) এ বিশ্বের রহস্য অকুল ।

ঘ) বিশাল বিশ্বের আয়োজন । (জন্মদিনে)

ঙ) জগতে রহিবে নিত্য — কলঙ্ক অক্ষর
তব অপমান রাশি বিশ্বজগন্ময় ।

উল্লিখিত উদাহরণে (ঙ) বিশ্বজগন্ময় শব্দটি সংস্কৃতের বিশ্বস্মিন্ জগতীতলে এর দ্যোতনা করছে । বিশ্বব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত ।

প্রিয়া-পর্যায় ঃ

ক) প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণ দণ্ড 'পরে

হেনকালে হাতে দীপশিখা

ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা ।(স্বপ্ন, কল্পনা)

খ) কভু কি অপূর্ণ রয়

প্রিয়ার প্রার্থনা ।(কাহিনী)

গ) যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া

রয়েছে মিশিয়া

তোমার সৌন্দর্য দূত যুগ যুগ ধরি

এড়াইয়া কালের প্রহরী ।(শাজাহান্, বলাকা)

প্রতিটি বক্তব্যে ভাবের ঔদার্যের সঙ্গে শব্দের ঔচিত্য প্রতিফলিত হয়েছে। শব্দের চয়নধর্মিতার মর্মে প্রিয়া যেন শাশ্বতী প্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে—হয়েছে চিরশ্রী মণ্ডিতা।

বসন্ত বাহার ঃ

ক) বসন্ত পরশে

পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে ।

(সঞ্চয়িতা, পৃঃ ২৬৪)

খ) বসন্ত পাঠায় দূত

রহিয়া রহিয়া (স্ফুলিঙ্গ)

গ) প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে

বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে ।

ঘ) নীরবে নিতান্ত অবনত

বসন্তের সর্বসমর্পণ ।(চৈতালী)

বসন্তের সঙ্গে ধরার মানুষ কবির গভীর আত্মিক যোগ প্রতিটি শব্দে প্রতিক্ষণে বিকশিত হয়েছে ।নৈসর্গিক বসন্তে ব্যক্তি সত্তা আরোপিত - তারই বার্তাবাহী শব্দ সমূহ ভারী চমৎকার ।শব্দ জাড্য নেই অথচ আছে পারিপাট্য ।

মেঘ-মর্ম ঃ

ক) মেঘমগন পূর্ব গগন, বেলা নাই রে আজ ।

এসো হেসে সহজ বেশে, নাই বা হল সাজ ।।

খ) মেঘে ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে ।

গ)   দিনান্তের এই এক কোণাতে

সন্ধ্যা মেঘের শেষ সোনাতে ।(গীতবিতান)

ঘ)   মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী (পূরবী)

প্রতিটি শব্দবৈভবে মেঘের মর্মকথা শব্দবিশারদ কবি

স্তরে স্তরে প্রাঞ্জল-প্রলেপে প্রকাশ করেছেন ।

শতধারা ঃ

ক)   শতশাখা অন্তরালে ফুলের মতন ।(সঞ্চয়িতা, পৃঃ ৩৭১)

খ)   শতেক যুগের গীতিকা (কল্পনা)

গ)   শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার ।

মানুষের নারায়ণে তবুও করনা নমস্কার ।(গীতাঞ্জলি)

চিরন্তন-সত্য-সন্ধানী কবির দৃষ্টিতে শত বা বহুকালের বহুভাব যথার্থ শতশব্দতরঙ্গে স্বতঃ উৎসারিত হয়েছে ।আবার শব্দ সারল্যে কত কত তত্ত্বকথা তার কাব্যে কাব্যে বিবৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই ।যেমন বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ আমরা দেখতে পাই গীতালির শব্দাবলীতে ঃ

"যাত্রা আমার চলার পাকে এই পথেরই বাঁকে বাঁকে

নতুন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।।"

এদিকে শব্দপ্রতীক সম্পর্কে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে,

"শব্দের প্রতীক আমাদের মনের সঙ্গে মিশিয়ে থাকে,

অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থের বিস্তার হতেও বাধা ঘটে না ।[২২]

বিশেষতঃ রবীন্দ্রকাব্যে শব্দের নৈপুণ্যজনিত ঔচিত্যবোধ সম্পর্কে ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় বলেন,[২৩]

"রবীন্দ্র ব্যবহৃত শব্দগুলি দুরূহ, অপ্রচলিত, আভিধানিক ছিল না । কিন্তু সেই সকল শব্দের প্রয়োগ ক্ষেত্রে তিনি নূতন অভিব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিলেন ।" তাঁর কাব্য আস্বাদনের এটাই মধুর মর্মকথা ।

কবি নিজের কথাতেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এতে ছন্দ, সুষমা ও গ্রাহ্য "ছন্দের নিয়মটা জানবার যোগ্য বিষয় বলে, কিন্তু ব্যবহার করবারকালে আরো বেশি কিছু আবশ্যক হয়, সেটা ভাবকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না - এ বেলায়ও খাটে— "ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন" ।[২৪]

রবীন্দ্রকাব্যে শব্দের আলংকারিক প্রয়োগরূপে রসে ভাবে অনুভাবে অপরিসীম

আনন্দধারা বর্ষণ করছে। তার কিছু প্রতীক নিম্নরূপে সংকলিত হল ঃ

১। অনুপ্রাসঃ
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলন-মাঙ্গল্য-হোম প্রজ্জ্বলিত পলাসে পলাসে। (বনবাণী)

২। উপমা অলংকার ঃ
জলেস্থলে স্তনে শিশুর মতন
আদিম আনন্দ-রস করিয়া শোষণ।

৩। পর্যায়োক্ত অলংকার ঃ
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী। (পূরবী)

৪। অর্থান্তর ন্যাস ঃ
ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান, লক্ষ লক্ষ তৃণ (কাহিনী)।

৫। সার অলংকার ঃ
নিজের সে বিশ্বের সে বিশ্বদেবতার
সন্তান নহে গো মাতা, সম্পত্তি তোমার।

৬। অপ্রস্তুত প্রশংসা ঃ
ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে। (কণিকা)

৭। সমাসোক্তি অলংকার ঃ
নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।

(অশেষ)

—কাব্যাংশের শব্দপ্রয়োগ রসিক পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে বৈকি।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের ক্ষেত্রে পর্যন্ত 'ভাষার প্রকৃতি' [২৫] বুঝাবার জন্য প্রত্যেকটি শব্দের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে কবি দীর্ঘ সমাস-বদ্ধ পদও ব্যবহার করেছেন যাতে করে শব্দ ব্যবহার ঔচিত্য অপূর্বভাবে মাধুর্যপূর্ণ হয়েছে। সমাস বদ্ধ পদ কাব্যে প্রয়োগহেতু কবির গভীর মনোভাব যথার্থরূপে প্রকটিত হয়েছে। ঠিক ঠিক ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক সমাসযুক্তপদ বা

শব্দ ব্যবহার চাতুর্য আশ্চর্যভাবে কাব্যোৎকর্ষ সম্পাদন করেছে। তৎকৃত সমাসগুলিতে অর্থগৌরব ও ধ্বনিসৌন্দর্য বিদ্যমান। যেমন —

১। কুরু পতি ! দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা জয়রস, ঈর্ষা-
সিন্ধুমন্থন সঞ্জাত, সদ্য করিয়াছি পান- । (গান্ধারীর আবেদন)

২। দেবী, তব নতনেত্রকিরণ-সম্পাতে চিত্ত বিগলিত মোর
সূর্যকরাঘাতে শৈলতুষারের মতো। (কর্ণকুন্তী সংবাদ)

৩। চির-অন্ত-অন্ধকার ...
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী

....

হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা (বলাকা)

৪। পুষ্পমালামাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষি দলে। (পূরবী)

সমাসদ্ধ পদ সাধারণতঃ কাব্যশ্রাব্যতার পরিপন্থী বলে বদ্ধমূল ধারণা থাকলেও রবীন্দ্রকৃত সমাসবদ্ধ পদসমূহ রসপূর্ণ হয়েছে। বিশেষতঃ সে সব শব্দের স্বতঃপ্রণোদিত প্রয়োগ হীরার হারের মত সতত মনোহরণ করে। এখানেই রবীন্দ্র শব্দ প্রয়োগ প্রভুত্ব।

তারপর 'লালনললিত যত্ন', 'সুরভিসোহাগ', 'অশ্রুগলিত গীতে' ঃ 'সৌরভবিহ্বল শুক্লরাতে' (মহুয়া), 'অরুণবরণ পারিজাত', 'ভাষাহীন ব্যথা', বিরামহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি' (গীতাঞ্জলি) - কবি-ব্যবহারের জন্য এসব শব্দের মনোরম-মালিকা আমাদের হৃদয়ে স্বতঃ আনন্দরসোৎপাদন করে। এতজ্জাতীয় শব্দ সৃষ্টির পারিপাট্য রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব।

রবীন্দ্রকাব্যে শব্দাদ্বিত্বে অমোঘ মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। কবি নানা ভাবানুভাবে শব্দযুগ্মের প্রয়োগ করে কাব্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি করেছেন। একই শব্দ দুইবার এক সঙ্গে সমুচ্চারিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা করে। রবীন্দ্রনাথ নিখুঁত মনের ভাব প্রকাশার্থে শব্দদ্বৈত প্রয়োগ করেছেন তাঁর কালজয়ী কাব্যে কাব্যে। ব্যাকরণে এ সব শব্দযুগ্ম দ্বন্দ্ব বা ব্যতিহার সমাসের বিষয়ীভূত হওয়ার কথা ছেড়ে দিলেও মহাকবির হাতে এ সব শব্দযুগলের প্রতিমা ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার নির্মাণশৈলীরূপে রসে গন্ধে ছন্দে লাবণ্যময়তা লাভ করেছে। আবার দ্বিরুক্তিমূলক শব্দসমূহ বহুবচনাত্মক অর্থ প্রকাশ করে, এটাও এর একটা বৈশিষ্ট্য। নিম্নলিখিত উদাহরণসমূহে শব্দবিৎ রবীন্দ্রনাথের যথার্থতা উপলব্ধি করা যাবে —

ক) ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী

নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি (পূরবী)

খ) দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী (ঐ)

গ) চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে । (প্রান্তিক)

ঘ) ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত - আঘাতে । (কল্পনা)

ঙ) সহে না সহে না আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় । (কল্পনা)

রবীন্দ্রনাথ ধ্বনিদ্বৈতাত্মক শব্দও তার কাব্যে প্রচুর ব্যবহার করেছেন । এতে শব্দ ধ্বনির অর্থব্যঞ্জনা প্রদান করে । যেমন কবির লেখাতে রয়েছে —

ক) প্রলয়পিণাক তুলি কবে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া,
জগতের আদি অন্ত থরথর থরথর
উঠিল কাঁপিয়া । (প্রভাত সঙ্গীত)

খ) সুখে গৌরীর আঁখি ছল ছল
তার হিয়া দুরু দুরু দুলিছে ।
তার পুলকিত তনু জরজর । (উৎসর্গ) [১৩]

গ) জীর্ণ পাতা বিদায় গাথা
গাইছে ঘমঘম । (বনবাণী)

ঘ) নয়ন মম করিছে ছলোছলো । (বীথিকা)

ঙ) তন্বী নৌকা তরতর চলে । (আরোগ্য)

খুব কাছাকাছি অর্থেও চমৎকার শব্দদ্বিত্ব দৃষ্ট হয় — তার কাব্যের মণিপটে । যেমন —

ক) যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়,
রব গায় গায় মিশি ।
....
.... রব আমি কাছে কাছে
.... বেড়াইব পাছে পাছে ।। (ছবি ও গান)

খ) সৃষ্টি যজ্ঞে সেই হোম
তোমার সত্তায় চুপে চুপে । (বৃক্ষবন্দনা)

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আর এক প্রকার জোড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে, যেটা হল

ধ্বনিদ্বৈত। কবির মতানুসারে "বাংলায় তাহার প্রধান কর্ণধার ট-ব্যঞ্জনবর্ণটি।... অর্থাৎ ট, ফ, স ও ম এ চারটি ব্যঞ্জনবর্ণই বিকারে স্থলে যুক্ত হয়।[২৭]

ক) ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছট্‌ফট্‌। (সহজপাঠ) কথাটি খুবই খাঁটি যে, "রবীন্দ্রকাব্যের মূল সৌন্দর্য তার শব্দ চয়ন ...।"[২৮]

ব্যতিহার সমাস বিন্যাসেও শব্দদ্বৈতের প্রভাব প্রভূতরূপে দৃষ্ট হয। এর বৈশিষ্ট্য পরস্পর সাপেক্ষ ক্রিয়া বা পরস্পর ক্রিয়া বিনিময়। রবীন্দ্রকাব্যে রয়েছে ঃ

ক) যে ভাষায় তারা করে কানাকানি। (উৎসর্গ)

খ) শরৎকালের পশ্চিম আকাশে
সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি। (পুনশ্চ)

গ) বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছে তাড়াতাড়ি। (ঐ)

ঘ) দোঁহাব মুখে দোঁহে চেয়ে নাই হৃদয়ের খোঁজাখুজি।
মধুমাসে মোদের মিলন নিতান্তই এ সোজাসুজি।। (ক্ষণিকা)

ঙ) দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম। (সেঁজুতি)

শব্দ ও অর্থের প্রতীতি দৃঢ় হওয়াতে মানুষের চিত্তে তাদের স্মৃতি জেগে থাকে।[২৯]

শব্দনৈপুণ্যের ভিত্তিভূমি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথাটি দিয়েই গঙ্গাজলে গ[illegible]াব মত রবীন্দ্রপূজা শেষ করছি,[৩০]

"সাহিত্যের মধ্যে কারুকাজ, কাব্যে যার প্রাধান্য, তার একটা দিক হচ্ছে শব্দেব বাছাই - সাজাই করা। কালে কালে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ভাষায় শব্দ জমে যায় বিস্তব। তারমধ্যে থেকে বেছে নিতে হয় এমন শব্দ যা কল্পনার ঠিক ফরমাশটি মানতে পারে পুরো পরিমাণে।"

অবগতির সূত্র

১। Panchatantra of Visnusarman, M.R. Kale. Edition, Delhi, 1911, P-2.

২। রঘুবংশম, মহাকবি কালিদাস ১/১, গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৮৩।

৩। Quoted from the Philosophy of Word and its Meaning, Dr. Gaurinath Shastri, Cal. 1959, P. 17.

তদ্বিষয়ক আলোচনা ঃ শব্দার্থ তত্ত্ব, অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃঃ ১-৪ । 'শব্দের রয়েছে ধ্বনি ও অর্থ' কাব্যতত্ত্ব, ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১৬ ।

৪। পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী, ১/১ ।

৫। সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রকা ইতিহাস, যুধিষ্ঠির মীমাংসক, ১ম খণ্ড, ২০২০ সংবৎ, পৃঃ ১৯৮ ।

৬। মহাভাষ্য, অঃ ১, পাঃ ১, আঃ ১ ।

৭। আচার্য যাস্কের নিরুক্তিঃ ১/১৬ শব্দের অর্থ হল -

"শব্দোহক্ষরে যথোগীত্যোর্বাক্যে খে শ্রবণে ধ্বনৌ ।"

বাঙ্ময়ার্ণব ঃ , মঃ মঃ রামাবতার শাস্ত্রী, বারাণসী, সংবৎ ২০২৫, পৃঃ ৪৪০ ।

৮। তর্কসংগ্রহ, নারায়ণ গোস্বামী, কলি ১৩৮০, পৃঃ ৪৪০

৯। ন্যায়দর্শন বিমর্শঃ, ডঃ কালীপ্রসাদ সিংহ, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃঃ১৩৬ ।

১০। তদেব, পৃঃ ১৩৮ ।

১১। উনাদি সূত্রম, ৪.৯৭ ।

১২। শব্দস্তোমমহানিধি ঃ তারানাথ ভট্টাচার্য, বারাণসী, ১৯৬৭, পৃঃ ২৬২ ।

১৩। মালবিকাগ্নিমিত্রম, কালিদাসকৃত, ৪/৩১

১৪। শিশুপালবধম, পৃঃ ৪৪৮ (মঃ মঃ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত)

১৫। নৈষধচরিতম্ ১/১২

১৬। শ্রীমাঘকৃতশিশুপালবধম্, মঃ মঃ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, পৃঃ ১৭৪।

১৭। কাব্যালংকার - সূত্র বৃত্তি, ১/৩/১৫ ।

১৮। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৪৫।

১৯। জীবনস্মৃতি, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা, ১৩১৯, পৃঃ ৫৩ ।

২০। সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৯৬৯, পৃঃ ৮ ।

২১। বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৯৬৯, পৃঃ ৫৯ ।

২২। বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৯৬৯, পৃঃ ৫৯ ।

২৩। রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য, ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়,

কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃঃ ২৩ ।

২৪। উদ্ধৃতি ছন্দ-জিজ্ঞাসা, প্রবোধ চন্দ্র সেন, কলিকাতা ১৯৭৪, পৃথ ৭৫৪ ।

২৫। অনুবাদ চর্চা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, কলিকাতা, ১৩৫৭, ভূমিকা, পৃঃ ৫।

২৬। এস্ব ধ্বনিদ্বৈত্যত্মক শব্দ দ্বাবা হরগৌরীর মিলনের প্রাক্‌কালের আত্যন্তিকভাব যেরূপ প্রকাশিত হয়, কবির মৃত্যুর সঙ্গে সেরূপ ভাববিনোদিত হযেছে —
রবীন্দ্রসাহিত্য ঃ মৃত্যুর অমৃত পাত্রে, ডঃ শিশিব কুমার সিংহ, ১৯৯২, পৃঃ ৮৩ ।
মূলতঃ শব্দদ্বৈতেব ব্যবহাব এত মূল্যবহ ।

২৭। শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র বচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ৪০৫ ।

২৮। বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ, ডঃ কৃষ্ণা দাশ, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ২৬৯ ।

২৯। কাব্যতত্ত্ব, ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ বায়, কলিকাতা ১৯৮৬, পৃঃ ২০ ।

৩০। বাংলাভাষা পরিচয, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভাবতী ১৯৬৯, পৃঃ ৫৯ ।

লেখক পরিচিতি ঃ

[illegible] স্কুলের ৭ম শ্রেণী থেকে বাংলা কবিতা রচনার সূচনা । তারপর [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে অনার্স ও এম.এ ফার্স্ট ক্লাশ পাশ করে গবেষণার [illegible] পি.এইচ.ডি., পি-আর. এস. (সাহিত্য) এবং মৌয়াট রিসার্চ গোল্ড [illegible] থেকে বাংলায় সাহিত্যভারতী ও অন্যান্য বহু সংস্থান থেকে সংস্কৃতে [illegible] উপাধি লাভ করেন । কর্মজীবনে রামঠাকুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃ সমিতির [illegible] ও অধ্যক্ষ পদে যুক্ত হন । অতঃপর ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট [illegible] সালে অবসর [illegible] । [illegible] রেজিস্ট্রার ছিলেন [illegible] বিদ্যাবিজ্ঞান [illegible] । [illegible] আধিকারিক ছিলেন গভঃ [illegible] এডাল্ট এডুকেশন সেন্টারে (১৯৮৩-৯৫) । [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে গেস্ট লেকচারার (বাংলা) হিসাবে পড়াচ্ছেন তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব ১৯৮৪ থেকে । সংস্কৃত মহাকাব্য [illegible] [illegible] (ট্রাইবেল [illegible]) কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছে অনেক কপি । [illegible] বিদ্যাবত্তার জন্য 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পেয়েছেন ২০০৩ সালে । এছাড়াও [illegible] ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি ও বাংলা ভাষায় কাব্যগ্রন্থ [illegible] নিবন্ধ ।

******

রূপকথা ঃ লোককথা

— ডঃ রণজিত দে

'বাংলার কৃষি জীবন' বলে আমার যে ইংরেজী বই আছে, তাতে আমি চাষীর গোবিন্দকে রোজ সন্ধ্যায় বেশ কয়েকঘন্টা ধরে শম্ভুর মা বলে এক বুড়ির গল্প শুনিয়েছি। সারা গাঁয়ে নাকি কেউ অত ভালো গল্প বলতে পারত না । বিশিষ্ট ভারতীয় শাসক স্যার রিচার্ড টেম্পল- এর ছেলে বেঙ্গল স্টাফকোর-এর ক্যাপ্টেন আর সি টেম্পল ঐ অংশটি পড়ে আমাকে লিখেছিলেন যে এ দেশের বুড়িরা সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছেলেমেয়েদের যে সব অলিখিত গল্প বলে, তার একটি সংগ্রহ পেলে বেশ হয় । তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আমি ঐ রকম একটি সংকলন করে দিতে পারব কিনা।

গ্রিস ভাইদের গল্প সংগ্রহ ডাসেন্ট্রের 'নর্স কাহিনী' পোয়েল অনুদিত আর্নাসনের 'আইসল্যাণ্ডের গল্প', ক্যাম্বেলের করা 'হাইল্যান্ড কাহিনী'-র ইংরেজী সংস্করণ, আরো অন্যান্য লেখকদেরকৃত নানান পরীদের গল্পের সংগ্রহ প্রকাশিত হলে, লোককথা ও আপেক্ষিক পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে অধুনা যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই বইখানি যতই অকিঞ্চিতকর হোক না কেন, তবু হয়তো খানিকটা করলেও কেমন হয়, এতেও প্রমাণ হবে যে, গঙ্গাতীরের কালো কালো প্রায় উলঙ্গ চাষী হল টেমস নদীর ধারের ফরসা সুবেশ ইংরেজরই ভাই, তা সে যতই দূর সম্পর্কের হোক না কেন । তাই প্রস্তাবটা আমার মনে লেগে গেল, আমিও উপকরণ সংগ্রহ করতে লেগে গেলাম।" (১) বস্তুত এই ধারণায় অনেকেই অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়ে পরে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র মতই সংগ্রহ কাজ করেন । এই সব লোককথা বা গল্পকে ত্রিপুরা রাজ্যে পরস্তাব বলে । এর সাহিত্যিক নাম রূপকথা-উপকথা । "বাংলায় লৌকিক কাহিনী অর্থাৎ কোকটেল বা ফেয়ারী টেল অর্থে একদা অপূর্বকথা শব্দটি চলিত ছিল । কালক্রমে লোকমুখে অপূর্বকথা পরিবর্তিত হল অপরূপ কথায় । অবশেষে অপবাদ করে দালাল রূপকথায়"। (২) লোককথার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, নাপিত বা রাজার, রাজপুত্রের প্রসঙ্গেই প্রাধান্য পায়, রূপকথা বা পরস্তাবের শুরুটা সহজ সরল — "এক ছিল ব্রাহ্মণ", এভাবে প্রস্তাবের শুরু । "এক যে ছিল রাজা"— এই বলে প্রস্তাব শুরু হয়, কিন্তু শ্রোতার মনে প্রশ্ন জাগে না — এ রাজার রাজ্য কোথায়, রাজধানী কোথায়? 'তখন ইহার বেশি জানিবার আবশ্যক ছিল না । কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি ? এরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ বোধ করিতাম না । রাজার

নাম শিলাদিত্য কি শালীবাহন, কালী, কাঞ্চী কোনৌজ, কৌশল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাহার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল, আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ বেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা" । তারপর বহু ঘটনা—রাজা, উজীর, কোটাল অনেকের জীবনে বহু সমস্যা দেখা দেয়— সমাধানও হয় — শুনতে শুনতে শিশু বৃদ্ধ সকলেই মুগ্ধ হয় — তারপর সব জানার অবসান হয়— শুধু তেপান্তরের পরে রাজকুমার রাজকন্যার অন্তর্ধানের ছবিটি জেগে থাকে ।

বস্তুত ঃ গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন । লোককথার অলৌকিকতার স্রোতে মানুষের মন অবাধ গতি লাভ করে, বাস্তব আকাঙ্খার কাল্পনিক সমাধান ঘটে । অন্যান্য দেশও জাতির মত ত্রিপুরার মানুষের লোককথার প্রচুর সম্পদ আছে । কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য "এখনকার কালে বিলাতের ফেয়ারি টেলস" আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে । 'স্বদেশের দিদিমা কোম্পানি একেবারে দেউল । তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিক্‌স এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু কোথায় গেল—রাজপুত্র, মন্ত্রী পুত্র, কোথায় গেল বেঙ্গমা বেঙ্গমী, কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদী—পারের সাত রাজার ধন মাণিক !

পালাপার্বন যাত্রাগান কথকতা, এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে । ইহাতে বয়স্কলোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে, দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রসে বঞ্চিত হইল । তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এত নীরব কেন ? ...

"কেবলি বইয়ের কথা ।

স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল ? ...

এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙালী বালকদের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অক্ষুন্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত, বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষকদের পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে ... নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত" ।

রূপকথা, প্রস্তাব বা লোককথা বা গল্প রাজ্যের নানা জায়গায় নানাভাবে ছড়িয়ে আছে।

শিশুসাহিত্য হিসাবে প্রচলিত থাকায় লোককথা বা রূপকথা উপযোগিতা সম্পর্কে মাঝে মাঝে প্রশ্ন দেখা দেয়। সন্ধ্যায় শিশুদের আনন্দদান এগুলির বিশেষ দিক হিসাবে পরিগণিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি পরিণত মনের ও রসপিপাসা চরিতার্থ করতে পারে, কারণ বয়স্ক নারী পুরুষ যখন এগুলি বলে — তখন তারা নিজেরা এগুলিতে আনন্দ ও অতৃপ্তি জনিত ক্ষুধা মোচন করেন। এ বিষয়ে পরিণত মনের ভূমিকা সম্পর্কে আর. এম উকিনস্ বলেন যে, বুদ্ধি ও মানসিক চর্চার দিক দিয়ে অগ্রসর সমাজের প্রস্তাব বা লোককথায়, রূপকথা মানব চরিত্রেরও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে এর স্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। 'ফকির চাঁদ'— একটি জনপ্রিয় কাহিনী। ইহার প্রথম ভাগেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের ঘোড়ায় চড়িয়া দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছে। যাত্রাপথে আড়ম্বর সহকারে কেহ তাহাদিগকে আনুষ্ঠানিক বিদায় সম্বর্ধনা জানায় নাই, মাতা পিতার অশ্রুপাত করিয়া তাহাদের যাত্রাপথ পিচ্ছিল করিয়া দেয় নাই। তারপর তাহারা যখন চলিয়াছে তখন সম্মুখের দিকে কেবলই চলিয়াছে — কত নদনদী গিরিগুহা অরণ্যপ্রান্তর তাহাদের পথের দুই পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। কিছুই তাহাদের পথ রোধ করিতে পারে নাই। একদিন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে আসিয়া রাত্রি হইল, অন্ধকারে পথ দেখিতে পাওয়া যায় না, নীচে অশ্ব বাঁধিয়া বৃক্ষের শাখায় আরোহন করিয়া তাহারা শঙ্কিত প্রহর গুণিতে লাগিল। এমন সময় পথ চিহ্নহীন নির্জন অরণ্যে এক নতুন পথের নিশানা দেখা দিল। অজগরের পরিত্যক্ত মানিক লাভ করিয়া তাহার প্রদীপ্ত আলোকে তাহারা সেই নতুন পথ রেখা ধরিয়া চলিল। তারপর, যেখানে পৌঁছিল, সূর্যের কিরণ সেখানে পৌঁছিতে পারে না। অথচ উদ্যানে চিরবসন্তের অমলিন পুষ্প সম্ভার নিত্য সুরভি দান করে — কোন জনমানুষ নাই — অথচ সুবৃহৎ ফটিকের প্রাসাদ শৃঙ্গ তুষারের মত সুনির্মল দেখায়। তাহার মধ্যে সোনার পালঙ্কে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার শিয়রে সোনার কাঠি ও পদতলে রূপার কাঠি। কাহিনীটি এই পর্যন্তই। এক অলৌকিক পথে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র যে জনমানবহীন দেশে আসিয়া এক ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধান পাইল, সেই দেশটি কি ? ... এই যে রাজকন্যা শিয়রে সোনার কাঠি ও পৈধানে রূপার কাঠি লইয়াগভীর নিদ্রার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা অনন্ত জীবনধারাই প্রতীক। জন্ম ও মৃত্যু জীবনের এই দুই পরিচয়। জন্মের পর মৃত্যু। মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম ইহা সোনার কাঠি রূপার কাঠির এক অনন্ত খেলা, এই রূপক কথাটির মধ্যে এই যে একটু রূপক বা সঙ্কেত রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষাভাবে পরিণত

মনকে স্পর্শ করিতে পারে ।" সুতরাং শুধু শিশুসাহিত্য বলে লোককথাকে প্রকাশ করার পদ্ধতি সঠিক নয় । কারণ এই সাহিত্য শিশুদের দ্বারা রচিত নয় -- বা শুধু তাদের জন্য রচিত নয় । আদিম মানুষ তার জীবন ও চেতনা দিয়ে এগুলি রচনা করেছে । বস্তুত আদিম মানুষের সহজ সরল এই জীবন ও চেতনাকেই শিশুকে বোঝানো যেতে পারে । প্রকৃতপক্ষে আজকের নাগরিক সভ্যতায় বর্ধিত শিক্ষিত শিশুর মনোভঙ্গী ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে আদিম মানুষের মনোভঙ্গী তুলনীয় । এখানে একটি লোককথা তুলে ধরা হলো— যেখানে জীবনের মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ।

ইতর প্রাণীও মানুষ ঃ

এক জমিদার ছিলেন । খুব প্রতাপশালী জমিদার । গ্রামবাসী সবাই তাঁর প্রজা— সবাই তাঁকে ভয় করে । তিনি প্রজাদের উপর অত্যাচার করতেন । ভগবানের এমনই লীলা—তাঁর কোন সন্তান ছিল না । জমিদার ও তাঁর স্ত্রী চিন্তা কবলেন— বয়স বাড়ছে, এখন আমাদেরে পরকালের জন্য কিছু করা দবকাব । জমিদার বললেন যে, একজনকে গুরু ধরে— তাঁর থেকে মন্ত্র নিয়ে পরকালের ব্যবস্থা করা দরকার । এরপর স্বামী-স্ত্রী ঠিব করলেন, তাঁদের প্রজা একজন গোঁসাই থেকে মন্ত্র নেবেন ।

এরূপ স্থির করে পরদিন ভোরবেলায় জমিদার ও তাঁর পত্নী সেই গোঁসাইর বাসায় উপস্থিত হলেন । গোঁসাই তখনও ঘুম থেকে উঠেন নি । জমিদাবেব কথা শুনে খুব ভীত হয়ে পড়লেন । কারণ, জমিদার কোন অত্যাচার করবে কিনা—ডাকছে যখন দরজা খুলে দিল । তারপর সম্বর্ধনা করে ঘরে নিয়ে বসাল ।

জমিদার বললেন—গোঁসাই আপনার নিকট এসেছি । আপনার নিকট দীক্ষা নিতে চাই । গোঁসাই ভাবলে, এই সুযোগ-জমিদার সর্বদাই অপমান অত্যাচার করছে, এবার সুবিধামতো পাওয়া গেল । তারপর জমিদারকে বললেন, আচ্ছা বাপু, এসেছ ভালো কথা— কিন্তু আজ তো হবে না । ভালো দিন স্থির করেই এই কাজ করতে হবে । এছাড়া নানা জিনিসপত্রও লাগবে । জমিদার বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে । আপনার কি কি লাগে তার একটা ফর্দ দিন এবং দিনস্থির করে বলে দিন । গোঁসাই বললেন — আমি তো দরিদ্র মানুষ—পঞ্জিকা নেই । জমিদার বললেন, আমার কাছ থেকে টাকা নিন— আপনি পঞ্জিকা কিনে দিন স্থির করে দিন ।

গোঁসাই গোঁসাইনি আলোচনা করতে লাগলেন কি করা যায় ? গোঁসাই বললেন— সুযোগ মতো দিন পাওয়া গেল, এখন এমন একটি ফর্দ দাও—যাতে আমাদের অনেকদিনের খাদ্য সংগ্রহ হয়ে যায় । গোঁসাই বিকেল বেলায় বাজারে গেলেন — কিন্তু পঞ্জিকা কিনলেন

না । জমিদারের নিকট থেকে অর্থ আদায়ের জন্যই—নেই বলেছেন । পরদিন কথামত জমিদার গোঁসাইর বাড়িতে এলেন ।

গোঁসাই বললেন, এ মাসে তো শুভ দিন নেই ।

সামনের মাসে অমাবস্যা তিথিতে সোমবার পড়েছে— ঐ দিন কাজ করতে হবে এবং একটি ফর্দ দিয়ে দিল সোনা রূপা, চাল ডাল, ফলমূল, কাপড়, চোপড় ইত্যাদি ।

জমিদার বাড়ি এসে গিন্নিসহ যুক্তি করে সমস্ত জিনিস কিনে নিল, তারপর ডাকল প্রজাদের । এই উপলক্ষে তাদেরও খাওয়াতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । জমিদার তার এই ইচ্ছা প্রজাদের নিকট প্রকাশ করলেন এবং তাদের জানালেন—এই সব ব্যাপারে তোমরা সকলে সহযোগিতা করে কাজ করবে । প্রজারা তো জমিদারের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল । জমিদার আবার জানিয়ে দিলেন যে, এই খাওয়া হবে নিরামিষ, কারণ গুরুর আদেশ।

দেখতে দেখতে দীক্ষার দিন এসে গেল । গোঁসাই এবং গোঁসাইনি সমস্ত প্রকার আয়োজন করে জমিদার বাড়ি এলেন । অন্যান্য প্রজারাও উৎসাহের সঙ্গে রান্না ও অন্যান্য কাজকর্ম করতে লাগল । বেলা এগারটা গোঁসাই বলল-আপনারা স্নান করে আসুন এবং স্নান করে আসতে এক ঘটি জল আনবেন ।

তাঁর পূর্বদিন সংযম পালন করেন এবং পরদিন স্নান করে এসে দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন । কয়েকদিন পরে জমিদারের মন সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ল । জমিদার স্ত্রীকে সেকথা জানালেন । জমিদারের স্ত্রী সেকথা শুনে বললেন যে—তিনিও জমিদারের সঙ্গে যাবেন । জমিদার তাঁকে নানাভাবে বুঝলেন । তারপর উভয়ে গোঁসাইর নিকট গেলেন এবং বিষয় সম্পর্কে সব গোঁসাইকে সমর্পণ করে বললেন যে জমিদারের স্ত্রী গোঁসই-এর সেবা করবেন । জমিদার সংসার ত্যাগ করে চলে যাবেন । গুরুর আশীবার্দ নিয়ে জমিদার চলে গেলেন ।

যেতে যেতে জমিদার গভীর অরণ্যে চলে গেলেন । সেই অরণ্যে এক জায়গায় জমিদার কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন । কন্নার শব্দ শুনে জমিদার এক জায়গায় দেখলেন— একটি গর্তে একটি সাপ, একটি বাঘ, একটি বানর ও একটি মানুষ পড়ে গেছে । তারাই কান্না করছিল । জুমে ত্রিপুরীরা আগুন দিয়েছিল । আগুনের তাপে তারা পালাচ্ছিল, সেই সময়ে গর্তে পড়ে যায় । তারা সেখান থেকে আর উঠতে পারছিল না । একজন আর একজনকে ইচ্ছে খেতে পারে— কিন্তু খাচ্ছে না । তারা সকলে জমিদার বাবুকে অনুরোধ করল, তাদের উপরে তোলার জন্য । জমিদার আর কি করে — জুম থেকে একটা লতা এনে কূপে ফেলল । লতা পেয়েই টপ করে বানর উপরে উঠে এল এবং জমিদারকে

নমস্কার দিয়ে বলল—তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, তুমি আমার কাছে যেও । আমি এই উপকারের প্রতিদান দেব । তবে তোমার কাছ আমার অনুরোধ সবাইকে তুললেও দু'পায়াকে তুলবে না ।

জমিদার আবার লতা ফেললেন—এবার উঠল সাপ । সাপও জমিদারকে প্রণাম করল এবং বলল— তুমি আমার প্রাণদাতা বন্ধু - তোমার কি উপকার করব, তবে তুমি আমার দুইটা চুল রাখ । যখন বিপদে পড়বে এই দুটা আগুনে দিলে আমি অসব । এই বলে সাপ চলে গেল, দু'পায়া বা মানুষটিকে তুলতে মানা করল । জমিদার আবার লতা ফেললেন—এবার উঠল বাঘ । বাঘ ও জমিদারকে প্রণাম করলেন এবং বললেন যে তুমি আমার প্রাণদাতা বন্ধু — আমি অমুক পর্বতে থাকি, কোনদিন যদি ঐ দিকে যাও— আমার সাথে দেখা করিও । বাঘও অন্যদের মত বলল যে— তোমায় একটি অনুরোধ দু পায়াকে তুলবে না ।

সবাই মানুষকে তুলতে মানা করলেও জমিদার ভাবলেন — সংসার সবকিছু ছেঁড়ে যখন চলে এসেছি— তখন আর কিসের ভয় ? লোকটি আমার কি ক্ষতি করবে ? বিষয় আশয় নিয়ে তো সংসারে অশান্তি । এই ভেবে লোকটিকেও তুললেন । লোকটি উঠে নমস্কার করল এবং নিজের নাম ও ঠিকানা দিল ।

তারপর কিছুদিন পরে জমিদার ভাবল— আচ্ছা বানরের এখান থেকে একবার ঘুরে আসি । এই বলে বানরের ঐখানে গেল । বানর ওকে কোলাকুলি করল, নমস্কার করল । এ অবস্থা দেখে সব বানরেরা জমিদারকে প্রণাম করল । বানর জমিদারকে এখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করল । জমিদার জানাল যে —ঘুরতে ঘুরতে বানরের কাছে আসা হয়েছে । এরপর বানর অন্যান্য বানরদের খাবার আনতে এবং জমিদারকে যত্ন আর্তি করতে বলল । জমিদারের কয়েকদিন খুব সুখে গেল । এরপর জমিদার বিদায় নিলেন । বিদায়ের পূর্বে বানর বন্ধু একটা ফল দিল এবং বলল যে এই ফল যে খাবে, সে দীর্ঘজীবন ও যৌবন প্রাপ্ত হবে । জমিদার ফল নিয়ে আবার চলতে লাগলেন । চলতে চলতে ভাবলেন—আমি ফল নিয়ে কি করব—আমি তো সংসার ত্যাগ করেছি এবং ফলটা গুরুকেই দিই, তাহলে গুরু আরো কিছুদিন জমিদারি— ভালোভাবে চালাতে পারবে এইভেবে গুরুর বাড়িতে রওনা দিল ।

এদিকে গুরু শিষ্যের পত্নীকে দেখে—তার প্রতি খুব আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন । কিন্তু শিষ্যপত্নী—এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না — কারণ শিষ্যপত্নী-র নিকট গুরু সেবাই ছিল প্রধান কাজ । এই অবস্থায় শিষ্যের আগমনে গুরু ভয় পেয়ে গেলেন । কারণ গুরুর মনে হল শিষ্যপত্নী যদি শিষ্যকে এই সব কথা বলে দেন—তবে

ঝামেলা হবে । কিন্তু দেখা গেল শিষ্য কারো সঙ্গে কথা বললেন না— সোজা গুরুর নিকট গেলেন এবং গুরুকে বললেন, "গুরুদেব এই ফলটা আপনার জন্য এনেছি—এই ফল খেলে মানুষ দীর্ঘ যৌবন ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করে । আমি তো সংসার ত্যাগ করে চলে গেছি- আমার এটাতে প্রয়োজন নেই । এরপর ফলটা দিয়ে শিষ্য আবার চলে গেলেন, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বললেন না ।

গুরু শিষ্যের ধর্মের প্রতি এই আগ্রহ দেখে খুব অবাক হয়ে গেলেন। তারপর পত্নীকে বললেন, এই ফলটা রাখ— এটা একটা বিষফল, খুব সাবধানে রাখ । এরপর কয়েকদিন চলে গেল ।

এদিক শিষ্য বনের পথে পথে চলতে চলতে ভাবল বাঘ-বন্ধুর কাছে যাওয়া যাক । তারপর চলতে চলতে বাঘ বন্ধুর দেশে গিয়ে পৌঁছলেন, বাঘ তাকে দেখে নমস্কার করলো, আলিঙ্গন করলো । বাঘ অন্যান্য বাঘদেরও বলে দিল— বন্ধুর জন্য খাবার আনতেও আদর আপ্যায়ন করতে । বাঘ বাজারে থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে এল । এইভাবে শিষ্য কয়েকদিন সুখেই কাটালেন । তারপর একদিন বন্ধু বাঘের কাছে বিদায় চাইলেন । বাঘ বলল, ঠিক আছে তুমি চলে যাচ্ছ । একটু অপেক্ষা কর, এই কথা বলে বাঘ রাজবাড়ির দিকে গেল । এই সময় রাজবাড়ির পুকুরে রাজার মেয়ে স্নান করছিল । বাঘ লাফ দিয়ে রাজার মেয়ের গলা থেকে বহুমূল্যের হারখানা নিয়ে এল এবং শিষ্যকে বলল —"বন্ধু এই নিন, আপনাকে আমি আর কি দিব - হারখানা নিন" । শিষ্য হারখানা নিয়ে রওনা হল । ভাবল মনুষ্য বন্ধুর বাড়ি যাবেন । চলতে চলতে শিষ্য মনুষ্য বন্ধুর বাড়ি পৌঁছলেন, মনুষ্য বন্ধু শিষ্যের ডাকে প্রথমে সাড়া দিতে চায় নি । পরে শিষ্যকে আলিঙ্গন করে ঘরে নিল । তারপর রাত্রে খাওয়ার পর শিষ্য বন্ধুকে বাঘের দেয়া হারখানা রাখতে দিলেন । হার দেখে তো বন্ধু অবাক । সে বুঝল এই হার এই রাজ্যের রাজার কন্যার ।

রাজকন্যার হার বাঘে নেয়ার পর — রাজকন্যা রাজাকে বলেছিল — হারখানা বাঘে নিয়েছে । রাজা এই ঘটনা বিশ্বাস করেনি । রাজা ভাবল — হার কেউ নিয়েছে । রাজা এই রাজ্যে ঘোষণা দিয়েছিল, যে হার দিতে পারবে — সে ৫০০ টাকা পুরস্কার পাবে।

এই পুরস্কারের খবর মানুষ বন্ধুটি জানতে পারল । সে রাত্রে জমিদার বন্ধুকে ঘুমাতে দিয়ে রাজবাড়ির সেপাইর নিকট গেল এবং তাদের বলল "রাজকন্যার হার পাওয়া গেছে । তোমরা কাল খুব সকালে আমার বাড়ি যাবে এবং সেখানে একজন লোক দেখবে । ওর কাছেই হারটা আছে । তারপর আমাকে আমার পুরস্কার দেবে ।" পরদিন সকালে রাজার সেপাই এসে শিষ্যকে ধরল এবং হারের কথা জিজ্ঞেস করল । তারপর শিষ্যকে কারাগারে রাখতে হুকুম দিল । শিষ্য অতিকষ্টে কারাগারে দিন কাটাতে লাগলেন ।

এইভাবে দিন কাটাতে কাটাতে শিষ্যের সাপের কথা মনে পড়ল । একদিন আগুনে শিষ্য সাপের দুটো চুল ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সাপ এলো । সাপ বলল, 'কি বন্ধু আমায় কেন ডেকেছ ? শিষ্য সব কথা বললেন । সাপ বলল, ঠিক আছে । আমি এখন যাওয়ার সময় রাজার ছেলেকে মেরে যাব এবং তোমাকে দুখানা চুল দিয়ে যাব । রাজার ছেলেকে কেউ ভাল করতে পারবে না । তুমি বলবে যে তুমি ভালই করবে । তারপর তুমি আবার এই দুটি চুল পোড়ালে আমি আসব এবং ছেলের বিষ তুলে নেব । এই বলে সাপ রাজার ছেলেকে কামড় দিয়ে বলে গেল। হঠাৎ এই ঘটনায় রাজবাড়িতে কান্নাকাটি আরম্ভ হল । রাজা ডাক্তার বদ্যি ওঝা আনল, কিন্তু কেউ ভাল করতে পারল না ।

এই কারাগার থেকে শিষ্য বলল যে সে ভালো করতে পারবে । রাজা তাকে মুক্তি দিল । শিষ্য গোপনে মন্ত্রতন্ত্রের কথা বলে — গোপনে চুল পোড়াল। চুল পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপ এলো । সাপ দেখে লোকজন সরে গেল । সাপ এসে ছেলের বিষ নিয়ে চলে গেল। এই ঘটনায় রাজার শিষ্যের উপর খুব বিশ্বাস হল এবং বুঝল যে সে চোর নয় ।

তারপর শিষ্য সব কথা বলল । রাজা বুঝলেন যে—সমস্ত চক্রান্ত লোকটার দ্বারাই হয়েছে । রাজা শিষ্যকে অনেক ধনসম্পদ দিতে চাইলেন — কিন্তু শিষ্য কিছুই গ্রহণ করলেন না । শিষ্য চলে গেল । রাজা লোকটাকে খুব শাস্তি দিলেন।

এদিকে যে ফলটা শিষ্য গুরুকে দিয়েছেন সে ফলটা গুরুপত্নী পায়খানায় ফেলে দিল। কারণ একদিন তার স্বামী রাগ করেছিল এবং সংসার ত্যাগের ভয় দেখিয়েছিল । স্ত্রী ভাবল স্বামী ফল খেয়ে মারা যেতে পারে । এদিকে রাজবাড়ির মালী — ময়লা পরিস্কার করতে এসে সেই ফলটা পেল এবং মালিনীকে সেই ফলটা দিল, তবে খেতে নিষেধ করল । একদিন মালিনী—মালীর সঙ্গে ঝগড়া করে ফলটির অর্ধেক খেয়ে ফেলল । কিন্তু খেয়ে দেখল এর ফলে মালিনীর চেহারা ও স্বাস্থ্য খুব সুন্দর হয়ে গেছে । মালী এই দৃশ্য দেখে অবশিষ্ট অর্ধেক নিয়ে খেয়ে ফেলল । ফলে দুজনেরই স্বাস্থ্যই খুব সুন্দর হয়ে গেল । তারপর দুজনে গুরুর নিকট গেল এবং গুরুকে নমস্কার করে বলল যে ওরা আর কাজ করবে না । গুরু তো তাদের দেখে অবাক তারপর তাদের শরীর কিভাবে এরূপ হল জানতে চাইল । মালী তখন ফলের কথা জানাল । শুনে গুরু বুঝলেন যে— শিষ্যের দেয়া ফলটা তারা খেয়েছে । এই সময় শিষ্য এসে উপস্থিত । শিষ্যকে দেখে গুরু বললেন, তোমার দেয়া ফলটা তো আমি খেতে পারি নি — আমার স্ত্রীর ভুলে মালী-মালিনী খেয়েছে । তুমি আমাকে একটা এনে দাও ।

শিষ্য গুরুর আদেশ মানতে আবার বানর বন্ধুর ওখানে গেলেন । বানর বলল যে, একবার মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে একটাই ফল দিয়েছিল । এখন তো আর নেই ।

মহাদেবকে সন্তুষ্ট করতে পারলে হয়তো পেতে পার । এইকথা শুনে শিষ্য কৈলাসে চললেন। সেখানে গুরুর নামে শিষ্য মহাদেবকে স্তব করতে লাগলেন । মহাদেব এসে সব শুনে বললেন, যে ওটা পেয়েছিলাম শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে । শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিনী ঝগড়া করে গোলক থেকে ইন্দ্রের মাধ্যমে আনিয়ে ছিলেন । মহাদেব বললেন যে তুমি নারায়ণের নিকট খোঁজ করে দেখতে পার । শিষ্য এবার নারায়ণকে স্তব করে তার কাছে একটা ফল চাইলেন, নারায়ণ বললেন যে এই ফল ইন্দ্রের রক্ষকের নিকট পেতে পার । এবার শিষ্য গোলকধামে চললেন। এইভাবে বহুকাল চলে গেল ।

গোলকধামে এসে শিষ্য দেখলেন ভগবানের দুয়ারে শিষ্যের মৃত স্ত্রী স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছেন । গুরুও মারা গেছেন । সে স্বর্গে যেতে পারে নি — নরকে পড়ে কান্নাকাটি করছে । শিষ্য গুরুর এই অবস্থায় খুব কষ্ট পেলেন । গুরুকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করলেন । ভগবান বললেন যে এটা সম্ভব নয় । স্বর্গের সিংহাসন তোমাদের স্বামী স্ত্রীর জন্য ।

এইভাবে শিষ্য দোপায়ার দ্বারা লাঞ্ছিত হলেন এবং চোপায়ারদ্বারা স্বর্গে গেলেন ।

(পূর্ববর্তী) 'ইতর প্রাণীও মানুষ' প্রস্তাবে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার ছবি ফুটে উঠেছে । "উপকারীকে বাঘে খায়" এই প্রবাদের সমর্থক এই পরস্তাবটি । মানুষ যার নিকট থেকে উপকার পায় সুযোগ মতো তাই ক্ষতি করতে দ্বিধা করে না । লোকজীবনের এই সত্যটা পরস্তাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । প্রবাদের বাঘ দীর্ঘদিন খেতে না পেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করে । কিন্তু মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থেই উপকারীর অনিষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করে না । ইতর প্রাণীরা এই ধরণের ক্ষতি করে না । আমার আমাদের পরিচিত জীবনেই দেখতে পাই গৃহপালিত কুকুর বা অন্যান্য পোষা জীব প্রভুর সামান্য খাদ্যেই খুশী । কিন্তু মানুষকে যত দেয়া হোক — মানুষ খুশী হয় না বরং কম দেয়া হয়েছে বলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে । এখানে মানুষের এই স্বভাবকে কেন্দ্র করে একটি পরস্তাব তুলে ধরা হলো — চন্দনের ক্রন্দ ।

এক ছিল ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণ প্রতিদিন পূজো করতে নানা গ্রামে যায় । একদিন ব্রাহ্মণের দূর গ্রাম থেকে ফিরতে পথে রাত হয়ে যায় । ব্রাহ্মণের রাত কাটানোর জন্য এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল । এই সময় বাঘের ডাক শুনে ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগল । নিকটেই একটি চন্দন গাছ ছিল । ব্রাহ্মণের দুঃখে চন্দন গাছ বিচলিত হয়ে পড়ল । ব্রাহ্মণকে গাছ ডেকে বলল— আমার ফাটলের মধ্যে ঢুকে বসে থাক — রাত পোহালে চলে যাবে । বাঘে তোমাকে দেখতে পাবে না। ব্রাহ্মণ ফাটলে ঢুকলে—ফাটা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যায়, রাত পোহালে ফাটলের মুখ খুলে যায় — ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বাড়ির দিকে রওনা হয় ।

রাজবাড়ির পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় রাজার উজির ব্রাহ্মণকে ভোরবেলা কোথা থেকে আসছে জিজ্ঞেস করে । ব্রাহ্মণের নিকট এলে, উজির তার গায়ের গন্ধে অবাক হয়। উজির বলল - ব্রাহ্মণ তোমার গায়ে কিসের গন্ধ ? ব্রাহ্মণবলল যে তার গায়ে কোন গন্ধ নেই । উজির এই জবাব শুনে খুব রেগে যায় । উজির ভাবল ব্রাহ্মণ মিথ্যে কথা বলছে । উজির ব্রাহ্মণকে রাজার নিকট নিয়ে গেল এবং বলল যে, ব্রাহ্মণের গা থেকে সুবাস বের হচ্ছে । ব্রাহ্মণ কোথা থেকে এই সুবাস পেল, তা বলতে অস্বীকার করছে ।

রাজা ঃ ঠিকই তো ব্রাহ্মণ-তোমার গায়ের গন্ধে রাজাবাড়ির এলাকা সুবাসে ভরে গেছে । তোমার আসার আগে তো এমন গন্ধ ছিল না ।

ব্রাহ্মণ ঃ রাজা মশাই, আমি কোন গন্ধ দ্রব্য লাগাইনি ।

রাজা ঃ কি বললি ? মিথ্যা কথা বলবি না । গায়ে গন্ধদ্রব্য না দিলে গন্ধ কোত্থেকে আসবে ? সত্য কথা না বললে — তোকে জেলে পাঠাব ।

ব্রাহ্মণ ঃ রাজা মশাই, কাল রাতে আমি বাঘের ভয়ে চন্দন গাছের ভিতরে রাত কাটাই । চন্দন গাছের সুন্দর গন্ধ আছে । ঐ গাছ থেকে আমার গায়ে ঐ গন্ধ আসতে পারে।

রাজা ঃ ঐ গাছটা কোন জঙ্গলে ?

ব্রাহ্মণ তখন এলাকার ঐ গাছের বিবরণ দিল । এই কথা শুনে রাজা উজিরকে হুকুম দিলেন — ব্রাহ্মণকে নিয়ে এবং কয়েকজন লোক নিয়ে যেন সেই গাছটা কেটে নিয়ে আসে । রাজা ঐ গাছ দিয়ে পালঙ্ক তৈরী করবেন ।

রাজার লোকেরা গিয়ে গাছটা কেটে নিয়ে এল । গাছের ডালপালাগুলি নদীতে ফেলে দিল । মূল গাছটি রাজার কাজে লাগল । ডালপালাগুলি স্রোতে ভাসতে ভাসতে কাঁদতে লাগল । মানুষকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে এখন তাঁদের মরণ । মানুষের উপকার করলে এই দশাই হয় । গাছের কান্না শুনে জলের নীচ থেকে শঙ্খ ভেসে উঠে,

শঙ্খ গাছের ডালপালার ক্রন্দনের কারণ কি জানতে চাইল । ডালপালা কাঁদতে কাঁদতে বলল — এক ব্রাহ্মণকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম । এখন ব্রাহ্মণের লোকেরা আমাদের কেটে জলে ভাসিয়ে দিল । মানুষের উপকার করে এই লাভ হল ।

শঙ্খ বলল, ঠিকই বলেছ । আমিও মানুষের উপকার করতে গিয়ে এখন মানুষের হাতে কাটা পড়ি । চন্দন বলল — তোমার ঘটনা কি রকম ? শঙ্খ বলল — বংক নামে এক রাজা একবার যুদ্ধে হেরে যায় । শত্রুপক্ষ রাজাকে আক্রমণ করে । রাজা পলায়ন করতে করতে এই নদীর পাড়ে আসে । আমি মনে করলাম — এই দেশের রাজা শত্রুর হাতে মারা

যাবে — এটা ঠিক হবে না । সে জন্য তাকে বাঁচানোর জন্য — আমি রাজাকে বললাম, আমি হাঁ করছি — আপনি পেটে ঢুকেন । রাজা পেটে ঢুকল । আমি রাজাকে নিয়ে গভীর জলে চলে গেলাম । শত্রুরা চলে গেলে, রাজ্য নিরাপদ হলে, রাজাকে ছেড়ে দিলাম । রাজা রাজ্যে গিয়ে হুকুম দিল নদীতে শঙ্খ আছে । সেই শঙ্খ কেটে হাতের শাঁখা বানাও । সেদিন থেকে শঙ্খদের মরণ দশা শুরু হলো । শঙ্খ কেটে শাঁখা বানানো শুরু হলো ।

মানুষের পরস্পরের ক্ষতি করবার যেমন প্রবণতা, তেমনি হিংসা নিয়েও পরস্তাব পাওয়া যায় । লোকজীবনে পরস্তাবের মাধ্যমে এগুলির সরল প্রকাশ দেখা যায় ।

যেমন — 'বার জোড়া নারকেল, তের জন ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা হিসাবে নানাদ্রব্য সংগৃহীত হয় । এরূপ তের জন ব্রাহ্মণ বার জোড়া নারকেল পায় । নারকেল পেয়ে খুব খুশী । কিন্তু ওগুলো বহন করতে গিয়ে — পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায় । কে খালি হাতে যাবে — কে বয়ে নিয়ে যাবে । কারণ বার জন বার জোড়া নিলে — একজন খালি হাতে যাবে । কিন্তু সবাই খালি হাতে যেতে চায় । সমানভাগ করতে গেলেও হবে না । তারপর ঠিক হয় কিছুক্ষণ ধরে একজনই বার জোড়া বইবে । এভাবে চলা শুরু হয় ।"

এতে বোকামীর পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মানুষের লোভও স্বার্থের পরিচয়ও ফুটে ওঠে । নারকেল পেয়ে সবাই খুশী কিন্তু অসম প্রাপ্তির জন্য কোন দুঃখ নেই । অন্যকে দান করার প্রবণতা নেই, উল্টো শ্রমও অন্যকে দিয়ে করানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । একজন খালি হাতে যাবে বন্ধুর এইটুকু সুখও অন্যেরা সহ্য করতে রাজী নয় । ব্যাপারটা সামান্য হলেও — বুঝতে পারি শুধু ব্যক্তিগতজীবনে নয় — সমষ্টিগত জীবনেও অনৈক্য তৈরী হয় ।

লোককথার পঠন পাঠন : লোককথা বা রূপকথা শিশুদের বা বড়দেরও আনন্দ দান করে । কিন্তু লোক সংস্কৃতিবিদ্ লোককথার মধ্যে আর্থ সামাজিক, রীতিনীতি বা নানা সমস্যার ইঙ্গিত অনুসন্ধান করেন । লোককথা যার কাছ থেকেই সংগ্রহ করা হোক — সেই গল্প কথক কোন পূর্ববর্তী নিকট থেকে এগুলিসংগ্রহ করেছেন — "গবেষণায় প্রমাণিত হবে যে, কাহিনীর একটি ইতিহাস আছে এবং এই কাহিনী কোন একটি বিশেষ দেশে জন্মগ্রহণ করলেও ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করে তার কলেবরে বিচিত্র সভ্যতায় চিহ্ন ধারণ করেছে । সুতরাং ফোকলোরবিদ্ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাহিনীটি বা গল্পের অংশ বিশেষ কিভাবে বিদ্যমান তা যথার্থভাবে জানবার চেষ্টা করেন এবং এই কাহিনী কোথায়, আনুমানিক কোন সময় জন্ম নিয়ে কোন কোন পথে বিশ্বের অন্যান্য দেশে কিভাবে ভ্রমণ

করেছে, তা আবিষ্কার করতে প্রয়াস পান । জার্মাণ পণ্ডিত থিওডোর বেনকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থটির ভূমিকায় বাংলাদেশ ও পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে লোককাহিনীসমূহ কিভাবে ভ্রমণ করে পাশ্চাত্যদেশে পৌঁছেছে এবং পাশ্চাত্য দেশের লোককাহিনীগুলোকে নবজন্ম দান করেছে, তা প্রমাণ করেন " । (১) এই তত্ত্বকে থিওরি অফ ইণ্ডিয়ান অরিজিন অফ ফোকটেলস্ বলা হয় । বেনকেই প্রথমপ্রমাণ করেন যে প্রত্যেক লোককথার মাতৃভূমি আছে এবং পর্যটন ধর্ম লোককথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

লোককথার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নায়কের অসম্ভব কাজ সমাপন করা । প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকলদেশেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । যেমন ইংল্যাণ্ডে প্রাপ্ত একটি লোককথা যা ১৮৯১ সালের অক্টোবর মাসেই লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফোকলোর কংগ্রেসে গঠিত হয় । পরে ১৮৯৩ সালে কাহিনীটি জার্নাল অব আমেরিকান ফোকালের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

ভাগ্যানেষী যুবক ঃ

জ্যাক নামে এক যুবক খাদ্যন্বেষণে বের হয়ে এক দানবের গৃহে উপস্থিত হয় । দানব কন্যা জ্যাকের প্রতি অনুরক্ত হলেও দানব তাকে কয়েকটি অসম্ভব কাজ দেয় এবং দানব শর্ত দেয় কাজগুলি করতে না পারলে তাকে মেরে ফেলবে । কাজগুলো এই পাখার পালকে একটি ভাঁড়ার ঘর পূর্ণ করতে হবে । বিভিন্ন রকমের বীজ মিশ্রিত স্তুপ থেকে বীজগুলো আলাদা করতে হবে, বালি দিয়ে দড়ি তৈরী করতে হবে । সমস্ত কাজই সে দানব কন্যা ফিদার ফ্লাইটের সাহায্যে সম্পন্ন করে ।

ফিদার ফ্লাটি বুঝতে পেরেছিল — এরপরও জ্যাককে দানব হত্যা করবে । তাই তারা পলায়ন করে । দানব তাদের পিছু ধাওয়া করে । কিন্তু ফিদার ফ্লাইট যাদুর সাহায্যে বেঁচে যায় ।প্রথমে সে একটি মন্ত্রপূত কাঠি ফেলে সঙ্গে সঙ্গে একটি জঙ্গল গজিয়ে যায় । দানব জঙ্গল অতিক্রম করলে সে এক ফোঁটা জল ফেলে — সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি দীঘি তৈরী হয় । দীঘির জল পান করতে গিয়ে — দানব সেই দীঘিতেই ডুবে মরে । অবশেষে জ্যাকও ফিদারফ্লাইট একটি শহরে আসে । শহরে নিকটেই একটি গাছে উঠে ফিদার ফ্লাইট লুকিয়ে থাকে । জ্যাক আহার সংগ্রহ করতে শহরে যায় । ইতিমধ্যে কিছতু লোক গাছের উপর ফিদার ফ্লাইটকে দেখে পেত্নী মনে করে — মেরে ফেলতে উদ্যত হয় । এই সময় জ্যাক এসে তাকে উদ্ধার করে । দুজনের বিয়ে হয় ও সুখে জীবনযাপন করতে থাকে । ইউরোপ যাদুর প্রভাব বা যাদু শক্তির সাহায্যে নায়ক কাজ সম্পন্ন করেছে । আমাদের এদেশে এসেছে ঈশ্বর শক্তির সাহায্যে । বাংলার ব্রতকথায়ও এরকম ঘটনা দেখতে পাই ।

মা সুদ্ধ গুীর ব্রত ঃ

দুইয়া (দুঃখী / দুইয়া) রাজবাড়িতে চাকরী করত । রাজার ১০১ টি হাঁস সে চরাত। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান । সকালে হাঁস নিয়ে জলাশয়ে যেত এবং বিকেলে ফিরত । এটাই তার রোজকার কাজ । মা ও ছেলে এইভাবে জীবন নির্বাহ করত ।

একদিন দুইয়া রাজবাড়িতে কাজ করতে গেছে । তার মাও এক চাঁড়ালনি থেকে পুঁটি মাছ কিনল । কিন্তু দুইয়ার মার হাতে পয়সা ছিল না । সে চাঁড়ালনীকে বলল যে, দুইয়া এলে দাম দেবে । দুইয়ার মা যখন মাছ নিয়ে কাটছিল — তখন চাড়ালনি পয়সার জন্য এল। বিধবা বলল ছেলে এলে পয়সা দেবে । একথা শুনে চাড়ালনী চলে গেল । বিধবা যখন মাছগুলি পরিস্কার করছিল তখন চাড়ালনি আবার এল । বিধবা আবার বলল যে, ছেলে এলে পয়সা দেবে ।

মাছ রান্নার পর চাড়ালনী আবার পয়সার জন্য গেল । বিধবা ছেলের কথা বললে— চাড়ালিনী মাছ নিয়ে যেতে চাইল । বিধবা কোন উপায় নেই দেখে — মাছের ঝোল রেখে মাছগুলি ফিরিয়ে দিল । কারণ ছেলে না এলে পয়সা দিতে পারবে না । অনেক পরে দুইয়া এল । সে ভাত খেতে গেলে — তার মা তাকে ঝোল দিল । শুধু ঝোল দুইয়া মাকে কারণ জিজ্ঞেস করল । তার মা তাকে সব কথা বলল এবং জানাল যে, মাছের ঝোল রেখে মাছ ফিরিয়ে নিয়েছে ।

দুইয়া মাছের ঝোল খেয়ে খুব আনন্দ পেল । ভাবল মাছের ঝোলে এত স্বাদ — মাংসের ঝোল বোধ হয় আরো বেশি স্বাদ । সে তার মাকে বলল যে —"আমি রাজার বাড়ির একটা হাঁস নিয়ে আসব" । এই কথা শুনে বিধবা ছেলেকে নিষেধ করল । সে মায়ের কথা শুনল না, রাজার বড় হাঁসটি নিয়ে এল । হাঁসটির মাংস খেল এবং পালক এবং পা প্রভৃতি একটা গর্তের মধ্যে রেখে দিল । দুইয়া চুরি করে হাঁস নিয়েছে —এ বিষয়ে ২/৪ জন লোক টের পেয়েছে । তারা মহারাজকে নালিশ করল । মহারাজ দুইয়াকে আসতে খবর দিল । মহারাজ হাঁস চুরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে — দুইয়া বলল যে, সে সব হাঁস এনেছে । রাজা দুইয়াকে বলল যে, কালকে সব হাঁস গুণে গুণে এনে রাখবে । নতুবা তোমাকে কেটে তিল থেকেও ছোট করে ফেলব ।

রাজার এই আদেশ শুনে মা ছেলে দু'জনেই কাঁদতে লাগল । তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সে সময় রাস্তা দিয়ে এক বুড়ি যাচ্ছিল । বুড়ি বলল — তোরা কাঁদছিস কেন ? মা ছেলে কেঁদে কেঁদে বলল, রাজার হাঁস চুরি করে আমরা খেয়েছি — কালকে হাঁস দিতে না পারলে রাজা আমাদের কেটে ফেলবে । বুড়ি বলল — তোরা কাদিস্ না — হাঁসের

নাড়িভূঁড়ি ও পালকগুলি নিয়ে আয়, তারপর তিনখিলি পান নিবি, এক খিলি পান হাতে রাখবি । এক খিলি পান কোমড়ে কাপড়ের মধ্যে রাখবি, আর এক খিলিপান গালে রাখবি। তারপর তিনবার জল ছিটিয়ে সুষ্কণ্ডী মা তিনবার ডাক দিবি । প্রথম ডাক মা শুনবেন, দ্বিতীয় ডাকে মা আসবেন এবং হাঁস জোড়া দেবেন এবং শেষ ডাকে হাঁসের প্রাণ দেবেন এবং হাঁস ডাক দেবে ।

বুড়ির কথা অনুযায়ী দুইয়ার মা, সুষ্কণ্ডীকে ডাক দিল এবং মা এসে জীবন দিলেন ।

পরদিন সকালে দুইয়া ১০১ টি হাঁস নিয়ে রাজার নিকট গেল । রাজাতো হাঁস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন । রাজা তাকে আর এক পরীক্ষায় ফেললেন । রাজা সাত ঢোল সর্ষে মাঠে ছিটিয়ে দিলেন এবং দুইয়াকে বললেন যে, এগুলি আবার এক রাতের মধ্যে তোলে ভর্তি করি দিতে হবে । যদি ঢোলের (বাঁশ দিয়ে তৈরী ধান রাখার বড়পাত্র) মধ্যে ভর্তি করে না রাখে — তবে তাকে কেটে তিল থেকেও ছোট করে ফেলবে ।

এ আদেশ পেয়ে মা ছেলে আবার কাঁদতে লাগল । মা ছেলেকে খুব গালে দিতে লাগল এবং কাঁদতে লাগল । এই সময় আবার সেই বুড়ি র াস্তা দিয়ে যাচ্ছিল । বুড়ি তাদের কান্না শুনে কারণ জিজ্ঞেস করল । বুড়ি বলল 'তোরা কাঁদিস না । আবার আগের মতো খিলি পান নিয়ে তিনবার জল ছিটিয়ে মা সুষ্কণ্ডীকে তিনবার ডাক দিবি । এক ডাকে মা শুনবেন, আর এক ডাকে অনেক পাখি আসবে, আর এক ডাকে তারা সর্ষ তুলে ঢোল ভর্তি করে দেবে । বুড়ির নির্দেশ অনুযায়ী — রাত্রে দুইয়ার মা তিনবার করে মাসুষ্কণ্ডীকে ডাক দিল । দেখতে দেখতে অনেক পাখি এসে ঢোল ভর্তি করে দিল ।

রাজা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল ঢোলগুলি সর্ষে ভর্তি হয়ে গেছে । রাজা খুব অবাক হয়ে গেল । এই ঘটনায় দুইয়ার উপর রাজার রাগ আরো বেড়ে গেল ।

রাজার এবার তাকে রাজবাড়ির দরজায় যে পুকুর আছে তা বাঘের দুধ দিয়ে ভর্তি করে দিতে বলল । দুইয়া এবারও মা সুষ্কণ্ডীর কৃপায় বাঘের দুধ দিয়ে পুকুর ভর্তি করে দিল । রাজা এবার আর এক পরীক্ষা করল । দুইয়াকে বলল কুমীরের দাঁত এনে দিতে । এবারও মা সুষ্কণ্ডীর কৃপায় দুইয়া কুমীরের দাঁত এনে দিল । রাজার এবার দুইয়াকে আর এক পরীক্ষা দিতে বলল । রাজা দুইয়াকে দুটা সাপ এনে দিতে আদেশ ডাক দিল । দেখতে দেখতে অসংখ্য সাপ ভীষণভাবে শব্দ করে রাজবাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। রাজার সিংহাসন কেঁপে উঠল । রাজা পাত্রমিত্রাদের জেজ্ঞস করলেন - কিসের শব্দ হচ্ছে । পাত্রমিত্ররা বলল - দুইয়া আপনার নির্দেশে সাপ নিয়ে রাজবাড়ির দিকে আসছে । অবস্থা দেখে রাজা ভীত হয়ে পড়লেন । দুইয়াকে অনুরোধ করলেন - সাপ সামলাতে এবং প্রচার করে দিলেন -

দুইয়ার নিকট রাজকন্যার বিয়ে দেবে এবং দুইয়াকে অর্ধেক রাজত্ব দেবে।

এই অনুরোধ শুনে - দুইয়া দোহাই মা দুষ্কণ্ডী বলে সাপদের সামলে দিল রাজা দুইয়াকে রাজ্যভার দিয়ে নিজে অবসর নিলেন। রাজা হয়ে দুইয়া মা সুষ্কণ্ডীর ব্রতের আয়োজন করল। কিন্তু এতে গোয়াল গোয়ালিনী দুধ দিতে রাজী হলো না। এর ফলে উভয়ে অন্ধ হয়ে যায়। পরে তা মা সুষ্কণ্ডীর ব্রত করে ভালো হয়। এই ব্রতে অলৌকিকতা থাকলেও দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাঙ্খাই এখানে ফুটে উঠেছে। পুঁটি মাছের কথা বাঙালীর মাছ ভাতের প্রতি লোভের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পাহাড় জঙ্গল জলাভূমি নিয়ে এই ভূ-প্রকৃতির বন্য জন্তু বাঘ বা সাপদের দেবতা হিসাবে সুষ্কণ্ডী দেবীই চিহ্নিত হয়েছেন। যেমন বাংলার দেবতাদের শ্রেণীবিচারে বাঘের দেবতা দক্ষিণারায়। সাপের দেবতা মনসাকেই বুঝানো হয়।

রূপকথাগুলিতে দেখা যায় — রাজারা প্রায়ই অপুত্রক বা নিঃসন্তান। আঁট কুড়ে রাজার মুখ দেখতে প্রজারা এমনকি রাজবাড়ির মালীও রাজী নয়। তারপর রাজা বনবাস কিংবা মৃত্যুর সংকল্প নেন। অবশেষে সন্ন্যাসী বা অপরিচিত ব্যক্তি গাছের শিকড় বা পাকাকলা বা অন্য কোনবস্তু রাণীদের খেতে বলে এবং রাণীরা সন্তানবতী হন। এইভাবে সন্তান প্রাপ্তির ব্যবস্থার প্রধান কারণ আদিম মানুষ সন্তান জন্মের রহস্য জানত না। তাদের নিকট সন্তানের জন্ম অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বা ঐন্দ্রজালিক ঘটনা। বস্তুতঃ আদিম মানুষের ধর্ম সর্ব প্রাণবাদ বা ঐন্দ্রজালিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা সর্বত্রই প্রাণের সন্ধান করেছে — সহজ উপলব্ধি তাদের সব কিছুকে গ্রহণে সাহায্যও করেছে যেখানেই ভয়ঙ্কর বা অজনাকে দেখেছে সেখানেই তারা ভীত হয়ে পড়েছে এবং তার ব্যাখ্যা হয়েছে 'অলৌকিক' বলে। তাই প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীপ্রদত্ত দ্রব্যের মূলকথা হল সন্তানের জন্মরহস্য বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল। এখানে রাজ্যে প্রচলিত 'সাত ভাই চম্পার' রূপকথা বা লোককথাটি দেয়া হল (বাংলার প্রচলিত 'সাত ভাই চম্পার কথান্তর)।

এক ছিল রাজা। তাঁর পাঁচ রাণীর কিন্তু কারো কোন সন্তান নেই। তাই সকলের মনে সর্বদা ভাবনা। একদিন রাজা মনের দুঃখে বলে চলে গেলেন। যেতে যেতে রাজা এক সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন। সন্ন্যাসী রাজাকে প্রশ্ন করলেন — "কোথায় যাচ্ছ"। রাজা বললেন, "আমার পাঁচ রাণী, কিন্তু কারো কোন সন্তান নেই — তাই মনের দুঃখে সংসার ছেড়ে চলে এলাম। রাজা সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক পুকুরে এল। সন্ন্যাসী বললেন, "এই পুকুরের জলে একটি ডুব দাও। রাজা সন্ন্যাসীর নির্দেশে ডুব দিল। সন্ন্যাসী বললেন —"কি দেখলে "? রাজা বললেন—"জলের নীচে একজন লোক একটি কলাগাছ রোপণ করছে"। সন্ন্যাসী বললেন, "আবার ডুব দাও"। রাজা আবার ডুব দিলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, "কি দেখলে " ?

রাজা বললেন, "কলাগাছে ছোট ছোট কয়েকটি কলা ধরেছে" ।

সন্ন্যাসী বললেন, "কি দেখলে" ?

রাজা বললেন, "কলাগুলিপাকার উপযুক্ত হয়েছে" ।

সন্ন্যাসী বললেন, "আবার ডুব দাও" ।

রাজা আবার ডুব দিলেন ।

সন্ন্যাসী বললেন, "কি দেখলে" ?

রাজা বললেন, 'কলাগুলি পেকেছে" ।

সন্ন্যাসী বললেন, "আবার ডুব দাও এবং তিনটি কলা নিয়ে এস" ।

তারপর রাজা ডুব দিয়ে তিনটি কলা নিয়ে এলেন । সন্ন্যাসী বললেন, "তোমার পাঁচ রাণীকে কলাগুলি সমানভাগে ভাগ করে খেতে দাও" ।

রাজা কলাগুলি এনে বড়রাণীকে দিলেন এবং সবাইকে সমানভাগে খেতে নির্দেশ দিলেন । বড়রাণী ছোট দুই রাণীকে কলার ভাগ দিলেন না এবং বড় তিনজনে তিনটি কলা খেয়ে ফেললেন । চতুর্থ রাণী খবর পেয়ে কলা খেতে চাইলেন—বড় রাণী বললেন, কলাখাওয়া হয়ে গেছে । এ খবর শুনে রাণী কাঁদতে লাগলেন । অবশেষে কলার বাকল খেলেন । ছোটরাণী এ খবর শুনে দৌড়ে এলেন । খবর শুনে কেঁদে আকুল হলেন । অবশেষে চতুর্থ রাণী বাকলগুলি যে শিলে পিষেছিলেন— ছোটরাণী সে জায়গাটা ধুয়ে জল খেয়ে নিলেন — ছোটরাণী সে জায়গাটা ধুয়ে জল খেয়ে নিলেন । কিছুদিন পর ছোটরাণী সন্তানসম্ভবা হলেন । রাজ্যে আনন্দের বান এল । রাজা প্রজা সকলেই মহাখুশী। এই খবরে কিন্তু বড় চাররাণী খুশী হলেন না । কারণ তারা সন্তানের জননী হতে পারলেন না । এইজন্য তারা ঠিক করলেন ছোটা রাণীর সন্তানকে গোবরের গর্তে ফেলে দেয়া হবে এবং রাজাকে বলা হবে রাণী কাঠের পুতুল প্রসব করেছে। ছোটরাণীর সাত ছেলেও এক মেয়ে হল —সবাইকে বড় রাণীকে গোবরের গর্তে ফেলে দিল । এদিকে রাজা ছোটরাণী সন্তানের পরিবর্তে কাঠের পুতুল প্রসব করেছে শুনে মহাবিরক্ত হয়ে তাকে অন্তঃপুরের বাইরে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন ।

এই নির্দেশ ছোটরাণীর দুঃখ কষ্টের শেষ নেই । রাণী পথে পথে ঘুরে বেড়ান । এইভাবে দিন যায় । এদিকে গোবরের গর্তে একটি গাছ সাতটি চাঁপা ও একটি পারুল ফুটেছে । রাজার মালী ফুল দেখে তুলতে এল । মালিকে দেখে পারুল ফুল বলল — "সাতভাই চম্পা জাগোরে" । চাঁপারা বলল - কোন ভাই পারুল ডাকোরে' ? চাঁপারা বলল - কেন ভাই পারুল ডাকোরে' ? পারুল বলল — এসেছে মালী দিবে কি ফুল ?"

চাপা বলল — 'দিব না দিব না ফুল,
উঠিব শতেক দূর,
আগে আন রাজা
তবে দিব ফুল ।'

শুনেতো মালী অবাক । ফুলেদের কথা বলতে তো মালী আর শুনেনি । মালী দৌড়ে গিয়ে রাজাকে খবর দিল । রাজা খবর শুনে ছুটে এল । রাজা ফুল ধরতে গেলে, অমনি ফুলেরা বলে উঠল —

'দিব দিব না ফুল
আগে আসুক বড়রাণী
তবে দিল ফুল'' ।

এইভাবে ফুলেরা সকল রাণীকে সেখানে হাজির করালো, ছোটরাণীকে দেখে ফুলেরা সাতভাই এক বোন তার কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ।

রাজা ছেলেমেয়েদের নিকট সব ষড়যন্ত্র জানতে পারলেন । রাজা চক্রান্তকারী রাণীদের মাটিতে পুঁতে ফেলতে আদেশ দিলেন এবং ছোটরাণী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রাসাদে দিয়ে গেলেন । রাজার দিন সাথে কাটতে লাগল ।

এইভাবে রূপকথার সন্ন্যাসী প্রদত্ত বরে বা অন্য কোন অলৌকিক উপায়ে পুত্রলাভ ঘটে ।এই রূপকথার অন্য একটি মোটিভ হল — বাক্‌শক্তি সম্পন্ন ফুলের কথা এবং এক সঙ্গে বহু সন্তানের জন্ম দান ।

ত্রিপুরায় প্রচলিত রূপকথা বা লোককথার বৈশিষ্ট্য ঃ

ত্রিপুরায় প্রচলিত রূপকথা বা লোককথার বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের রূপকথা উপকথা থেকে বহুলাংশে ভিন্ন প্রকৃতির । প্রাচীন বাংলার রূপকথা—উপকথার সংকলন গ্রন্থের মধ্যে লালবিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের সংকলণ গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য । লালবিহারী দের প্রকাশিত গ্রন্থেব আগে ১৮৯২ খ্রীঃ উইলিয়াম কেরী তাঁর 'ইতিহাস মালা' গ্রন্থে আটটি রূপকথা সংযোজিত করেন ।

এঁদের সংগৃহীত রূপকথা উপকথার যে লিখিত আদর্শ দাঁড়িয়ে গেছে তা থেকে পরবর্তী সময়ে নতুনভাবে অন্য কোন রূপকথা সংকলন দেখা যায় না । লালবিহারী দে তাঁর ফোকটেলস্ অব বেঙ্গল' গ্রন্থে সংগৃহীত প্রত্যেক রূপকথার শেষে একটি ছড়ার উদ্ধৃতি করেছেন । যেমন —

আমাব কাহিনী ফুরুলো / নটে গাছটি মুড়লো ।
কেন বা নটে মুড়লি / গরু কেন খায় ?
ক্যানরে রাখাল চরাস না ? বড় ক্যান ভাত দেয় না ?
ক্যানরে বউ ভাত দিস নে ? ছেলে কেনো কাঁদে ?
ক্যানরে ছেলে কাঁদিস ? / পিঁপড়ে কেনো কামড়ায় ?
ক্যানরে পিঁপড়ে কামড়ায় ? / কুটুব কাটুর কামড়াবো ?

চালার ভিতর সামাব । এই ধরণের ছড়া পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চতলে দেখা যায় । অবশ্য দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন বা ডঃ আসুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ রূপকথা সংগ্রহে এই ছড়া সংযুক্ত করেন নি । সম্ভবতঃ এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে এবং এখানে প্রাপ্ত রূপকথাও ছড়াব সংযোজন নেই । এছাড়া ত্রিপুরা জুম চাষ, মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি গভীব সমর্থন বা উপজাতিদেব অনেক আচার বা সংস্কারও প্রাপ্ত রূপকথার লোককথায় দেখা যায় ।

(১) অনস্বীকার ফোকলার পরিচিত এবং লোকসংস্কৃতির পঠন পাঠন ঃ পৃঃ ১৪৬) (২) মাটি কথা কয় । (৩) সখী সুন্দরী দেবী (৪) নগেন্দ্রবালা কর্মকার (৫) রেণুকা দে ।

******
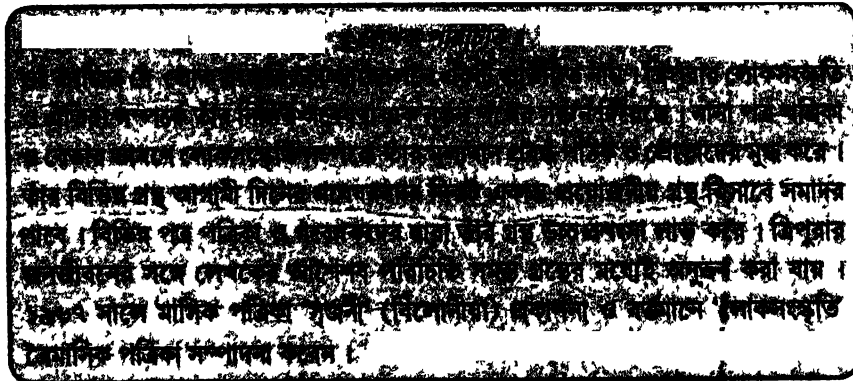
চিরবন্দিনী রমণী

— রাখাল রায় চৌধুরী

এক সময় 'নারী' শব্দটির উচ্চারণের মধ্যে একটা কাটোক্তীর আভাষ মিলতো । এমনও বলা হতো, একেবারে মেয়েলোকের মতো কথা বলছিস যে ! অর্থাৎ মেয়েলোক মানেই একটা মনুষ্য পদবাচ্য বর্হিভূত অধম এক জীবমাত্র, আরকি । ওদের সামান্য ত্রুটিতেও আমাদের ভৎর্সনার প্রচণ্ডতার মধ্যে কোন প্রকার ঘাটতি থাকে না। ধরুণ, আপনার একটি কথা ও ঠিক বুঝতে পারল না বা পরিবারের প্রাত্যহিক কোন একটি কাজকে ভুলে গেল বলে যথাসময়ে সম্পূর্ণ করতে পারল না । একে ক্ষমা চোখে দেখাটা পুরুষ বিক্রমের ক্ষেত্রে শোভোন নয় । এইরকম ভুল পুরুষদের মধ্যে দেখা কি যায় না ? যায় তবুও আমাদের সুদীর্ঘকালের লালিত এবং অভ্যস্ত খবরদারীটা ওদের উপর তীব্র মাত্রায় চলবেই, কারণ, আমরা পুরুষরা ভাবতে আনন্দ পাই যে, আমরা শাসক, নারী হলো শাসিত- বিলকুল রাজা-প্রজা, ভিক্টোরিও প্রথায় যা অনুমোদিত । মেয়েদের জন্ম থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত ওদের কেন্দ্র করে যে ঘৃণ্য বিচিত্র নাটক নোভেল গল্প কাব্যের সৃষ্টি হয় তার ট্র্যাজেডি গর্ভ সমষ্টির কাছে মহাভারত দূর ছাড় । গর্ভে সন্তান এলে ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, এই নিয়ে এক চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় । এই গুঞ্জনে থাকে একটি রহস্যময় কৌতুহল আর সেটা হলো, যদি একটা ছেলে হয় ... । এই গুঞ্জনের পরিসমাপ্তি ঘটে ডেলিভারি হওয়া পর্যন্ত, আমরা মা দুর্গা প্রণামে উচ্চারণ করি ধনং দেহী, যশো দেহি পুত্রং দেহী ... ইত্যাদি যম, ঐশ্বর্য পুত্র পেতে প্রার্থনা জানাই । আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে গর্ভস্থ কন্যা সন্তানটিকে নষ্ট করে দেওয়ার উদ্যোগ নিতেও আমরা ইতস্তত করি না । পূর্বে পাঁঠা বা মোষ বলিদান সংকল্প করা হতো । এরপরেও কি বুঝতে অসুবিধা হবে যে কন্যা সন্তান কতখানি অবাঞ্ছিত আমাদের কামনায় ।

ভূমিষ্ঠ হবার পর কন্যাসন্তানটিকে দেখামাত্র আত্মীয় স্বজনেরা কৌতূক করে বলতে থাকে, ''নাও এবার কন্যার বিয়ের জন্য এখন থেকে টাকা জমাতে আরম্ভ করো ।'' এই মন্তব্যটি যে কন্যার প্রতি শুভেচ্ছা কামনা নয়, তা আর বুঝতে বাকি থাকবে কারো ? এই শিশু সন্তানটির যথার্থ সেবা-যত্ন আহার শৈথিল্যের ছোঁয়ায় কিছুটা মন্দা গতি হতেই পারে। ছেলেটির বেলায় নয়, বড় হয়ে উঠলে, মেয়েটি আবার কার চোখে পড়ে, কোথায় যায়, স্কুলে গিয়ে কি করে, কাকে আবার কি বলে ফেলে ইত্যকার চিন্তা উদ্বেগের মধ্যে অভিভাবকদের মনে একটি গোপন বিরক্তিও ঠাঁই গেঁড়ে বসে । যা উপলব্ধি করতে পারলে মেয়েটির অস্বস্তির সীমা পরিসীমা আর থাকবে না । মেয়েটি কিছুই বুঝে না, এমনও নয় । ওইদিন তাকে এক আত্মীয় বাড়ি যেতে দেয়নি । সেখানে গেলে নতুন অভিজ্ঞতা পেতে

পারতো, এইবার রথমেলায় অনেক বলা কওয়ায় ওকে যেতে দিল । ওর ভীষণ কষ্ট হয় মনে । কিছু পরিষ্কার করে বলতেও পারছে না । সে এখন বড় হয়েছে, তাকে অনেক কিছু জানতে হবে, শিখতে হবে, দেখতে হবে । সে নিজেকে ছেলেদের মত প্রতিষ্ঠা করতে চায় । এভাবে গৃহবন্দী হয়ে থাকলে, সে কি করবে । ক্ষোবে, ঘৃণায়, দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠায় ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে । দাপিয়ে জ্বলে উঠে আগুন তার সারা দেহে । এই আগুনের নির্বাণ নেই, তাকেই জ্বেলে পোড়ে খাক করে দিচ্ছে । দেহের অগ্নিতাপ দুফোঁটা অশ্রু বিন্দুতে বেরিয়ে আসে ওর দুগণ্ড বেয়ে । ভেবে ভেবে কখনও অস্থির হয়ে পড়ছে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না, কি করবে সে ।

এর মধ্যে ওর মাসিক আরম্ভ হয়ে গেছে । ওমা ! এ-ও যেন মেয়েটির অপরাধ । নাক উঁচিয়ে কথা বলা, ওকে দূরে দূরে রাখা । কেমন তরো এক অঘোষিত বয়কট । এরা বুঝতে চায় না, এটা যে একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া । মাসিক অর্থাৎ ঋতু । যা ঋতম্ শব্দ থেকে আসা। ঋতম্ শব্দটির অর্থ হল সত্য — যে সত্য বিশ্ব জগৎকে চালনা করে, যে সত্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিচক্র ।

এই ঋতুস্রাবকে ঘিরে সৃষ্ট হল কত যে দুঃসহ অপমানের কাহিনী । অনেক সমাজ এই ঋতুক্ষরণকে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে অশুভ জ্ঞান করেছে । পশ্চিমে এক সময়ে বিশ্বাস ছিল যে, ঋতুকালে নারীদের সংস্পর্শে শস্যহানি ঘটে, বাগান বিলুপ্ত হয়, মৌমাছিরা হারায় প্রাণ, মদ হয় ভিনেগার, দুধ হয়ে যায় টক, উনিশ শতকের শেষ ভাগেও চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণাপত্রে বলা হল, "ঋতুমতী নারীর ছোঁয়ায় মাংস পচে যায় । এ শতকের প্রথমে ফ্রান্সে মদের কারখানায় ওদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ । ঋতুমতীর ছোঁয়া লাগলে চিনি কালো হয়ে যেতো, আদিম সমাজে ঋতুকালীন ওদের স্থান হতো গ্রামের এক প্রান্তে নিঃসঙ্গ কুটিরে। ওদের দুধ খেতে দেয়া হত না, স্বামীর জিনিসপত্র ওরা ছুঁতে পারত না, স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়বে । স্বামীর অস্ত্র স্পর্শ করলে স্বামী যুদ্ধে নিহত হবে । বাইবেলে এবং কোরাণে ওদের নির্দেশ করা হয়েছে নিষিদ্ধ এবং দূষিত প্রাণীরূপে । কোরাণে আছে ঃ "লোকে তোমাকে রজঃক্ষরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে । তুমি বলো, তা অশুচি, তাই রজঃক্ষরণকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে, আর যত দিন না তারা পবিত্র হয়, তাদের কাছে যেও না ।" হিন্দুধর্মের শিউরে উঠা ঋষিরা আরও এগিয়ে গিয়ে কয়েকশত শ্লোক ও বিধি রচনা করে ফেললেন ঋতুমতী নারীর অস্পৃশ্যতার উপর । ভোজনরত কোন ব্রাহ্মণের চোখে যেন সে কখনও না পড়ে । ক্ষরণের প্রথম দিনে সে চণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয় দিনে রজকী । সামাজিক এবং ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া তার নিষিদ্ধ । মনু-অঙ্গীরা পরাশর অনেক লিখেছেন । মনু বলেছে, রজস্বলা নারীতে সঙ্গত ব্যক্তি তার বুদ্ধি, তেজ, বল, আয়ু, চক্ষু হারাবে । বরাহপুরাণে আছে, রজস্বলা নারীর সঙ্গে কেউ কথা বলবে না, তার হাতে কোন খাদ্য গ্রহণ করবে না, তার সামনে কোন মন্ত্র উচ্চারণ করা যাবে না, বামন বলেছেন, এর সঙ্গে সঙ্গম মহাপাপ । তাদের কাছাকাছি আসা বা দেখা করা প্রায়শ্চিত্য যোগ্য ইত্যাদি ...

ইত্যাদি ... । সংযম ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে দিতে কন্যা সন্তানটি এখন বিদ্যালয় গণ্ডি পেরিয়ে মহাবিদ্যালয় তথা কলেজে এসে পৌঁছেছে । সে টের পায় কলেজের পথে কেউ তাকে দূর থেকে অনুসরণ করছে । এটাকে সে সামলিয়েই চলছে, কিন্তু সংকট বেঁধে যায় যখন শিস্ অথবা গান বা কবিতার উদ্ধৃতি ওকে শুনানো হয় কিংবা ওদের কোনও মনোনীত নামে ওকে সম্বোধন করা হয় খুব কাছ থেকে । কি অসহায়তায় তখন সে । এই ঝামেলাতো নিত্যদিনের, তবুও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না ; এটাই কখন কোথায় কি-রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়। মনে হয়, ওদের অভিভাবক, সমাজ এবং সরকার ওদের স্বেচ্ছাচার-এর কাছে একেবারেই অসহায় ।

এই কন্যা সন্তানটি বালিকা থেকে নারী হয়ে উঠার এই কালপর্বে হয়তো আপনার অগোচরে, সমাজের এক জঘন্য অভিশাপ মাথায় বয়ে চলেছে ... । নারীর এই শাপমোচন কবে ঘুচবে কেউ জানে না । সমাজ ও ধর্মকে সঙ্গে রেখে কালের খেয়াল বিধির যে শেকল পরিয়ে দিল মাতৃত্বের দুই চরণে, তাকি অত সহজে খসে পড়বে ? মাত্রিতন্ত্রে তর্পন ধ্বনি শোনা যাবে কি কোনও একদিন ? অথচ, এই পুরুষতন্ত্র মুখরোচক সভাষিত কতগুলো শব্দ মায়ায় বেঁধে রাখতে সচেষ্ট অল্পেতে খুশি নারীদের ও যেমন ঃ কন্যা-সুকন্যা, মাতা, গৃহিনী, সুমাতা, সুগৃহিনী, দেবী, সতী, সতীত্বকে বানিয়েছে নারীর মুকুট, চিরন্তনী, শাশ্বতী, কল্যাণী, গৃহলক্ষী, সুখ-শয্যাসঙ্গিনী, প্রাণেশ্বরী, প্রাণ সখী, হৃদয়-শায়িনী ইত্যাদি ... ।

কিন্তু এই কৌশলী খেলায় মানব সাম্রাজ্যের অপর সমসত্তা মানবীর অধিকারে আরোপিত পুরুষের জবর হস্তক্ষেপ হ্রাস পাবে কবে পর্যন্ত । কেন কন্যা সন্তানের এই মিথ্যে অভিশাপ ? কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে কেউই দায়ী নয় । না ঈশ্বর, না জনক, না জননী । ছেলে বা কন্যা জন্মাবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে শুক্রাণু অর্থাৎ ক্রোমোসোম । 'নারীর ডিম্বানু আদিম কোষ । তা নারীর ডিম্বাশয়ে জন্ম নেয় অনেক আগে । পরে আর কোন ডিম্বানু জন্মে না । পুরুষের ক্ষেত্রে ঘটে অন্যরকম । যৌবনারম্ভ থেকে বুড়োকাল পর্যন্ত পুরুষের অণ্ডাশয়ে ধারাবাহিকভাবে উৎপন্ন হতে থাকে শুক্রাণু । অণ্ডকোষে পাওয়া যায় একরকম আদিম কোষ, যার থেকে তৈরি হয় শুক্রাণু । পরিপক্ক হওয়ার আগে সেগুলোর পরিবর্তন ঘটে বেশ কয়েকবার এবং এ-সময় প্রতিটি শুক্রাণুতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় । প্রতিটি পরিপক্ক শুক্রাণুতে থাকে ২৩টি ক্রোমোসোম, যার মধ্যে ২২টি অটোসোম এবং ১টি লিঙ্গ ক্রোমোসোম । শুক্রাণুর লিঙ্গ ক্রোমোসোমে থাকে ১টি X ক্রোমোসোম বা ১টি y ক্রোমোসোম । পুরুষের কোটি কোটি শুক্রাণুকে যদি দুঃভাগে ভাগ করে ফেলা হয়, তবে এক ভাগের শুক্রাণুতে থাকে ২২টি অটোসোম ও একটি X ক্রোমোসোম, এবং আরেক ভাগের শুক্রাণুতে থাকে ২২টি অটোসোম ও ১টি y ক্রোমোসোম । তাই যখন কোন y ক্রমোসোমবাহী শুক্রানু কোন ডিম্বানুর উর্বর করে, তখন নতুন কোষটিতে থাকে ৪৪টি অটোসোম এবং একটি X ক্রোমোসোম এবং y ক্রোমোসোম । এর ফলে যে শিশু জন্ম নেয়, সে হয় ছেলে । আর যদি ১টি X ক্রোমোসোমবাহী শুক্রাণু ডিম্বাণুকে উর্বর

করে, তাহলে নতুন কোষটিতে থাকে ৪৪টি অটোসোম ও ২টি X ক্রোমোসোম । এর ফলে সন্তানটি হয় মেয়ে । তাই পিতাই নিয়ন্ত্রণ করে সন্তানের লিঙ্গ, যদিও কোন ধরণেব শুক্রাণু গর্ভবতী করবে ডিম্বানুকে তা নিয়ন্ত্রণের শক্তি নেই তার ।'

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত একটি মেয়ের মুখ আপনারা দেখেছেন । আর সে থাকবে না। নিরুদ্দেশ হয়েছে সে । এতো অপমান লাঞ্ছনায় আধুনিক কোন মেয়ে টিকে থাকতে পারে?..... আসলে এই প্রবন্ধে কোন নায়িকা বা পার্শ্ব-চরিত্র কিছুই নয় । নারীদের এই আজন্ম দুঃখ ও দুর্দশাকে কিঞ্চিৎ মূর্তিময়ী করে তোলার উদ্দেশ্যেই ওর ক্ষণ উপস্থিতি ।

নারীদের অপমান কাকে বলে, আর একটু দেখুন ঃ এলেন সিজো পুরুষ নারীর দ্বিমুখী বৈপরীত্যের একটি তালিকা রচনা করেছেন । এতে ধরা পড়েছে যে, পুরুষ সবসময় সদ্ গুণের অধিকারী আর নারীর ক্ষেত্রে সবই নঞর্থক । পুরুষ শাসিত সমাজের প্রতিফলনে পুরুষ কত স্বর্গীয়, নারী কত নারকীয় । যে কোন অভিধানে বা ভাষায় পুরুষ হচ্ছে —'নর, মানুষ, আত্মা, ঈশ্বর, পরমব্রহ্ম, পুরুষত্ব, উদ্যম, তেজ, রতিশক্তি । আর নারী হচ্ছে — রমণী, স্ত্রীলোক, পত্নী, নারীধর্ম-সতীর, ক্ষমতা, বাৎসল্য, জায়া, বামা, কামিনী, স্ত্রীধর্ম হচ্ছে, "রজঃ, ঋতু । কত হেয় করে তোলা হল নারী জাতিকে । এবার 'এলেন সিজো'র তালিকাটি দেখুন।

পুরুষ	নারী
সক্রিয়	অক্রিয়
সূর্য	চন্দ্র
সংস্কৃতি	প্রকৃতি
দিন	রাত্রি
পিতা	মাতা
বুদ্ধি	আবেগ
বোধগম্য	দুর্বোধ্য, স্পর্শকাতর
বিশ্ব নিয়ন্ত্রক	করুন

এইরকম তালিকা কোনও জাগ্রত মনীষা সঞ্জাত হতে পারে না । পুরুষতন্ত্রের অন্ধ অনুপ্রেরণা ছাড়া এটা আর কিছু নয় । (১৯৬৬) ওয়েবস্টার (Webster's) ইংরেজী ভাষাব (পণ্ডিতদের) অভিধানে পুরুষ তন্ত্র নির্দেশে আরও বেশি দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন । দেখুন, 'Manly'-র অর্থ কি ঃ 'having gualities appropriate to a man not effeminate or timorous : bold, resolute, open in conduct or bearing, belonging or appropriate in character to a man, of undaunted Courage : Gallant, এই একই অভিধানে 'Womanly'- র অর্থ দেয়া হয়েছে, marked by qualities characteristic of a woman, possesed of the Character or behaviour befitting grown woman,

characteristic of, belonging to, or suitable to a woman's nature and attitudes rather than to a man's. ।

র‍্যানডম হাউসের ইংরেজী ভাষার অভিধানে (১৯৬৭)-র 'manly'-র অর্থ দেয়া হয়েছে 'strong, brave, honourable, resolute, virile আর 'womanly–র অর্থ দেয়া হয়েছে Like or befitting a woman, feminine, not masculine or girlish', in the manner of a befitting, a woman. আরেকটি বিষয় এই যে, পুরুষকে লম্পট, চোর, পশু, বদমাশ, গাধা বললে অপমান বোধ করে না, তা সত্য নয় । তবে মেয়ে বললে অতিশয় অসন্তুষ্ট হয় ।

আমরা এটা পরিষ্কার বুঝেছি যে, হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষতন্ত্র জবর দখল করে রেখেছে নারীর সঙ্গত অধিকার, পঙ্গু করে রেখেছে তাকে, গৃহকোণে নিজেদের ভোগ লালসাকে চরিতার্থ করার গোপন ষড়যন্ত্রে । বাহিরে ঘোষণা করে বেরাচ্ছে ওদের অযোগ্যতা এবং পঙ্গুতার মিথ্যা গল্প ... ।'' নারীরা যদিও আজকাল মুক্তমঞ্চে নিজেদের কথা বলতে পারছেন, তবু বলতে হয়, ওরা সুপরিকল্পিত রাজনীতির শিকার । শেকলে বাঁধা শরীর নিয়ে এগুতে পারছে না অনেকদূর, তাই কেঁদে কেঁদে দেখছে, আপনার স্বাদ, অধিকার, স্বপ্ন, মনুষ্য বিকাশ কিভাবে বিনাশ হয়ে যাচ্ছে স্বীয় প্রাণময় অস্তিত্বে । তার চাইতে আরও অনেক বেশী করুন, অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, নারী যখন উপলব্ধি করে, কিভাবে তার মনটিকে নিয়ে পুরুষ স্বেচ্ছা-খেলার ছলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নর্দমার গভীর তলদেশে । সে তখন অবাক হবার অবসর পায় না — আত্মহননের ঐকান্তিকতার ঘোরে । ''আমাদের উগ্র পুরুষতান্ত্রিক, মধ্যযুগীয়, দরিদ্র, অশিক্ষিত সমাজে নারী শোষণ বন্ধ করা বিশেষভাবেই কঠিন ; নারীর মুক্তি তো সুদুর ব্যাপার । বড় ধরণের সামাজিক বিপ্লবের প্রতিক্ষায় থাকতে হবে ।

নারী সম্পর্কে রুশো অনেক লিখেছেন । কিন্তু, নারীর সত্যরূপ suggest করতে তিনি ব্যর্থই হলেন । উদাহরণস্বরূপ তাঁর দর্শনের কিছু কথা বল দায় । তাঁর মতে নারী হচ্ছে পুরুষের কামসামগ্রী এবং তার স্থান পুরুষের অধীনে । নারী পুরুষের তৃপ্তি যোগাবে, কিন্তু নিজে থাকবে কামবাসনাহীন । ... নারীকে, একই সাথে ও শরীরে, হতে হবে তীব্র কামজাগানো অগ্নিগিরি ও তুষারের মতো পরিশুদ্ধ; অতিকামময়ী ও নিষ্কাম । রুশোর মতে স্বামীকে সৎ হওয়ার বিশেষ দরকার নেই । স্ত্রীকে হ'তে হবে নিখুঁত সতী । ...

আমরা কি বুঝলাম ? বুঝলাম, পুরুষ তন্ত্রের বিশ্বাসী প্রতিভূ রুশো ।

এরপর দেখলাম রাসকিনকে । তিনিও সেই একই পথের পথিক । নারীর অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা স্পৃহাকে বাতিল করে দিয়ে ভুলিয়ে রেখে তিনি নারীদের নিঃস্ব করে রেখে মুখরোচক, সুখ শ্রুত ও বাহ্য সম্মানীয় শব্দ মালা পড়ালেন । তিনি লিলি বা পদ্ম, রাণী বলে নারীদের সম্বোধন করার পক্ষপাতি । এভাবেই আদর কিংবা সম্মান দেখিয়ে ওদের গৃহিনী বা পুরুষের সেবাদাসী বানিয়ে রাখতে চেয়েছেন ।

টেনিশনের 'প্রিন্সেস'-এ নারী পুরুষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও পরিপূরকত্ব দেখা যায় কিছুটা ।

For woman is not underdevelopmant but driverse'...

Not like to like, but like in differance ... / either sex alone

Is half itself, and in true marriage lies / nor equal, nor ımequal : each fulfills defect in each".

টেনিসনের এই ভিন্নতা এবং পরিপূরকতার কাছে জৈবিক যুক্তি ও আদর্শ যাতে পাবে পুরুষ আনন্দঘন কর্তৃত্ব । নারীর কিছু নেই এতে । ভিক্টোরিয় যুগে নারীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত কম হয়নি । ওদের শিক্ষার মধ্যে ঢুকিয়েছিল সেই স্বামীমুখি বোধ । এই যুগেরই কথা ঃ "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে" । এখানে পারিবারিক বা সাংসারিক সুখ-দুঃখের জন্য পুরুষরা দায়ী নয়, দায়ী নারী । এর থেকে হাস্যস্পদ আর কি হতে পারে ! নীচের কাব্যটিতে ভিক্টোরিয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে প্রচণ্ডভাবে ঃ

"মাঠের জন্যে পুরুষ আর চুলোর জন্যে নারী,
তলোয়ারের জন্য পুরুষ সূচের জন্যে নারী ;
পুরুষের আছে মগজ, নারীর আছে হৃদয়;
পুরুষ দেবে আদেশ, আর পালন করবে নারী ;

পুরুষ শিকারী, নারীরা শিকার ।
মৃগয়ার চকচকে ঢলমলে মৃগ,
আমরা শিকার করি তাদের চামড়ার সৌন্দর্যের জন্যে ; .
এই জন্যেই তারা ভালবাসে আমাদের এবং
আমরা অশ্ব ছুটিয়ে তাদের ভূপাতিত করি ।

দেখুন ভিক্টোরিয়া যুগের রসিকতা ওদের জবর দখলে অবস্থান রত নারীদের নিয়ে। দুঃসাহস, ভণ্ডামি, সীমাহীন বর্বরতা । এই টেনিসন লিঙ্গগত পরিপূরকের কপট সুরমূর্ছনা তোলে অভিভূত করার চেষ্টা করে নারীদের আর স্থবির করে রাখে ওদের ঘুনে ধরা সর্বনাশা পূর্বাবস্থায় ।

এবার আমরা জন স্টুয়ার্ট মিলকে দেখব । পুরুষতন্ত্রী রুশো-রাসাকিন্‌দের বিপরীত তিনি, তাই আমরা শুনেছি । তিনিই প্রথম নারীকে দেখেছেন মানুষরূপে, নারীর জন্য খুলে দিতে চেয়েছেন মানবিক সমস্ত অধিকার । ১৮-৬৯ এ বেরোয় মিলের 'দি সাব্ জেকশন অফ উইমেন (নারী-অধীনতা) । He is the first man, who wrote a complete book in support of woman's right. হ্যাঁ, আমরা মানবিক নারীবাদী হিসেবে দু'জন

মহাপুরুষ পেয়েছি। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। তবে মিলই প্রথম বিস্তৃতভাবে পুরুষতন্ত্রের নারী শোষণের রূপটি তুলে ধরেন। মিল তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে, আপনার ক্ষোভসহ ব্যাখ্যা করেন স্বীয় বক্তব্য। যেহেতু মিলের 'নারী অধীনতা' প্রথা-বিরোধী সত্যপক্ষের রচনা, সুবিধাভোগী পুরুষরা ঐ প্রথাকে ঐশ্বরিক, শাশ্বত, প্রাকৃতিক বলে মিলের পেছনে লাগলেন। প্রথার প্রধান শিক্ষাই হচ্ছে নারী। মিল তার 'নারী অধীনতা' বইটি লিখেছিলেন ১৮৬১তে। এই গ্রন্থরচনায় তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী হ্যারিয়েট টেইলর এবং সহায়তা করেছিলেন সৎকন্যা হেলেন টেইলর। হ্যারিয়েট নারীবাদী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। মিলের 'নারী-অধীনতা' পারিবারিক আবেগ থেকেই রচিত হয়েছিল। বিপরীত দুই লিঙ্গের বিবাহিত জীবনে সর্ববিষয়ে উভয়ে ভোগ করবে সমতা। সমব্যথি, সহমর্মী, সমভাবাপন্ন হবে অকুণ্ঠভাবে উভয়ে। 'কারো বেশি, কারো কর্ম', প্রথা হবে বিলুপ্ত। প্রথা নয়, সাম্যের নীতিতে হবে প্রতিষ্ঠিত জীবন। পুরুষতন্ত্র প্রচার করে থাকে ঃ পুরুষের প্রভুত্ব, নারীর অধীনতা ঈশ্বরিক, স্বাভাবিক, শাশ্বত, প্রাকৃতিক ইত্যাদি। এটাই ওদের প্রথা,— কুপ্রথা। এবার আমরা রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের কথা শুনব। রবীন্দ্রনাথও দেখি ভিক্টোরিয়ার যুগ - প্রভাব থেকে মুক্ত নন। সমাজে নারীর বাস্তব অবস্থানকে এড়িয়ে শুধু তার রূপসৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাকে অনুপম কিছু তৈরি করলে কি তার সামাজিক, আর্থিক, জৈবিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত মান, দাম্পত্য জীবনের নানা প্রশ্ন ইত্যাদির সমস্যা সমাধানের উপায় হবে ?

"সোনার তরী" কাব্যে (১৩০০) 'সোনার বাঁধন' নামে কবিতায় —
'বন্দী হয়ে আছো তুমি সুমধুর স্নেহে
অয়ি গৃহলক্ষী, এই করুন ক্রন্দন
এই দুঃখে দৈন্যে-ভরা মানবের গেহে।
****
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন দুখানি।
রোমান্টিকের চোখে নারীর আরেক রূপ মানসী (১৩০২)
শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী !
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি

****
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।'

প্রশ্ন উঠে সবিনয়ে — পুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতার অধীনে নারীর যে সমস্যা, তার

কথাতো কিছু বলছেন না গুরুদেব । কাব্য-রস, মধুর নারী বর্ণনায় উপকৃত হবে কতটুকু নারী তার অন্তর্লোকে । তিনি নারী শিক্ষায় (উচ্চস্তরীয়) বিশেষ উৎসাহি ছিলেন না । নারী মুক্তির আন্দোলনকে বলেছেন, কোলাহল । পুরুষ তন্ত্রের পক্ষে তিনি কথা বলেছেন । উনিশ শতকের বাঙালী নারীরা নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করলেন দুটো রূপক শব্দেঃ পিঞ্জর ও কারাগার ।

চিত্রাঙ্গদা কাব্যে কি বলছেন তিনি ?

আমি চিত্রাঙ্গদা ?

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমনী / পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি / নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে / পিছে, সেও আমি নহি । যদি পার্শ্বে রাখ / মোরে সংকটের পথে দুরূহ চিন্তায় / যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর / মোরে কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে / যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী / আমার পাইবে তবে পরিচয় ।

এখানেও রবীন্দ্রনাথ নারীর স্বাধীনতার কথা বললেন না । চিত্রাঙ্গদা কোন সার্বভৌম সত্তা বা স্বাধীন স্বায়ত্ত শাসিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য দাবী করেনি । সে যা চায় তা হল সাদামাটা সহচরীর অধিকার । ১৯৩৬-এর অক্টোবরে মহিলাদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ নিখিল বঙ্গমহিলা কর্মী সম্মেলনে পাঠ করেন তার প্রবন্ধ নারী । এই সভায় তার প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বাতিল করে দিলেন নারী মুক্তি বা নারী বিপ্লব সম্বন্ধে তার পূর্ব যুক্তি ও ধারণা । এখানে তিনি বললেন যে, পৃথিবীর সকল মেয়েরাই এখন সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে বাইর হয়ে আসছে । আধুনিক এশিয়াতেও তা' দেখা যায় । সীমানা ভাঙ্গার যুগ এসেছে । বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে । প্রয়োজনের সঙ্গে আচার বিচার মিলাতে হবে ।

আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্য তাদের বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চার একান্ত আবশ্যক । এখন অন্ধ সংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না । তাদের স্বাভাবিক জীব পালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্য কায়মনে প্রবৃত্ত হবে । এখানে কাব্যে রবীন্দ্রনাথকে কেবল কাব্যিক সৌন্দর্যের কাননে মাতোয়ারা দেখি এবং যেন স্বেচ্ছায় মহিলাদের বাস্তব ভূমিতে গিয়ে দাঁড়াতে চান না, কিন্তু তাঁর উপন্যাস 'মালঞ্চ', 'দুই বোন', 'চার অধ্যায়', 'বাঁশরী', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদিতে আমরা বাস্তবমুখী (Realist) রবীন্দ্রনাথকে দেখি, এই হল বিশ্বকবির অন্তর্গূঢ় রহস্য।

ফ্রয়েড-এর ধারণায় কুসংস্কার ধরা পড়ে তার নারী ধারণা ও নারী বিশ্লেষণে । তার 'লিবিডো' তত্ত্ব মানুষকে আদিম প্রবৃত্তির সংঘাতে জর্জরিত না বলে, তিনি দেখিয়েছেন অশেষ সম্ভাবনাময় রূপ ।

এ্যাড্‌লার, মিলেট ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত নন । ফ্রয়েড, ছিল রক্ষনশীল ভিক্‌টোরিয় আদর্শে । তিনি সর্বত্র শুধু 'কাম' দেখতে পেতেন । ফ্রয়েড নারীকে পুরুষেরই অধীন ঈর্ষা পরায়ণ নারী ভাবতেন । ফ্রয়েডীয় ভাবনায় শিশুই বিধাতা তার চোখে শিশ্নের পাশে ভগাঙ্কুর শোচনীয়ভাবে নিকৃষ্ট । ফ্রয়েড় নারীর দুটো বৈশিষ্টের কথা বলেছেন । লজ্জা ও ঈর্ষা । ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানে পুরুষ অক্রিয়তা আর নারী অক্রিয়তা সক্রিয়তা, মর্ষকাম ও আত্মপ্রেম নারীর আরেক বৈশিষ্ট । ক্লারা, কারেন, হোরনি, টম্পসন, আলফ্রেড্‌, অ্যাডলার প্রত্যাখ্যান করেছেন ফ্রয়েড্‌কে ।

আমরা এই নিবন্ধের যে মেয়েটিকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাকে খুঁজে বের করে যদি আনা হয় এখানে, তা' হলে কেমন হয় ? তাকে এবার আমরা বিয়ে দিয়ে দেবো। অতদিনে ওতো অনেক বড় হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই । কি অবস্থার মধ্যে পড়ে ওকে জীবনের গতিকে আঁকড়ে থাকতে হয়েছিল, তাতো আমরা সবই দেখলাম । কিন্তু দুর্ভাগ্য ! সে আসবে না । জেনে ফেলেছে সে বিয়ের পরিণাম । সে পিতৃতন্ত্র থেকে শিখেছে—'বিয়ে ও সংসার' জীবনের পরিণাম । আর মেয়েদের জীবন বিস্তৃতির যবনিকা এখানেই ঘটে । মনুষ্যত্ব টুটে যায় অকস্মাৎ তার, পরিণত হয় অবিকশিত অসহায় প্রাণীতে । সংকীর্ণ একটি জায়গা তারজন্য বরাদ্দ, সে হল পরিবার । এবার গৃহিনীর ভূমিকা পালন করবে সে । পোশাকি বাতাবরণে বন্দী থাকে সে দাসিত্বে । এঙ্গেলস্‌ বলেছেন, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এর প্রতিষ্ঠাটি হল "স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়" ।

হিন্দু-মতে পতিপরম গুরু ; সে স্বামী, পতি বা ঈশ্বর । মুসলমান মতে স্বামীর পায়ের নীচে বেহেস্ত (স্বর্গ), স্বামী প্রায় সেজদার (পূজা) উপযুক্ত ; খ্রীষ্টান মতে স্বামীই নারীর ঈশ্বর। মিল্টনের ইড আদমের কাছে আত্মসমর্পন করে বলে —

"আমার প্রণেতা ও ব্যবস্থাপক, তুমি যা আদেশ করো প্রশ্নহীন আমি মান্য করি, এ-ই বিধাতার বিধি ; বিধাতা তোমার বিধি, তুমিই আমার ; এর বেশি কিছু না জানাই নারীর সবচেয়ে সুখকর জ্ঞান ও গুণ ।" পিতৃতন্ত্রে রচিত বিয়ের বিধান পুরুষের অর্থাৎ পাত্রের স্বার্থে । নারী বা পাত্রীর স্বার্থ এখানে দেখা হয় নি । নারীকে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করাই হয়নি । হিন্দু বিধানে বিয়ে 'নারী-বলি', মুসলমান বিধানে বিয়ে 'চুক্তি বদ্ধ, দেহদান', খ্রীষ্টান বিধানে বিয়ে নারীর 'অস্তিত্ব বাতিল'।

বিয়ে ও সংসার নারীকে তৈরি করে গৃহিনী ও জননী । নিজেকে নিঃশেষ করে সংসার কাজে ডুবে থাকাই পুরুষ সমাজের চোখে শ্রেয়তর প্রিয়তর । সংশ্লিষ্ট সময়ের জনৈকা নারী কবি লিখেছেন ঃ

'বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুলনারী
ধীরতা নম্রতা মাথা, ঘোমটায় মুখ ঢাকা
রয়েছে উনুন-ধারে চিরকাল ধরি ।

****

বিয়ে এবং সংসার যে শিক্ষিত মহিলাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর বাধা তা কেউ কেউ - বিশেষ করে ভুক্তভোগীরা উপলব্ধি করতে পারছেন, এটা আগামীর জন্য এক আকর্ষনীয় সংবাদ । প্রথম উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণীদের অনেকে বিয়ে করেননি । যেমন ঃ ডাঃ বিধুমুখী, যামিনী, আর রাধারাণী, সুরবালা, হেমপ্রভা, লজ্জাবতী । কেউ কেউ বিয়ে করেছেন বেশি বয়সে — চন্দ্রমুখী বসু, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, কামিনী রায়, সরলা, কুমুদিনী বিয়ে করেছিলেন তিরিশ পেরোনোর পর । বিবাহিত জীবনে কারো কারো শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে । প্রথম দিকের স্নাতক কামিনী রায় বিয়ের পূর্বে কবিতা লিখতেন, বিয়ের পর তা বন্ধ হয়ে যায় । স্বামীর মৃত্যুর পর আবার লিখতে শুরু করেন । আমরা তাকে স্মরণ করি তাঁর অসামান্য কবিতার জন্য ।

এক 'গৃহিনী-মায়ের' স্বপ্নভঙ্গের তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকারোক্তি পেশ করলেন ফ্রাইডান "আমি স্ত্রী ও মায়ের সুন্দর ভাবমূর্তিটি রক্ষা করার জন্যে খুব পরিশ্রম করতাম । আমি আমার সব সন্তান প্রসব করেছি স্বাভাবিকভাবে । আমি তাদের বুকের দুধ দিয়েছি । একবাব এক পার্টিতে এক বৃদ্ধার কথায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, যখন আমি তাকে বলি যে সন্তান প্রসবই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ; আদিম পাশবিক কাজ এবং তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি কি পশুর চেয়ে বেশি কিছু হতে চাও না?"

এই ছোট্ট কথাটার কি যে মূল্য, কি যে তার শক্তি তা উপলব্ধি করলেন 'মা' ও 'স্ত্রী'র সুন্দররূপ দেয়ার কাছে ডুবে থাকা মহিলাটি, আপনার অন্তর গভীরে । তিনি বুঝলেন তার এই 'স্ত্রী-জননী', 'প্রসব' কর্মের ধারাবাহিকতা তাকে অপরিনামদর্শী নির্বোধের পর্যায়ে এনে পশু চরিত্রে মণ্ডিত করেছে । অনুকূল সত্য ধারণালোকে মনের অন্ধত্ব ঘুচে যেতে পারে এভাবেই ।

পুরুষের দুনির্বার ধর্ষণ প্রবৃত্তির ব্যাপকতা এবং প্রচণ্ডতায় 'সন্তান-সংসার সতীত্বের' নামের আড়ালে কিভাবে শাস্তি পেতে হয় নারীদের তা' আর বেশি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে কি ? নারীর দৈহিক গঠন অপেক্ষাকৃত নির্জোর এবং কোমল হওয়ায় সে শিকার হয় কামোন্মাদ পুরুষের হাতে । আগে, একে বলা হতো বলাৎকার, এখন খোলাখুলিই বলা হয় ধর্ষণ । প্রাচীনকালে অপরাধবোধকে লুকোবার কৌশলে 'ধর্ষণ'কে ধর্মে ও দর্শনে রূপময় করেছিল। ভারতীয় পুরানে পরাশর ধর্ষণ করেছে সত্যবতীকে, এছাড়া, আরো অনেক দেবতা ও ঋষিরা ধর্ষণ করেছেন অনেক দেবী বা ভক্তনারীদের । দেবরাজ ইন্দ্র একাজে বিষারদ । স্বর্গ-মর্ত্য জুরে ধর্ষণ করে বেড়াতো । গ্রিক পুরানের জিউস ধর্ষণ কর্মে অতুলনীয়। এমনও ধারণা এসে কখনও সখনো চিন্তাকে কৌতুহলী করে তোলে যে দেবতারা স্বর্গ থেকে এসে পৃথিবীতে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন । পুরনো অভ্যাসও অবশ্যই রয়েছে, আর সেজন্য পৃথিবীতে অত ধর্ষণ ।

নারীদের পক্ষে, যিনি পুরুষতান্ত্রিক সকল লেখকদের নারী সম্পর্কিত অভিমতগুলিকে প্রবল যুক্তিদ্বারা বাতিল করে দিতে পেরেছিলেন তিনি ছিলেন মেরিওলস্টোন্ ক্র্যাফট। ১৭৫৯-এ লণ্ডনের বাইরে এপিংবনের কাছাকাছি এক গরিব চাষী পরিবারে জন্ম হয় মেরির। মেরি ছিলেন প্রথম সন্তান তাঁর বাবা অ্যাড্ওয়ার্ড ওলস্টোন ক্র্যাফট্-এর। ১৭৯১-এ বত্রিশ বছরের তরুণী, মাত্র ছ-সপ্তাহে লেখেন তাঁর তের পরিচ্ছেদের ভয়ঙ্কর বইটি, যার নাম 'ভিণ্ডিকেশন অফ দি রাইট অফ ও ম্যান, উইথ স্ট্রিকচারস্ অন পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড মোরাল সাবজেক্টস্, বেরোয় ১৭৯২-এ; দুশো বছর আগে। এই গ্রন্থটিই সত্যকার নারীবাদী আন্দোলনের সর্বপ্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী গ্রন্থ। প্রগতিশীলদের প্রশংসা, নিন্দা দু-ই কুড়িয়েছেন তিনি। মেরি এই বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে এবং চারপাশের জগতের দিকে উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে আমার চেতনা পীড়িত হয়েছে বেদনার্ত ক্ষোভের সবচেয়ে বিষন্ন আবেগে এবং আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি একথা স্বীকার করে যে, হয়ত প্রকৃতিই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে বড়ো বিভেদ, নয়তো পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, তা খুবই পক্ষপাতপূর্ণ।

তিনি আবার বলেছেন, 'আমাকে দুর্বিনীত বলতে পারেন ; তবু, আমি যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তা আমাকে বলতে হবে যে, রুশো থেকে ডঃ গ্রেগরি পর্যন্ত যারা নারী শিক্ষা ও ভদ্রতা সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁরা সবাই নারীকে সাহায্য করেছেন আরও কৃত্রিম, দুর্বল চরিত্রের হয়ে উঠতে এবং পরিণামে তাদের করে তুলেছেন সমাজে আরো বেশি অপদার্থ সদস্য।

আমার লিঙ্গ শ্রেণীয়রা, আশা করি আমায় ক্ষমা করবেন, যদি আমি তাদের রমণীয় রূপের তোষামোদ করার বদলে তাদের গণ্য করি বুদ্ধিমান প্রাণীরূপে এবং যদি আমি মনে না করি যে, তাঁরা রয়ে গেছেন। চির শৈশবে, যারা নিজেরা দাঁড়াতে পারেন না।

মেরি রাজতন্ত্র, অভিজাত তন্ত্র, সেনাবাহিনী, পুরোহিত তন্ত্রগুলির মত প্রতিষ্ঠানের প্রবল সমালোচনা করেছেন, উত্তরাধিকার সূত্রে টিকে থাকা এইসব স্বেচ্ছাচারী শক্তিগুলির বিলোপন চেয়েছেন তিনি। এই শক্তিগুলিই নারী পীড়ণের উৎসস্থল।

সহ মরণ থেকে নারীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ-এর ১ম প্রস্তাব ও ২য় প্রস্তাব প্রকাশ করেন রামমোহন রায় যথাক্রমে ১৮১৫ ও ১৮১৯, এ বিষয়ে তাঁর শেষ লেখা সহমরণ বেরোয় ১৮২৯-এ। পৃথিবীতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর পূর্বে আর কেউ নারী সম্পর্কে কিছু বলেননি। রামমোহন সহমরণ থেকে নারীকে রক্ষা করার সংকল্পে দৃঢ়। বিদ্যাসাগর শুধু সহমরণমুক্তি নয়, বিধবাদের পুনর্বিবাহের যুক্তিও তিনি খাড়া করেছেন।

বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম প্রস্তাব প্রকাশ করেন ১৮৫৫ তে এবং একই বছরে প্রকাশ করেন তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রবর্ত্তক পিতৃতন্ত্রের অভিযোগের উত্তরে নিবর্ত্তক বা রামমোহন বলেছেন (১৮১৮, ২০০২), 'স্ত্রীলোককে যে পর্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে ।... স্ত্রীলোকরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাদিগকে আপনা হইতে দুর্বল জানিয়া যেই উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, যে যে তাহা হইতে উহাদিগের পূর্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন । পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহার সেই পদ প্রাপ্তিযোগ্য নহে ।'

বিদ্যাসাগর (১৮৭১,৮৪৩) বলেছেন, 'স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন । এই দুর্বলতাও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষ জাতির নিকট অবনত অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন । প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষ জাতি, যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন, তাহার নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন । পৃথিবীর প্রায় সর্বপ্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা।

রামমোহন প্রাণ দান করলেন হিন্দু নারীকে আর ওদের জীবন দান করেছেন বিদ্যাসাগর । রামমোহন চাইছেন বিধবারা ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক প্রাণে বেঁচে থাক । সতীদাহ তাঁর অনভিপ্রেত ঘটনা । বিদ্যাসাগর চান বেঁচেও থাক বিধবা নারী স-সম্মানে এবং সশরীরে রক্তমাংসের সজীবতা নিয়ে । তিনি চান পুনর্বিবাহের ভরে উঠুক ফুলে ফলে ওদের দেহগত ও মনগত সুখের জীবন । ব্রহ্মচর্যে তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না ।

কিন্তু তাঁদের কেউই নারীর সার্বভৌম স্বাধীনতার বিষয় নিয়ে ভাবেননি । হয়ত, তা সেকালের পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাব । ভারতে তথা বাংলায় নারী-নির্যাতন বিরোধী প্রথম বিপ্লবী এই দুই মনীষি । ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে ।

পুরুষ-তন্ত্র বিরোধী নারীবাদী বেগম রোকেয়া সারা জীবন প্রতিবাদের যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন নারীমুক্তির জন্য অনেক ঘটনা, অনেক যুক্তি, অনেক বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন । তিনি নিজে ক্লেষ ভোগ করেছেন প্রচুর । তাঁর রেখে যাওয়া দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে তাঁর উত্তরাধিকারী নারীরা হয়েছেন ভদ্রমহিলা, স্বামীর শিক্ষিত দাসী প্রমোদ সঙ্গিনী, সামাজিক সুবিধাভোগী । তারা ব্যর্থ করে দিয়েছেন বেগম রোকেয়াকে ।

উনিশ শতকে স্ত্রী-শিক্ষার হাওয়া বয়েছিল কিছু — সেটা ছিল পুরুষের মনোমত শিক্ষিত করে তোলা নারীকে নিজের স্বার্থে । কিন্তু বিশেষ বা উচ্চ শিক্ষা নয় । এই শিক্ষা নারীর স্বার্থে নয় । সামান্য শিক্ষা দান করে ওদের ভদ্রমহিলা বানিয়ে অন্তঃপুরে ঢুকিয়ে দেয়া হল — শোভনীয়, মধুময় এবং সোহাগী নাম দিয়ে ওদেরে বাধ্য করা হল তৃপ্ত মনে পরিবারাভ্যন্তরে সময় কাটাবে স্বামীর সুখ বিনোদন এবং সন্তান পরিচর্যা কর্মে । ওদের বলা হত অন্তপুরিকা, পুরনারী, পুরলক্ষ্মী, পুরাঙ্গনা, পুরস্ত্রী, পুরমহিলা, পুরবালা, পুরবাসিনী, অন্তপুরবাসিনী, পৌরাঙ্গনা, অসূর্যম্পর্শা । এই নামের মালা দিয়ে তৈরী সামন্ত দেয়ালে

আট্‌কা পড়ল চিট বিত্তের নারী । বাংলায় নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো আকর্ষনীয় সহচরী, সু-গৃহিনী, সুমাতা উৎপাদন করা । অন্যদিকে পুরুষের চাই শিক্ষিত স্ত্রী আর নারী শিক্ষিত হতে চায় ভাল বর পাওয়া । প্রথম দিকে এমনই ছিল ।

এখন শেষ কথা যা বলার তা' বলবেন আধুনিক নারীরা । পুরুষ তন্ত্রের সংকীর্ণ শিক্ষা-দীক্ষা ছেড়ে দিতে হবে । পুরুষের মধুর সম্বোধন, ভাষণ, আশ্বাসে বিশ্বাস নেই, কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে । তাকে আয়ত্ত করতে হবে প্রকৃতশিক্ষা, সমাজ বিচারের নৈপুণ্যতা, পেশা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা । প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মানসিকভাবে তাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে । তাকে মনে রাখতে হবে সে মানুষ, নারীত্ব তার লৈঙ্গিক পরিচয় । পুরুষের সঙ্গে তার পার্থক্য মাত্র একটি ক্রোমোসোমের । তাকে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে । নিজের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে নিতে হবে নিজেকেই ।

ভাবার বিষয় এই যে, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ভ্রান্ত খুসিতে উদ্ভাসিত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব কর্তৃক সমর্থিত গণতন্ত্র, বিচারালয় বা প্রশাসন, কবি-দার্শনিক-সাহিত্যিক, ধর্ম সমাজ যেখানে পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত বা প্রভাবিত এবং নারীকে সম্মান, নিরাপত্তা এবং মানুষের মত তার পূর্ণ বিকাশোপায়ে সুনিশ্চিৎ করতে অক্ষম, সেখানে অসহায় সংখ্যালঘু নারীদের ঐক্যবদ্ধ সামাজিক এবং লৈঙ্গিক বিপ্লব ঘটাতে হবে । এটা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে, সুদীর্ঘকাল ধরে প্রভুত্ব এবং আয়েশভোগে অভ্যস্ত পুরুষ-সমাজ মেয়েদের স্বার্বভোম অধিকার লাভে এগিয়ে আসবে ... ।

(কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই নিবন্ধের বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে প্রখ্যাত লেখক শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন আজাদ সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থ 'নারী' থেকে) ।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

লেখক রাখালরায় চৌধুরী জন্ম পূর্বপঙ্গের লাকশাম থানার অন্তর্গত উত্তরদা গ্রামে ৬ই জানুয়ারী ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক । ছোটবেলা থেকেই তিনি লেখালেখি করেন । সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর সাহিত্যচর্চায় বিশেষভাবে মনোযোগী । ইতিমধ্যেই ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ছোটগল্প, উপন্যাস সহ মোট ১৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । শিশু সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে । আমেরিকা থেকে তিনি আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছেন ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে । আগরতলা আকাশবাণীর তিনি একজন গীতিকার । বহু গান রচনা করেছেন । ত্রিপুরা কৃষ্টি সংহতি, শিশুমহল, যতীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার, জ্যোতি প্রকাশনী ও সাহিত্যপত্র গোধূলির প্রতিষ্ঠাতা তিনি । ত্রিপুরা রবীন্দ্রপরিষদের তিনি আজীবন সদস্য । এই দুটো বৃহৎ সম্মানসহ রাজ্য ও বর্হিরাজ্য থেকে প্রচুর পুরস্কার ও সম্বর্ধনায় ভূষিত রাজ্যের এই প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিক ।

******

বাংলা ভাষা আন্দোলনে উত্তরণের ইতিহাস কথা কও

— শ্যামল চৌধুরী

বিংশ-শতাব্দীর ৫০ এর দশকে অর্থাৎ দেশ খণ্ডিত হওয়ার কয়েক মাস পরেই ভাষা আন্দোলনে এক বিস্মৃত পথিক হলেন পূর্ববাংলার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত সদস্য হিসাবে তিনি ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণ-পরিষদে (Constituent Assembly) ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উর্দ্দু ও ইংরেজীর সাথে বাংলাকেও পাকিস্তান গণ-পরিষদের অন্যতম সরকারী ভাষারূপে ব্যবহারের দাবী তোলেন। এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাকালে গণ-পরিষদে তুমুল বির্তকের সৃষ্টি হয়। গণ-পরিষদে পূর্ব-বাংলা থেকে নির্বাচিত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উত্থাপিত দাবীকে জোরাল সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য সকল সদস্যই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করে গণ-পরিষদে দাঁড়িয়ে বলেন—

"(Pakistan is a Muslim State and must have as its lingua franca the language of Muslim nation. The Constituent Assembly Member should realise that Pakistan has been created because of the demand of one hundread million Muslims in the sub-continent and the language of hundred million Muslims is Urdu and no other language. (Constituent Assembly of Pakistan Debates, 25th Feb. 1948)

এ প্রসঙ্গে ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ পাকিস্তানের গণতন্ত্র শীর্ষক আলোচনায় আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় 'বাংলা ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠা কল্পে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা অখণ্ডনীয় বলে জোরাল যুক্তির অবতারণা করেন। যা এরূপ—"সমগ্র পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মাঝে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। সুতরাং পাকিস্তানের গণ-পরিষদের আলোচনায় বাংলাকে স্থান দিতেই হবে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা জনসংখ্যার বিচারে বাংলাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই উচিত। পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়া পাক প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের অবস্থা তো অতীব শোচনীয় করিয়া তুলিলেন।"

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় উন্নীত করার আবেদনে পূর্ব বাংলার উর্দ্দুপ্রেমী গর্ভনর খাঁজা নাজিমুদ্দিন ও লিয়াকত সাহেবের মতো ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অকথ্য গালি-গালাজসহ দেশদ্রোহীরূপে আখ্যায়িত করেন । পাকিস্তান গণ-পরিষদে ৭৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪৪ জনই বাংলা ভাষিক । বিস্ময়করভাবে ধ্বনি ভোটে দত্তের প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেল । খুব সম্ভবতঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে পরিষদের কার্য্যবিবরণী প্রকাশ হল । পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণ পূর্ববাংলা থেকে গণ-পরিষদে নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হন । করাচি থেকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকা তেজগাঁও বিমান বন্দরে পৌঁছলে ছাত্ররা শ্রীদত্তকে এক উষ্ণ সংবর্ধনা জানালেন । এ সময় থেকে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে দাবী চলতে থাকে । এর মধ্যে আন্দোলনের গতিবেগ লাভ করে অর্থনৈতিক শোষণের তীব্রতায় । যেমন পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত চন্দ্রঘোনা কাগজকল এশিয়ার বিখ্যাত কাগজ কল । এই কলে যে পরিমাণ কাগজ উৎপাদন হতো সমস্ত কাগজ জাহাজে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরিত হতো Pakistan মার্কা কাগজে সীল দেবার জন্য । ফলে পূর্ববাংলার মানুষ এই কাগজই দ্বিগুণ মূল্যে কিনত । এ রকম বহু বিষয়েই বাংলার মানুষের উপর অন্যায় অবিচারে বাংলাদেশের মানুষ ক্রোধে ফুঁসতে থাকে। তারপর নূরুল আমিন ও খাঁজা নাজিমুদ্দিনের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে । খাঁজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে এসে ঢাকায় ঘোষণা দেন ; উর্দ্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা । তারই ফলশ্রুতিতে ফেব্রুয়ারীতে বাংলা ভাষা আন্দোলন মহীরূহে পৌঁছে। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থে বশীর আল হেলাল লিখেছেন, "সালাম, বরকত ও জব্বরসহ আটজনের শহীদ হওয়ার কথা সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়।" আপাত দৃষ্টিতে এই সংখ্যা শহীদ হলেও পূর্ব বাংলার গণজাগরণে তাঁদের আত্মত্যাগ মহাভারতের দধিচীর মতো । যা পরবর্তী পর্যায়ে ৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলীম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের জয়কে সুনিশ্চিত করে । যদিও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পশ্চিমী শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে অপরিণত সময়েই ভেঙ্গে যায় । এ সমস্ত ধারাবাহিক বঞ্চনা-শোষণের জ্বালা থেকেই নিস্কৃতির খোঁজে ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থীরা নিরঙ্কুশ জয়লাভে সমর্থ হয় । এই বিপুল জয়লাভেও আওয়ামীলীগ দলকে ফৌজি প্রেসিডেন্ট ইয়াইয়া খাঁন ক্ষমতা অর্পণের পরিবর্তে উল্টো জনগণের উপর প্রতিশোধাত্মক জিঘাংসায় নামে । যার ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে বিরাট আলোড়ন ঘটে । পূর্ব পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় । বাংলাদেশ সৃষ্টির বীজ যে ভাষা আন্দোলনেই নিহিত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ সম্পর্কে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথায় ১৯৯৫ সনে ঢাকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের সম্পাদকীয়তে সম্পাদক আনিসুজ্জমান দ্ব্যার্থহীন ভাষায় উল্লেখ করে লিখেছেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতের বৃটিশ শাসন বিরোধী সংগ্রামের সৈনিক এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা ভাষার মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রবর্ত্তক তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি সর্বাধিক মূল্য দিয়েছেন ১৯৭১ এর মার্চে। নিজের হাতে কুমিল্লার বাড়ীতে তুলেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। এর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হয়েছিল বাংলার মাটি। তাঁর সঙ্গে কনিষ্ঠপুত্র দিলীপ দত্তকেও ময়নামতী সেনা ছাউনীতে নির্মমভাবে খুন করে পাকিস্তানের হিংস্র পশুশক্তি।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে বীজ ১৯৪৮ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী গণ-পরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বপন করেছিলেন, সেই চারা থেকেই বটবৃক্ষের মতো ১৯৭১-এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে। প্রথমে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই ছিলেন ভাষার মাধ্যমে প্রচারক এবং জনতার প্রেরণা। তাঁর একনিষ্ঠ দেশপ্রেমে বাঙ্গালী হিন্দুরা যেমন মুক্তিযুদ্ধে অকাতরে প্রাণ দেন, মুসলিমরাও মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করে দেশমাতৃকাকে পশ্চিম পাকিস্তানের যাঁতাকল থেকে মুক্তির জন্যে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে সামিল হন। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে জেলে কাটিয়ে আবার দেশভাগের পরেই মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠায়, মন্ত্রীসভায় স্বাস্থ্যবিভাগের দায়িত্বে থেকে বহু অসমাপ্ত কাজকে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা, আবার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, একের ভিতর এতগুলি মহৎগুণের সমাবেশ ভারতে কয়েকশত বৎসরের ইতিহাসেও দেখা যায়নি। এজন্যই দেশভাগের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন — "আপনার মতো নির্ভীক জননেতা ও সুদক্ষ পার্লামেন্টিরিয়ান ভারতের প্রয়োজন।" উত্তরে তিনি জানান আমার জন্মভূমিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। বলা বাহুল্য ভারতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকা অপেক্ষা মাতৃভূমিকেই স্বর্গাদপি গরিয়সী ভেবেছেন। সুতরাং, এত বড়ো মহান দেশপ্রেমিকের প্রাপ্তি যা তা অত্যন্ত বেদনাদয়ক ও রোমহর্ষক। বাংলাদেশে যেমন মৌলবাদীদের বিষবাষ্পে তা চাপা পড়ছে ; ভারতও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত নয়। এ জন্যই পণ্ডিত প্রবর মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন "বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি"। উল্লেখ্য মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, সীমান্তগান্ধী প্রমুখরা যেমন উপমহাদেশের স্তম্ভস্বরূপ; শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তও সামগ্রীক বিচারে আলোকস্তম্ভ। যিনি দেশমাতৃকাকে নিজের জীবনসহ স্নেহভাজন পুত্রকে পর্য্যন্ত স্বদেশের হিতে দিয়ে গেলেন। (১৯১০ইং সন) ছাত্রাবস্থায় কৈশোর থেকেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেশের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। কাজেই শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঠিক মূল্যায়ন দেরীতে হলেও ইতিহাসের আলোকে সঠিকভাবে স্থান পেলে আগামী প্রজন্মও

এই মনীষীর জীবন-বেদের চর্চায় ফলপ্রসু দিকের উন্মোচনে সহায়ক হবে।

এখন আসা যাক বাংলা ভাষাভাষীদের উপর পর্যায়ক্রমে অকথ্য নির্যাতনের মর্মন্তুদ ঘটনার স্মৃতি রোমন্থনে। বৃটিশ শাসনাধীন আসাম রাজ্যে ১৮৩৮ এর নভেম্বর মাস থেকে ১৮৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। যদিও তার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামের এক ভাষা ছিল। ১৯৩৮ সালে বীর বিদ্রোহী মণিরাম দেওয়ান যে আসামের ইতিহাস লিখেন তার ভাষাও ছিল বাংলা। যে গ্রন্থটি আসামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক আকর গ্রন্থ। খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের স্বার্থে আমেরিকান মিশনারীরা অসমীয়া ভাষায় ব্যাকরণ, অভিধান রচনা ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক অসমীয়া ভাষার গোড়াপত্তন করেন। বৃটিশদের প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৭৩ সালে কামরূপ, দরং, নওগাঁ, শিবসাগর এবং লাখিমপুরে জেলায় বিদ্যালয়সমূহে এবং কোর্ট-কাছারিতে অসমীয়া ভাষা সরকারী ভাষার প্রতিষ্ঠা পায়। লক্ষ্যনীয় ১৮৩৮ থেকে ১৮৭৩ এই সময়কালে আসামে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচলনকে কেন্দ্র করে পরবর্ত্তী পর্যায়ে বাংলা ভাষিকদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। অথচ অসমীয়া ভাষার বিকাশ ও প্রসারে বাংলা ভাষিকরা কোনদিনই বিরোধিতা করেনি। শুধুমাত্র ন্যায়সংগত সাংবিধানিক অধিকারকে উত্থাপন করেছে। দাবী আদায়ের অধিকারকে শুধু অস্বীকারই করা হয়নি, হিংস্র আক্রমণ, দাঙ্গা, নিপীড়ন, ধর্ষণ সমস্তরকম বঞ্চনার সম্মুখীন ও শিকার হতে হয়েছে বাংলা ভাষীদের বারবার।

শ্রীহট্ট ও কাছারকে প্রশাসনিক প্রয়োজনের অজুহাতে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে এতদঞ্চলের বাংলা ভাষিকদের স্বার্থকেই শুধু বিঘ্নিত করা হয় নি, তার সাংস্কৃতিক ও জাতীয় অস্তিত্বের পরিচয়কে বিপন্ন করে তোলা হয়েছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে শ্রীহট্টের অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর জীবনের স্বপ্নকে চিরতরে সমাধি ঘটানো হল। ১৯৪৭ এর ৭ জুলাই শ্রীহট্টে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, তার ফলাফল ঘোষিত হল ১২ জুলাই। তাতে দেখা গেল মাত্র ৫৫,৫৭৮ ভোটের ব্যবধানে শ্রীহট্ট জেলাকে পাকিস্তান ভুক্তির জন্য নির্ধারিত হয়। উল্লেখ্য প্রায় ৩ লক্ষ চা বাগান শ্রমিকদের যাঁরা সকলেই ভারতীয় তারা স্থানীয় অধিবাসী নন এই অজুহাতে গণভোটের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হল। বিচিত্র বিরল করুন ইতিহাসের মর্মস্পর্শী ঘটনা। তার পূর্বে লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনাও ছিল এই বাংলা ভাষিকদের উপর আক্রমণ। এদের ঠাণ্ডা করতে পারলে ভবিষ্যত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মৃগয়া বিপদ মুক্ত। এ ধরণের জঘন্য বর্বরতা বিশ্বের কোন ইতিহাসেই স্বাক্ষর রাখেনি। ইংরেজ তার স্বার্থকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে বাংলার মত একটি জাতি গোষ্ঠিকে চরম নির্মমভাবে খুনের নির্লজ্জ উদাহরণ পৃথিবীতে নজিরবিহীন। জাতীয় নেতাদের খামখেয়ালীতে দেশভাগের পর থেকে যেমন পর্বতপ্রমাণ সমস্যায় দেশ আক্রান্ত, ভবিষ্যতের

গর্ভে যে আরোও অনেক অঘটনের জন্ম দেবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কুমিল্লা নোয়াখালীর বেশীর ভাগ অঞ্চল ত্রিপুরা মহারাজাদের শাসনাধীন এলাকা ছিল। এ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রাজমালায়ও উল্লেখ রয়েছে। ইংরেজ আমলে বহুবার ঐ এলাকাকে ত্রিপুরার রাজশাসনের বর্হিভূত করার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এই বিষয়ে ঢাকা-আলিপুর কোর্টে সর্বশেষ লণ্ডনেও মহারাজাদের আধিকারকেই মান্য করা হয়েছে। অথচ দেশভাগে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা অধিবাসীদের তাদের ন্যায্য অধিকারকে যেমন চিরদিনের জন্য ধ্বংস করা হয়েছে, তেমনি কুমিল্লা নোয়াখালি, শ্রীহট্ট হিন্দু অধিবাসীদের উপর বঞ্চনা করা হয়েছে। সেই অঞ্চলকে বলা হতো চাকলা রোশনাবাদ। এই রোশনাবাদ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোক বর্ত্তমানে ত্রিপুরার বসবাসকারী। তাঁদের ভাগ্যে নেমে এল অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা, জুটল উদ্বাস্তু নাম। অপরদিকে আসামের চিত্রও একই। ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগষ্ট শিলং টাইমস্ কাগজে মুখ্যমন্ত্রী বরদলৈ বললেন "Assam is for Assamese"। স্বাধীন আসামের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনে তদানীন্তন রাজ্যপাল আকবর হায়দারী উদ্বোধনী ভাষণে বললেন "The natives of Assam are now the masters of their own house." স্বাধীনতার শুরু থেকেই আসাম রাজ্য বাঙ্গালীদের বিদেশী, বহিরাগতরূপে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে। আসামের প্রতি বাংলাভাষিকদের আনুগত্য নিয়ে সংশয় ও সন্দেহই নয় প্রতিপক্ষ ও প্রতিবাদীর অভিধায় চিহ্নিত করা হল। ৫০ সনে গোয়ালপাড়া জেলায় শুরু হল বঙ্গাল খেদা আন্দোলন। নির্বিচারে হত্যা, অগ্নিসংযোগ লুটপাটে আতঙ্কগ্রস্ত প্রায় ২ লক্ষাধিক বাংলা ভাষিক উত্তরবঙ্গে ও অন্যান্যস্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। স্বাধীনতার পর থেকে ভাষা, শিক্ষা, নিয়োগ, ভূমিবন্টনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভৃতি বিষয়ে আসাম সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়ালো এক পেশে। যা বৈষম্যের নীতি। সমগ্র ব্রহ্মপুত্র ধরে চললো সাংস্কৃতিক আক্রমণ। দেখা গেল দেশভাগের আগে আসাম Legislative Council-এ বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখার যে সুযোগ ছিল তা ১৯৫৩ সালে বাতিল করে নুতন আইনে রূপান্তরিত হলো : The business of the House shall be transacted in Assamese or in English.

উগ্র অসমীয়া ভাষা নীতি, অনসমীয়াদের উপর অত্যাচার-নিগ্রহ, আর্থ-সামাজিক ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের উপর নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ১৯৫৪ সালের ১৯শে জুন করিমগঞ্জে, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর বঙ্গভাষা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের ২১ এবং ২২শে এপ্রিল আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভায় অসমীয়াকেই একমাত্র রাজ্য ভাষা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২১শে জুন "নিখিল আসাম বাংলা ভাষা সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা জুলাই শিলচরে

সম্মেলন শেষ হওয়ার পরদিনই সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাব্যাপী শুরু হল ভয়াবহ দাঙ্গা । এই দাঙ্গায় ৪০ জনের বেশী লোক নিহত হলেন । বাড়ীঘর আগুনে ভস্মীভূত হল প্রায় দশ সহস্রাধিক । পঞ্চাশ হাজার লোক নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে । ১০ই অক্টোবর আসাম বিধানসভায় রাজ্য ভাষা বিল উত্থাপিত হয় এবং ২৪শে অক্টোবর তা গৃহীত হয় । আইনগতভাবে বাংলা ভাষা তার মর্যাদা হারায় । অসমীয়া ভাষা হয় রাজ্যভাষা । ১৯৬১ এর ৫ই ফেব্রুয়ারী করিমগঞ্জের টাউন ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে কাছাড় জেলা জন সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় । জন সম্মিলনের নেতৃত্বে ছিলেন করিমগঞ্জের প্রখ্যাত জননেতা ও আসাম বিধানসভা এম, এল, এ রথীন সেন এবং ছাত্রনেতা পরিতোষ পাল চৌধুরী । ৪ ঠা এপ্রিল নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষিকদের পক্ষে কয়েকজন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সংবিধানের ৩৪৭ নং ধারানুযায়ী আসামে বাংলা ভাষাকে রাজ্যভাষার স্বীকৃতির অনুরোধ করেন । ১৪ই এপ্রিল পালিত হল সংকল্প দিবস । ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই মে বিভিন্ন শোভাযাত্রা পদযাত্রা সংগঠিত হয় । ১৯শে এপ্রিল থেকে শুরু হয় পদযাত্রা। প্রায় দু সপ্তাহ ধরে ২২৫ মাইল পদযাত্রা শেষে পদযাত্রীদল করিমগঞ্জ শহরে পৌঁছেন ২রা মে তারিখে । এলো সেই মহান ১৯শে মে. সারাদেশ ব্যাপী চলছে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন। ১৯ মে গণসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কাছাড় জেলায় সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করা হয়। ঐ দিন শিলচর রেল স্টেশনে চত্বরে যখন হাজার হাজার সত্যাগ্রহী শান্তভাবে অবস্থান করছেন, তখন তৎকালীন আসাম সরকারের আসাম রাইফেল পুলিশ সত্যাগ্রহী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে দুপুর ২টা ৩৫ মিঃ সময় অর্তকিতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ে । মুহূর্ত্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ১১টি তাজা প্রাণ। শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন কুমারী কমলা ভট্টাচার্য্য, সুনীল সরকার, কানাইলাল নিয়োগী, সুকোমল পুরুকায়স্থ, সতেন্দ্র দেব, কুমুদ দাস, তরণী দেবনাথ, হীতেশ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র সূত্রধর, চণ্ডীচরণ সূত্রধর ও শচীন্দ্রলাল পাল । এর মধ্যে কমলা ভট্টাচার্য্য ষোড়শ বৎসরে পদার্পণে ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ করেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন । শহীদ হীতেশ বিশ্বাস, কুমুদ দাশ ও সত্যেন্দ্র দেব ত্রিপুরার ছেলে । জীবন-জীবিকার তাগিদে বেসরকারী কাজে সেই সময়ে শিলচরে ছিলেন । ভাষা আন্দোলনে তাজা রক্তগুলি ঝড়ে কৈশোরেই ।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এ রক্ত ঝরার জন্য দায়ী কে বা কারা ? দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় জাতীয় নেতৃত্ব । কেননা এ সম্পর্কে অতীত ঘটনা স্মরণ করা দরকার বাঙালী জাতীয়তাবাদকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের একটি উদাহরণ উল্লেখ্য : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স তখন মাত্র কুড়ি । ঐ সময়ের ইংলিশম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙালীদের প্রতি ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর চরম অবমাননাকর একটি মন্তব্যে কবিকে অতীব ব্যথিত করে । "Kick them (the Bengalees) first and then speak to them" এই উক্তির বিদ্রুপাত্মব

ভাষায় তিনি ভারতীতে লিখলেন, ইংরেজ গর্ভনমেন্ট নিয়ম জারী করেছেন যে, যেহেতু বাঙ্গালীদের শরীর অত্যন্ত বে-যুৎ হয়ে গিয়েছে, তাদের প্রত্যহ কার্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে । রবীন্দ্রনাথের চোখে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ভুলভাবে ধরা পড়েছিল । তাই জুতা-ব্যবস্থায় ১৮৮৯তে নানাহ প্রবন্ধে শ্লেষযুক্ত রচনায় লিখলেন। তাছাড়াও ইংরেজদের ধ্বংসাত্মক নীতি-যেমন লর্ড লরেন্স ও লিটন শিক্ষিত বাঙ্গালীদের বিশেষতঃ আই. এ. এস. দের সম্পর্কে অত্যন্ত ঘৃণ্য কটূক্তি প্রচার করেন । ঐ দৃষ্টিভঙ্গীতেই ১৯০৫ইং সনে বঙ্গভঙ্গ সময়ে লর্ড কার্জণ বাংলাদেশের রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম - এই তিনটি বিভাগকে আসামের সহিত যুক্ত করায় এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রচুর রক্ত ঝড়ে । বৃটিশ গর্ভনমেন্ট নানা প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করে । সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরা মহারাজার অতিথিরূপে কুমিল্লায় এসেছিলেন। কবিগুরুর পদার্পণে কুমিল্লায় এক জনজাগরণ ঘটে । যার ফলে বাংলাদেশের সর্বমান্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, কুমিল্লার জমিদার বাবরুমিএগ্রা, অখিল দত্ত, রায়বাহাদুর ভূধর দাস, মথুরামোহন দেব, এ. রসুল ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র আলোড়ন গড়ে তোলেন । স্মরণীয় তখন বঙ্গদেশের আয়তন ছিল ১,৮৯,৯০০ বর্গমাইল । লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটির মতো । রাজস্বের পরিমান ছিল ১১ কোটি । ইংরেজ সরকারের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দু ও মুসলমান মিলে বঙ্গদেশে প্রায় তিন হাজার প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন । এর মধ্যে কলকাতার টাউন হলে পাঁচটি বিশাল সভার অধিবেশন হয় । এ সকল সভায় রাজা-মহারাজা-জমিদার-শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জাতিধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছিলেন । বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট সত্তর হাজার লোকের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়েছিল । গান্ধীজী এই আন্দোলনকে ভারতের প্রকৃত নবজাগরণ বলে উল্লেখ করেছিলেন । বাংলার বিধানসভা (Legislative Assembly) এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন । জননেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার বলেন যে, 'খুনী আসামীকে ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়; কিন্তু কোটি কোটি বাঙ্গালীকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তাঁদের চরম দুর্ভাগ্যের ব্যবস্থা করা হল'। ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেন বাঙ্গালী জাতি ও একতার ধ্বংসমূলক যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, মোগল ও পাঠান সুলতান, নবাবদের আমলেও এরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় নাই । লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা । এই উদ্দেশ্যেই ঢাকার নবাব সলিমউল্লাকে চৌদ্দ লক্ষ টাকা ধার দিয়ে তাঁকে বঙ্গ বিভাগের প্রধান সমর্থকরূপে দাঁড় করালেন । হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিভেদের বীজ লর্ড কার্জনই প্রথম বপন করলেন । এ জন্য বাংলাদেশে বড় বড় শহরে কার্জনের কুশ পুত্তলিকা দাহ করা হল । বিখ্যাত

দেশাত্মবোধক 'বন্দেমাতরম' গানটি তখন ধ্বনিত হল। এই গানটি দিয়েই সভা আরম্ভ হতো । ফরাসী বিদ্রোহের সময় বিখ্যাত 'লা মার্সেলিশ সঙ্গীত ছাড়া বিশ্বের ইতিহাসে আর কোন সঙ্গীত একটি জাতির মনে অনুরূপ সাড়া ও কৌতুহলের সৃষ্টি করেনি । মোটের উপর অসন্তোষের ও বিদ্বেষের আগুন সাড়া দেশে জ্বলে উঠল । ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হল । কবিগুরু কবিত্বপূর্ণ ভাষায় এই দিনটিকে উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্ন স্বরূপ রাখী বন্ধনের প্রস্তাব করে লিখলেন, আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হবে । তাই ঐ দিনকে বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করবার জন্যে রাখী বন্ধনের দ্বারা পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বেঁধে দিতে হবে । রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভে অরন্ধন পালন করার প্রস্তাব করেন । উভয় প্রস্তাবই কার্যে পরিণত হল । ৩০শে আশ্বিন তা প্রতিপালিত হল । ১৩১২ বাং ৩০শে আশ্বিন রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আপামর জন সাধারণ এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করে গঙ্গা তীরে সমবেত হল । গঙ্গাস্নানের পর পরস্পরের হস্তে রাখী বন্ধন করা হল । এই উপলক্ষে কবিগুরুর রচিত কবিতা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে কলকাতা সহ বঙ্গদেশেব সর্বত্র গীত হল।

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পূণ্য হোক - পূণ্য হোক - পূণ্য হোক , হে ভগবান ।

লর্ড কার্জন যে অস্ত্র দ্বারা বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্য বিনাশে তৎপর হয়েছিলেন ইতিহাসের অমোঘ বিধানে তাই ভারতের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা উন্মেষের বীজ বপন করল । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, বিশেষতঃ তা দমনের জন্য সরকারের কঠোর নিপীড়ন-নীতি অবলম্বনের ফলে বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ ক্রমেই জনপ্রিয় হল। গিরিগাত্র থেকে যে ক্ষুদ্র জলধারা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল বেগে পর্বত বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছিল, তার গতি কখনও ব্যাহত হয়নি। এজন্যেই ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক উইলিয়াম ডুরান্ট মন্তব্য করেন, ১৯০৫ সন থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত গণনা করতে হইবে । কেননা বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ শাসনের শান্তিময় যুগের অবসানের দিন ঘনিয়ে তোলে । সত্যিই ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারের সমাপ্তিকালে ভারত সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে সমগ্র বংলার জনসাধারণকে বিস্মিত করলেন । এজন্যই মহামতি গোখলের ঐতিহাসিক উক্তি স্মরণীয় 'What Bengal thinks today-India thinks tomorrow' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় কবিগুরু সিংহবেশে ভারতবাসীর নেতা সেজে যে ভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে ইংরেজের সিদ্ধান্তকে প্রতিহত

করেন; তা এক গৌরবোজ্জ্বল ও স্মরণীয় অধ্যায় ।

কিন্তু যে ত্যাগ ও লড়াইর বিনিময়ে যা অর্জিত হল জাতীয় নেতৃত্বের খামখেয়ালীপনায় দেশভাগে তার সুফল ও সার্থকতা পরবর্তীকালে শূন্যের কোঠায় পৌঁছল । লর্ড ওয়াভেল ভারত হইতে বিদায় নেওয়ার পরে ভারতের ভাইসরয় মাউন্টব্যাটন কার্য্যভার গ্রহণ করে ভারতে আসেন । ভারতকে দুই রাষ্ট্রে বিভাজন করিয়া, দুই দেশের ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের হাতে শাসনভার অর্পণের জন্য । ভারতে বৃটিশরাজ খতমের সায়াহ্ন । বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার ভার স্যার র‍্যাডক্লিফের উপর ন্যস্ত হয় । বাংলা বিভাগ করা হল । চট্টগ্রাম, ঢাকা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগে কিয়দংশ খুলনা ও যশোর জেলা এবং আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয় । শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমায় কয়েকটি থানা আসামের অর্ন্তভূক্ত করা হয় । জাতীয় নেতাদের সম্পূর্ণ অবিমৃষ্যকারিতায় এ ধরণের ঘটনা ঘটল । উল্লেখিত জেলার জনগণের মতামত নেওয়া ছাড়া দিল্লীতে বসেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ দেশবাসীর প্রতি হঠকারিতার সামিল । আর যে লোকের উপর দ্বায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছিল উল্লেখিত এলাকা সম্পর্কে শূন্যের চেয়েও তার জ্ঞান কম ছিল । উল্লেখ্য শ্রীহট্ট থেকে কাছাড় জেলাকে কেটে আসামের সাথে যুক্ত করে দেওয়া ক্ষমতাসীন অবস্থায় খুবই সহজ কাজ । কিন্তু এতদঞ্চলের ভাষা কৃষ্টি, সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে না জেনেশুনে জাতীয় স্পর্শকাতর বিষয় সমাপ্ত করার মতো ঘটনা চরম হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয় । রাজশাহী, খুলনা ও যশোর জেলার ভাষা বাংলা । পশ্চিমবাংলার সাথে ভাষাগত ভাবে সম্পূর্ণ মিল । তাঁদের খুব একটা অসুবিধা না হলেও মাতৃভূমিকে চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার বেদনা ভুলে যাওয়া সুকঠিন । বৃটিশের বিরুদ্ধে কবিগুরু দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে যে সাফল্য অর্জন করেন; জাতীয় নেতারা তড়িঘড়ি করায় আবার ইংরেজের ফাঁদেই পা বাড়ালেন। কেননা বঙ্গবিভাগের সময়ে বাংলার ভৌগোলিক আয়তন ১,৮৯,৯০০ বর্গমাইল জমির বর্তমানে উভয় বাংলার মিলিত অবস্থায় ও উল্লেখিত জমির হিসাবে মিলিবে না । স্বাভাবিক প্রশ্ন ? কোথায় সে জমি ? বাংলা বিভাগের ফলে ইংরেজের চক্রান্তে তথা জাতীয় নেতাদের উদাসীনতায় কতক পরিমান গেল আসামের সাথে আর কতক পরিমান গেল অন্যান্য প্রদেশের দখলে । এমনিভাবে ইংরেজের ষড়যন্ত্রে বাংলার ভূমির সীমানাই ছোট করা হয় নাই, পরন্তু ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি উৎপাদিত ফসল, কুটির শিল্প ও বস্ত্রশিল্পীদের ধ্বংস করা হয়েছে, যথেচ্ছ রাজস্ব আদায়ে চাষীদের চরম দুরবস্থায় ফেলে । যার পরিণামে ক্ষমতা দখলের ১৩ বছরের মাঝেই ছিয়াত্তরের মন্বান্তরে বাংলার অর্দ্ধেক লোকের মৃত্যু ঘটে তার সংখ্যা ছিল ১কোটির মতো । যা অতি বিস্ময়কর ।

এখন আবার আসছি শিলচরে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের উদ্দেশ্যে ২০ মে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সমবেত লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবিদের দৃপ্ত শোক মিছিলের পর্বের কথায় । ইডেনে এগারটি মৃতদেহ নিয়ে পঞ্চাশ হাজারের অধিক মানুষের আওয়াজ উঠল । 'প্রাণ দিয়েছি আরো দেব, মাতৃভাষা ভুলব না, শহীদ তোমাদের রক্তদান বৃথা যাবে না' ইত্যাদি শ্লোগানে ইডেনের আকাশবাতাস মুখরিত হয়েছিল । আসামের রাজ্যপাল জেনারেল নাগেশ শহীদ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন; এই আন্দোলনের নেতা মহীতোষ পুরকায়স্থের কাছে । যিনি এই শোকবার্তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে তা প্রত্যাখ্যান করেন । শিলচরসহ কাছাড় জেলার সর্বত্র রেলকর্মীরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২১ শে মে কর্মবিরতি পালন করেন । ২২শে মে সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় মিছিল মিটিং এর মাধ্যমে । বিধানসভার বিরোধীদল নেতা জ্যোতিবসু বলেন — কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই দলের শাসন থাকা সত্ত্বেও আসামে ভাষা সমস্যার কোন সমাধানের উদ্যোগ না নেওয়ায় বাংলা ভাষার আন্দোলনে রক্ত ঝরল । সরকারকে এ বিষয়ে জবাব দিতেই হবে ।

২২শে মে ভোরের বিমানে একাদশ শহীদের চিতাভস্ম নিয়ে আগরতলা ও কলকাতার পথে রওনা হলেন ভাষা আন্দোলনের সংগঠকবৃন্দ । আগরতলার নেতৃত্ব দেন প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সাংবাদিক জীতেন্দ্র চন্দ্র পাল মহাশয় । ঐ দিন বরাক উপত্যকায় হরতাল পালিত হয়। ২৩শে মে গৌহাটি, শিলং, হাফলং, আইজল ও আগরতলায় প্রভৃতি স্থানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় । আগরতলা শিশুউদ্যানে প্রতিবাদ সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশিষ্ট সেনাপতি শ্রী শাহনওয়াজ খান, ত্রিপুরা কংগ্রেসের সহসভাপতি সুখময় সেনগুপ্ত, তড়িত মোহন দাশগুপ্ত তাঁদের বক্তব্যে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন । ২৪ তারিখে কলকাতা ময়দানে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে লক্ষাধিক লোকের সভায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো । ঐদিন বরাকেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠিত হয় । ২৬শে মে আগরতলায় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে পি. এস. পি. ও তপশীলি জাতি সমিতির মিলিত আহ্বানে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে মে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে আসামে ভাষা প্রসঙ্গে স্থিতাবস্থা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব দেন । ঐদিনই প্রখ্যাত উপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে বললেন — "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে বলছি, এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার চাইছি" । ওদিকে শিলচরে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা অজয় ঘোষের নেতৃত্বে আন্দোলনকারীদের সংগ্রামী মনোভাব পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় । ২৯ শে মে ছিল ভাষা শহীদ দিবস । ঐ দিন কাছাড় জেলার সর্বত্র হরতাল, অরন্ধন, চিতাভস্ম নিয়ে মিছিলে

শহীদদের স্মৃতি তর্পণ করা হয় । আগরতলা শিশু উদ্যানে বর্তমানে সুকান্ত একাডেমীর প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ত্রিপুরার আলোড়নকারী জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক শ্রী জীতেন্দ্র চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে শহীদ দিবস পালন করা হয় । বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিধু হাজরা ছিলেন অন্যতম বক্তা । ত্রিপুরায় ঐ দিনটিকে শহীদ দিবস পালন করা হয় । ইহা অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক ঘটনা যে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষের মতে বিশ্ববন্দিত স্মরণীয় ঘটনার দিনে বরাকে মাতৃভাষার জন্যে এক নদী রক্ত ঢালতে হলো, যে রক্তে সুরমা, কুশিয়ারা প্লাবিত হলো । প্রেরণায় অবশ্যই ছিল বাহান্ন সালের ঢাকার ছাত্র আন্দোলন । আর যার প্রেক্ষাপট ১৯৪৮ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের স্রষ্টা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত । ১৯৬১ -ই শেষ নয় বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে ১৯৭২, ১৯৮৬ সালেও তিন তরুণ আত্মবলিদান করেছেন । ১৯৬১ -এর ভাষা আন্দোলনের ১১ বছর পরে আবার নুতন করে মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার হরণের চক্রান্ত শুরু হয়েছিল। ১৯৭২ সালে সিদ্ধান্ত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার বাহন হবে অসমীয়া ভাষা । এর বিকল্প হিসাবে অল্প সময়ের জন্য ইংরেজী চালু থাকবে । এর মাঝে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সার্কুলার জারী করে । সেখানে বলা হল বরাকেও অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে পড়াতে হবে । শুরু হলো আবার আন্দোলন । করিমগঞ্জ মহকুমার যুবনেতা বিজন চক্রবর্তী ভাষা আন্দোলনের বন্ধের প্রচারে আক্রান্ত হয়ে ১৭ই অগাষ্ট মৃত্যুবরণ করেন । সমগ্র বরাক উপত্যকায় তাকে দ্বাদশ ভাষা শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয় । এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে ১০ বছরের জন্য স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা দেওয়া হল। ১৯৮৬ সালে অসম গণপরিষদ ক্ষমতায় এলে ১৯৮৬ -এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী আবার সার্কুলার জারী করে । এর প্রতিক্রিয়ায় গঠিত হয় বরাক উপত্যকায় সংগ্রাম সমন্বয় সমিতি । ২১শে জুলাই মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত করিমগঞ্জ শহরে এলে সংগ্রাম সমন্বয় সমিতি বন্ধ ও সত্যাগ্রহ সংঘটিত করে । মুখ্যমন্ত্রী যেখানে অবস্থান করেছিলেন, ঐ স্থান থেকে মাত্র ৬০০ গজ দূরে অবস্থানরত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে পুলিশ গুলী চালালে মাটিতে লুটিয়ে পরেন শহীদ জগন্ময় দেব ও দিব্যেন্দু দাস । এই পটভূমিতে ভাষা সার্কুলার অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হয় । এ সকল অনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলেই অসময়ে অনেকের রক্ত ঝরে চলেছে । তাই দাবী উঠেছে শিলচরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্ষদ গঠনের । এই পর্ষদ গঠিত হলে বরাকের মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষিত হতে পারে । ভাষাগত আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা পাবে । উল্লেখ্য, ভাষার আগ্রাসন, ধর্মের আগ্রাসন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী । মহান ২১শে এর পটভূমি প্রত্যেক বাংলাভাষীকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের হৃদয়ের অনুভূতিতে একুশ জড়িত । তেমনি ১৯শে মে-ও সমভাবে বাংলাভাষিকদের মননে অনুরণিত । মহান

উনিশকে বাদ দিলে যেমন জাতি গঠনের ইতিহাস পরিপূর্ণতা হতে পারে না, তেমনি ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত পথপ্রদর্শক বা স্থপতি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ছাড়াও জাতির ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হবে না । যিনি অনিবার্যভাবেই ভাষা শহীদ ও জাতিসত্তার লড়াকু সৈনিক, চেতনার এক জ্বলন্ত প্রতীক, মহান দেশপ্রেমের অনুপ্রেণায় বিশ্ব ইতিহাসের বাঙালী জাতিকে উচ্ছাসনে নিদর্শন রেখেছেন, এই কিংবদন্তী পুরুষ শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত । বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এক নদী রক্ত ঢেলে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে । রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের অভিমতে প্রায় ৩০ লক্ষাধিক লোক মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছিল । এই দীর্ঘ তালিকায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম, প্রধান মন্ত্রী তাজুদ্দিন এবং সাহিত্যিক শহিদুল্লা কাইসারের মত মনীষীও রয়েছে । তাছাড়াও গত দু'দশকে মেঘালয়ের রাজধানী শিলং, পশ্চিমবাংলার মরিচঝাঁপি, আন্দামান, মধ্যপ্রদেশের বস্তার, দণ্ডকারণ্যেও বিভিন্ন ন্যায্য আন্দোলনে নির্যাতিত হয়ে শতশত বাংলাভাষী মৃত্যুবরণ করেন । একমাত্র অপরাধ তারা বাংলাভাষী । এদের পরিচিতি বা অভিধা অনুপ্রবেশকারী, উদ্বাস্তু ইত্যাদি । এমনকি অতিসাম্প্রতিককালেও পশ্চিমবাংলায় নাগরিকত্ব কার্ডের জন্য শতশত লোক হেনস্থা হয়ে চলেছে । তাছাড়া ঝাড়খণ্ড রাজ্যেও বাংলা ভাষীরা পরিসংখ্যানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে । তা সত্বেও ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলনে নির্যাতিত হয়ে চলছে । অতীব দুঃখের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তালবাহানা করে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভাষাসাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশে চূড়ান্ত আঘাত হেনে চলেছে । ১৯০৫ সনে অত্যাচার দমন-পীড়ন বৈষম্য ইত্যাদির আবহে লর্ড কার্জনের ষড়যন্ত্রে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল । স্বাধীনতাকালে সেই ধারা ভিন্নরূপে বাংলার উপর নেমে এসেছিল । সেই বঙ্গভঙ্গের একশত বৎসর পর, এই প্রবন্ধ লেখার সময়েও নির্যাতন, বঞ্চনা, নীপিড়ন যা সাম্প্রতিককালেও ঝাড়খণ্ডসহ অন্যত্র চলছে । এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে ভারতের অন্য কোন ভাষার আন্দোলনে এত লোক শহীদ হওয়ার ও নির্যাতনের মর্মন্তুদ বিবরণের নজীর মেলে না ।

মাতৃভাষার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় পিছুপা হয় না কোন জাতি । এরই নাম সন্মানবোধ । প্রগতিশীলতা । পৃথিবীর দেশে দেশে এই ইতিহাস বিরল নয় । যে ইতিহাস মানবতাবোধের প্রেরণা হয়ে বাঁচে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রসংঘও সকল ভাষার বিকাশের কথা বলছে । কারণ ভাষার গণতান্ত্রিকতা ছাড়া জাতীয় সত্ত্বার বিকাশ ঘটে না । আন্তর্জাতিকতায়ও সমৃদ্ধি আসে না । এতে যদি কেউ উৎকট জাতীয়তাবাদ বা (Chauvinism) বলে নিন্দা করতে চায়, তারা কৃত্রিমতার অভিনয়ে নকল খেলোয়াড় হিসাবে চিহ্নিত হয় মাত্র ।

বাংলা ভাষা আন্দোলনের উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়গুলি বিংশ শতাব্দীর বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনের স্মৃতি রোমন্থনসহ দেশভাগের সময় থেকে সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক ঘটনাপর্বের । আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উপর আলোকপাত করা দরকার । বাংলা ভাষাকে বিকাশের লক্ষ্যে অনেকেরই অবদান রয়েছে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু যেটা অতীব গুরুত্বের তা হল ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট এ. বি. পাওয়ার ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রের শাসন সময়ে মহারাজাকে অনুরোধ করে ত্রিপুরার কোর্ট লেঙ্গুয়েজ বাংলার পরিবর্তে ইংরেজীকে চালু করার জন্য । মহারাজা বীরচন্দ্র দ্ব্যার্থহীনভাবে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টের ঐ অনুরোধ প্রত্যাখান করে বাংলা ভাষাকেই চালু রাখেন। স্বাভাবিকভাবেই মহারাজার এই সিদ্ধান্তে রীতিমত আলোড়ন পড়ে। কেননা তখনো ভারতের রাজধানী কলকাতায় । ইংরেজী Culture এর প্রভাবে নব্য বাবুরাও মাতোয়ারা ছিল । বাংলার মূল ভূখণ্ডেই ইংরেজী ভাষা । কোর্ট কাছারি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে । যেখানে কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি ও কর্মভূমি । বাংলা ভাষার প্রধান প্রাণকেন্দ্র । সারা বাংলাদেশ এর প্রভাবে প্রভাবিত হবার ফলে বাংলার কবি, সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবিরাও ত্রিপুরার মহারাজের দুরদর্শীতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন । এমনিভাবে বারবার বাংলা ভাষার উপর ঝড় বয়ে যাওযা সত্ত্বেও এটা ঐতিহাসিক সত্য বিশ্ব মানচিত্রে এবং রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে । এটা আমাদের অহঙ্কার ও গৌরব । যদিও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বিভিন্ন সময়ে ভারত-বাংলাদেশের মাঝে চক্রান্তের গুটি নাড়ে । কিন্তু সফলকাম হতে পারে নি। ভারতেও যেমন জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে মাঝে মাঝে কিছু কানাঘোষা শোনা যায়। উল্লেখ্য যিনি শুধু কথায় নয়, কাজের দ্বারা সরজমিনে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের জনগণের কল্যাণ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন, যাঁহার কাব্যছায়ায় কবিতার ভাষা শতধারায় প্রবাহিত, শতমুখী কাব্যপ্রতিভার দ্বারা বাঙ্গালী ও বাংলাভাষাকে জগৎ সভায় পরিচয় করিয়ে ভারতকে গৌরবান্বিত করেছেন, তাতে ভারতীয় মাত্রই এই গৌরবের অধিকারী । সেখানে এ ধরণের বিচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনা রাষ্ট্রকেই দুর্বল করে । সুতরাং বাংলার হৃত গৌরব সকল বিভেদ ভুলে আগামীদিনে প্রতিষ্ঠিত হউক, বঙ্গভাষী মাত্রই তা কামনা করে । বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বাংলা বিশ্বসভায় স্থান করে নিয়েছে । বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে । এই ভাষার উপর আক্রমণ ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির উপরই আক্রমণ এর ফলে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয় । বাংলাভাষা ও সাহিত্য ভারতবাসীর গর্বের বস্তু, এটা যেন কেউ ভুলে না যাই । পরিশেষে নিধিরাম গুপ্তের কবিতাটি স্মরণীয় —

''নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ?
এতে যদি সুখী হইবে, হে মন রাজন'

অহঙ্কার দূর কর ক্রোধ নিবারণ ।"

কবির আবেগ মথিত ভাবের সঙ্গে আমাদেরও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে বীর শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তকে আমরা যেন ভুলে না যাই । তিনি যে আলোকবর্তিকা রেখে গেছেন তা বহন করে নেবার দায়িত্ব পালনে আমরা যেন পিছপা না হই ।

ঃ লেখকের পরিচিতি ঃ

১৩৪৯ বাংলার ১৩ই পৌষ পূর্ব বাংলার কুমিল্লা জেলায় মুরাদনগর থানার দৈয়ারা গ্রামে লেখকের জন্ম । পিতা স্বর্গীয় ডাঃ চিন্তাহরণ চৌধুরী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী । মাতা প্রয়াতা হিরণ-প্রভা চৌধুরী । পিতার কাছ থেকেই লেখকের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও আনুগত্য বজায় রাখার শক্তিশালী মানসিকতা লাভ । দীর্ঘকাল প্রগতিবাদী গণআন্দোলনের নেতৃত্বে যুক্ত থাকার ফলে জনগণকে খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন লেখক । গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষপটে প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে লেখালেখির অঙ্গনে যাত্রা শুরু । বিভিন্ন পত্রিকায় লেখকের প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে ২০05 সাল পর্যন্ত অব্যাহত রচনাধারায় লেখকের ছয়টি রাজনৈতিক গ্রন্থ ও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে — যেমন, ভারতের মৌলবাদ ও উপমহাদেশের সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, কাশ্মীর ও উত্তরপূর্বাঞ্চলের জ্বলন্ত সমস্যা, বুশ-ব্লেয়ারের ধ্বংসম্মোদনায় বিশ্বজাগরণ প্রভৃতি। বইগুলো শুধু ত্রিপুরায় নয়, রাজ্যের বাইরেও পাঠকদের আলোরিত করেছে ও সমাদৃত হয়েছে। লেখক ত্রিপুরায় সেবামূলক সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত । গ্রন্থরচনায় অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি হল সমাজের দুর্গত নিপীড়িত মানুষের জন্য লেখকের গভীর মমতাবোধ ও দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের প্রকৃত স্বরূপটি অনাবৃত করার নিরলস প্রয়াস । ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগী মহলে শ্রীচৌধরী একটি জনপ্রিয় নাম।

******

ইতিহাসের আলোকে ত্রিপুরার যাত্রার আসর

— সুদর্শন মুখোপাধ্যায়

'যাত্রা' শব্দটির মধ্যে এমন কি মাদকতা আছে যা আবহমান কাল থেকে সকল বয়সের নরনারীদের গভীরভাবে আকর্ষণ করে আসছে ।

আমরা জানি প্রতীচ্য আদর্শে বংলাদেশে নাট্যরস পরিবেশনের পথিকৃত রুশদেশবাসী গেরাসিক লেভেভক্ । মঞ্চ তৈয়ারী করে অভিনয় করার রীতি এ দেশে প্রতীচ্য থেকে আগত ।

'যাত্রা' কথাটির মধ্যে গমন নিগমন জড়িয়ে আছে । সে হিসেবে প্রতিটি সংসারই যাত্রার আসর । প্রতিটি সংসার বা বলি কেন প্রতিটি মানুষের জীবনই আগম নিগমের সুতায় বাঁধা — যতটুকু যার অভিনয় করার সেটুকু শেষ হলেই যবণিকা অন্তরালে গমন । এক আসে এক যায় — কেউ আসেন আর চলে যান । কেউ হাসান, কেউ কাঁদান, কেউ পথ নির্দেশ দিয়ে যান । ক্ষণিকের ত্বরে আসার এই আগমন নিগমন নিয়েই যাত্রা । যদিও বাস্তব জগৎও অভিনয় জগতের মধ্যে কিছুটা ফারাক থেকেই যায় ।

প্রাচীন ভারতের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রাচীনভারতে সংস্কৃত নাটক যে সব মঞ্চে অভিনীত হত সে সব রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদভূমিতে কোন পর্দা থাকত না । রঙ্গমঞ্চে বাস্তব জগতের বস্তুগুলি তুলে ধরা হতো না— অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয়ের মাধ্যমে - ঐ সব বস্তুর অস্তিত্ব দর্শক চিত্তে প্রতিফলিত করতেন । অন্যদিকে গ্রীক নাটক অনেক সহজ ও সরল ছিল । আমরা জানি জীবনের বিচিত্র রূপ ধরা পড়ে সাহিত্যে । কিন্তু জীবন যখন উথাল-পাথাল হয়ে শান্তজীবনে ঝড়ে আসে তখনই নাটকের জন্ম হয় । নদী তার যাত্রাপথে বাধাপ্রাপ্ত হলে দুর্বার হয়ে উঠে-ঠিক তেমনি জীবন যখন অশান্ত হয় নাটক প্রতিবাদী সুর তোলে তখন তাই নাটক জীবনদর্শন দর্পণ স্বরূপ । মানব জীবনে অহরহ নাটকের অভিনয় চলছে । কখন সে রুদ্র, কখনও শান্ত, কখনও প্রতিবাদে মুখর, কভু বা হাস্য উজ্জ্বল নব-নব রূপ তার ।

সংস্কৃত 'যা ধাতু' অর্থাৎ গমন করা থেকে যাত্রা শব্দের উৎপত্তি । এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রস্থান বা গমন করা । কিন্তু যাত্রা শব্দ আবার উৎসবার্থেও ব্যবহার হত, শুভ যাত্রা । বর্তমান যাত্রার বীজ পত্তন হয়েছিল দ্বাদশ শতকে কিংবা তারও আগে । তবে যাত্রা অভিনয়

প্রসঙ্গে ষোড়শ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর অবদানের কথা বিশেষরূপে স্মরণ করতে হয় ।

যাত্রা গানের উদ্ভব কীর্তন গান অথবা পাঁচালী থেকে । তার প্রাথমিক প্রকাশ ঢপ যাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছিল । 'গীত গোবিন্দ' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিশেষ করে ষোড়শ শতকে চৈতন্য দেবের কৃষ্ণ লীলা অভিনয়ই মূলত যাত্রার প্রাথমিক রূপ এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। আধুনিক যাত্রার শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ।

বর্তমানে যাত্রাকে অনেক উত্থানপতন ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। ফলে নিয়ত পরিবর্তনের মধ্যে তাকে অগ্রসর হতে হচ্ছে । যাত্রা গান হচ্ছে যাত্রালীলা । যাত্রালীলাগীতাভিনয় যা কালক্রমেরূপ নিয়েছে যাত্রাভিনয়ে। সেই যাত্রাভিনয় কালক্রমে পরিণত হয়েছে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রায় ।

দেশ স্বাধীন হবার আগে রাজা মহারাজা, জমিদার, জোতদার ও সমাজের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিরা যাত্রাগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । পরবর্তী সময়ে গ্রামগঞ্জের মহাজন শ্রেণী চা-বাগান ও ..... মালিকগণ যাত্রাগাণের পৃষ্ঠপোষকের ভারগ্রহণ করেন । বিশেষ করে দুর্গাপূজা, দোল প্রভৃতি উৎসবকে কেন্দ্র করে শ্রমিক শ্রেণীকে আনন্দ দিতে চা বাগানে বা কালিবাড়িতে যাত্রাগাণের ব্যবস্থা করা হতো । এতে করে মালিকগণ শ্রমিক শ্রেণীর সুনজরে আসতে সমর্থ হতেন । এইভাবে গ্রাম-গঞ্জে যাত্রাগান তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে । সে সময় বিনোদনের সবচেয়ে আকর্ষনীয় বিষয় ছিল কোন ধর্মীয় বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা । অনেক সময় গ্রাম-গঞ্জের স্বল্প নির্মিত জনেরা মিলিতভাবে কোন পালাগানের ব্যবস্থা করতেন নিজেরাই তাতে অভিনয় করে । গ্রাম্য সংস্কৃতি এইভাবে প্রসার লাভ করেছিল ।

যাত্রার নান্দনিক দিক অস্বীকার করা যায় না, অন্যদিকে এর ঐতিহাসিক মূল্যও সীমাহীন । বাংলার সংস্কৃতি বিকাশে যাত্রার এক বিশেষ ভূমিকা বর্তমান । এ কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলা চলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে যাত্রা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । জনচিত্তে যাত্রা জাতীয় আন্দোলনকে অনেকখানি প্রথিত করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রথমদিকে যাত্রা মূলতঃ ছিল ধর্মকেন্দ্রিক । পালাগান বা ঢপযাত্রারূপে যাত্রার শুভারম্ভ । কালীয় দমন, নৌকাবিলাস, কংস বধ, চণ্ডালিকা উদ্ধার, মাথুর, নদের নিমাই, সতী, বেহুলা, চাঁ-সদাগর প্রভৃতিকে এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রার পট পরিবর্তন । ধর্মীয় কাহিনী থেকে তার উত্তরণ মানবীয় দিকে । বিদ্যাসুন্দর, নলদময়ন্তী, সীতা, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাত্রা শিল্পের প্রশংসা করে গেছেন মুক্তকণ্ঠে । "প্রচুর দক্ষতা ও সাহস না থাকলে যাত্রা অভিনয় করা অত্যন্ত দুরহ । কারণ চারদিকে দর্শক এমতাবস্থায় অভিনয় নৈপুণ্য দেখানো খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার । নাটকের বেলায় তিনদিক আচ্ছাদিত থাকে অতএব নাট্যশিল্পীদের অভিনয় কুশলতা দেখাবার সুযোগ থাকে যথেষ্ট ।" যাত্রা যে লোক শিক্ষার অন্যতম বাহন কবিগুরু শুধু বাণীতে নয়, কাজেও তিনি তা প্রমাণ রেখে গেছেন শান্তিনিকেতনের উপর প্রকৃতির নিবিড় ঘন বৃক্ষমূলকে শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম স্থান নির্বাচন করে । শিক্ষামূলক কাহিনীকে অভিনয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীগণের অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন । যাত্রার মাধ্যমে যে শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা সম্ভব তা কোন বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ব বিদ্যালয়ের পক্ষেও সম্ভব নয় । পথ নাটক অনেকটা যাত্রাই আর এক রূপ ।

যাত্রা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন যাত্রায় প্রকাশের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে তার হৃদয়াবেগ । এই হৃদযবেগ নিয়েই তাকে শহর গ্রামের নির্মিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র সকলের চিত্তজয় করে বেড়াতে হচ্ছে । এই সর্বজনমুখিতাই যাত্রাকে 'যাত্রা' বলে চিনিয়ে দেবে । যতক্ষণ বুদ্ধির পথে না গিয়ে হৃদয়ের পথে সে থাকবে তাতে যতো আলোক সম্পাত ও শব্দ প্রণোদন করণের আধুনিকতম চাতুর্যই প্রকাশ পাক না কেন, যাত্রা থাকবে 'যাত্রা'ই তার পদস্খলন ঘটছে না ।"

মূলতঃ শীতকালেই যাত্রার আসর জমে ভাল, বিশেষ করে এইসব শীত প্রধান অঞ্চলে, শীতকালে শীতটা বেশ জাঁকিয়ে বসলে কাঁথা কম্বল গায়ে জড়িয়ে যাত্রার আসরে গিয়ে গায়ে গা লাগিয়ে বসে যাত্রা দেখার আনন্দই আলাদা । যাত্রার আসরে যাত্রামোদীরা ভুলে যায় জাতি ধর্ম, বর্ণ এর ভেদাভেদ । ধনী নির্ধনী সবাই যাত্রার আসরে চারদিকে গোল হয়ে বসে মুক্তমঞ্চেমুক্ত প্রাণে আনন্দ উপভোগ করে । এর মধ্যে এক অনাবিল আনন্দ ধারা প্রবাহিত হয় সে কথা স্বীকার করতেই হয় । জাতীয় সংহতির বাতাবরণ সৃষ্ঠ হয়, যাত্রার আসরে । লোকপ্রিয় জাতীয় উৎসব প্রাঙ্গণ - লোকপ্রিয়তার সবার উপরে । যাত্রা শোনো ফাতরা লোকে এই প্রবাদ আজ অচল ।

যাত্রার আসর রচিত হয় মধ্যখানে । চারদিকে জনতা, কেবলমাত্র সাজঘর থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের চলাচলের সরু পথ অভিনয় মঞ্চে যাওয়ার আসার জন্য উন্মুক্ত থাকে । ঐ পথ ধরেই অভিনেতারা মঞ্চে আসে, যে যার অভিনয় করে আবার ঐ পথেই ফিরে যান সাজঘরে । মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের আদান প্রদান চলে দলের লোক মারফত । মঞ্চ ঘিরে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র শিল্পীরা, তারাই যাত্রার প্রাণসঞ্চার করেন

মিলিতভাবে যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে যাকে বলে 'কনসার্ট' । 'কনসার্ট' চলে বেশী কিছুক্ষণ ধরে, পালা আরম্ভ হয় তার বেশ পরে । ঐ 'কনসার্ট' যেন সাপুরিয়ার বাঁশি । সাপুরিয়ার বাঁশী শুনে যেমন সাপ নৃত্য করে ঠিক তেমনি কনসার্ট এর বাজনা শোনা মাত্র যাত্রাগত প্রাণ মাতালের মত ছুটে চলে যাত্রাগানের আসরে দিকে । এর আকর্ষণ যে কত দুর্বার জীবনে যারা যাত্রা দেখেনি তারা তা কল্পনাও করতে পারবে না । অভিভাবকের শত সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে শীতের রাতে লেপের নিচে কোলবালিশকে রেখে কনসার্ট টেনে নিয়ে গেছে যাত্রার আসরে জীবনের জীবন্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তা আজ স্মরণে আসে । বাদ্য যন্ত্রশিল্পীদের মাঝেই একটুখানি স্থানে খুপটি মেরে বসে থাকেন সেদিনকার পালাবই হাতে 'প্রোমটার' অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংলাপ স্মরণ করিয়ে দেওয়াই যার প্রধান ভূমিকা । যাত্রা আসরের মূল বৈশিষ্ট্য মাঝখানে যে আসর রচিত হয় তার চারদিকে থাকে না কোন আবরণ শুধু উৎকন্ঠি সচকিত দর্শকজন । সবার মনোরঞ্জন করতে হয় যাত্রার শিল্পীদের বড় সুকঠিন কাজ । মধ্যে মধ্যে দর্শকজনের নানা ধরণের মন্তব্যও সহ্য করতে হয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের।

মানুষের আনন্দ উপভোগের ক্রম বিবর্তনে ঢপ যাত্রা রূপ নেয় বর্তমান যাত্রায় । সেই সময় থেকে নানাপ্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাত্রাতে অনেক পরিবর্তন এসেছে কালের রীতিতে যা একান্ত অপরিহার্য । এটা মেনে নিতে কোন বাধা নেই । পূর্বে যাত্রা ছিল শ্রবণীয়, বর্তমানে তা দর্শনীয় । আগে লোকে যাত্রা শুনতে যেত, বর্তমানে যায় দেখতে । হ্যাজাক, ডেলাইট, ধুমাকুপির কালে যাত্রা ছিল শোনার বস্তু, বর্তমানে বিদ্যুতের চকমকী রকমারীতে যাত্রা এখন দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে । অতীতে যাত্রায় না ছিল আলোর কারসাজি না ছিল এত চটককারী । কড়া চড়া গলার স্বর আর হাত পা ছুঁড়ে স্বর ক্ষেপনের মাধ্যমে জনগণের চিত্রকে আকর্ষন করা । স্বর উচ্চগ্রামে বাঁধতে না পারলে অভিনেতা দর্শকজনের চিত্তে কোন প্রকার সাড়া জাগাতে পারতো না । ফলে পালাগানের দুর্নাম হতো। কালের চাকা ঘুরে গেছে আজকাল আর চড়া সুরের অধিকারী হতে হয় না অভিনেতা অভিনেত্রীদের এসে গেছে যন্ত্রস্বর । স্বর যত জীর্ণই হোক তাকে বহুদূর পৌঁছে দেওয়া এখন কোন ব্যাপারই নয় । বিজ্ঞান আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে স্বর যন্ত্রবাহী হয়ে বহুদূর শোনার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে ।

যাত্রার অন্যতম আকর্ষন হলো 'বিবেক' । যাত্রার বিবেক পালা গানের অন্যতম অভিনেতা । বিবেক - যার আগমন মাত্র দর্শকজন বুঝতে পারে যাত্রা পালার গতি কোনদিকে কি হতে চলেছে । এ বিষয়ে অগ্রজ প্রতিম রমাপ্রসাদ দত্ত (পল্টুদা), একস্থানে, লিখেছেন —"যাত্রাভিনয়ের একটি প্রধান চরিত্র বিবেক । এই বিবেকের অভিনয়ের উপর সমগ্র

যাত্রার সফলতা নির্ভর করে । ঘটনার সংযোগ স্থাপন একমাত্র বিকেই করে থাকে, যার ফলে নাট্যরস জমজমাট হয় । এরই পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রার কোন চরিত্রে যখনই কোন দ্বিধা সঙ্কোচ দেখা দেয় কিংবা মনের ভাবকে, কোন সংকল্পকে আমূল পরিবর্তন বোঝাবার জন্য বিবেকের প্রয়োজন হয় । বিবেক তার গানের মাধ্যমে অভিনেতার মনের ভাবকে দর্শকের সামনে তুলে ধরেন । সুতরাং সেখানে অভিনেতা নিস্ক্রিয়, বিবেক সক্রিয় । অর্থাৎ বিবেকের অভিব্যাপ্তির মাধ্যমেই যাত্রার কুশীলবের মনের পরিবর্তন যেমন হতে হবে, তেমনি তারই সুষ্ঠু প্রকাশ দর্শকদের মনেও রেখাপাত করতে হবে । সুতরাং বিবেকের ভূমিকা যাত্রা অভিনয়ের একটি উল্লেখযোগ্য দিক । 'বিবেক' এর অভিনয় যদি ভাল না হয় তবে যাত্রাও জমে উঠবে না — এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা ।''

সেজন্য বলা হয়ে থাকে যে দলে বিবেক ভাল সেইদল জনচিত্ত জয় করে সহজে । যাত্রা পালায় বিবেকের ভূমিকা পালার গতি প্রকৃতিই শুধু নিয়ন্ত্রণ করে না , পালাগানে প্রাণ সঞ্চারও করে থাকে । ঐ বিবেকের গানের মধ্যে লোকশিক্ষা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে । যাত্রা লোক শিক্ষার বাহন বলে তখন থেকে চিত্রিত হয়ে আসছে । বিবেক জনচিত্তে কতখানি স্থান দখল করে তা উপলব্ধি করা যায় পালা শেষ দর্শক জনের ঘরে ফেরার পথে বিবেকের গান গাইতে গাইতে ফেরার মধ্যে । তখনই ধরা পড়ে বিবেক । কতখানি জুড়ে থাকে পাল গান ।

যাত্রার আসরে 'অধিকারীর' ভূমিকাটি বেশ চমকপ্রদ । ছাতা বগলে তিনি প্রবেশ করেন মঞ্চে, তখন হয়তো নর্তকী নৃত্যে ভুলাচ্ছে দর্শকজনের মন প্রাণ । অধিকারীর কোন সংলাপ নেই - তার আগমন নেহাৎ উপস্থিত দর্শকজনকে আগামী দিনের পালার নিমন্ত্রণ জানানো । যাত্রা পালার প্রায় অন্তিমলগ্নে তিনি বিনয়ে অবনত হয়ে দর্শকজনকে জানান দিয়ে যান পরের দিনের পালার নাম । ক্ষনিকের চমক সৃষ্টি ছাড়া তার আর কোন ভূমিকা থাকে না । তবুও তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় যাত্রা পালার বিজ্ঞাপন স্বার্থে ।

যাত্রা অভিনয় কালে অভিনেতাগণকে মঞ্চের চারদিকে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে হয় বলে একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটে শুধু তাই নয় খোলা জায়গায় হাজার হাজার দর্শকজনের সম্মুখে অভিনীত হয় বলে নাট্যরূপের মধ্যে সুক্ষ্ম ভাষাভিত্তিক বেশ অপেক্ষা, উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি ও নৃত্য গীতের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়ে থাকে । যাত্রার আসরের এমনই প্রাণ খোলা হৃদয় খেলা আমোদ গ্রহণের মিলনবাসর যা সবকালে সবদেশে চির আকর্ষনীয় ।

অতীতে যাত্রাপালায় ছেলেরাই মেয়েদের অভিনয় করত । যুগের কারণে সে সময় মেয়েদের প্রকাশ্যে মঞ্চে অভিনয়ের অনেক বাধা ছিল বিশেষ করে অবিবাহিতরা তো

বাড়ির বাইরে বের হবার অনুমতিটুকুও পেত না। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে তা দূর হলেও অভিনয়ে অংশগ্রহণ তাও প্রকাশ্যে যাত্রামঞ্চের মত চারদিক উন্মুক্ত মঞ্চে কল্পনারও অতীত ছিল। কালের চাকা ঘুরে যখন অন্ধ কুসংস্কারকে টোকা দিল — সমাজ উন্নত হল, শিক্ষার প্রসারতা ঘটলো, সেই সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ও অভিভাবকদের চিন্তার প্রসারতা ঘটল, মেয়েদের অভিনয়ে অংশ গ্রহণের মঞ্চ প্রশস্ত হল। অবশ্যই সেটা স্বাধীনতা লাভের বেশ কয়েক বছর পর।

যাত্রার সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের যোগসূত্র নিবিড়। সারা দিনের পরিশ্রমের পর যাত্রার আসরে তাদের গভীরভাবে আকর্ষন করে। যাত্রার আসরে বসে তারা কিছুক্ষণের জন্য হলেও সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি ও মনের সকল দুঃখ, দারিদ্রের জ্বালা বেদনা সবকিছু ভুলেগিয়ে শিল্পীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। একথা অনস্বীকার্য পুরানে সামাজিক ঘটনাবলী তুলে ধরতে যাত্রার বিকল্প কিছুদিন আগেও খুঁজে পাওয়া যেত না।

মনে পড়ে শীতের রাত্রে যাত্রা আসরের ঢং ঢং ঢং করে তিনবার ঘন্টাধ্বনি পরার সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা- বাঁশীর একত্রে বেজে উঠা। বাজনা দিয়ে আসর গরম করাই ছিল যাত্রার রীতি। পালা আরম্ভ হতে দেরী হতো - আগে চলত নিছক কিছু গানের সুরে বাজনা সেই ফাঁকে পান বিড়ি সিগারেট খাওয়ার জন্য দর্শকজন নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসন অন্যের হেপাজতে রেখে উঠে যেতেন। ধুমপানান্তে তারা তড়িঘরি করে ছুটে আসতেন নিজের স্থানে — কেউ কেউ এসে দেখতেন তার স্থান দখল করে কম্বল চাদর জড়িয়ে বসে আছে অন্যজন। ফলে বিবাদ অনিবার্য হয়ে উঠত — হাতাহাতি হতো আসর গরম করা কথা কাটাকাটি চলারকালেই যাত্রার কনসার্ট অর্থাৎ নানাধরণের বাদ্যযন্ত্রের মিলিতসুর বেজে উঠতো। বিবাদ মিলিয়ে যেত মুহূর্তে। চেপে চুপে বা পথেও বসে যেত সব সখীগণের মিলিত নৃত্যে সব কোলাহল হারিয়ে যেত। সামান্য স্থান নিয়ে বিবাদ করে অমন বিনে পয়সায় আনন্দ উপভোগের নির্মল আনন্দটুকু কেউ হারাতে রাজি হতেন না।

কালো লম্বা বাঁশী যাত্রার পেতলের বাঁকা বাঁশি তার সঙ্গে ঢোল করতাল আর হারমোনিয়ামের মিলিত সুর জনতাকে উন্মুখ করে তোলে। এই বুঝি আরম্ভ হয়ে গেল পালা। আর ঠিক ঐ সময়েই আসরে প্রবেশ করে সেদিনের পালার বই হাতে প্রোমটার। তিনি এসে স্থান করে নেন বাজনা দারদের মধ্যে। মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছর আগে যাত্রাগানের আসরের রূপ ছিল ঐ রকম। তখন যাত্রা হতো সারা রাতব্যাপী উষাকালে যাত্রা ভাঙ্গতো অনেক যাত্রাগানের শতরঞ্জিতে ঘুমিয়ে পড়তো। যাত্রা আজ তিন ঘন্টায় এসে গেছে। এ কথা স্বীকার করতেই হয় যাত্রা তার পূর্ব গৌরব থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। পূর্বকার

সেই অপূর্ব পৌরাণিক সংলাপ আজ যাত্রায় অনুপস্থিত। কে সেই দৃপ্ত চড়া সুর ভুল উচ্চারণ।

"দন্তে দন্তে হতেছে সংহার কর্ষন - পদভরে মোদিনী কম্পিত,

মুখ মণ্ডলহতে বাহিরিয়া আসে বিশ্বগ্রাসী হুতাসন।"

আমাদের জাতীয় আন্দোলনে কবিগান ও যাত্রার দল এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এ কথা অনস্বীকার্য। ইতিহাসের আলোকে একথা বলা চলে উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশের অগণিত নারী পুরুষ জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণে দুঃখকষ্ট অশেষ সহ্য করেছিল। স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষে বাংলার দান ছিল সবার চেয়ে অধিক। স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে বাংলা দেশের বরিশালের টাউন হলে জনগণকে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য মহাত্মা অশ্মিনী কুমার দত্ত জ্বালাময়ী বর্ক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেই সভায় যজ্ঞেশ্বর দাস পরবর্তীকালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস উপস্থিত ছিলেন। তিনি তন্ময় হয়ে অশ্বিনী দত্তের বক্তৃতা শুনছিলেন। বক্তৃতা করার কালে অশ্বিনী কুমার জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন তাদেরই বক্তৃতার বিষয়বস্তু যদি কোন কবি বা গায়ক যাত্রা পালার মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে প্রচার করে তবে তা হবে আরো হৃদয়গ্রাহী ও কার্যকবী। তার কথায় অস্থির হয়ে উঠেছিল যজ্ঞেশ্বরের মনপ্রাণ। সে যুগের অন্যতম চারণ কবি যজ্ঞেশ্বর ছিলেন উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী। তাঁর পূর্বেকার জীবনী থেকে জানা যায় কিশোর বয়স থেকে তিনি তার খেলার সাথীদের নিয়ে যাত্রা অভিনয় করতে খুব ভালবাসতে। একবার কিছু উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজ মাতাল তার গ্রামে অত্যাচার চালালে তিনি প্রতীজ্ঞা করেন যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাবেন, কিশোর বয়সেই তিনি যাত্রা দলে যোগদান করেন ও দলের সঙ্গে বহু দেশে ঘুরে বেড়ান। ঐ ভ্রমণে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। পরবর্তীকালে তা তাকে মনুষ্য চরিত্র সৃষ্টি করতে প্রেরণা দিয়েছিল। ফলে তিনি সার্থক যাত্রা শিল্পী হয়ে উঠেন। সে সময় থেকেই তার মনে দানা বাঁধতে থাকে যে স্বদেশী আন্দোলনেব জোয়ার আনতে হবে এবং তা আনতে হবে যাত্রাগানের মাধ্যমে।

তিনি সুন্দর সুন্দর স্বদেশী গান ও স্বদেশী যাত্রাপালা রচনা করে যাত্রাদলের মালিকদের দিলে বিদেশী শাসকের ভয়ে তারা তা মঞ্চস্থ করতে অস্বীকার করে। সে সময় স্বদেশী ভাবাপন্ন লোকদের উপর বৃটিশ সরকার চরম অত্যাচার করত।

স্বদেশ প্রেমিক কবি অনেক চেষ্টায় নিজেই একটি যাত্রাদল গঠন করেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ও স্বীয় গুরু রামদাস স্বামীর আশীর্বাদ গ্রহনান্তে তিনি তার রচিত স্বদেশ সংগীত, স্বদেশী ভাবাপন্ন যাত্রাপালা নিয়ে গ্রামের পর গ্রামের জনচিত্তে কম্পন সৃষ্টি করেছিলেন। তার রচিত যাত্রা পালাগুলিতে সে সময়কার জনগণ এক নতুন স্বাদ আস্বাদন

করেছিল বিশেষ করে তার রচিত স্বদেশীগানগুলি ছিল অন্তরের ফুলকী । সেজন্য অবশ্য তাকে বৃটিশ সরকারের কারাগারেও যেতে হয়েছিল বারবার । কিন্তু অকুতোভয় মুকুন্দ দাস তাতে বিচলিত হন নি । দেশবাশী তাকে তাদের অন্তরের অন্তস্থলে বরণ করে নিয়েছিল। সারা পূর্ববঙ্গ ও কলকাতার বহু স্থানে তিনি স্বদেশী সঙ্গীত ও স্বদেশী যাত্রা পালা পরিবেশন করে তিনি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় এসেছিলেন । তাকে পূর্ববঙ্গ থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন ম্যাজিসিয়ান প্রফুল্লচন্দ্র সেন । এডভোকেট রমানাথ চক্রবর্তী, এডভোকেট প্রফুল্ল ভট্টাচার্য তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন রাজগুরু বাড়ী শ্রীপাটে । লুঙ্গির মতন দুভাজ করা পরনে কাপড়, আলখোলোর মত সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী, কোমরে সাদা পেটি, মাথায় সাদা পাগড়ী, হাতে লাঠি । স্বামীজীর মত বেশভূষায় । শ্রীপাটের তরুণ সঙ্গের সদস্যাদের সঙ্গে তিনি মিলিত হন এবং রাজ গুরু বাড়ির নাট মন্দিরে তিনি তার সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন 'বান এসেছে মরা গাঙ্গে খুলতে হবে নাও ---

তোমরা এখনো ঘুমাও ।''

''জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জ্বালিয়াত খেলছ জুয়া'' ।

''ভয় কী মরণে মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমরাঙ্গনে ।'

'আজ শ্বেত মহিষ বলি দিয়ে হাত রাঙ্গাতে হবে ।'

এই শেষের গানটি গাইলে তাকে একশত টাকা জরিমানা দিতে হতো তখন - শ্রীপাটে গানটি গাওয়ার জন্য তাকে কোন জরিমানা দিতে হয়নি ।

তরুণ সংঘের সদস্যরাই তাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মহারাজ বীরবিক্রমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ।

চারণ কবি মুকুন্দ দাসের যাত্রা পালা ছিল মূলত গানভিত্তিক সেজন্য জনচিত্তে সহজে সাড়াদিত । ঐসব যাত্রাপালা ছিল গীত নাট্যের সমতুল । মহারাজ বীর বিক্রমও রাজবাড়ি মহিলা তার যাত্রা গান শুনে খুবই প্রীত হয়েছিল । তিনি শুধু শ্রীপাটেক রাজবাড়িতেই যাত্রাপালা অভিনয় করেন নি সে সময়কার বিশিষ্ট জনের বাড়িতে ... হৃদয় রঞ্জন ঠাকুর, ললিত ঠাকুর, দুর্গাবাড়ি ও আর অনেক স্থানে পালা গান করে গেছেন ।

স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে দেশের জনচিত্ত যখন উথাল-পাতাল তখন লোকে পৌরাণিক যাত্রা পালা অনেকাংশে বর্জন করতে থাকে । এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় ---'' পৌরাণিক যাত্রাগুলি অনুসরণ করলেও বোঝা যায় যে বাংলা নাটক যখন যে ভাব ও রূপ পরিগ্রহ করেছে যাত্রাও তাই অনুসরণ

করেছে। চারণ কবি মুকুন্দদাসের রচিত স্বদেশী যাত্রা ও গান আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বঙ্কিমের আনন্দমঠের সমতুল বলে বিবেচিত হতো।

এখন আসা যাক ত্রিপুরায় যাত্রাগানের আসরের কথা। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় যে যাত্রা গান হতো - তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ত্রিপুরার রাজকুল। শুধু মাত্র যাত্রাই নয় তাদের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠ পোষকতায় ত্রিপুরার শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত এক কথায় সুকুমার শিল্পের সকল দিক ও তাদের শাখা প্রশাখা পুষ্ট হয়েছে। নানাপ্রকার উৎসবকে কেন্দ্র করে তারাই বসাতেন যাত্রার আসর। রাসযাত্রা, বাসন্তীপূজা, দুর্গাপূজা, চরকপূজা, নববর্ষ ইত্যাদিকে উপলক্ষ করে যাত্রার আসর বসতো রাজপ্রাসাদের পেছন দিকের মাঠে। বিশেষ করে রাসযাত্রাকে উপলক্ষ করে রাজগীর ত্রিপুরায় রাজগুরুবাড়ি শ্রীপাটে যে যাত্রার আসর রচনা হতো — তাতে ঐ সময়কার নামকরা সব যাত্রার দল অংশ নিত। ঐ যাত্রার দল আসতো অধুনা বাংলাদেশের নানাস্থান থেকে এমন কী কলকাতা থেকেও। শ্রীপাটের রাসোৎসব তিনদিন ধরে চলতো ঐ তিন দিনই যাত্রা হতো। ঐ তিন দিনের জন্য তখনকার দিনের নামকরা যাত্রাপার্টি আট-ন'শ এমন কী বারশো টাকাও নিত। তাছাড়া স্থানীয় দুর্গাবাড়ি, শিববাড়ি, আস্তাবল মাঠে, হৃদয়রঞ্জন ঠাকুরের বাড়ি, খোস বাগানের (অধুনা হকার্স কর্ণার) মাঠে শীতকালব্যাপী যাত্রা গান হতো। কয়েক বছর পরে শিশু উদ্যানে যাত্রার আসর বসতো। দুর্গা বাড়ির 'মুকুন্দমঞ্চ' বর্তমানে যাত্রার অন্যতম মঞ্চ।

ত্রিপুরায় বিশেষ করে রাজাদের শাসনকালে রাজধানী আগরতলা, যে সময়ে রাজধানী ছিল পুরাতন হাবেলীতে যা পুরাতন আগরতলা নামে পরিচিত, তখন সেখানে ঢপ যাত্রার আসর বসত ধুমাকুপির আলোতে। ঐ ঢপ যাত্রা ছিল মূলতঃ একক অভিনয়ের। একজন শিল্পীই নানা কাহিনীর মাধ্যমে ঢপযাত্রা করতেন সঙ্গে অবশ্য নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র থাকত। ঐ সব ঢপ যাত্রা ধর্মীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত হতো। যেমন শ্রী রাধার মানভঞ্জন, নিমাই সন্ন্যাস, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, সাবিত্রী সত্যবান প্রভৃতি। একান্ত গ্রাম্য পরিবেশে ঐ সব ঢপ যাত্রা জনমনে গভীর রেখাপাতই শুধু করতো না, তাদের বিমল আনন্দ দিত।

কালের গতি পরিবর্তনও বিশেষ করে মহারাজা কৃষ্ণ কিশোর কর্তৃক নতুন হাবেলী তথা বর্তমান আগরতলায় রাজধানী পত্তন করায় জনগণের রুচির পরিবর্তনের সূচিত হয়। কৃষ্ণকিশোর গেলেন, এলেন ঈশানচন্দ্র! তার আমলে মণিপুরী সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনীয়ারা ঢপ যাত্রার প্রচলন করেছিল। নৃত্যের মাধ্যমে চামর হাতে নিয়ে নেচে নেচে পালা পরিবেশন করতেন। তারপর এলো নানা সাজে সজ্জিত হয়ে ঢপ যাত্রা, ঐ সব ঢপ যাত্রায় সঙ্গীতই প্রাধান্য পায়। গীতি নাট্যই ছিল ঢপ যাত্রার প্রাণ। এলো হ্যাজাক লাইটের দিন। দর্শককে

আটকে রাখা যেত তার সঙ্গে থাকতো কৌতুক নকসা । ফলে আসর জমজমাট । সে সময় দর্শক জন ঐ রকমই চাইতো । ঢপ যাত্রার একটা সুবিধা ছিল সে সময় যে কোন বাড়ি উঠানে বা পূজা মণ্ডপের ভিতরে আসর জমানো যেতে । দর্শক জনের অধিকাংশই অল্প শিক্ষিত ও দরিদ্র শ্রেণী হওয়ায় সংলাপ যেমনই হোক গানটাকে বেশী পছন্দ করতো সঙ্গে যদি নাচ থাকতো তবে তো কথাই নেই । অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, জমিদার শ্রেণী বা উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীর বাড়িতে দোল দুর্গোৎসব ঝুলন পূর্ণিমা ঐসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষেই সাধারণতঃ ঢপ যাত্রার আসর রচনা হতো ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ত্রিপুরায় অবশ্যই রাজেন্দ্র শাসিত ত্রিপুরায় নাট্যগীতাদির বহুল প্রচার হয়েছিল । সে সময়কার কবির লড়াই, পাঁচালী, পদকীর্ত্তন, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি যাত্রার পূর্বেকার রূপ বলে চিহ্নিত করা চলে।

ত্রিপুরার সংস্কৃতি ভাবাপন্ন নৃপতিগণ সকল রকম সুকুমার শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তারা নিজেরা যেমন ছিলেন প্রতিষ্ঠাভাজন শিল্পী তেমনি শিল্পীদের মর্যাদা দিতেও কোনরূপ কুণ্ঠা প্রকাশ করতেন না । বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসম্ভারের ন্যায় বীরচন্দ্রের রাজসভাও বহুবিশিষ্ট শিল্পী বিশেষ করে বহুবিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর সমাবেশ সদা গমগম করতো । সমকালীন নাট্যশিল্পীদের ও ত্রিপুরার রাজগণ নানাভাবে অনুপ্রাণিত করতেন ।

সে সময় রাজ্যের নাট্যশিল্পীরা নিজেদের মধ্যে নানা দল গঠন করে নাট্যচর্চার মেতে উঠেছিলেন । প্রাচীন নাট্যগীত নামে এ যুগের, যাত্রায় রূপান্তরিত হয় । সেসবের মধ্যে ধর্মীয় ... মূলক ও দেশাত্মবোধক পালা থাকতো । অশ্লীলতাপূর্ণ নাট্যগীত ছিল না, এমন বলা চলে না । তবে তা প্রচারে বাধা প্রাপ্ত হতো ।

ইতিহাসের আলোকে ত্রিপুবায় যাত্রা চর্চার কথা বলতে গেলে বলতে হয় মহারাজ বীরচন্দ্র যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজন সত্যিকারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তেমনি গৌড়িয় ও মণিপুরী ধারায় পুষ্ট অভিনয় বিশেষ করে মণিপুরী নৃত্যও কৃষ্ণ বিষয়ক পালা অভিনয়েও উৎসাহ দিতেন ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এ রাজ্যে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা গীতিনাট্য পালা অভিনয়ের সূচনা হয়েছিল বলে বলা চলে ।

বীরচন্দ্র পুত্র রাজর্ষি রাধাকিশোর সাহিত্যের মুখ্য পোষকতা করলেও যাত্রাভিনয় কবির লড়াই ও প্রচলিত লোকনাট্য চর্চারও তিনি একজন উৎসাহদাতা ছিলেন । তাঁর রাজত্বকালে আগরতলায় যাত্রাপার্টি গড়ে উঠেছিল । তাদের মধ্যে কর্ণেল বাড়ির যাত্রা

পাট্রি কাঁসারি পট্টির নাম করা যায় । তখন আদিবাসীরাও যাত্রার দল গড়ে ভালো যাত্রা পালা করতেন ।

এ রাজ্যের যাত্রার ইতিহাস বলতে গেলে শ্রীপাট রাজগুরুর বাড়ির কথা বলতেই হয় । ত্রিপুর রাজগণের গুরুবাড়ি শ্রীঘাট প্রভুর বাড়িতে রাজগীর ত্রিপুরায় রাসোৎসবকে কেন্দ্র করে অধুনা বাংলাদেশও কলকাতা থেকে সে সময়কার বিখ্যাত যাত্রা দলগুলি এসে এখানে যাত্রা করে গেছে এ কথা পূর্বে উক্ত হয়েছে । তাদের উৎসাহে উৎসাহী হয়ে পরবর্তীকালে এ রাজ্যে অনেক যাত্রা দল গড়ে উঠেছিল । তারা কয়েক বছর যাত্রা সম্মেলন করে ত্রিপুরায় যাত্রাগানের স্থায়ী আসন রচনা করেছেন / সেই প্রভাব আজও সমানতালে প্রবহমান ।

১৯৫৪সালের শেষের দিকে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন উৎসবের অঙ্গস্বরূপ তরণী সেন বধ নাটকের অভিনয় ত্রিপুরার নিজস্ব যাত্রা শিল্পের ইতিহাসে একটি কীর্তিসমুজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল।

আগে জনগণ যাত্রাকে যতটা হীন দৃষ্টিতে দেখতেন আজ আর তা নেই । যাত্রা শিল্প এখন তার স্বমহিমায় উজ্জ্বল । লোকশিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যমরূপে যাত্রার সর্বশেষ গুরুত্ব অনস্বীকার্য । যাত্রা স্বদেশী আমলে যেমন এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে এসেছে বর্তমানে সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে সে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সক্ষম । বিশেষ করে পনপ্রথা, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি বিষয়ে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —"যাত্রা গান যেন শুকনো গাঙে এক ক্রোশ থেকে দু'ক্রোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা । পথের লোক হঠাৎ এসে আঁজলা ভরে তেষ্টা মিটিয়ে নেয় ।"

১৯৭৯ ইং সনে রাজধানীর মুকুন্দ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন । চলেছিল কিছুকাল, পরে আবার ৮৮ইং তা অনুষ্ঠিত হয় ।

যাত্রা লোক সংস্কৃতির ধারক বাহক । লোকশিক্ষা এবং লোক রঞ্জনের এই শক্তিশালী মাধ্যমটি সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই । এ রাজ্যে যাত্রা সম্মেলন একদা শিল্প জগতে শহর ও গ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । যাত্রা সম্মেলনে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরার ভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই স্ব স্ব দল নিয়ে রাজধানীতে এসেছিলেন সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য ।

যাত্রা প্রচারের টেকনিক আজ আধুনিক কায়দায় রূপান্তরিত হচ্ছে । সিনেমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে কাগজে নানা প্রকার বিজ্ঞাপন দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হচ্ছে । প্রয়োগ পদ্ধতিতেও আধুনিক আঙ্গিকে কাজে লাগানো হচ্ছে ।

এ রাজ্যের যাত্রার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ । এক প্রবন্ধে তার সবকিছু তুলেধরা সম্ভব নয় । তবে এ বিষয়ে যবনিকা টানার আগে কৈলাসহরের অতীত ত্রিপুরার এক স্বনাম খ্যাত

যাত্রা শিল্পীর কথা বলতেই হয় তার নাম ছিল কান্তি সিংহ। তাঁর যাত্রা দলের নাম ছিল সিংহযাত্রাপার্টি। মণিপুরী সম্প্রদায়ের ঐ যাত্রার দল সুদীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে ত্রিপুরার গ্রামগঞ্জে যাত্রাগান পরিবেশন করে জনগণকে আনন্দ বিলিয়েছিলেন। তাঁদের পালাগুলি ছিল চিত্রাঙ্গদা, শ্মশান মিলন, প্রবীর পতন, ধনসংসার। তখন যাত্রা করার কালে মাইকের কথা কেউ চিন্তাই করতে পারতেন না। আলো বলতে ছিল হ্যাজাক। এই অভিনয়ে দক্ষতার চাইতে গলার শক্তি এবং কারুকার্য ও শারীরিক অভিনয়ই বেশী মূল্য পেত। সংলাপ ছিল পদ্যে যেমন 'মাইরী নাকি পোড়া মুখী', 'পাগুর থাকী ভাঙ্গা ঢেকি', 'বিড়াল চোখী খাঁদা নাকি', 'ঘুঘু পাখি কলসী কাখী'।

সে সময়কার যাত্রাগান মূলতঃ গ্রামের মানুষকে বিশেষ করে আকর্ষন করতো। ফলে ঐ রকম সংলাপ খুব সম্ভবত গ্রাম্য দর্শকদের খুব পছন্দই ছিল।

সেকালে যাত্রায় যুদ্ধটা খুব জনপ্রিয় ছিল। পান থেকে চুন খসলেই রাজায় রাজায় যুদ্ধ বেঁধে যেত। জনতা ও নিজেদের ঐ যুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতো - যাত্রায় হতো প্রাণ সঞ্চার। যাত্রা সম্বন্ধে প্রখ্যাত অভিনেতা শিশির ভাদুড়ী বলেছেন — "যাত্রার মধ্যেই আমাদের অভিনয় শিল্পকে খোঁজা উচিত ছিল।"

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

লেখক সুদর্শন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম - ১৯৩৫ এর ১৫ই ডিসেম্বর রাজধানী আগতলায়। পিতা ঁঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাজেন্দ্র শাসিত ত্রিপুরার 'সাপ্তাহিক ত্রিপুরা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, মাতা ঁসুনয়না দেবী। তিনি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে পড়ার সময় থেকেই লেখালেখির জগতে আসেন। ঁনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের আশীর্বাদ ধন্য লেখক শিথক্ষকতা করার ফাঁকে ফাঁকে ত্রিপুরার ও কলকাতার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ কবি ও হাস্যরসাত্মক গল্প লিখতে থাকেন। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটক দপ্তরের মুখপাত্র 'গোমতী ও অন্যান্য সরকারী স্মারক গ্রন্থও পত্রিকার নিয়মিত লেখক তিনি। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের এবং তিনি আজীবন সদস্য। তাছাড়া শিল্পীবাসর, সাহিত্য বাসর, ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদ, সঙ্গীতাচার্য শচীনকর্তা ও অনিল ঠাকুর স্মারক সমিতির, অরবিন্দ সোসাইটি, ত্রিপুরা আর্টিস্ট ফোরাম, কবি হরিচরণ স্মারক সমিতি, ত্রিপুরা এন্টিড্রাগ সোসাইটি মুক্তধারা সাংস্কৃতিক সংস্থা, ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পরিষদসহ ত্রিপুরার প্রায় সকল শিল্প সাহিত্য, সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক সংস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কবি গল্প ও নাট্যকার মুখোপাধ্যাট আকাশবাণী ও দূরদর্শনের একজন গীতিকার ও শিল্পী।)

******